দীন ইসলাম-এর

জানা-অজানা

কুরআন ও সহীহ হাদীসভিত্তিক আমল
বনাম
সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি

সংকলন ঃ
ড. ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ

প্রচারক কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণ
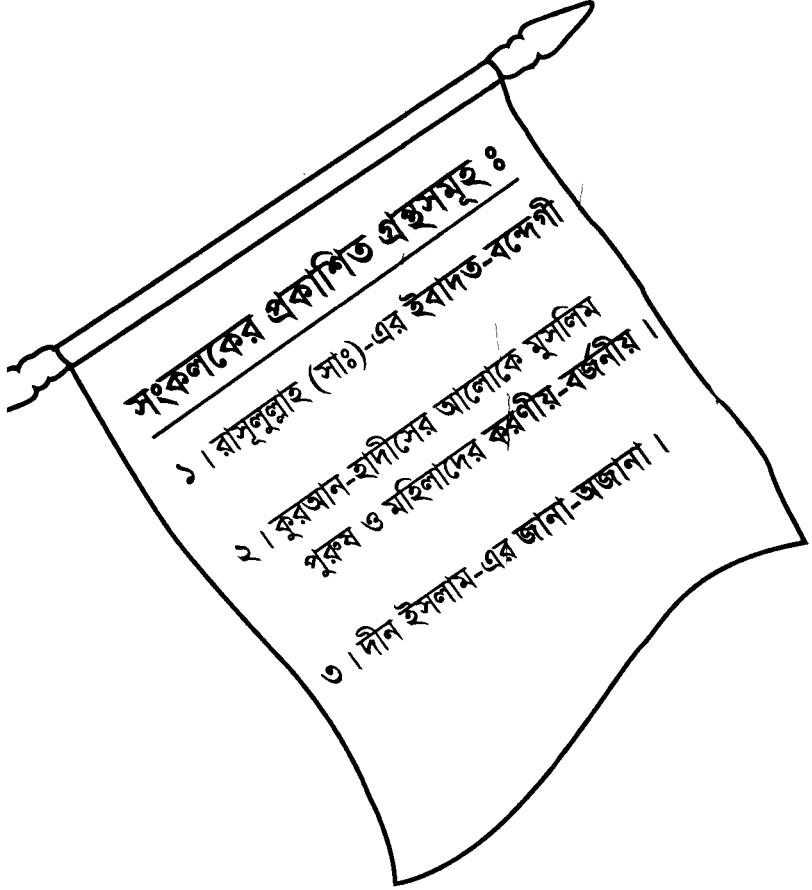
সংকলকের প্রকাশিত গ্রন্থসমূহ ঃ
১। রাসূলুল্লাহ (সাঃ)-এর ইবাদত-বন্দেগী
২। কুরআন-হাদীসের আলোকে মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের করণীয়-বর্জনীয়।
৩। দীন ইসলাম-এর জানা-অজানা।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

দৃষ্টি আকর্ষণ

মুহতারাম/মুহতারামা
আসসালামু আলাইকুম ওয়া রাহমাতুল্লাহ।
"দীন ইসলাম-এর জানা-অজানা" বইটির প্রকাশক হিসাবে মহান আল্লাহর নিকট অশেষ শুকরিয়া জানাচ্ছি যে, কিছু সংখ্যক ধর্মপ্রাণ ভাই ও বোনেরা এই বইটি প্রায় ২৫ (পঁচিশ) হাজার কপি ছাপিয়ে প্রচারক হিসাবে "বিনামূল্যে" বিতরণ করেছেন। বইটি পাঠ করার পর যদি দীন প্রচারের স্বার্থে আপনিও প্রচারক হিসাবে "বিনামূল্যে" বিতরণের প্রয়োজন বোধ করেন তাহলেই নিম্নের মোবাইল ফোনের মাধ্যমে আপনার প্রয়োজনীয় কপির সংখ্যা জানাবেন এবং প্রচারক হিসাবে নাম দিয়ে বা নাম না দিয়েও প্রচারের জন্য সরবরাহ নেয়ার অর্ডার দিতে পারবেন। প্রয়োজনে আমরা আপনার ঠিকানায় বই পৌছানোর চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বইটি ছাপানোর জন্য প্রয়োজনীয় কাগজ, প্রেসের মুদ্রণ ও বাইন্ডিং খরচ শুধু লাগবে, অন্য কোন খরচ দিতে হবেনা। বর্তমান প্রেক্ষাপটে খরচ পড়েছে প্রতি কপি ৮৫/- টাকা হারে একশত কপির জন্য ৮,৫০০/- এবং এক হাজার কপির জন্য ৮৫,০০০/- টাকা। বইটিতে প্রতিটি বিষয়ে প্রথমে প্রমাণপঞ্জি হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন ও সহীহ হাদীস গ্রন্থ থেকে উল্লেখ রয়েছে এবং একই সঙ্গে বর্তমান সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্গে কিছুটা তুলনা করে উপস্থাপন করা আছে। তবে কোন দল/মত/পথ এর কাহাকেও হেয় করার জন্য নয়।

এমতাবস্থায়, আপনি সমাজের একজন যোগ্য ও সচেতন ব্যক্তি হিসাবে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও দীনের দাওয়াতে আপনার ভাই-বোন/আত্মীয়-স্বজন/বন্ধু-বান্ধব/অফিসের কর্মকর্তা-কর্মচারী/নিজগ্রাম-পার্শ্ববর্তী গ্রামের লোকদেরকে ইবাদত-বন্দেগী শিক্ষার, দীন সম্পর্কে জানা ও বুঝার জন্য প্রতিটি ঘরে বা পরিবারের মধ্যে কুরআন ও হাদীসের দলীল সমৃদ্ধ এই বইটি বিতরণের মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার সন্তুষ্টি অর্জন করার উদ্যোগ নিতে পারেন। কেবলমাত্র লোকদেরকে সাহায্য, দান-খাইরাত বা যাকাত দিয়েই আপনার/আমার কর্তব্য শেষ হয়ে যাবেনা। কারণ আমাদের ধর্ম, দীন, ইবাদত-বন্দেগী ইত্যাদি সম্বন্ধে সঠিকভাবে নিজে জানতে হবে এবং অন্যকেও জানাতে হবে। তাহলেই আমাদের আমল/দায়িত্ব পরিপূর্ণতা লাভ করবে। নতুবা আল্লাহর নিকট আমাদেরকে প্রশ্নের সম্মুখীন হতে হবে। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যারা জানে এবং যারা জানে না তারা কি সমান? রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যে কোন আমল করার পূর্বেই আমাদেরকে ঐ আমল সম্বন্ধে পরিপূর্ণ জ্ঞান অর্জন করতে হবে। রাসূল (সাঃ) আরও বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ ধর্মের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই তা পরিত্যাজ্য।

অতএব, আসুন আমরা আমাদের সকল প্রকার ইবাদতের জ্ঞান লাভ করি ও অন্যকে জানানোর মাধ্যমে ইসলামের প্রচার, প্রসার ও দাওয়াতের ক্ষেত্রে এই বইটির প্রচারার্থে নিজের অর্থ ব্যয় বা নিজের দান-খাইরাত এর টাকা বা আমরা নিজে যে যাকাত দিয়ে থাকি সেখান থেকে কিছু অর্থ দিয়ে (যাকাতের টাকা ইসলামের প্রচার, প্রসার, গবেষণা ও প্রকাশনার কাজে ব্যয় করা যায়) এই বইটি ছাপিয়ে যতটা সম্ভব আপনার/আমাদের পরিচিত/অপরিচিত ঘরে ঘরে পৌছে দিয়ে দীনের দাওয়াতী কাজে অংশ গ্রহণ করে সবাই আমরা সহীহ আমল করার চেষ্টা করি। আল্লাহ আমাদেরকে এই বইটি পাঠে উপকৃত হওয়ার তাওফীক দান করুন। আমীন

নিবেদক — মোবাইল # ০১৫৫২-৩৯৯৬০০ # ০১৭১৪-৫৫৬০০৮
প্রকাশক — # ০১৭১৫-৬৯৬৯৮৪ # ০১৮২৪-৮৬৮০১২

দীন-ইসলাম এর

জানা-অজানা

কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক আমল
বনাম
সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতি

সংকলন ঃ ড. ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ

সম্পাদনা ঃ ইউসুফ ইয়াসীন

প্রকাশক ঃ
মোঃ আশরাফ হোসেন
গ্রাম ঃ মহানন্দখালী, পোষ্ট ঃ নওহাটা
থানা ঃ পবা, জেলা ঃ রাজশাহী

সার্বিক সহযোগিতায় ঃ ইঞ্জিনিয়ার মোঃ নজরুল ইসলাম

প্রথম প্রকাশ ঃ রজব-১৪৩৩, জুন-২০১২
প্রথম সংস্করণ ঃ যিলহাজ্জ-১৪৩৪, নভেম্বর-২০১৩

প্রচারক কর্তৃক বিনামূল্যে বিতরণ

প্রচারক ঃ

ঠিকানা ঃ

কম্পোজ ও পেজ মেকআপ ঃ মোঃ আবু তাহের সরকার
প্রচ্ছদ ঃ মোঃ মিজানুর রহমান
মুদ্রণ ঃ মাহির প্রিন্টার্স, ২২৪/১, ফকিরের পুল, (১ম গলি) ঢাকা-১০০০

সূচীপত্র

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"

মুখবন্ধ

সমস্ত প্রশংসা একমাত্র **আল্লাহর জন্য**, যিনি আমাদেরকে আশরাফুল মাখলুকাত হিসাবে সৃষ্টি করেছেন **এবং তাঁরই প্রেরিত** রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে হিদায়াতের **সরল ও সঠিক পন্থায়** পৌছিয়েছেন দু'টি জিনিসের মাধ্যমে। একটি কুরআন, **অন্যটি তাঁর প্রেরিত নাবীর জীবনাদর্শ**, যার নাম সুন্নাত। (আবূ দাউদ/৩৫১২) **এ দু'টির মাধ্যমে মানব সমাজ চিরন্তন** সত্য সঠিক কর্মপন্থা নিরূপনের **সন্ধান ও পরকালের মুক্তির পথ প্রাপ্ত হয়। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ** আজ তোমাদের **জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম ও তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ** সম্পূর্ণ **করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। (মায়িদা-৩) যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? (যুমার-৯) তুমি বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে** সংবাদ দিব তাদের, যারা কর্মে অধিক **ক্ষতিগ্রস্ত? তারাই** সেই **লোক যাদের** প্রচেষ্টা দুনিয়াবী জীবনে বিভ্রান্ত হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা **সৎ কর্ম** করছে। (কাহফ-১০৩-১০৪) তোমরা আল্লাহকে যথাযথভাবে ভয় কর এবং **তোমরা** মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করনা। (আলে ইমরান-১০২) রাসূল (সাঃ) **বলেছেন** ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। (মুসলিম/৪৩৪৩)

উপরোক্ত আয়াতগুলির প্রতি লক্ষ্য রেখে মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবনে দীন জানার ব্যাপারে উপদেশ পৌছে দেয়া নৈতিক দায়িত্ব মনে করেই বইটি সংকলনের তাগিদ অনুভব করি। ইসলামের বিভিন্ন বিষয় ও প্রশ্নোত্তরের মাধ্যমে বইটি সংকলন করা হয়েছে। প্রতিটি বিষয়ে প্রথমে প্রমাণপঞ্জি হিসাবে ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে বর্ণনা এবং পরবর্তীতে বর্তমান সমাজে প্রচলিত রীতি-নীতির সঙ্গে তুলনা করার চেষ্টা করা হয়েছে। তবে কোন দল/মত/পথ এর কাউকে হেয় করার জন্য নয়।

সংকলনের ক্ষেত্রে সংক্ষিপ্ত আকারে সহজ সরল ভাষা ব্যবহার করার চেষ্টা করা হয়েছে। এরপরও কোন ভুল-ত্রুটি পরিলক্ষিত হলে এবং কোন সহৃদয় পাঠক আমাকে অবহিত করলে পরবর্তীতে তা সংশোধনের চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ। বইটি সংকলনে আমার স্ত্রী ও কন্যারা তাদের প্রাপ্য সময়কে আল্লাহর রাস্তায় ব্যয় করতে আমাকে উৎসাহ দিয়েছে। তা ছাড়াও বইটি প্রকাশ করতে যারা আমাকে বিভিন্নভাবে যেমন কম্পোজ, সম্পাদনা, প্রকাশনা ও প্রচারের ক্ষেত্রে এবং বিভিন্ন লেখকের কিতাবের সহায়তায় সংকলনে উৎসাহ যুগিয়েছেন তাদের সকলের প্রতি আমি কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করছি। আল্লাহ তা'আলা তাদের জাযায়ে খাইর দান করুন। পরিশেষে বইটি পাঠে মুসলিমদের দৈনন্দিন জীবন যাপনের ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক যে সকল বিধান আছে তা মেনে চললে আমাদের শ্রম সার্থক হচ্ছে বলে মনে করব।

বিনীত

ড. ইঞ্জিনিয়ার মোশাররফ

উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও কেবলমাত্র আল্লাহর অহী অনুসরণ করতে হবে

১। আল্লাহ বলেন ঃ

اتَّبِعُواْ مَا أُنزِلَ إِلَيْكُم مِّن رَّبِّكُمْ وَلاَ تَتَّبِعُواْ مِن دُونِهِ أَوْلِيَاء قَلِيلاً مَّا تَذَكَّرُونَ

তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূরা আ'রাফ-৩]

২। আর সে মনগড়া কথাও বলেনা। এটাতো অহী, যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ হয়। [সূরা নাজম-৩-৪]

৩। জনৈক মহিলা আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদের (রাঃ) কাছে এসে জিজ্ঞেস করল ঃ আপনি কি বলেছেন যে, যে মহিলা খোদাই করে (হাতে বা শরীরের অন্য কোন অংশে) নাম লিখে বা লেখায় অথবা দাগ টানে বা টানায় তার ওপর আল্লাহর অভিশাপ? আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ হ্যাঁ । মহিলা বলল ঃ আমি তো প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত কুরআন পাঠ করেছি, কিন্তু কই এ কথা তো কোথাও পেলামনা। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ তুমি যদি কুরআন পাঠ করতে তাহলে নিশ্চয়ই পেতে, তুমি কি এ আয়াত পাঠ করনি?

⊙ আল্লাহ বলেন ঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাক। তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। [সূরা হাশর-৭] এই আয়াত শ্রবণ করে মহিলা বলল ঃ হ্যাঁ, আমি পাঠ করেছি। আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ) বললেন ঃ আমি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের উপর লা'নত বা অভিশাপ দিতে শুনেছি। [বুখারী/৫৪৯৪, মুসলিম/৫৩৮৮]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, কুরআন এবং আমার হাদীস। যতদিন তোমরা ঐ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ), তাকদীর অধ্যায়, রেওয়াত নং-৩]

⧉ উম্মাতে মুহাম্মাদীকেও কেবল অহীয়ে ইলাহী মেনে চলতে হবে। অর্থাৎ আল কুরআন এবং সহীহ হাদীস তাদেরকে অবশ্যই মেনে চলতে হবে। আর এ দু'টিকে বাদ দিয়ে কোন অলী, পীর, দরবেশ, ফকীর, ধর্মীয় নেতা বা জনতার দীনের ব্যাপারে ব্যক্তিগত মতামত মোটেই মানা যাবেনা। কোন ব্যাপারে যদি কোন আলেম, পীর, দরবেশ ও অলী অহীয়ে ইলাহী তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বরাতে কোন কথা বলেন তাহলে তা অবশ্যই মানতে হবে। তখন ঐ মানা অহীয়ে ইলাহীকেই মানা হয়। উক্ত অহীয়ে ইলাহীর উদ্ধৃতি পেশকারী আলেমকে মানা হয়না। তাকে কেবল শ্রদ্ধা করা হয়। কিন্তু এর বিপরীত কোন শ্রদ্ধার পাত্র বা বুজুর্গ ব্যক্তি যদি ধর্মীয় ব্যাপারে অহীয়ে ইলাহী তথা কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যম ছাড়া ব্যক্তিগত অভিমত তথা তার ধারণাপ্রসূত কিয়াসী

ফাতওয়া দেন তাহলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া **সাল্লামের** অভিমতের মত পালন করা উচিত হবেনা এবং বিবেকপ্রসূত **ফাতওয়া মান্য** করতে কোন মুসলিম বাধ্য নয়।

মৃত ব্যক্তিকে অসীলা (মধ্যস্থতাকারী) বানানো যাবেনা

১। আমি মূসাকে **কিতাব দিয়েছিলাম,** আর সেটাকে করেছিলাম ইসরাইল বংশীয়দের জন্য **সত্য পথের নির্দেশক** (তাতে নির্দেশ দিয়েছিলাম) যে, আমাকে ছাড়া অন্যকে **কর্মবিধায়ক গ্রহণ করনা।** [সূরা বানী **ইসরাইল-২**]

২। **বরং আল্লাহই তোমাদের অভিভাবক এবং তিনিই সর্বশ্রেষ্ঠ সাহায্যকারী।** [সূরা আলে **ইমরান-১৫০**]

৩। **যখন** আমার বান্দাগণ আমার সম্পর্কে তোমার নিকট জিজ্ঞেস করে, আমি তো (তাদের) নিকটেই, আহ্বানকারী যখন আমাকে আহ্বান করে আমি তার আহ্বানে সাড়া দেই। সুতরাং তাদের উচিত আমার নির্দেশ মান্য করা এবং আমার প্রতি ঈমান আনা, যাতে তারা সরল পথ প্রাপ্ত হয়। [সূরা বাকারা-১৮৬]

৪। আল্লাহ বলেন ঃ তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও [সূরা শু'আরা-২১৪] যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বললেন ঃ হে ফাতিমা বিন্‌ত মুহাম্মাদ! হে সাফিয়া বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাইতে পার। [মুসলিম/৩৯৭]

⧉ বর্তমান সমাজের কেহ কেহ বলে, "খাজা বাবার দরবার হতে কেহ ফিরেনা খালি হাতে।" আর উপরোক্ত আয়াত হতে বুঝা গেল, কোন নাবী-রাসূল মৃত্যুর পর আর কিছুই করার ক্ষমতা রাখেনা, যত বড় কামিল বুজুর্গান, নেক বান্দা হোকনা কেন, মৃত্যুর পর তাদের কোন কিছুই করার ক্ষমতা থাকেনা। খাজা নামক ব্যক্তি নিশ্চয়ই আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে উচ্চ মর্যাদাশীল ছিলেননা। আল্লাহ আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে বললেন ঃ "বল ঃ আমি তোমাদের কোন ক্ষতি বা কল্যাণ করার ক্ষমতা রাখিনা।" রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত থাকা অবস্থায় যা পারতেননা, খাজা বাবা মরার পর তা কি করে পারছেন বলুন তো? এ ধরণের কথা ও কাজ মূর্খদের, খাজা বাবার নয়। কারণ ইবলীসের আয়ু কিয়ামাত পর্যন্ত এবং সে আল্লাহর কাছ থেকে অনেক কিছু কর-ার ক্ষমতাপ্রাপ্ত হয়েছে, ধোকা দিয়ে সে অনেক কিছু দেখায় ও করে।

আমরা মুখে বলি, সর্বময় ক্ষমতার অধিকারী মহান আল্লাহ, আর সন্তান পাবার জন্য ছুটে যাই আজমীরের মৃত ও রুহবিহীন খাজার কাবরের কাছে সাহায্য নিতে। "সব কিছু দেবার মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ" এ কথা স্বীকার করেও মাজারে শায়িত ব্যক্তির নিকট দৌড়ে যাই তার সাহায্য পাবার আশায়। আল্লাহর

পরিবর্তে মাজারে শায়িত ব্যক্তির সাহায্য পাবার আশা করাই হল শির্ক। তাহলে ভেবে দেখুন, আমাদের ঈমানের অবস্থা কি দাড়ালো?
আল্লাহ তাঁর বান্দার ডাকে সাড়া দেন, তিনি সর্বোত্তম সাহায্যকারী, প্রত্যেক বান্দাহ আল্লাহর প্রতিনিধি, তাই আল্লাহর সাহায্য, ক্ষমা, দয়া বা রাহমাত পাওয়ার জন্য কোন মাধ্যমের প্রয়োজন নেই। এই আয়াতগুলির উপর বিশ্বাস নেই বলেই খাজা বাবাকে উকিল বানিয়ে নিজেকে ক্ষতিগ্রস্থ বানালেন এবং পুরাপুরি ইবলীসের খপ্পরে পড়ে গেলেন। কারণ এ ব্যাপারে খাজা বাবার কোন দায় দায়িত্ব নেই, যেহেতু আল্লাহর কথায় বুঝা গেল যে, খাজা বাবা কিছুই করতে পারেননা বা শোনেননা। বরং আখিরাতে পার পাওয়ার জন্য খাজা বাবা আল্লাহর দয়া এবং দুনিয়ার মু'মিন মানুষের দু'আর মুখাপেক্ষী হয়ে আছেন।

অনুসরণ করব কাকে? রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতি নাকি সমাজে প্রচলিত পদ্ধতি/সংস্কৃতি?

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ

আমি কুরআনকে সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য, উপদেশ গ্রহণ কর-ার কেহ আছে কি? [সূরা কামার-১৭, ২২, ৪০]

২। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে লিপ্ত হয় সুস্পষ্ট গুমরাহীতে। [সূরা আহযাব-৩৬]

৩। যে কেহ রাসূলের অনুগত হয় নিশ্চয়ই সে আল্লাহরই অনুগত হয়ে থাকে, এবং যে ফিরে যায় আমি তার জন্য তোমাকে রক্ষক রূপে প্রেরণ করিনি। [সূরা নিসা-৮০]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-৫৯, ৬৫, ইউসুফ-৩২

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সে আল্লাহর অনুসরণ করল, আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল সে তো আল্লাহর নাফরমানী করল। [ইব্ন মাজাহ/৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার সম্পর্কে কোন মনগড়া কথা বলে যা আমি বলিনি, সে যেন তার বাসস্থান জাহান্নামে খুঁজে নেয়। [ইব্ন মাজাহ/৩৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

বর্তমান সমাজে অনেক মুসল্লী ভাই/বোনেরা বলে থাকেন যে, আমরা কুরআন হাদীস বুঝিনা। ইমামগণ কুরআন হাদীস ভাল বুঝেন, তাই আমরা ইমামগণের অনুসরণ করে থাকি। 'আমরা কুরআন বুঝিনা, তাই আমরা আমাদের ইমামগণের কথা অনুযায়ী চলি' এ কথা বলে আমি/আপনি নিজেদের দায়িত্ব এড়াতে পারবনা। কারণ কাল কিয়ামাতের দিন আল্লাহর নিকট আমাকে/আপনাকেই জবাবদিহি করতে হবে। আপনার জবাব আপনার ইমাম সাহেব দিবেননা। আর আল্লাহ এ কথাও বলবেননা যে, হে অমুক! তুমি তো

অমুক ইমামের অনুসরণ করতে, তাই তোমার জবাবদিহি তোমার **ইমামই** করবে। বরং তোমার নিকটেই তোমার ভাল-মন্দের জবাব চাবে। **কখনও** আল্লাহ আপনার/আমার **ইমামের** নিকট আপনার/আমার আমলের **জবাব** চাবেননা। বরং প্রত্যেক**কেই** আল্লাহর নিকট নিজ নিজ কর্মের জবাবদিহি করতে হবে।

অলী-আওলিয়া ও অন্যান্যরা কেহই ইবাদাতের পদ্ধতি নির্ধারণের জন্য মনোনীত নয়

১। আজ আমি **তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম**, তোমাদের প্রতি **আমার নি'আমাত পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে কবূল করে নিলাম**। [সূরা মায়িদা-৩]

২। **হে মানবমন্ডলী! পৃথিবীর মধ্যে যা বৈধ ও পবিত্র, তা হতে আহার কর এবং শাইতানের পদাঙ্ক অনুসরণ করনা, নিশ্চয়ই সে তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। সে এতদ্ব্যতীত তোমাদেরকে আদেশ করে শাইতানী ও অশ্লীল কাজ করতে এবং** আল্লাহ সম্বন্ধে তোমরা যা জাননা তা বলতে। [সূরা বাকারা-১৬৮-১৬৯]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাহা-১৩, আলে ইমরান-৩৩, বাকারা-১৩০, আন'আম-৩৮।

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সঠিকভাবে ও মধ্যম পন্থায় সৎ আমল করতে থাক। আর জেনে রেখ যে, তোমাদের কেহকে কেবল তার সৎ আমল জান্নাতে নিবেনা এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে প্রিয় আমল হল যা নিয়মিত করা হয়, তা সেই আমল অল্প পরিমাণই হোক না কেন। [বুখারী/৬০০৭-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৬৮৬১]

৫। যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দিবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবেনা। [মুসলিম/৬৬০৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

◫ মহান আল্লাহ নাবী-রাসূল ছাড়া আর কেহকে মনোনীত করেননি। কারণ তাদের কাছে আল্লাহর তরফ থেকে অহী নাযিল হত। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যদি শেষ নাবী হিসাবে মানতে হয় তাহলে তার পরে আর কেহকেও আল্লাহর মনোনীত ব্যক্তি হিসাবে মান্য করা যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা ইবরাহীম (আঃ) ও ইমরানের (আঃ) বংশধরদের মনোনীত করেছেন। সেই কারণেই সকল নাবী ও রাসূলগণই এই দুই বংশের অন্তর্ভুক্ত। তবে ইবলীস শাইতান মানুষকে পথভ্রষ্ট করার জন্য আল্লাহর মনোনয়ন পেয়েছে। অলী, আওলিয়া ও পীরদেরকে আল্লাহ মনোনীত করেছেন বলে কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোথাও উল্লেখ নেই।

গুপ্ত (বাতিনী) বিদ্যা শিক্ষা প্রকৃত অলী-আওলিয়া হওয়ার কি একটি আলামাত?

১। হে রাসূল! তোমার রবের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর। যদি না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন

করলেনা। মানুষ হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সৎপথ প্রদর্শন করেননা। [সূরা মায়িদা-৬৭]

২। আল্লাহ ফিরিশতাগণের মধ্য হতে বাণীবাহক মনোনীত করেন, আর মানুষদের মধ্য হতেও। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। [সূরা হাজ্জ-৭৫]

৩। দীনের ব্যাপারে তোমাদের মনগড়া মতামতকে নির্ভরযোগ্য মনে করনা। [বুখারী/৬৭৯৭-আনাস (রাঃ)]

☐ **সকল** নাবী-রাসূলেরই তাদের উপর আল্লাহর নাযিল কৃত অহী লোকদের নিকট পৌঁছানোর দায়িত্ব ছিল। আল্লাহর নাযিল করা কিছু অংশ কোন ব্যক্তি বিশেষের নিকট আলাদা করে পৌঁছানোর কথা মহান আল্লাহ কুরআনে কোথাও বলেননি। তাহলে গুপ্ত (বাতিনী) বিদ্যা কার মাধ্যমে অলী, দরবেশ, পীর সাহেবগণ পান? এটা ভেবে দেখার বিষয়। আল্লাহ তা'আলার কুরআনে কোন কিছু গোপন নেই। তাহলে বলতে হয় এই পথটা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ নয়, এটা ২ নম্বর পথ, ইবলীস শাইতানের পথ।

অলী-আওলিয়ারা কি আল্লাহর নিকট কোন লোকের জন্য সুপারিশের (শাফা'আতের) নিশ্চয়তা দিতে পারে?

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَمِ اتَّخَذُوا مِن دُونِ اللَّهِ شُفَعَاءَ قُلْ أَوَلَوْ كَانُوا لَا يَمْلِكُونَ شَيْئًا وَلَا يَعْقِلُونَ

তারা কি আল্লাহকে বাদ দিয়ে অপরকে সুপারিশকারী বানিয়ে নিয়েছে? বল ঃ যদিও তারা কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং তারা বুঝেনা ? [সূরা যুমার-৪৩]

২। বল ঃ যাবতীয় শাফা'আত আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত, আকাশ ও পৃথিবীর রাজত্ব তাঁরই, অতঃপর তাঁর কাছেই তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা যুমার-৪৪]

৩। আল্লাহর পরিবর্তে তারা যাদেরকে ডাকে, সুপারিশের ক্ষমতা তাদের নেই, তবে যারা সত্য উপলব্ধি করে ওর সাক্ষ্য দেয় তারা ব্যতীত। [সূরা যুখরূফ-৮৬]

৪। কোন বহনকারী অন্যের বোঝা বহন করবেনা, কোন ভারাক্রান্ত ব্যক্তি যদি কেহকেও এটা বহন করতে আহ্বান করে তাহলে তার কিছুই বহন করা হবেনা, নিকট আত্মীয় হলেও। তুমি শুধু সতর্ক করতে পার তাদেরকে যারা তাদের রাব্বকে না দেখে ভয় করে এবং সালাত কায়েম করে। যে কেহ নিজেকে পরিশোধন করে সেতো পরিশোধন করে নিজেরই কল্যাণের জন্য। প্রত্যাবর্তনতো আল্লাহরই নিকট। [সূরা ফাতির-১৮]

৫। তিনি (আল্লাহ) ব্যতীত তোমাদের জন্য কোন অভিভাবক নেই, সুপারিশকারীও নেই। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? [সূরা হা মীম আস্‌সাজদা-৪]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ শূরা-৮, ৯, ২৮, ৩১, জাসিয়া-১০, ১৯, আনকাবূত-২২, ৪১, কাহফ-১৭, রাদ-৩৭, বাকারা- ২৩, ২৫৭, ফাতির-২২, ইনফিতার-১৯, আ'রাফ-৩, ২৭, ৩০, ইউনুস-১০৮, তাহা-১০৯।

৭। আনাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তা'আলা সমস্ত মানুষকে একত্রিত করবেন। তখন তারা বলবে ঃ আমাদের জন্য আমাদের রবের কাছে যদি কেহ শাফা'আত করত, যা এ স্থান থেকে আমাদের উদ্ধার করত। তখন তারা সকলেই আদাম (আঃ) এর কাছে এসে বলবে ঃ আপনি ঐ ব্যক্তি যাঁকে আল্লাহ তা'আলা স্বহস্তে সৃষ্টি করেছেন। আপনার মাঝে নিজ থেকে রুহ্ ফুঁকে দিয়েছেন এবং ফিরিশতাদেরকে হুকুম করেছেন; তাঁরা আপনাকে সাজদাহ করেছে। সুতরাং আপনি আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে শাফা'আত করুন। তখন তিনি বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। এরপর বলবেন ঃ তোমরা নূহ (আঃ)- এর কাছে যাও, যাকে আল্লাহ তা'আলা প্রথম রাসূল হিসাবে প্রেরণ করেছেন। তখন মানুষ তাঁর কাছে যাবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা ইবরাহীমের (আঃ) কাছে চলে যাও যাঁকে আল্লাহ তা'আলা খলীল রূপে গ্রহণ করেছেন। সুতরাং মানুষ তাঁর কাছে আসবে। তিনিও স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করে বলবেন ঃ আমি তোমাদের এ কাজের উপযোগী নই। তোমরা মূসা (আঃ)-এর কাছে চলে যাও। যার সঙ্গে আল্লাহ তা'আলা কথা বলেছেন। তখন তারা তাঁর কাছে আসবে। তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই এবং স্বীয় অপরাধের কথা উল্লেখ করবেন। তিনি বলবেন ঃ তোমরা ঈসা (আঃ) এর কাছে যাও। তারা তাঁর কাছে আসবে। তখন তিনিও বলবেন ঃ আমি তোমাদের জন্য এ কাজের উপযোগী নই, তোমরা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-এর কাছে চলে যাও। তাঁর সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে। তখন তারা সকলেই আমার কাছে আসবে। তখন আমি আমার রবের কাছে চাইব। যখনই আমি আল্লাহ তা'আলাকে দেখতে পাব তখন সাজদায় পড়ে যাব। আল্লাহ তা'আলার যতক্ষণ ইচ্ছা আমাকে এ অবস্থায় রাখবেন। এরপর আমাকে বলা হবে ঃ তোমার মাথা উঠাও। সাওয়াল কর; তোমাকে দেয়া হবে। তুমি বল, তোমার কথা শ্রবণ করা হবে। তুমি শাফা'আত কর, তোমার শাফা'আত কবূল করা হবে। তখন আমি মাথা উত্তোলন করব এবং আল্লাহ তা'আলা আমাকে যে প্রশংসার বাণী শিখিয়েছেন তার মাধ্যমে তাঁর প্রশংসা করব। এরপর আমি সুপারিশ করতেই তখন আল্লাহ তা'আলা আমার জন্য সীমা নির্ধারণ করবেন। অতঃপর আমি তাদেরকে জাহান্নাম থেকে বের করে জান্নাতে প্রবেশ করিয়ে দিব। এরপর আমি আবার উক্ত কাজের পুনরাবৃত্তি করব এবং পূর্বের ন্যায় তৃতীয়বার অথবা চতুর্থবার সাজদায় পড়ে যাব। অবশেষে কুরআনের বাণী মুতাবেক যারা অবধারিত জাহান্নামী তারা ব্যতীত আর কেহই জাহান্নামে অবশিষ্ট থাকবেনা। কাতাদাহ (রাঃ) উক্ত আয়াতের ব্যাখ্যায় তখন বলেছিলেন ঃ চিরস্থায়ী জাহান্নাম যাদের জন্য অবধারিত হয়েছে। [বুখারী/৬১০৬]

◫ উপরোক্ত অহীর ঘোষণার পর কে বা কারা আগাম সুপারিশকারী হবার দুঃসাহস দেখায় এবং ভক্তের ভক্তি সংগ্রহে হাত বাড়ায়? ভেবে দেখুন, অলী-আওলিয়া বা পীরের কোন ক্ষমতা আছে কি যে, তিনি কারো জন্য শাফা'আত করতে পারবে? ⊙ যিনি শাফা'আত করার অনুমতি পাবেন, তথাপিও সেই দয়ার নাবী স্বীয় স্নেহের কন্যা ফাতিমা (রাঃ) কে বলেছিলেন ঃ মুহাম্মাদের কন্যা হিসাবে কাল কিয়ামাতে আমি তোমার জন্য কোন কিছুই করতে পারবনা, যদি তোমার আমল তোমাকে পৌঁছে না দেয়। [মুসলিম/৩৯৭] তাহলে জিন্দা, মুর্দা, ল্যাংটা, শিকল পরা, ঠান্ডা বা গরম বুজুর্গ, দরবেশ ও পীরের যে কিছুই করণীয় নেই এটা কি সরল প্রাণ মানুষেরা বুঝবেনা? বর্তমান সমাজের শিক্ষিত লোকেরা পরকালের নাজাতের জন্য পীর, ফকির, দরবেশ, অলী-আওলিয়া, নাবী বা অন্য কোন ব্যক্তির কাবরে বা মাজারে গিয়ে নিজের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ করার উদ্দেশে বিভিন্ন বিষয়ে দু'আ করে, যা উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীস বিরোধী।

অলী-আওলিয়া কি গায়িব জানে?

১। আমি তো তোমাদেরকে এ কথা বলছিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন-ভান্ডার আছে। আর আমি অদৃশ্যের খবরও জানিনা। আর আমি এ কথাও বলিনা যে, আমি ফিরিশতা। আমি এ কথাও বলিনা যে, তোমাদের চোখ যে সব লোককে অবজ্ঞা করে, আল্লাহ কখনও তাদের কল্যাণ করবেননা। তাদের অন্তরে কী আছে আল্লাহই তা উত্তমরূপে জানেন। (এ রকম কথা বললে) আমি তো যালিমদের শামিল হয়ে যাব। [সূরা হুদ-৩১]

২। বল ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল বা মন্দ করার কোন ক্ষমতা নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে নিজের জন্য অনেক বেশি কল্যাণ হাসিল করে নিতাম, আর কোন প্রকার অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতনা। যারা ঈমান আনবে আমি সেই সম্প্রদায়ের প্রতি সতর্ককারী ও সুসংবাদদাতা ছাড়া অন্য কিছু নই। [সূরা আ'রাফ-১৮৮]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ লুকমান- ৩৪, আন'আম- ৫৮, ৫৯।

৪। যদি কেহ বলে যে (ক) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাব্বকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। (খ) যে ব্যক্তি বলবে যে, আগামীকাল কি হবে তিনি তা জানেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী (গ) যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথা গোপন রেখেছেন তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। [বুখারী/৪৪৮২-আয়িশা (রাঃ)]

◫ সমাজের বেশী সংখ্যক মানুষ নিজ ভাগ্য সম্বন্ধে আগেভাগে জানার জন্য অতি উৎসাহী। যে কেহ তার ভাগ্য বলতে পারলে তা হয় দারুন কিরামাতি। হারানো জিনিস পাইয়ে দেয়ার জন্য, অদৃশ্য খবর বলে দেয়ার জন্য, আগাম ভাল-মন্দ বার্তা জানিয়ে দেয়ার জন্য মানুষ পীরের দরগায়

ভীড় জমায়। এগুলি বলা নাকি অলী-আওলিয়ার পক্ষে **খুবই সহজ** । অলীয়ে কামেল বা সিদ্ধ পুরুষ হতে হলে নাকি অবশ্যই ইলমে গায়িব জানা জরুরী। ইলমে মারিফাতের সবক হাসিলের ক্ষেত্রে উচ্চ স্তরে উপনীত হবার ঐটা নাকি হাতিয়ার। অথচ দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বোচ্চ জ্ঞানী ব্যক্তি হলেন নাবী ও রাসূলগণ। তাদেরকে লক্ষ্য করে আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা এ কথা বলবেনা যে, অদৃশ্য বিষয় জানি বা গায়িব বলতে পারি। অথচ আমাদের বর্তমান সমাজে যারা নিজেদেরকে অলী-আওলিয়া বলে প্রচার/ দাবী করে তারা কিভাবে অদৃশ্য বিষয় বা গায়িব জানে বলে প্রচার করতে পারে? তার বিচার ও বিবেচনার ভার পাঠকের উপরই রইল।

দীনের অলী বনাম দুনিয়ার অলী

❖ অলী এর বহু বচন আওলিয়া। অলী এর আভিধানিক **অর্থ অভিভাবক,** সাহায্যকারী, বন্ধু। দীনের অলী সম্বন্ধে মহান আল্লাহ তা'আলা কুরআনে ইরশাদ করেন ঃ

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي ذَٰلِكَ لَآيَةً وَمَا كَانَ أَكْثَرُهُم مُّؤْمِنِينَ - وَإِنَّ رَبَّكَ لَهُوَ الْعَزِيزُ الرَّحِيمُ

নিশ্চয়ই তাতে আছে নিদর্শন; কিন্তু তাদের অধিকাংশই মু'মিন নয়। নিশ্চয়ই তোমার রাব্ব মহা পরাক্রমশালী, অতি দয়ালু। [সূরা শু'আরা-৮-৯]

২। (মূসা) বলল ঃ (তিনিই) পূর্ব ও পশ্চিমের রাব্ব, আর এ উভয় দিকের মাঝে যা আছে তারও, যদি তোমরা বুঝতে। [সূরা শু'আরা-২৮]

৩। (ফির'আউন) বলল ঃ তাহলে তা উপস্থিত কর, যদি তুমি সত্যবাদী হও। [সূরা শু'আর-৩১]

৪। আল্লাহ, তিনি আকাশমন্ডলী, পৃথিবী ও এতোদুভয়ের অর্ন্তবর্তী সব কিছু সৃষ্টি করেছেন ছয় দিনে। অতঃপর তিনি আরশে সমাসীন হন। তিনি ছাড়া তোমাদের কোন অভিভাবক নেই এবং সাহায্যকারীও নেই, তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা? [সূরা সাজদাহ-৪]

৫। বল ঃ যারা বিভ্রান্তিতে আছে, দয়াময় তাদের জন্য ঢিল দিয়ে দেন, যে পর্যন্ত না তারা দেখতে পাবে যার ওয়াদা তাদেরকে দেয়া হচ্ছে- তা শাস্তিই হোক কিংবা কিয়ামাতই হোক।' তখন তারা জানতে পারবে মর্যাদায় কে নিকৃষ্ট, কে জনবলে দুর্বল। [সূরা মারইয়াম-৭৫]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ জাসিয়া-১০, কাহফ-১৭, আনকাবূত-২২, ৪১, আ'রাফ-৩, ২৭, ৩০, রা'দ-৩৭, বাকারা-২৫৭, জিন-২৬।

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা করেন ঃ আমি সেইরূপ, যেরূপ বান্দা আমার প্রতি ধারণা রাখে। আমি তার সাথে থাকি যখন সে আমাকে স্মরণ করে। যদি সে মনে মনে আমাকে স্মরণ করে, আমিও তাকে নিজে স্মরণ করি। আর যদি সে লোক সমাবেশে আমাকে স্মরণ করে তাহলে আমিও তাদের চেয়ে উত্তম সমাবেশে তাকে স্মরণ করি।

যদি সে আমার দিকে এক বিঘত অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই, যদি সে আমার দিকে এক বাহু অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দুই বাহু অগ্রসর হই। আর সে যদি আমার দিকে হেঁটে অগ্রসর হয় তাহলে আমি তার দিকে দৌঁড়ে অগ্রসর হই। [বুখারী/৬৮৮৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

মুসলিম ভাই ও বোনেরা! একটু চিন্তা করলে বুঝতে পারবেন, দীনের ক্ষেত্রে আল্লাহ ছাড়া অন্য কেহকেও অলী হিসাবে মানা এবং তার নির্দেশ পালন করা হলে আল্লাহর সাথে শরীক হয়ে যায় এবং ইহা স্পষ্টতই শির্‌ক। কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল ব্যতীত কেহ যদি নিজের অনুমান, ইচ্ছা ও কামনার ভিত্তিতে বিভ্রান্তিকর কথাবার্তা বলে সে নিশ্চিতই শাইতানের আইন-কানূন মেনে চলে। একমাত্র আল কুরআন ও সহীহ হাদীস ব্যতীত দীন ইসলামের নামে অন্য কোন দলীল গ্রহণ করা যাবেনা। যারা এই ২ (দুই) দলীলের সমর্থনের বাইরে জবরদস্ত আলেম, মহা বুজুর্গান, পীরানে পীর, অলীয়ে কামেল, হাদিয়ায়ে যামান, মোহিয়ে সুন্নাত, আমিরুশ শারিয়াত, কুতুবে রাব্বানী ইত্যাদি যত টাইটেলই ধারণ করুক না কেন তাদের নির্দেশের উপর 'আমল করা শাইতানের অনুসরণ ছাড়া আর কিছু নয়।

যে কোন মানুষ বা পীর, দরবেশকে আল্লাহর অলী বলা মহান আল্লাহর সার্বভৌমত্বের উপর অংশীদার করা বুঝায়। তথাকথিত বহু শিক্ষিত লোকেরাও লেংটি পড়া জটাধারী লোক দেখলে মনে করে যে, সে বড় বুজুর্গ লোক, আল্লাহর অলী। ময়লা ছেঁড়া কাপড় ও শরীরে গন্ধ থাকলে তাদেরকে আরও বড় বুজুর্গ মনে করা হয় এবং তাদের সালাত/সিয়াম পালন করার দরকার নেই বলে সাধারণ লোকেরা ধারণা করে। এগুলি মূর্খতা ছাড়া আর কিছুই নয়। এ ছাড়াও যাকে মাসজিদে দাফন করা হয় সে কখনই অলী হতে পারেনা। আর কারও জন্য মাজার বানানো হলে কিংবা কাবরের উপর গম্বুজ বানানো হলে তা অলীদের কাজ হতে পারেনা। কারণ এগুলি ইসলামী শিক্ষার পরিপন্থী।

⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবরে পাকাঘর নির্মাণ, কাবরকে বর্ধিতকরণ, চুনকাম করা এবং কাবরের উপর লিখতেও নিষেধ করেছেন। [নাসাঈ/২০৩১-জাবির (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/১৫৬২, ১৫৬৩, তিরমিযী/১০৫২]

মৃত ব্যক্তিদের স্বপ্নে দেখতে পাওয়াও শরীয়তের দৃষ্টিতে অলী হওয়ার মাপকাঠি নয়, বরং তা অনেক সময় শাইতানের ধোঁকাও হতে পারে। কাবরে পাকা ঘর এবং কাবরকে বর্ধিত করণ করা হাদীসে নিষেধ আছে, তার পরেও যারা করছে তারা অবশ্যই ভ্রান্তির মধ্যে আছে।

প্রকৃত অলী-আওলিয়া কে?

❖ 'অলী' অর্থ অভিভাবক, সাহায্যকারী এবং বন্ধু। 'অলী' এর বহু বচন হল 'আওলিয়া'। আমরা অনেকে আল্লাহর অলী বলি, তার অর্থ দাঁড়ায় ঃ আল্লাহর অভিভাবক, আল্লাহর সাহায্যকারী, আল্লাহর বন্ধু। কোন সৃষ্টি তার স্রষ্টার

(আল্লাহর) কিভাবে অভিভাবক, সাহায্যকারী বা বন্ধু হতে পারে? **আল্লাহ** আমাদের সবার অভিভাবক এবং আল্লাহ যাকে বন্ধু বলেন শুধু সেই **আল্লাহর** বন্ধু হতে পারেন। যেমন আল্লাহ ইবরাহীমকে (আঃ) খলিল (বন্ধু) বলেছেন। [সূরা নিসা-১২৫] তাই তিনি 'খলিলুল্লাহ', আল্লাহর বন্ধু। কেহকে আল্লাহর 'অলী' বলা কোন অবস্থায়ই সমীচীন নয়।

ক) মু'মিনদের একমাত্র অলী-আওলিয়া হল আল্লাহ রাব্বুল আলামিন ঃ

১। তুমি কি জাননা যে, আকাশমন্ডলী ও ভূমন্ডলের রাজত্ব সেই আল্লাহরই এবং আল্লাহ ছাড়া তোমাদের কোনও অলী (বন্ধু) নেই এবং সাহায্যকারীও নেই। [সূরা বাকারা ১০৭]

২। **আল্লাহ মু'মিনদের** অলী বা অভিভাবক, তাদেরকে **অন্ধকার থেকে আলোর দিকে বের করে** আনেন এবং কাফিরদের অভিভাবক **হচ্ছে** তাগুত, সে **তাদেরকে আলো** থেকে অন্ধকারের দিকে নিয়ে যায়। এরাই আগুনের **বাসিন্দা**, এরা **চিরকাল** সেখানে থাকবে। [সূরা বাকারা-২৫৭]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আলে ইমরান-৬৮, মায়িদা-৫৫, ৫৬, আন'আম-১৪, ৫১, ৭০, ১২৭, আরাফ-৩, ১৯৬, তাওবা-১১৬, ইউসুফ-১০১, রাদ-৩৭, বানী ইসরাইল-৯৭, ১১১, কাহফ-২৬, ফুরকান-১৮, সাজদাহ-৪, আহযাব-১৭, সাবা-৪১, হা মীম আস্‌সাজদাহ-৩১, শূরা-২৮, ৩১, হুদ-১১৩, জাসিয়া-১৯, আহকাফ-৩২, নিসা-৪৫, ১২৩, ১৭৩।

খ) আল কুরআনে "শাইতানকে যাদের আওলিয়া" রূপে বর্ণনা করা হয়েছে ঃ

১। নিশ্চয়ই শাইতান শুধুমাত্র তার অলী হতে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করে; কিন্তু যদি তোমরা বিশ্বাসী হও তাহলে তাদেরকে ভয় করনা; এবং আমাকেই ভয় কর। [সূরা আলে ইমরান-১৭৫]

২। ঈমানদারগণ আল্লাহর পথে যুদ্ধ করে, আর যারা কাফির তারা তাগুতের পথে যুদ্ধ করে। অতএব তোমরা শাইতানের অলীর (বন্ধুদের) বিরুদ্ধে যুদ্ধ কর, শাইতানের ফন্দি অবশ্যই দুর্বল। [সূরা নিসা-৭৬]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-১২১, আরাফ-২৭, ৩০ রাদ-১৬, নাহল-৬৩, কাহফ-৫০, ১০২, মারইয়াম-৪৪, ৪৫, আনকাবূত-৪১, যুমার-৩, শূরা-৪৪, ৪৬, জাসিয়া-১০, মুমতাহিনাহ্‌-১, নিসা-১১৯।

গ) যারা কাফির, মুশরিক, ইয়াহুদী ও খৃষ্টানদেরকে আওলিয়া বা বন্ধু বানিয়েছে ঃ

১। ইয়াহুদী ও নাসারারা তোমার প্রতি সন্তুষ্ট হবেনা যে পর্যন্তনা তুমি তাদের ধর্মের আদর্শ গ্রহণ কর। বল, আল্লাহর দেখানো পথই প্রকৃত সুপথ এবং তুমি যদি জ্ঞান প্রাপ্তির পরেও ওদের ইচ্ছা অনুযায়ী চল তাহলে তোমার জন্য আল্লাহর ক্রোধ হতে রক্ষা করার মত কোন অলী (অভিভাবক) ও সাহায্যকারী থাকবেনা। [সূরা বাকারা-১২০]

২। মু'মিনগণ যেন মু'মিনগণ ছাড়া কাফিরদের সঙ্গে বন্ধুত্ব না করে, যে এমন করবে আল্লাহর সাথে তার কোনই সম্পর্ক নেই, তবে ব্যতিক্রম হল যদি তোমরা

তাদের যুল্‌ম হতে আত্মরক্ষার জন্য সতর্কতা অবলম্বন কর। আর আল্লাহ তাঁর নিজের সম্বন্ধে তোমাদেরকে সাবধান করছেন এবং আল্লাহরই দিকে প্রত্যাবর্তন। [সূরা আলে ইমরান-২৮]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-৮৯, ১৩৯, ১৪৪, মায়িদা-৫১, ৮১, তাওবা-২৩, সাজদা-৩৪, শূরা-৮, ৯, জুমু'আ-৬।

ঘ) মুমিনগণ আল্লাহর বন্ধু এবং তারা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ঃ

১। মু'মিন পুরুষ আর মু'মিন নারী পরস্পর পরস্পরের অলী বা বন্ধু। তারা সৎ কাজের নির্দেশ দেয়, অন্যায় কাজ থেকে নিষেধ করে, সালাত কায়েম করে, যাকাত দেয়, আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে। তাদের প্রতিই আল্লাহ করুণা প্রদর্শন করবেন। আল্লাহ তো প্রবল পরাক্রান্ত, মহা প্রজ্ঞাবান। [সূরা তাওবা-৭১]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৫৬, ইউনুস-৬২, আনফাল-৭২।

ঙ) কাফিরেরা পরস্পর পরস্পরের বন্ধু ঃ

১। আর যারা কুফরী করে তারা একে অপরের অলী বা বন্ধু। যদি তোমরা তা না কর (অর্থাৎ তোমরা পরস্পর পরস্পরের সাহায্যে এগিয়ে না আস) তাহলে দুনিয়ায় ফিতনা ও মহাবিপর্যয় দেখা দিবে। [সূরা আনফাল- ৭৩]

⧉ অলী বা আওলিয়া শব্দটি শুনলেই অধিকাংশ মানুষের মনের পর্দায় কাদের কথা ভেসে উঠে? নিশ্চয়ই জীবিত বা মৃত কোন বুজুর্গ, দরবেশ বা পীর সাহেবের কথা মনে হয়। কেন এমনটি হয়? সাহাবায়ে কেরাম ছিলেন লক্ষাধিক। তাদের কথা মনে পড়েনা কেন? অলী বা আওলিয়া যে শব্দ দু'টির কথা বলা হচ্ছে তা তো স্রেফ আরাবী শব্দ। আল কুরআনের ২৯টি সূরায় প্রায় ৭০ বার ঐ শব্দ ব্যবহার করা হয়েছে। অলী বা আওলিয়া শব্দটি বন্ধু বা অভিভাবক অর্থেই ব্যবহার করা হয়েছে। আর প্রায় প্রত্যেকটি আয়াতে "আওলিয়া" বা "অলী" দ্বারা আল্লাহকে বুঝানো হয়েছে। যেখানে ব্যাপকভাবে অলী বা আওলিয়া শব্দটি দ্বারা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলাকে বুঝানো হল তা ঢালাওভাবে কে বা কারা কোন ব্যক্তির প্রতি ব্যবহার করল তা বোধগম্য হয়না। আর এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

শারীয়াত সম্মত অসীলা তালাশ করা

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ اتَّقُواْ اللّهَ وَابْتَغُواْ إِلَيهِ الْوَسِيلَةَ وَجَاهِدُواْ فِي سَبِيلِهِ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

হে ঈমানদারগণ! আল্লাহকে ভয় কর, তাঁর নৈকট্য অনুসন্ধান কর এবং তাঁর পথে জিহাদ কর যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা মায়িদা-৩৫]

২। হে আমাদের রাব্ব! আমরা একজন ঘোষণাকারীকে ঈমানের ঘোষণা করতে শুনেছি যে, তোমরা তোমাদের রবের প্রতি ঈমান আন। সেই অনুযায়ী আমরা ঈমান এনেছি। সুতরাং হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পাপগুলো ক্ষমা কর এবং

আমাদের থেকে আমাদের মন্দ কাজগুলো বিদূরিত কর, আর সৎ বান্দাদের সঙ্গে শামিল করে আমাদের মৃত্যু দাও। [সূরা আলে ইমরান-১৯৩]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আলে ইমরান-১৬, ৩১, ৫৩, ১৯২, মু'মিনূন-১০৯, আরাফ-১৮০, আম্বিয়া-৮৩, ৮৭, কাসাস-১৬, আহযাব-২১, বাকারা-১৮৬, মু'মিন-৬০, নিসা-৬৪।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুশমনী করবে; আর দান করবে আল্লাহর জন্য এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। [আবূ দাউদ/৪৬০৭-আবূ উমামা (রাঃ)]

৫। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি শারীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখে এবং সে যদি হাত দিয়ে বাধা দিতে সক্ষম হয় তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখের কথা দিয়ে প্রতিবাদ করবে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতর স্তর। [ইব্ন মাজাহ/৪০১৩-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), তিরমিযী/২১৭৫]

৬। ইব্ন উমার (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একদা তিন ব্যক্তি হেঁটে চলছিল এমন সময়ে প্রবল বৃষ্টি শুরু হলে তারা এক পাহাড়ের গুহায় প্রবেশ করে। হঠাৎ একটি পাথর গড়িয়ে তাদের গুহামুখ বন্ধ করে দেয়। তাদের একজন আরেক জনকে বলল ঃ তোমরা যে সব আমল করেছ তার মধ্যে উত্তম আমলের অসীলা করে আল্লাহর কাছে দু'আ কর। তাদের একজন বলল, ইয়া আল্লাহ! আমার অতিবৃদ্ধ পিতা-মাতা ছিলেন, আমি (প্রত্যহ সকালে) মেষ চরাতে বের হতাম। তারপর ফিরে এসে দুধ দোহন করতাম এবং এ দুধ নিয়ে আমার পিতা-মাতার নিকট উপস্থিত হতাম ও তাঁরা তা পান করতেন। তারপরে আমি শিশুদের, পরিবারের অন্যান্যদের এবং আমার স্ত্রীকে পান করতে দিতাম। এক রাত্রে আমি আটকা পড়ে যাই। তারপর আমি যখন এলাম তখন তাঁরা দু'জনে (পিতা-মাতা) ঘুমিয়ে পড়েছেন। আমি তাদের জাগানো পছন্দ করলামনা। আর তখন শিশুরা আমার পায়ের কাছে (ক্ষুধায়) চীৎকার করছিল। এই অবস্থায়ই আমার ও আমার পিতা-মাতার ফাজর (সকাল) হয়ে গেল। ইয়া আল্লাহ! তুমি যদি জান তা আমি শুধুমাত্র তোমার সন্তুষ্টি লাভের আশায় করেছিলাম তাহলে তুমি আমাদের গুহামুখ হতে পাথর এতটুকু ফাঁক করে দাও যাতে আমরা আকাশ দেখতে পারি। বর্ণনাকারী বলেন, তখন গুহামুখ একটু ফাঁক হয়ে গেল। আরেকজন বলল, ইয়া আল্লাহ! তুমি জান যে, আমি আমার এক চাচাতো বোনকে এত চরম ভালবাসতাম যেভাবে একজন পুরুষ একজন নারীকে ভালবেসে থাকে। সে (চাচাত বোন) বলল, তুমি আমা থেকে সে মনঃস্কামনা সিদ্ধ করতে পারবেনা, যতক্ষণ আমাকে একশত দীনার না দিবে। আমি চেষ্টা করে তা সংগ্রহ করি। তারপর যখন আমি তার পদদ্বয়ের মাঝে উপবেশন করি তখন সে বলে ঃ আল্লাহকে ভয় কর, যথাযথ অধিকার

ছাড়া আবদ্ধ মাহর ভাঙ্গবেনা। এতে আমি তাকে ছেড়ে উঠে পড়ি। (হে আল্লাহ !) তুমি যদি জান আমি উহা তোমারই সন্তুষ্টি অর্জনের উদ্দেশে করেছি তাহলে আমাদের থেকে আর একটু ফাঁক করে দাও। তখন তাদের থেকে (গুহা মুখের) দুই তৃতীয়াংশ ফাঁক হয়ে গেল। অপরজন বলল ঃ হে আল্লাহ! তুমি জান যে, এক ফারাক (তিন সা' পরিমাণ) শস্যদানার বিনিময়ে আমি একজন মজুর রেখেছিলাম। আমি যখন তাকে তা দিতে গেলাম তখন সে তা গ্রহণে অস্বীকার করল। তারপর আমি সেই এক ফারাক শস্যদানা দিয়ে চাষ-আবাদ করে ফসল উৎপন্ন করি এবং তা দিয়ে গরু ও রাখাল ক্রয় করি। কিছুকাল পরে সেই মজুর এসে বলল ঃ হে আল্লাহর বান্দা! আমাকে আমার পাওনা দিয়ে দাও। আমি বললাম ঃ এই গরুগুলো ও রাখাল নিয়ে যাও। সে বলল, তুমি কি আমার সাথে উপহাস করছ? আমি বললাম ঃ আমি তোমার সাথে উপহাস করছিনা বরং এসবই তোমার। হে আল্লাহ! তুমি যদি জান আমি তা তোমারই সন্তুষ্টির উদ্দেশে করেছি তাহলে আমাদের থেকে (গুহামুখ) খুলে দাও। তখন তাদের থেকে গুহামুখ খুলে গেল। [বুখারী/২০৬৯]

⊙ **নিম্নোক্ত উপায়েও অসীলা তালাশ করা যায় ঃ**

- ঈমান গ্রহনের মাধ্যমে সাহায্যের অসীলা তালাশ করা।
- আল্লাহর একাত্মবাদকে অসীলা বানানো।
- আল্লাহ তা'আলার পবিত্র নামের দ্বারা অসীলা খোঁজ করা।
- আল্লাহর গুণের দ্বারা অসীলা তালাশ করা।
- নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পড়াকে অসীলা বানান।
- সৎ আমলের দ্বারা অসীলা খোঁজা ঃ যেমন সালাত (নামায), সিয়াম, হাজ্জ ইত্যাদি।
- পিতা-মাতার খিদমাত, অন্যের হক আদায়ের দ্বারা।
- আমানাত রক্ষার দ্বারা এবং অন্যান্য সৎ আমল দ্বারা।
- কোন পাপকার্য ঃ যেমন যিনা, মদ এবং অন্যান্য হারাম কাজ ত্যাগের দ্বারা অসীলা তালাশ করা।
- যাকাত ও সাদাকা, ভাল কথা, যিকর এবং কুরআন তিলাওয়াতের ও একাত্মবাদীদের প্রতি ভালবাসা এবং মুশরিকদের সাথে শত্রুতা করার দ্বারা অসীলা খোঁজ করা ইত্যাদি।

⧉ সৎ আমলের সাহায্যে আল্লাহ তা'আলার নিকট থেকে পাওয়ার আশা করা যায়। যেমন তাওহীদ, ঈমান, সালাত, সীয়াম, যাকাত, হাজ্জ, সদ্ব্যবহার, প্রতিবেশীর সাথে উত্তম ব্যবহার, সৎ চরিত্র, পিতা-মাতার খিদমাত এবং যে সকল কাজে আসমান-যমীনের সৃষ্টিকর্তার সন্তুষ্টি রয়েছে সেই সমস্ত কাজ করা, বেশী বেশী আল্লাহর যিক্র করা, আল্লাহর ওয়াস্তে মাহব্বাত করা এবং আল্লাহর ওয়াস্তে শত্রুতা করা। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সন্তুষ্টির জন্য উপদেশ দেয়া, সুন্নাতকে উজ্জীবিত করা এবং বিদ'আতের শৃংখলকে ভেঙ্গে দেয়া, তাকলীদ বর্জন করা (বিনা দলীলে কারো

ব্যক্তিগত রায়ের অন্ধ অনুসরণ করাকে তাকলীদ বলে), **ধৈর্যশীল হওয়া**, সৎসাহসী হওয়া, লজ্জাশীল হওয়া। ফল কথা, সর্বপ্রকার শারীয়াত অনুমোদিত সৎ কাজ পালন এবং সর্বপ্রকার নিষিদ্ধ ও নব আবিস্কৃত অসৎ কাজ বর্জন। অন্যান্য আনুগত্য ও নৈকট্য লাভের যাবতীয় বস্তুর মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকটবর্তী হওয়া। এগুলির মাধ্যমে একজন খাঁটি মুসলিম বৈধ অসীলা সহজে তালাশ করতে পারে। বর্তমান সমাজের লোকদেরকে দেখা যায় যে, তারা মৃতদের মাধ্যমে **অসীলা** খোঁজে ঃ তাদের কাছে কোন প্রয়োজনীয় জিনিস চাওয়া, সাহায্য চাওয়া ইত্যাদি। একে মানুষ অসীলা মনে করে, মূলে কিন্তু তা নয়। কারণ অসীলার অর্থ হল আল্লাহর নিকটবর্তী হওয়া; যা ঈমানের দ্বারা এবং সৎ আমলের দ্বারা সম্ভব। অন্যদিকে মৃতদের কাছে দু'আ করা আল্লাহ হতে মুখ ফিরানোর নামান্তর। নাবী বা মৃত অলী-আওলিয়াদের নিকট কোন দু'আ বা অসীলা তালাশ করা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদের বুঝার তাওফীক দান করুন।

জান্নাত থেকে বিতাড়িত হওয়ার সময় আদম (আঃ) কি নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর অসীলায় দু'আ করেছিলেন?

১। তারা বলল ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমরা নিজেদের প্রতি অন্যায় করেছি, তুমি যদি আমাদেরকে ক্ষমা না কর, আর দয়া না কর তাহলে আমরা অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে যাব। [সূরা আ'রাফ-২৩]

☐ আদম (আঃ) নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীলায় দু'আ করেছেন এ কথা কুরআন-সুন্নাহ সম্মত নয়। সাহাবাগণকে (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে অনেক দু'আ শিক্ষা দিয়েছেন। কোন দু'আয় এ কথা পাওয়া যায় না যে, হে আল্লাহ ! তুমি অমুকের মাধ্যমে, অমুকের অসীলায়, অমুকের দু'আয় আমার বিপদ দূর কর। আল্লাহর আদালতে কোন উকিলের প্রয়োজন নেই। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা আমার কাছে দু'আ কর, আমি তোমাদের দু'আ কবূল করব। [সূরা মু'মিন-৬০, সূরা বাকারা-১৮৬] উম্মাতে মুহাম্মাদীর প্রত্যেকেরই দু'আ করার অধিকার রয়েছে।

আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে, অন্যথায় আমল নষ্ট হবে

১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

২। যারা নিজেদের দীনকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করে নিয়েছে আর (আপন আপন অংশ নিয়ে) দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি পুরোপুরি আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। সময় হলেই তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। [সূরা আন'আম-১৫৯]

৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। [সূরা আ'রাফ-৩]

৪। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]
৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ যুমার-২৭, আলে ইমরান-১০৩।
৬। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার অনুসরণ করল সে আল্লাহর অনুসরণ করল আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে তো আল্লাহর নাফরমানী করল।** [ইব্‌ন মাজাহ/৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

☐ কুরআন ও সুন্নাহ আঁকড়ে থাকলে আমরা পথভ্রষ্ট হবনা। শারীয়াতের ক্ষেত্রে সর্বাবস্থায় আমাদেরকে অহী'র গন্ডীর মধ্যে সীমাবদ্ধ থাকতে হবে। কারণ প্রিয় নাবী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম সব সময় অহী'র অপেক্ষায় থাকতেন, তিনি নিজ থেকে কিছুই বলতেননা। দেখুন, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম যেখানে ইজমা-কিয়াস করেননি, অন্য কারো ইজমা-কিয়াস করার সুযোগ আছে কি? মহান আল্লাহ তা'আলার উপরোক্ত আয়াতের মাধ্যমে জানা গেল যে, একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাড়া অন্য কারো আনুগত্য করলে নিজেদের আমল ধ্বংস হবে। বিভিন্ন দলে/তরীকায় বিভক্ত হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উম্মাত হতে খারিজ হয়ে যাবে। মু'মিনগণ একমাত্র আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে। আল্লাহর একটি আদেশ অমান্য করার কারণে ইবলীসের কি পরিণতি হয়েছে তা সবাই জানে। একটি, দু'টি নয়, আল্লাহর অসংখ্য আদেশ অমান্য করে কুরআন ও সহীহ হাদীস ব্যতীত অন্য কারো দেয়া দলীল মানলে তাদের প্রতি শির্‌ক ও বিদ'আতের শাস্তি হওয়াই স্বাভাবিক। আর এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

আমাদের প্রতি মহান আল্লাহ তা'আলার নির্দেশ

১। বল ঃ তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আজ্ঞাবহ হও। অতঃপর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেননা। [সূরা আলে ইমরান-৩২]
২। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মৃত্যু বরণ করনা। [সূরা আলে ইমরান-১০২]
৩। তোমরা সেই লোকদের মত হয়োনা যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌঁছার পরে বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করেছে এবং ঐ শ্রেণীর লোকদের জন্য আছে মহাশাস্তি। [সূরা আলে ইমরান-১০৫]
৪। আল্লাহ্ ও রাসূলের হুকুম মান্য কর, যাতে তোমরা কৃপা প্রাপ্ত হতে পার। [সূরা আলে ইমরান-১৩২]
৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-১৪, ৫৯, ৮০, ১৫০, আন'আম-১৫৯, আ'রাফ-৩, কাহফ-১১০, মু'মিনূন-৩৪, রূম-৩১-৩২, আহযাব-২১, ৩৬, ৭১, ইয়াসিন-২১, শূরা-১০, মুহাম্মাদ-৩৩, ফাত্হ-১৩, মুজাদালাহ-২০, হাশর-৭, আলে ইমরান-৩১, ১০৩, ১৮৭, জিন-২৩, আন্‌ফাল-৪৬, হাদীদ-১৯, মু'মিন-৪।

কুরআনে উল্লেখিত বহু আদেশের মধ্যে উপরের কয়েকটি আয়াতের কথা উল্লেখ করা হল যাতে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ব্যতীত আর কারো আনুগত্য করা যাবেনা। অর্থাৎ আমাদেরকেও আল্লাহর অহীই মানতে হবে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ব্যতীত কোন মানব, সে যত বড় বুজর্গান, আলেম, মুফতী, পীর, যে কোন দলের ইমাম হোক না কেন, যার উপরে কোন অহী আসেনা তার আনুগত্য করা যাবেনা। আল্লাহ ছাড়া কারো মোকাল্লিদ হওয়া যাবেনা, বিধায় মু'মিন হতে হলে আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করতে হবে। যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য না করে বিভিন্ন দলের/তরীকার ইমামের/আলেমের আনুগত্য করে তাদের নিজকে মু'মিন বলে দাবী করাটা দাবীই মাত্র। মুসলিমদের উচিত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে উত্তম আদর্শ জেনে তাঁর আনুগত্য করা। আর আলেমের দায়িত্ব শুধু কুরআন-সুন্নাহই প্রচার করা।

আল্লাহর নির্ধারিত পন্থা বাদ দিয়ে অন্য কিছুর অনুসরণ করা

১। আল্লাহকে বাদ দিয়ে তারা তাদের আলেম আর দরবেশদেরকে রাব্ব বানিয়ে নিয়েছে; আর মারইয়াম-পুত্র মাসীহকেও। অথচ তাদেরকে এক ইলাহ ব্যতীত (অন্যের) ইবাদাত করার আদেশ দেয়া হয়নি। তিনি ব্যতীত সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই, প্রশংসা আর মহিমা তাঁরই, তারা যাদেরকে (তাঁর) অংশীদার গণ্য করে তিনি তা থেকে অনেক উর্ধ্বে। [সূরা তাওবা-৩১]

যদি কোন ব্যক্তি ইবাদাত পালন করে যেমন ঃ সালাত আদায়, সিয়াম পালন, হাজ্জ ও উমরা পালন করে কিন্তু তার ব্যক্তি জীবনে বা বৃহত্তর পরিসরে কিংবা সামাজিক ও রাষ্ট্রীয় জীবনে আল্লাহর বিধান ব্যতীত অন্য বিধানকে সন্তুষ্ট চিত্তে গ্রহণ করে, তাহলে সে আল্লাহর বিধানকে প্রত্যাখ্যান করে অন্য বিধানকে গ্রহণ করল। কেহ আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্য কারো ইবাদাত করলো সে আল্লাহর অধিকার অন্যকে সমর্পন করল।

সুতরাং যে ব্যক্তি দাবী করবে যে, আল্লাহর অনুমতি ব্যতীতই তার ইচ্ছামত বিধান দেয়ার অধিকার রয়েছে, বিধি-নিষেধ করার ইখতিয়ার রয়েছে, হালালকে হারাম করার হক রয়েছে, তাহলে সে তার সীমারেখা অতিক্রম করল এবং নিজেকে আল্লাহর আসনে বসাল, তা সে জেনে বা না জেনেই করুকনা কেন! আমাদের বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেক লোকেই এরূপ আচরণ করে চলছে, যা শির্কের অন্তর্ভুক্ত।

আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করা যাবেনা

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে বিভ্রান্ত হয় সুস্পষ্ট গুমরাহীতে। [সূরা আহযাব-৩৬]

২। এ বিষয়ে দেখুন সূরা সাদ-৫৫-৬৪ নং আয়াত।
৩। শাইতানের নিকট মর্যাদায় বড় সে, যে সর্বাধিক ফিত্না সৃষ্টিকারী। [মুসলিম/৬৮৪৫-জারীর (রাঃ)]

⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মুসলিমদের মধ্যে মারামারি হলে/করলে তারা কাফির। [বুখারী/৫৬০৫] মুসলিমদের মধ্যে বিভিন্ন দল থাকায় এবং ঐ সব দলের ভিন্ন ভিন্ন নীতি থাকায় তাদের মাঝে হত্যা নির্যাতন লেগেই আছে। নিজ নিজ দলের, ইমামের, জামা'আতের প্রাধান্য রক্ষার জন্য বহু লোক সংগ্রাম করে প্রাণ দিচ্ছে; আর বলা হচ্ছে শহীদ হয়েছে। মুসলিমে মুসলিমে মারামারি করলে কাফির হয়ে যায়। মারামারি করতে করতে কাফির হয়ে মারা গেলে কিভাবে আবার শহীদ হয়? এই রকম বিধান আল্লাহর দীনে নেই।

বাতিনী বা গুপ্ত বিদ্যার মাধ্যমে আল্লাহকে পাওয়া

১। হে রাসূল! তোমার রবের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি তা না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলেনা। মানুষ হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে কখনও সৎপথ প্রদর্শন করেননা। [সূরা মায়িদা-৬৭]
২। আর কোন নাবীর পক্ষে কোন বিষয় গোপন করা শোভনীয় নয়; এবং যে কেহ গোপন করবে তাহলে সে যা গোপন করেছে তা উত্থান দিনে আনয়ন করা হবে; অনন্তর প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করেছে তা পূর্ণরূপে প্রদত্ত হবে এবং তারা নির্যাতিত হবেনা। [সূরা আলে ইমরান-১৬১]
৩। যদি কেহ বলে যে (ক) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাব্বকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। (খ) যে ব্যক্তি বলবে যে, আগামীকাল কি হবে সে তা জানে তাহলে সে মিথ্যাবাদী (গ) যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথা গোপন রেখেছেন তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। [বুখারী/৪৪৮২-আয়িশা (রাঃ)]
৪। হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) বলেন ঃ বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুনাফিকদের চেয়েও জঘন্য। কেননা সেই যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে, আর বর্তমানে করে প্রকাশ্যে। [বুখারী/৬৬১৫]

বর্তমান সমাজে লোক মুখে প্রায়ই শোনা যায় যে, প্রত্যেক পীর সাহেবই দাবী করে তারা নিজেরাই খাঁটি, কামেল, অলী-আল্লাহ, আল্লাহর সাধক, মুকাম্মেল, আরো কত কি। অন্য কেহই ঠিক পথে নেই। শারীয়াতের আলেমদেরকে তারা বলে গোমরাহী, ফাসেক, জাহান্নামী ইত্যাদি। পীর সাহেবরা বলেন ঃ বাতেনী বা গুপ্ত বিদ্যার মাধ্যমেই আল্লাহকে পাওয়ার একমাত্র পথ। সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত ইত্যাদি জাহেরী আমল দ্বারা আল্লাহকে পাওয়া যাবেনা। ফলে বুজুর্গ/পীরদের এরূপ ভক্তির কারণে সমাজের লোকেরা সালাত, সিয়াম ইত্যাদি পালন থেকে বিরত থাকে। ইসলাম সম্পূর্ণ ভাবে অহী নির্ভর ধর্ম, আল্লাহর

কাছ থেকে অহী প্রাপ্ত হয়েছেন একমাত্র রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু **আলাইহি** ওয়াসাল্লাম যিনি অক্লান্ত পরিশ্রম করে অহী'র শতভাগ শিক্ষা মানব জাতীর কাছে প্রকাশ্যে পৌঁছে দিয়ে রিসালাতের দায়িত্ব সম্পূর্ণ করে গেছেন। তাই বাতিনী বা গোপন বিদ্যা আছে বলে বিশ্বাস করা মানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লামের রিসালাতের দায়িত্ব পালনকে অসম্পূর্ণ মনে করা (নাউযুবিল্লাহ)। হে পাঠক মুসলিম সমাজ ! কুরআন ও সহীহ হাদীসে যদি বাতিনী বা গুপ্তবিদ্যার রহস্য থাকে তাহলে তা উৎঘাটন করার দায়িত্ব আপনাদের উপর রইল।

আল্লাহর হুকুমে সবই হয় বলা ঠিক নয় বরং সবই আল্লাহর নিয়মে চলছে

১। **মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ**

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِرًا وَإِمَّا كَفُورًا

আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। [সূরা দাহ্‌র-৩]

২। অতঃপর তাকে তার অসৎ কর্ম ও সৎ কর্মের জ্ঞান দান করেছেন। [সূরা শামস-৮]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যদি অন্যায় কাজ হতে দেখে তাহলে সে যেন হাত দ্বারা বাধা দেয়। যদি এ ক্ষমতা না থাকে তাহলে মুখের দ্বারা, যদি তাও সম্ভব না হয় তাহলে অন্তর দ্বারা উক্ত কাজকে ঘৃণা করবে, আর এটাই ঈমানের সর্ব নিম্ন স্তর। [মুসলিম/৮৩]

৪। কল্যাণ এক মাত্র কল্যাণকেই বয়ে আনে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধনদৌলত ন্যায় ও সৎভাবে উপার্জন করবে এবং ন্যায় ও সৎকাজে ব্যয় করবে তা সেই ব্যক্তির জন্য সাহায্যকারী হবে। আর যে ব্যক্তি তা অন্যায়ভাবে উপার্জন করবে সেটা তার জন্য এ রকম খাদ্য হবে যে, সে তা খাবে কিন্তু পরিতৃপ্ত হবেনা। [বুখারী/৫৯৭১-আবূ সাঈদ (রাঃ), নাসাঈ/২৫৮৩]

আল্লাহ আমাদের সঠিক পথের দিশা খুঁজে পাওয়ার জন্য কুরআন নাযিল করেছেন। কুরআন ভাল ও মন্দের পার্থক্যকারী। আল্লাহর পক্ষ থেকে হক আসার পর আর সবই ভ্রান্তি। অন্যদিকে বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহ আমাদেরকে option choose করার ক্ষমতা দিয়েছে অর্থাৎ যে কোন কাজে আমরা ভাল পথটা যেমন গ্রহণ করতে পারি, ইচ্ছা করলে খারাপ পথটাও গ্রহণ করতে পারি। আল্লাহ আমাদেরকে এই সীমিত স্বাধীনতা দিয়েছেন পরীক্ষা করার জন্য। যারা মনে করে সবই আল্লাহর হুকুমে হয় তারা আসলে ভ্রান্তির মধ্যে আছে। আসলে বিষয়টি হচ্ছে আল্লাহর অগোচরে বা জ্ঞানের বাহিরে কোন কিছুই সংগঠিত হয়না। ভাল পথে চললে আল্লাহর রাহমাত ও নি'আমাত পাওয়া যাবে, আর খারাপ পথে চললে আল্লাহর গযবে পতিত হয়ে জাহান্নামে যেতে হবে। আমাদের সমস্ত কাজই যদি আল্লাহর হুকুমে হয় তাহলে জাহান্নাম তৈরী করার কোন প্রয়োজনই ছিলনা। কারণ যত খারাপ কাজ যেমন চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাস, হত্যা ইত্যাদি যাই করিনা কেন, এগুলি যদি আল্লাহর হুকুমে হয় তাহলে আল্লাহ কাকে শাস্তি দিয়ে জাহান্নামে পাঠাবেন? তাহলে তো আল্লাহ কেহকে

শাস্তি দিতে পারবেননা। সবাই বলবে ঃ আমরা তো আপনার হুকুমেই এ সমস্ত কাজ করেছি, তাই আমাদেরকে শাস্তি দিবেননা। তাই সবই আল্লাহর হুকুমে হয় কথাটা ঠিক নয়। আসলে পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে সব কিছুই মহান আল্লাহর নির্ধারিত নিয়মে চলছে, আল্লাহর নিয়মের ব্যতিক্রম কোন ক্ষেত্রেই পাবেননা। সৃষ্টির পর থেকে চন্দ্র-সূর্য আল্লাহর দেয়া নির্ধারিত নিয়মেই চলছে এবং চলবে কিয়ামাত পর্যন্ত। মাছ জাতীয় প্রাণীরা পানির নিচে বাস করতে পারবে এবং পাখীরা আকাশে উড়তে পারবে, মানুষসহ সমস্ত স্থল প্রাণীরা আকাশে উড়তে পারবেনা এবং পানির ভিতরেও বস-বাস করতে পারবেনা। আল্লাহ মানুষকে ভাল কাজ করার ক্ষমতা দিয়েছেন এবং খারাপ কাজ করারও ক্ষমতা দিয়েছেন। আর ভাল কাজ ও খারাপ কাজ কি এবং এ সবের পরিনাম কি তাও আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন। তবে এ কথা অবশ্যই বলা যায়, পৃথিবীতে যা কিছু ঘটছে তা সবই আল্লাহর দেয়া নিয়ন্ত্রণ/নিয়ম। যেমন ঃ চাঁদ পৃথিবীর চারি দিকে ঘুরে, বীজ থেকে গাছ হয়, গাছ থেকে ফুল হয়, ফল হয়। পানি থেকে বাষ্প হয়, বাষ্প থেকে মেঘ হয়, মেঘ থেকে বৃষ্টি হচ্ছে, পাপের কাজ করলে শাস্তি হয়। এ বিশ্বে যা কিছু ঘটছে তা সবই আল্লাহর দেয়া নিয়ন্ত্রণ।

আল্লাহ যা ইচ্ছা তা কার্যকরী করেন

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَا يُسْأَلُ عَمَّا يَفْعَلُ وَهُمْ يُسْأَلُونَ

তিনি যা করেন সেই বিষয়ে তাঁকে প্রশ্ন করা যাবেনা, বরং তাদেরকেই প্রশ্ন করা হবে। [সূরা আম্বিয়া-২৩]

২। আমি সব কিছু সৃষ্টি করেছি নির্ধারিত পরিমাপে। [সূরা কামার-৪৯]

৩। যিনি যমীন ও আসমানের রাজত্বের মালিক, তিনি কোন সন্তান গ্রহণ করেননি, তাঁর রাজত্বে কোন অংশীদার নেই, তিনি সমস্ত কিছু সৃষ্টি করেছেন, আর সেগুলোকে যথাযথ করেছেন পরিমিত অনুপাতে। [সূরা ফুরকান-২]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হাদীদ-২২, আন'আম-১৬৫, বাকারা-২৮৬, তাগাবুন-১৬।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার পা (কিয়ামাতের দিন) নড়বেনা যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে যে, কি কাজে সে তা শেষ করেছে; তার ইল্ম সম্পর্কে তদনুযায়ী কি আমল করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে যে কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; তার শরীর সম্পর্কে যে, সে কিসে তা বিনাশ করেছে। [তিরমিযী/২৪২০-আবূ বারযা আসলামী (রাঃ)]

☐ আল্লাহ তা'আলার গুণাবলীর মধ্যে রয়েছে তিনি যা ইচ্ছা তা কার্যকরী করেন। আল্লাহর ইচ্ছা ও সংকল্প ব্যতীত কোন কিছু অস্তিত্ব লাভ করেনা। পৃথিবীর কোন কিছুই তাঁর পরিমাপের বাইরে নয় এবং তাঁর ব্যবস্থাপনা ছাড়া কোন কিছুই বাস্তবে রূপ নেয়না। পূর্ব নির্ধারিত পরিমাপের কোন হেরফের হয়না।

ভাগ্য লিপিতে যা আছে তার বাইরে কিছু হয়না। তিনি যতটুকু **ইচ্ছা করেন** জগতবাসী ততটুকুই লাভ করে । কিন্তু তিনি (আল্লাহ) যদি বাধা দেন তাহলে কেহ তার বিরোধিতা করতে পারেনা। তিনি যদি ইচ্ছা করেন যে সমস্ত বস্তুই তাঁর আনুগত্য করুক তাহলে সকলেই তা করতে বাধ্য। তিনি সৃষ্টিকূল এবং তাদের যাবতীয় কার্যাবলী সৃষ্টি করেছেন। তাদের আহার নির্ধারণ করেছেন। তিনি যাকে **ইচ্ছা করেন** স্বীয় রাহমাত দ্বারা হিদায়াত দান করেন।

আল্লাহ নিরাকার নন

⊙ **আল্লাহরই জন্য** পূর্ব ও পশ্চিম; অতএব তোমরা যে দিকেই মুখ ফিরাও সে দিকেই আল্লাহর চেহারা বিরাজমান; কেননা আল্লাহ (সর্বদিক) পরিবেষ্টনকারী, পূর্ণ জ্ঞানবান। [সূরা বাকারা-১১৫]

⊙ কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। [সূরা শূরা-১১]

⊙ সুতরাং তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জাননা। [সূরা নাহল-৭৪]

১। আল্লাহর উভয় হাত প্রসারিত, যেভাবে ইচ্ছা দান করেন। [সূরা মায়িদা-৬৪]

২। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়না। কিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে থাকবে, আর আকাশমন্ডলী থাকবে ভাঁজ করা অবস্থায় তাঁর ডান হাতে। মাহাত্ম্য তাঁরই, তারা যাদেরকে তাঁর শরীক করে তিনি তাদের থেকে বহু উর্ধ্বে। [সূরা যুমার-৬৭]

৩। ধৈর্য ধারণ কর তোমার রবের নির্দেশের অপেক্ষায়; তুমি আমার চোখের সামনেই রয়েছ। তুমি তোমার রবের প্রশংসা, পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তুমি শয্যা ত্যাগ কর । [সূরা তুর-৪৮]

৪। তখন আমি তার কাছে অহী পাঠালাম ঃ আমার দৃষ্টির সম্মুখে আমার নির্দেশ অনুযায়ী নৌযান তৈরি কর। [সূরা মু'মিনূন-২৭]

৫। অবিনশ্বর শুধু তোমার রবের মুখমন্ডল যিনি মহিমাময়, মহানুভব। [সূরা আর রাহমান-২৭]

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ কিয়ামাতের দিন পৃথিবীকে মুষ্টিবদ্ধ করবেন আর তাঁর ডান হাত দিয়ে আকাশকে গুটিয়ে নিবেন। অতঃপর বলবেন ঃ আমিই বাদশাহ, পৃথিবীর রাজা-বাদশাহরা কোথায়? [বুখারী/৬০৬২, মুসলিম/৬৭৯৩]

৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নাম ততক্ষণে পূরণ হবেনা যতক্ষণ না আল্লাহ তাঁর পা জাহান্নামে রেখে দিবেন। তখন জাহান্নাম বলতে থাকবে ঃ যথেষ্ট হয়েছে। [বুখারী/৪৪৭৫]

আল্লাহতা'আলা সমগ্র বিশ্ব ও তাতে ছোট-বড় যা কিছু আছে সবকিছুর স্রষ্টা, তাঁর সৃষ্টির সাথে তাঁর কোন ধরনের সাদৃশ্যতা নেই। কোন সৃষ্টির সাথে তাঁর

উপমা বা তুলনা করা চলবেনা। কিন্তু এর অর্থ এই নয় যে, আল্লাহ নিরাকার। উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসসমূহে আল্লাহর বিভিন্ন অঙ্গ সম্পর্কে উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ নিরাকার বললে উপরোক্ত আয়াত ও হাদীসের বিরোধী হয়।

কাল্‌ব পরিশুদ্ধির মাধ্যমে কি আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যায়?

১। বারাকাতময় তিনি, যাঁর হাতে সর্বময় কর্তৃত্ব; তিনি সব কিছুর উপর ক্ষমতাবান। [সূরা মূলক-১]

২। বল ঃ আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ, আমার নিকট অহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে সে যেন সৎ 'আমল করে, আর তার রবের 'ইবাদাতে কেহকে শরীক না করে। [সূরা কাহফ-১১০]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেহ যেন এ কথা না বলে, আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে। [বুখারী/৫৭৩৪-সাহল (রাঃ)]

□ আমরা আল্লাহর বান্দা এবং শুধু তাঁরই ইবাদাত, তাবেদারী করার নিমিত্তে আমাদেরকে সৃষ্টি করা হয়েছে। এখন যদি আমরা বুজুর্গ, দরবেশ, পীরদের কথা মেনে তাদের মতামত অনুসারে/পদ্ধতিতে কাল্‌ব পরিস্কারে লেগে যাই তাহলে তাদের অনুসরণ করা হল এবং তাকে আল্লাহর সঙ্গে শরীক করা হল, এমতাবস্থায় আমরা মুশরিক হয়ে যাব। মুশরিক হলে আর আল্লাহর নৈকট্য লাভ করা যাবেনা, বরং চিরকাল জাহান্নামে থাকতে হবে। আল্লাহর নৈকট্য এবং সন্তুষ্টি লাভ করার জন্য তাঁকে ভয় করা, সর্বাবস্থায় শুধু তাঁরই ইবাদাত করার কথা বলেছেন। এ জন্যই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পথ অবলম্বন করে আল্লাহর দেয়া বিধান মেনে চললেই আমরা আল্লাহর নৈকট্য লাভ করতে পারব।

আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী নেই

১। যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে - তাহলেই তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারবে। [সুরা বাকারা-১৮৬]

২। তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারেনা এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে। [সূরা ইউনুস-১৮]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বানী ইসরাইল-২, ৫৪, আহযাব-৪৮।

৪। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডান দিকে দু'টি রেখা টানলেন এবং বাঁ দিকেও দু'টি রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে হাত রেখে বললেন ঃ এটা আল্লাহর রাস্তা। এ পথই হল সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবেনা। করলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। [ইব্‌ন মাজাহ/১১]

ইসলাম ধর্মে আল্লাহ ও বান্দার মাঝে মধ্যস্থতাকারী হিসাবে কোন উকিলের ব্যবস্থা নেই। হিন্দু ধর্মে সাধকরা সাধারণ মানুষদের উকিল, তারা সৃষ্টের সাথে সৃষ্টিকর্তার যোগাযোগ ঘটিয়ে থাকেন। কোন হিন্দুই সাধক, পুরোহিত বা ঠাকুর ব্যতীত তাদের ভগবানের সাথে যোগাযোগ করতে পারেনা। এই সাধক প্রথা, উকিল প্রথা বা মধ্যস্থতাকারীর প্রথা ইসলামে আল্লাহ তা'আলা রাখেননি। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রদর্শিত পথে বান্দাগনের আল্লাহর সাথে সরাসরি যোগাযোগের প্রথাই ইসলামে স্বীকৃত।

আল্লাহর সাথে যোগাযোগের জন্য কোন উকিলের ব্যবস্থা ইসলামে নেই। আল্লাহর রাস্তা থেকে মুসলিমদেরকে সরিয়ে নেয়ার জন্য মানুষের মনে শাইতান ও মানুষ শাইতান কুমন্ত্রণা দিয়ে চলছে এবং এই কুমন্ত্রণা কিয়ামাত পর্যন্ত চলতে থাকবে।

'আল্লাহই একমাত্র ইলাহ' এর উপর সর্বদা আমল করা

১। তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গুমরাহ করেছেন, আর তার কানে ও অন্তরে মোহর মেরে দিয়েছেন, আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহ ছাড়া আর কে (আছে যে) তাকে সঠিক পথ দেখাবে? এরপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? [সূরা জাসিয়া-২৩]

২। 'তোমরা দুই ইলাহ গ্রহণ করনা, তিনি তো এক ইলাহ; অতএব শুধু আমাকেই ভয় কর। [সূরা নাহল-৫১]

৩। আল্লাহর সাথে অন্য কোন ইলাহ সাব্যস্ত করনা, করলে নিন্দিত ও নিঃসহায় হয়ে পড়বে। [সূরা বানী ইসরাইল-২২]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১৫৯, আম্বিয়া-২৫, জীন-২, ইউনুস-৩৯, আন'আম-১৭, ৮২, ৮৮, সাদ-৫, যারিয়াত- ৫২, ৫৩, যুমার-৬৫, ৬৫, নাহল-৩৬, নূর-৫৫, আহযাব-৪, ৩৯, বানী ইসরাইল-৩১, ৩৯, নিসা-৩৬।

৫। আবূ মালিক তাঁর পিতার সূত্রে বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি 'আল্লাহ্ ছাড়া কোন ইলাহ নেই' এ কথা স্বীকার করে এবং আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যকে অস্বীকার করে তার জানমাল নিরাপদ। আর তার হিসাব নিকাশ আল্লাহর কাছে সহজ হবে। [মুসলিম/৩৭]

◻ কোন একজন মানুষ একই সাথে দুই ইলাহকে মেনে চলতে পারবেনা। সমাজে অতীতের ন্যায় বর্তমানেও এই দুই ইলাহর আনুগত্য, পায়রুবী, রেজামন্দী ও ইবাদাত-বন্দেগীর সিলসিলা চলছে। সমাজ নীতি হবে সমাজতান্ত্রিক, রাজনীতি হবে আমলা নির্ভর গণতান্ত্রিক, ধণতান্ত্রিক পুঁজিবাদী বা কমিউনিস্ট অর্থনীতি হবে, আর ধর্ম হবে যার যা খুশী ব্যক্তিগত। ধর্ম নিরপেক্ষ ব্যক্তি সমাজতন্ত্রে বিশ্বাসী হয় অথচ তিনি আবার বলেন ইসলাম পূর্ণাঙ্গ জীবন বিধান। আল্লাহর উপর আস্থা আছে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াতও স্বীকার করেন, কিন্তু ঐ বিশ্বাস এবং আস্থাকে জীবনে রূপ দিতে নারাজ। মুখে ইসলামের গুণগান! কিন্তু যখনই বলা হয় ইসলামী অর্থনীতি, সুদমুক্ত ব্যাংকিং, সরকারী ব্যবস্থাপনায় যাকাত আদায়/বন্টন হবে, ব্যভিচার, হত্যা, ডাকাতির শাস্তি কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী হবে তখনই তাদের ভীষন রাগ হয়। তখনই মৌলবাদী আর সাম্প্রদায়িকতার গন্ধ তালাশে মেতে উঠেন। যখনই বলা হবে রাজনীতি ইসলামে আছে, নারীকে পর্দায় রাখতে হবে, নারী পুরুষের কর্তা হবেনা তখনই গণতন্ত্রের মিছিল নিয়ে কুরআন হাদীসওয়ালাদের উপর হামলা, মামলা, ষড়যন্ত্র শুরু হয়ে যায়। তাহলে কি মাসজিদে ও ঈদগাহে কেবল ইসলাম বিচরণ করবে? আর কেবল বিবাহ-শাদী আর খাতনা ও মৃত্যুতে ইসলামকে নিয়ে টানা হেঁচড়া হবে? অথচ জন্ম-মৃত্যুর মাঝখানে ইসলাম ঢুকতে পারবেনা? এ ধরনের খায়েশী বন্দনা স্পষ্টত ইসলাম প্রত্যাখ্যান করার নামান্তর। বরং লোক দেখানো ইসলাম।

মু'মিন ব্যক্তি কি আল্লাহর দর্শন লাভ করেন?

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَلَا تَضْرِبُوا لِلّٰهِ الْأَمْثَالَ إِنَّ اللّٰهَ يَعْلَمُ وَأَنْتُمْ لَا تَعْلَمُونَ

অতএব কারও সাথে আল্লাহর তুলনা করনা। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জাননা। [সূরা নাহল-৭৪]

২। তাঁকে তো কারও দৃষ্টি পরিবেষ্টন করতে পারেনা, বরং তিনিই সকল দৃষ্টি পরিবেষ্টনকারী এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। [সূরা আন'আম-১০৩]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ শূরা-১১।

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসে, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা ভালবাসেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেনা, আল্লাহ তা'আলাও তার সাক্ষাৎ লাভ করা পছন্দ করেননা। [বুখারী/৬০৫০]

◻ জাগতিক মানব চক্ষু দ্বারা আল্লাহকে দেখা যাবেনা। তাই মূসা (আঃ) ইচ্ছা প্রকাশ করেও আল্লাহকে দেখতে পাননি। কারণ আল্লাহর নূরের তাজাল্লী ইহজগতের চোখ ধারণ করার ক্ষমতা রাখেনা।

স্বপ্নে আল্লাহকে দেখার দাবী একটা ধোকাবাজী, কারণ এমন কিছু স্বপ্নে দেখা যায়না, যার আকৃতিই আমাদের অজানা। কোন কোন দরবেশ, পীর আল্লাহকে মানব আকৃতিতে দেখে থাকে বলে দাবী করে। উপরোক্ত কুরআনের আয়াতসমূহে স্পষ্ট বলা হয়েছে যে, আল্লাহর আকৃতির সদৃশ নেই। জগতের কোন কিছুর আকৃতির সাথে আল্লাহর আকৃতির মিল নেই।

আল্লাহ কোথায় আছেন?

১। দয়াময় আরশে সুপ্রতিষ্ঠিত আছেন। [সূরা তাহা-৫]

২। তোমরা কি তোমাদেরকে নিরাপদ মনে করে নিয়েছ যে, যিনি আকাশে আছেন তিনি তোমাদেরকে যমীনে ধ্বসিয়ে দিবেননা যখন তা হঠাৎ থর থর করে কাঁপতে থাকবে? [সূরা মুলক-১৬]

৩। তোমাদের রাব্ব আল্লাহ যিনি ছয় দিনে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। [সূরা আ'রাফ- ৫৪]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাজদাহ-৪, ৫, হাদীদ-৪, ফাতির-১০, ইবরাহীম-১, ফুরকান-৫৯, রা'দ-২, ইউনুস-৩, নিসা-৫০, ১৫৮, আন'আম-৩, ১৮, মা'আরিজ-৪, নাহল-৫০, সূরা ইখলাস-১-২, বাকারা-১৬৩, মায়িদা-৭।

৫। যখন তোমরা (আল্লাহর কাছে) জান্নাত চাবে তখন 'ফিরদাউস' চাবে, কেননা এটি জান্নাতের মাঝখানে অবস্থিত। আর এর উপর করুণাময়ের (আল্লাহর) আরশ। [বুখারী/৬৯০৫]

৬। মিরাজে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সপ্তম আকাশে নিয়ে যাওয়া হয়, এমনকি তিনি তাঁর রবের সাথে কথাও বলেন এবং ঐ সময় পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য করা হয়। [মুসলিম/৩০৮]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহান আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন ঃ কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে, আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে, আমি (তার প্রার্থিত বস্তু) তাকে দান করব। কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাবে, আমি তাকে ক্ষমা করব। [বুখারী/১০৭৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/৪৪৬, মুসলিম/১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৩৬৬]

- আল্লাহর অবস্থান তাঁর আরশে, যা সপ্তম আকাশের উপর। সেখানে অবস্থান করেই তিনি সব জানেন ও প্রত্যক্ষ করেন। সূর্য আল্লাহর একটি সৃষ্টি। সূর্য নিজ অবস্থানে থেকে যদি সমগ্র পৃথিবীকে আলো ও তাপ দিতে পারে তাহলে যিনি এ বিশ্বজাহানের স্রষ্টা, তাঁর পক্ষে নিজ আরশে অবস্থান করে তাঁর বান্দাদের কাজ-কর্ম দেখা ও জানা আরও বেশি সম্ভব।

আল্লাহ সর্বত্র বিরাজমান নন। তিনি আরশে আসীন। এ ধরনের আলোচনাকে অনেকে ছোট খাটো বিষয় বলে এড়িয়ে যান। আসলে কি আল্লাহর অবস্থান সম্পর্কিত আলোচনা ছোট-খাট বিষয়? এটি কি আকীদার মৌলিক বিষয় নয়? আল্লাহকে খালিক, মালিক, রিয্‌কদাতা, আইন ও বিধানদাতা হিসাবে বিশ্বাস করা যেমন ঈমানের দাবী, ঠিক তেমনি আল্লাহ যে 'আরশের উপর আসীন' এ বিশ্বাসও ঈমানের দাবী। যারা আল্লাহকে নিজেদের রাব্ব ও ইলাহ হিসাবে মানে, 'আল্লাহর সার্বভৌমত্ব মানে ও তা প্রতিষ্ঠার চেষ্টা করে, তারা 'আল্লাহ আরশে আসীন' সর্বত্র বিরাজমান নন এ বিশ্বাসকেও এ বিষয়ের আলোচনাকে ছোট খাট বিষয় বলতে পারেনা। এ বিষয়ে আরও জানতে পাঠ করুন ঃ সূরা যুমার-৬৫, সূরা আ'রাফ-১৪৩। মু'মিন ব্যক্তিরা বিশ্বাস করে যে, আল্লাহ উপরে আছেন। আল্লাহর কিতাব, রাসূলের সুন্নাত ও সুস্থ বিবেকও তা সমর্থন করে। আমরা এও বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা সকল বস্তুকে বেষ্টন করে আছেন, কিন্তু আল্লাহকে কোন বস্তুই পরিবেষ্টন করতে পারেনা। কোন মু'মিনের জন্যই এটা বৈধ নয় যে, সে কোন মানুষের কথাকে গ্রহণ করতে গিয়ে কুরআন-সুন্নাহকে প্রত্যাখ্যান করবে, তা সেই মানুষটি যত বড়ই জ্ঞানী হোক না কেন।
যারা বলে আল্লাহ মু'মিন ব্যক্তির অন্তরে আছেন, তাদের কথার সমর্থনে আমাদের জানা মতে কুরআন, সুন্নাহ কিংবা সালাফে সালিহীনের কোন উক্তি পাওয়া যায়না। কথাটির অর্থ যদি এই হয় যে, আল্লাহ বান্দার অন্তরে অবতীর্ণ হয়ে আছেন তাহলে কথাটি সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট। তাদের উদ্দেশ্য হল আল্লাহ আকাশে আছেন এ কথাকে অস্বীকার করা এবং মু'মিনের অন্তরে আল্লাহর অবস্থানকে সাব্যস্ত করা, অথচ এটা বাতিল।

আলেম নামধারী কতিপয় লোকের বর্তমান অবস্থা

১। তোমরা কি এই আশা কর যে, তারা তোমাদের কথায় ঈমান আনবে? অথচ তাদের একদল আল্লাহর বাণী শ্রবণ করত ও বুঝার পর জেনে শুনে তা বিকৃত করত। [সূরা বাকারা-৭৫]

২। যখন তারা মু'মিনদের সংস্পর্শে আসে তখন বলে, 'আমরা বিশ্বাস স্থাপন করেছি'। আবার যখন তারা নিভৃতে একে অন্যের সঙ্গে মিলিত হয় তখন বলে, 'আল্লাহ তোমাদের কাছে যা (তাওরাতে) ব্যক্ত করেছেন (মুহাম্মাদ সাঃ সম্পর্কে) তোমরা কি তা তাদেরকে বলে দাও যাতে এর দ্বারা তারা তোমাদের রবের সম্মুখে তোমাদের বিরুদ্ধে যুক্তি পেশ করবে? তোমরা কি বুঝনা'? তাদের কি জানা নেই যে, যা তারা গোপন রাখে অথবা প্রকাশ করে অবশ্যই আল্লাহ তা জানেন? [সূরা বাকারা-৭৬-৭৭]

৩। তাদের মাঝে এমন কিছু নিরক্ষর লোক আছে যাদের মিথ্যা আকাংখা ছাড়া কিতাবের কোন জ্ঞানই নেই, তারা কেবল অলীক ধারণা পোষণ করে। [সূরা বাকারা-৭৮]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি **ইসলামে কোন** ভাল রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীকালে যদি সেই অনুযায়ী **আমল করা** হয় তাহলে আমলকারীর সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের পুরস্কারে কোন রূপ ঘাটতি হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কু-রীতির প্রচলন করবে এবং তারপর সেই অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তাহলে ঐ আমলকারীর মন্দ ফলের সমপরিমাণ পাপ তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের পাপ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবেনা। [মুসলিম/৬৫৫৬, তিরমিযী/২৬৭৪]

৫। যে ব্যক্তির আমল তাকে পিছিয়ে দিবে তার বংশ মর্যাদা তাকে এগিয়ে নিতে পারবেনা। [মুসলিম/৬৬০৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

☐ জাহিলি যুগের উক্ত রীতি আজকের মুসলিম সমাজে ব্যাপক **বিস্তার লাভ** করেছে। বর্তমান সমাজের কতিপয় আলেম এবং অলী-দরবেশ প্রবৃত্তি পরায়ণতায় সীমা ছাড়িয়ে গেছেন। তারা আল্লাহ সম্পর্কে এমন এমন কথা বলেন যার কোন ভিত্তি নেই। শারীয়াতের এমন সব ব্যাখ্যা দেন যে সম্পর্কে খোদ ইসলামই লজ্জাবোধ করে। সবকিছুর ফাইসালা আল্লাহর হাতে।

আল্লাহ মানুষের (মাখলুকের) সাথে থাকার অর্থ

১। তিনি আসমান ও যমীনকে ছয় দিনে সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর আরশে সমাসীন হয়েছেন। তিনি জানেন যা যমীনে প্রবেশ করে, আর যা তা থেকে বের হয়, আর যা আকাশ থেকে অবতীর্ণ হয়, আর যা তাতে উঠে যায়। তোমরা যেখানেই থাক তিনি তোমাদের সঙ্গে আছেন। তোমরা যে কাজই করনা কেন, আল্লাহ তা দেখেন। [সূরা হাদীদ-৪]

২। তুমি কি অনুধাবন করনা, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আল্লাহ তা জানেন? তিন ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে চতুর্থ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; এবং পাঁচ ব্যক্তির মধ্যে এমন কোন গোপন পরামর্শ হয়না যাতে ষষ্ঠ হিসাবে তিনি উপস্থিত থাকেননা; তারা এতদপেক্ষা কম হোক বা বেশি হোক, তারা যেখানেই থাকুকনা কেন তিনি তাদের সাথে আছেন। তারা যা করে, তিনি তাদেরকে কিয়ামাত দিবসে তা জানিয়ে দিবেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সম্যক অবগত। [সূরা মুজাদালাহ-৭]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাহা-৫, আ'রাফ-৫৪, শূরা-১১, যুমার-৬৭, আন'আম-১০৩, তাওবা-৪০, নাহল-১২৮।

৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে ঃ এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে ঃ কে তোমার রাব্বকে সৃষ্টি করেছে? এই পর্যায়ে পৌঁছলে, তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা করবে এবং এ ধরণের ভাবনা থেকে বিরত থাকবে। [মুসলিম/২৪৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

□ উপরোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে জানা গেল যে, আল্লাহ সৃষ্টি জীবের সাথে আছেন। তবে এর অর্থ এই নয় যে, তিনি মাখলুকের সাথে মিশে সর্বত্র বিরাজমান; বরং এর অর্থ হল আল্লাহ তা'আলা আরশের উপর থেকে স্বীয় জ্ঞান ও ক্ষমতার মাধ্যমে সমস্ত মাখলুককে ঘিরে আছেন। কোন কিছুই তাঁর জ্ঞানের বাইরে নয়।

আর আল্লাহ তা'আলা ধৈর্যশীল, মুত্তাকী ও সৎকর্মশীলদের সাথে থাকার অর্থ এই যে, সাহায্য ও হিফাযাতের মাধ্যমে তিনি তাঁদের সাথে আছেন। আল্লাহর প্রভাব স্বীয় মাখলুকের নিকট থাকা আরশের উপর থাকার পরিপন্থি নয়। কেননা আল্লাহর মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকা এক মাখলুক অন্য মাখলুকের নিকটে ও সাথে থাকার মত নয়। আরশের উপর বিরাজমান থেকে সমস্ত মাখলুকের যাবতীয় বিষয়ের খবর রাখার মধ্যেই আল্লাহর পরিপূর্ণ ক্ষমতার প্রমাণ বহন করে। ⊙ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কোন কিছুই তাঁর অনুরূপ নয়। তিনি শোনেন এবং দেখেন। [সূরা শূরা-১১] অনেকের ধারণা আল্লাহর আরশ মানুষের কাল্‌বে।

মোট কথা আমরা বিশ্বাস করি, কুরআনের এক আয়াত অন্য আয়াতের বিরোধী নয়। [সূরা নিসা-৮২] তাই আমরা বিশ্বাস করি যে, আল্লাহ তা'আলা আরশের উপরে আছেন। কারণ এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে অসংখ্য দলীল রয়েছে । এমনিভাবে অন্যান্য দলীলের মাধ্যমে জানা যায় যে, আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। উভয় প্রকার দলীলের মাঝে সমন্বয় করতে গিয়ে আমরা বলি ঃ যেখানে বলা হয়েছে আল্লাহ মানুষের সাথে আছেন তার অর্থ হচ্ছে জ্ঞানের মাধ্যমে, শক্তির মাধ্যমে এবং সমর্থনের মাধ্যমে আল্লাহ আমাদের সাথে আছেন। আর বাস্তবে তিনি স্বীয় সত্ত্বায় আরশের উপর বিরাজমান। আল্লাহর বিশালতার কারণে সব কিছুই তাঁর দৃষ্টির মধ্যে। মানুষের প্রয়োজনগুলি ফিরিশতাগণের মাধ্যমে করেন। যেমন রাসূলকে (সাঃ) সালাত শিক্ষা দিয়াছেন, যুদ্ধে সাহায্য করেছেন ইত্যাদি।

তা ছাড়াও আমাদের কথা যেমন ঃ "আমি তোমার সাথে আছি" এর অর্থ এই নয় যে, আমি তার সাথে মিশে আছি। আরাবী ভাষায় বলা হয় ঃ আমরা চলতে ছিলাম এমতাবস্থায় চন্দ্র আমাদের সাথেই ছিল। অথচ চন্দ্র পথিকের মাথার অনেক উপর এবং তার থেকে অনেক দূরে। শ্লোগানের মধ্যে বলা হয়ে থাকে ঃ অমুক তুমি এগিয়ে চল, আমরা আছি তোমার সাথে। অথচ নেতা রয়েছে এক শহরে, আর শ্লোগানদাতারা রয়েছে অন্য শহরে ইত্যাদি।

নবজাতকের কানে আযান দেয়া, আকীকা ও নাম রাখা প্রসঙ্গ

১। আবূ রা'ফে (রাঃ) বলেছেন ঃ ফাতিমার (রাঃ) ঘরে যখন হাসান ও হুসাইন জন্ম নেন তখন তিনি আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাদের কানে আযান দিতে দেখেছেন। [তিরমিযী/১৫২০]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আকীকার সাথে শিশুর বন্ধক। শিশুর পক্ষ থেকে সপ্তম দিনে পশু যবাহ করা হবে, নাম রাখতে হবে ও

মাথা মুন্ডন করতে হবে। কুরবানীতে যে ধরণের ছাগল যবাহ করা জায়েয আকীকায় সেই ধরণের ছাগল না হলে তা যবাহ করা যথেষ্ট বলে গন্য হবেনা। [তিরমিযী/১৫২৮-সামুরা (রাঃ), নাসাঈ/৪২২১]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে ঃ সন্তানের সাথে আকীকা জড়িত। তার পক্ষ থেকে রক্ত প্রবাহিত (অর্থাৎ আকীকার পশু যবাহ) কর এবং তার অশুচি (চুল, নখ ইত্যাদি) দূর করে দাও। [বুখারী/৫০৬৩-সালাম ইব্‌ন আমির (রাঃ), তিরমিযী/১৫২১]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছেলের জন্য দু'টি ছাগল এবং মেয়ের জন্য একটি ছাগল আকীকা দিতে হবে। আকীকার পশু নর হোক বা মাদী হোক তাতে তোমাদের কোন ক্ষতি হবেনা। [তিরমিযী/১৫২২-উম্মু কুরয (রাঃ), ১৫১৯, আবূ দাউদ-২৮২৫, নাসাঈ/৪২১৬, ইব্‌ন মাজাহ/৩১৬২]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখ; তবে আমার উপনামে (আবুল কাসিম) তোমরা নাম রেখনা। [আবূ দাউদ/৪৮৮১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৩২৭৭, ৫৭৪২]

৬। নাম (আকীকার নাম) বদলিয়ে পূর্ব নামের চেয়ে উত্তম নাম রাখা যাবে। [বুখারী/৫৭৪৫]

⧉ একটি পরিবারে যখন একটি শিশুর জন্ম হবে তখন কি করতে হবে তাও ইসলাম বলে দিয়েছে। সেদিকেও একজন আদর্শ মুসলিমকে সতর্কতার সাথে খেয়াল রাখতে হবে। নবজাতক ভূমিষ্ট হবার পরই কেঁদে উঠে শাইতানের খোঁচায়। কারণ তখনই শাইতানের পিছু লাগা কাজটি শুরু হয়ে যায়। আর তখনই আযান দিয়ে ইসলামী কানূনে শাইতান থেকে আটকে দিতে হবে ঐ সদ্য ভূমিষ্ট শিশুকে। এই আযান ধ্বনি নবজাতককে শুনানোর রীতি আজ ক'জনের বেলায় অনুসৃত হয়? এখানেই যদি শারীয়াতের কানূন লংঘিত হয় তাহলে তো শাইতানের শুরুটা নির্বিঘ্নে হতে থাকবে। আদর্শ মুসলিম পরিবারে এটা হতে দেয়া চলবেনা। শাইতানকে এখান থেকেই রুখতে হবে। শিশুর জন্মের ৭ম দিনে আকীকা করার সুন্নাত কাজটি গুরুত্ব সহকারে মুসলিম পিতা-মাতাকে পালন করতে হবে। সমাজে এটাকে যথেষ্ট গুরুত্ব না দিয়ে ধুমধাম সহকারে জন্মবার্ষিকী পালনের রেওয়াজ চলছে যা হাদীসে নেই। একটি সুন্দর অর্থবহ নাম রাখতে হবে। ইসলামী নাম হতে হবে যার অর্থ আল্লাহর দাসত্ব ও বন্দেগী প্রকাশ করে। অনেকে ঈদুল আযহার কুরবানীর গরুর ভাগে আকীকার কাজটি সেরে নেন। এর কোন হাদীস নেই। শারীয়াতে কুরবানীর গরুর ভাগে আকীকা প্রদানের কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবা (রাঃ) থেকেও প্রমাণিত নয়।

আমীরের আনুগত্য করা

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন

মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। [সূরা নিসা-৫৯]

২। আবু হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল সে আল্লাহরই আনুগত্য করল। আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল সে আল্লাহরই নাফরমানী করল এবং যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের আনুগত্য করল সে আমারই আনুগত্য করল । আর যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের নাফরমানী করল সে আমারই নাফরমানী করল। [বুখারী/৬৬৩৯]

৩। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ যদি তোমাদের উপর এরূপ কোন হাবশী দাসকেও শাসক নিযুক্ত করা হয় যার মাথাটি কিশমিশের ন্যায় তবুও তার আনুগত্য কর। [বুখারী/৬৬৪৪]

৪। আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী (সাঃ) বলেছেন ঃ যদি কেহ তার আমীর (ক্ষমতাসীন) থেকে এমন কিছু দেখে যা সে অপছন্দ করে তাহলে সে যেন ধৈর্য ধারণ করে। কেননা যে কেহ জামা'আত থেকে এক বিঘত পরিমাণ দূরে সরে মারা যাবে, সে জাহিলিয়াতের মৃত্যুর ন্যায় মারা যাবে। [বুখারী/৬৬৪৫]

মুসলিমদেরকে অবশ্যই জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করতে হবে। বাসা, গ্রাম, ইউনিয়ন, থানা, জেলা, দেশ ইত্যাদি পর্যায়ে অবশ্যই আমীর/নেতা থাকতে হবে, যার নেতৃত্বে ইসলামের সঠিক জীবন বিধান পরিচালনা করতে হবে। বর্তমান সমাজে কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধান মোতাবেক জীবন যাপন করার জন্য এরূপ আমীর/নেতা নেই বললেই চলে। তাই সমাজে আমরা নিজেদের ইচ্ছামত সাদাকাতুল ফিত্র, ধন সম্পদের যাকাত ও ফসলের যাকাত ঠিকমত বণ্টন করছিনা। ফলে জামা'আতবদ্ধ জীবন যাপন হচ্ছেনা, ফলে ইসলামের সুফল সমাজে প্রতিষ্ঠা হচ্ছেনা। অপরদিকে কোন ফাইসালা কুরআন-হাদীস অনুসারে হলেও কোন কোন ক্ষেত্রে তা মান্য করা হচ্ছেনা। ফলে কোথাও বিদ'আতের প্রচলন হচ্ছে, আবার কোথাও কুরআন-হাদীস অমান্য করা হচ্ছে, ফলে মুসলিমরা বেশী ক্ষতিগ্রস্থ হচ্ছে।

ইসলাম ধর্মের সঠিক মাপকাঠি কোনটি?

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلَا يَأْتُونَكَ بِمَثَلٍ إِلَّا جِئْنَاكَ بِالْحَقِّ وَأَحْسَنَ تَفْسِيرًا

তোমার কাছে তারা এমন কোন সমস্যাই নিয়ে আসেনা যার সঠিক সমাধান ও সুন্দর ব্যাখ্যা আমি তোমাকে দান করিনি। [সূরা ফুরকান-৩৩]

২। মহা কল্যাণময় তিনি যিনি তাঁর বান্দার উপর সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী (কিতাব) নাযিল করেছেন যাতে সে বিশ্বজগতের জন্য সতর্ককারী হতে পারে। [সূরা ফুরকান-১]

৩। রামাযান মাস, যে মাসে বিশ্বমানবের জন্য পথ প্রদর্শন এবং সু-পথের উজ্জ্বল নিদর্শন এবং হক ও বাতিলের প্রভেদকারী কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে। [সূরা বাকারা-১৮৫]
৪। কুরআনতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ। [সূরা কালাম-৫২]
৫। এটা মানবমন্ডলীর জন্য বিবরণ এবং আল্লাহভীরুগণের জন্য পথ প্রদর্শন ও উপদেশ। [সূরা আলে ইমরান-১৩৮]
৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-১৭৪, বানী ইসরাইল-৮১।
৭। ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকবে তাদের জন্য মুবারাকবাদ। [মুসলিম/২৭০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/৩৯৮৬]
৮। আনাস (রাঃ) বলেছেন, মানুষ যদি শুধু দুনিয়ার উদ্দেশে মুসলিম হয় তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারবেনা যতক্ষণ ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবে। [মুসলিম/৫৮১৪]
৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, কুরআন এবং আমার হাদীস। যতদিন তোমরা ঐ দু'টিকে আঁকড়ে ধরে থাকবে ততদিন তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ), তাকদীর অধ্যায়, রেওয়াত নং-৩]

ইসলাম ধর্ম জানার জন্য প্রত্যেক মানুষের উচিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল ভিত্তিক কিতাব থেকে জ্ঞান অর্জন করা। আমরা যে দলীলই খুঁজব তার প্রথমটি হতে হবে আল কুরআন আর দ্বিতীয়টি বিশুদ্ধ হাদীস। যখনই এই দু'টি সত্যকে পাশ কাটিয়ে যেতে চেষ্টা করব তখনই জটিলতার সৃষ্টি হবে। বিভিন্ন দল/তরীকা, ফিরকা এবং তাকলীদের অন্ধ অনুকরণ শুরু হয়ে যাবে। যুক্তি, বুদ্ধি, বিদ্যা, বাস্তবতা সবই বাঁকা পথে চলবে এবং হাজারও সমস্যার জট বেধে অখন্ড ইসলাম হকের মানদন্ডে ভেঙ্গে চুরমার হয়ে যাবে।

মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট যখন কোন সমস্যার কথা সাহাবাগণ (রাঃ) জানতে চাইতেন তখন কুরআনুল কারীমে তার উল্লেখ থাকলে তা বলে দিতেন, আর জানা না থাকলে অপেক্ষা করতেন অহীর। তবুও নিজের মনগড়া কোন কথা বলতেননা। তাঁকে অনুসরণ না করে মানুষ যখনই মনগড়া রায় ও কিয়াসের পথে চলতে শুরু করল, ঐ মহা-সত্যের মানদন্ড খোঁজা-খুঁজি না করে, তখনই নানা প্রতিকূলতা সামনে এল। একদল রায় আর কিয়াসকে পুজি করে তাই যথেষ্ট মনে করে তার অনুসরণে অবিচল রইল। আবার যখন হকের সন্ধান আল্লাহর কালাম ও রাসূলের (সাঃ) হাদীস হতে পাওয়া গেল তখন তা গ্রহণে গড়িমসি করে কালক্ষেপণ করে বিভিন্ন বুজুর্গদের/পন্ডিতের দিকে অঙ্গুলি নির্দেশ করে বলাবলি শুরু হল ঃ তাহলে কি তারা ভুল করেছেন? এত লোকে করছে কেন ইত্যাদি। এটাই নাহক, হককে জানবার পরও। এ রোগের ঔষধ হল আসমানী ফাইসালার প্রতীক্ষা। সঠিক বুঝ এবং সঠিক পথের সন্ধান, হকের মানদন্ড গ্রহণ ইত্যাদি আল্লাহর এক বিশেষ নি'আমাত। সকলের ভাগ্যে

তা জুটেনা। এ জন্য আল্লাহর নিকট সর্বদা তাওফীক চাইতে হবে হককে সর্বান্তকরণে, বিনা দ্বিধায় এবং বিনা বাক্য ব্যয়ে গ্রহণ করার। এ ক্ষেত্রে কারো পরোয়া বা কোন শাসন পীড়ন, হুমকি-ধামকি ও নানা রকম বিপদের আশংকা সব কিছুই অগ্রাহ্য করতে হবে। এটাই হকের মানদন্ড গ্রহণের আলামত। এক কথায় হকের মানদন্ড হল কুরআন ও সহীহ হাদীস। অন্য কিছুই নয়।

মুসলিমরা আজ দলে দলে বিভক্ত। বর্তমানে যাদের নামে দল (মাযহাব) মানা/করা হচ্ছে তারা কি আদৌ এ মাযহাব সম্পর্কে জানতেন? তারা কি তাদের নামে নিজেরাই মাযহাব তৈরী করেছেন? অথবা তারা কি তাঁদের নামে অন্যদেরকে মাযহাব তৈরী করতে বলেছেন? প্রচলিত চার মাযহাব চার ইমামের উপর ফার্‌য হয়েছে, এ কথা কি কেহ বলতে পারবেন? নাকি নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মাযহাব ফার্‌য হয়েছে? এ চার মাযহাব চারশত হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত কোন যুগে ছিল কি? এ বিষয়ে প্রমাণ দেখুন।

৪০০ হিজরীতে হামীদ বিন সুলাইমান কুফায় হানাফী মাযহাব চালু করেন। দলীল ঃ

⊙ শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ঃ চার মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে ৪০০ হিজরীর পরে।

⊙ "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ," দ্বিতীয় খন্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে ঃ সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মালেক (রহঃ) কেহই কোন মাযহাবী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেননি, যা পরবর্তী যুগে সৃষ্ট। এমতাবস্থায় মুসলিম হিসাবে কেবল কুরআন ও সহীহ (বিশুদ্ধ) হাদীস মানতে হবে।

নিম্নে মহানাবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যুর কত বছর পরে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, প্রসিদ্ধ চার ইমামের মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, বিখ্যাত ছয়খানা হাদীস গ্রন্থ সংকলনকারীদের মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে এবং ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মৃত্যুর কত বছর পর প্রসিদ্ধ হানাফী মাযহাবের ফিকাহর কিতাবগুলি রচিত হয়েছে তাদের তালিকাগুলো নিম্নে দেয়া হল।

মহানাবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে এর ছক ঃ

মহানাবী (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীন	(জন্ম -মৃত্যু) সন	মৃত্যু সন	(মাযহাব সৃষ্টি কাল)-(মৃত্যু সন)	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
বিশ্বনাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ)	৫৭০-৬৩২খৃ.	১১ হি.	৪০০-১১ হি.	৩৮৯ বছর পর
আবূ বাকর সিদ্দিক (রাঃ) ১ম খলিফা	৫৭২-৬৩৪খৃ.	১৩ হি.	৪০০-১৩ হি.	৩৮৭ বছর পর
উমার ফারুক (রাঃ) ২য় খলিফা	৫৮৩-৬৪৪খৃ.	২৪হি.	৪০০-২৪ হি.	৩৭৬ বছর পর
উসমান গণী (রাঃ) ৩য় খলিফা	৫৭৬-৬৫৬ খৃ.	৩৫হি.	৪০০-৩৫ হি.	৩৬৫ বছর পর
আলী (রাঃ) ৪র্থ খলিফা	৫৮০-৬৬১খৃ.	৪০হি.	৪০০-৪০ হি.	৩৬০ বছর পর

প্রসিদ্ধ চার ইমাম (রহঃ) এর মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে এর ছক ঃ

প্রসিদ্ধ চার ইমাম (রহঃ)	সংকলিত কিতাবের নাম	(জন্ম-মৃত্যু) সন	(মাযহাব সৃষ্টি কাল) - (মৃত্যু সন)	মাযহাব সৃষ্টি মৃত্যুর কত বছর পর
ইমাম আবূ হানিফা নুমান বিন সাবিত (রহঃ)	-	৮০-১৫০ হি.	৪০০-১৫০ হি.	২৫০ বছর পর
ইমাম মালিক বিন আনাস (রাঃ)	**কিতাবুল মুয়াত্তা**	৯৩-১৭৯ হি.	৪০০-১৭৯ হি.	২২১ বছর পর
ইমাম মুহাম্মদ বিন ইদরিস আশ শাফিঈ (রহঃ)	**কিতাবুল উম্ম**	১৫০-২০৪ হি.	৪০০-২০৪ হি.	**১৯৬ বছর পর**
ইমাম **আহমাদ বিন হাম্বল (রহঃ)**	মুসনাদে আহমাদ	১৬৪-২৪১ হি.	৪০০-২৪১ হি.	**১৫৯ বছর পর**

বিখ্যাত ছয়খানা হাদীস গ্রন্থ সংকলকবৃন্দ (রহঃ) এর মৃত্যুর কত বছর পর মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে এর ছক ঃ

বিখ্যাত ছয়খানি হাদীস গ্রন্থ সংকলকবৃন্দ (রহঃ)	সংকলিত কিতাবের নাম	(জন্ম -মৃত্যু) সন	(মাযহাব সৃষ্টি কাল) - (মৃত্যু সন)	মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে মৃত্যুর কত বছর পর?
ইমাম মুহাম্মাদ ইবনে ইসমাঈল আল বুখারী (রহঃ)	সহীহ বুখারী	১৯৪-২৫৬ হি.	৪০০-২৫৬ হি.	১৪৪ বছর পর
ইমাম আবুল হুসাইন মুসলিম ইবনে হাজ্জাজ নিশাপুরী (রহঃ)	সহীহ মুসলিম	২০৪-২৬১ হি.	৪০০-২৬১ হি.	১৩৯ বছর পর
ইমাম আবূ দাউদ সিজিস্তানী (রহঃ)	আবূ দাউদ	২০২-২৭৫ হি.	৪০০-২৭৫ হি.	১২৫ বছর পর
ইমাম আবূ ঈসা আত তিরমিযী (রহঃ)	তিরমিযী	২০৯-২৭৯ হি.	৪০০-২৭৯ হি.	১২১ বছর পর
ইমাম আব্দুর রহমান আহমদ আন নাসাঈ (রহঃ)	নাসাঈ	২১৫-৩০৩ হি.	৪০০-৩০৩ হি.	৯৭ বছর পর
ইমাম আবূ আব্দুল্লাহ মুহাম্মদ ইব্ন ইয়াযিদ ইব্ন মাজাহ (রহঃ)	ইব্ন মাজাহ	২০৯-২৭৩ হি.	৪০০-২৭৩ হি.	১২৭ বছর পর

ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মৃত্যুর কত বছর পর প্রসিদ্ধ হানাফি ফিকাহর কিতাবসমূহ রচিত হয়েছে তার ছক ঃ

ফিকাহ কিতাবের নাম	লেখকের নাম	লেখার সন (নিম্নের হিজরীর মধ্যে)	ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) এর মৃত্যুর কত বছর পর লেখা
কুদুরী	আহমাদ বিন মুহাম্মাদ বিন আহমাদ বাগদাদী	৪২৮ হি. ৫০০ হি.	২৭৮ বছর পর
হিদায়া	বুরহানউদ্দিন আলী বিন আবূ বকর মুরগীনানী।	৫৯৩হি. ৬০০ হি.	৪৪৩ বছর পর
মুনিয়াতুল মুসল্লী	বদরুদ্দীন কাশগড়ী	৭০০ হি.	
কানযুয দাকায়েক	আবূল বারাকাত আব্দুল্লাহ বিন আহমাদ হাফেজুদ্দীন নসফী	৭১০ হি. ৮০০ হি.	৫৬০ বছর পর
শরহে বেকায়া	উবায়দুল্লাহ বিন মাসউদ মাহবুবী	৭৪৫ হি. ৮০০ হি.	৫৯৫ বছর পর
দুররে মুখতার	মুহাঃ আলাউদ্দিন বিন শায়খ আলী হাসানী	১০৭১ হি. ১১০০ হি.	৯২১ বছর পর
ফাতওয়ায়ে আলমগীরী	আওরঙ্গজেবের সময় ৭০০ আলেম কর্তৃক	১১১৮ হি. ১২০০ হি.	৯৬৮ বছর পর
মা-লা-বুদ্দামিনহু	কাজী সানাউল্লাহ পানিপথি	১২২৫ হি. ১৩০০ হি.	১০৭৫ বছর পর
বেহেশতী জেওর	মাওঃ আশরাফ আলী থানভী	১২৮০ হি. ১৩০০ হি.	১১৩০ বছর পর

উল্লেখ যে, যার নামে উক্ত ফিকাহর কিতাবে মাস'আলা লেখা হল তার সাথে লেখকগণের দেখা হওয়া তো দূরের কথা ইমাম আবূ হানিফার (রহঃ) মৃত্যুর ২৭৮ থেকে ১১৩০ বছর পর ফিকাহর কিতাবগুলি লেখা । অথচ লেখক থেকে ইমাম সাহেব পর্যন্ত কোন সনদের প্রকৃতই ধারাবাহিকতা নেই। তাহলে এ কথা কিভাবে প্রমাণিত হবে যে, উক্ত কিতাবের মাস'আলাগুলি সত্যি সত্যিই ইমাম আবূ হানিফা নুমান বিন সাবিতের (রহঃ) কথা নাকি অন্য কারো। কেননা ইমাম সাহেব ছাড়া আরো ১৯ জন আবূ হানিফার নাম পাওয়া যায় যাদের মধ্যে কেহ মুতাজিলা, কেহ কাদরীয়া, কেহ শিয়া ছিলেন। মরহুম মাওঃ কুতুবউদ্দিন আহমাদ সাহেব তার ২ নং 'সত্যের আলো' পুস্তিকায় ইমাম সাহেবসহ ২০ জন আবূ হানিফার নাম উল্লেখ করেছেন।

[প্রফেসর এ,এইচ,এম শামসুর রহমান এর "সঠিক ইতিহাস সত্য কথাই বলে" বই থেকে ছকগুলো নেয়া হয়েছে]

ইসলাম ধর্ম বিশ্বাসের মৌলিক বিষয়সমূহ

ক) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনা

১। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করেছি সত্যতা সহকারে, অতএব আল্লাহর 'ইবাদাত কর দীনকে একমাত্র তাঁরই জন্য নির্দিষ্ট করে। জেনে রেখ, খালেস দীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে ঃ আমরা তাদের ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশ্যেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য এনে দিবে। তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফাইসালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখাননা। [সূরা যুমার-২, ৩]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সূরা গাফির-১৪, ইসরা-২৩, হুদ-১, ২, আম্বিয়া-২৫, নামল-৩৬, বাকারা-২১, ২২, নিসা-১১৬, সোয়াদ-৫।

খ) ফিরিশতাদের প্রতি ঈমান আনা

১। তাদের সামনে আর পেছনে যা আছে তা তিনি জানেন। তিনি যাদের প্রতি সন্তুষ্ট তাদের ব্যাপার ছাড়া তারা কোন সুপারিশ করেনা। তারা তাঁর ভয় ও সম্মানে ভীত-সন্ত্রস্ত। [সূরা আম্বিয়া-২৮]

২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'ঈমান কি?' তিনি বললেন ঃ 'ঈমান হল আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, কিয়ামাতের দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' [বুখারী/৪৮, তিরমিযী/২৬১১]

গ) আসমানী কিতাবের প্রতি ঈমান আনা

১। আমি আমার রাসূলদেরকে সুস্পষ্ট প্রমাণসহ পাঠিয়েছি, আর তাদের সঙ্গে অবতীর্ণ করেছি কিতাব ও মানদন্ড যাতে মানুষ ইনসাফ ও সুবিচারের উপর প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। [সূরা হাদীদ-২৫]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-১৫৫, নাহল-৮৯, আরাফ-১৫৮, বাকারা-২১৩।

ঘ) রাসূলগনের প্রতি ঈমান আনা

১। প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। [সূরা নাহল-৩৬]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আহযাব-৪০, নিসা-১৬৫।

ঙ) কিয়ামাত দিবসের উপর ঈমান আনা

১। তারা তোমাকে জিজ্ঞেস করছে, কিয়ামাত কখন সংঘটিত হবে? তুমি বলে দাও ঃ এ বিষয়ে আমার রাব্বই একমাত্র জ্ঞানের অধিকারী, শুধু তিনিই ওটা ওর নির্ধারিত সময়ে প্রকাশ করবেন, তা হবে আকাশসমূহ ও পৃথিবীতে একটি ভয়ংকর ঘটনা। [সূরা আ'রাফ-১৮৭]

চ) ভাগ্যের প্রতি ঈমান আনা

১। আল্লাহই তাঁর বান্দাদের মধ্যে যার জন্য ইচ্ছা রিয্‌ক প্রশস্ত করেন, আর যার জন্য ইচ্ছা সীমিত করেন। আল্লাহ সর্ব বিষয়ে সর্বাধিক অবগত। [সূরা আনকাবূত-৬২]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাফ-৪, ইয়াসীন-১২, ৮২, হাজ্জ-১৮, ৭০, তাকভীর-২৯, যুমার-৬২, ফাতির-৩।

ছ) পুনর্বার জীবিত হওয়ার উপর ঈমান আনা

১। তুমি বল ঃ তিনি কে, যিনি তোমাদেরকে আসমান ও যমীন হতে রিয্‌ক পৌঁছিয়ে থাকেন? অথবা কে তিনি, যিনি কর্ণ ও চক্ষুসমূহের উপর পূর্ণ অধিকার রাখেন? আর তিনি কে, যিনি জীবন্তকে প্রাণহীন হতে বের করেন, আর প্রাণহীনকে জীবন্ত হতে বের করেন? আর তিনি কে যিনি সমস্ত কাজ পরিচালনা করেন? তখন অবশ্যই তারা বলবে ঃ আল্লাহ! অতএব তুমি বল ঃ তাহলে কেন তোমরা (শির্‌ক হতে) নিবৃত্ত থাকছনা? [সূরা ইউনুস-৩১]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ যুখরুফ-৮৭, আনকাবূত-৬৫।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন ধর্মের উপর আমল করা বৈধ নয়

১। আর যে কেহ ইসলাম ব্যতীত অন্য ধর্ম অন্বেষণ করে তা কখনই তার নিকট হতে গৃহীত হবেনা এবং পরলোকে সে ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

২। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হল ইসলাম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, (সে জেনে নিক) নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর। [সূরা আলে ইমরান-১৯]

৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। [সূরা আ'রাফ-৩]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। (২) সালাত (নামায) কায়েম করা। (৩) রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা। (৪) যাকাত দেয়া এবং (৫) হাজ্জ করা [বুখারী/৭-ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/২০]

৫। আনাস (রাঃ) বলেছেন ঃ মানুষ যদি শুধু দুনিয়ার উদ্দেশে মুসলিম হয় তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারবেনা যতক্ষণ ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবে। [মুসলিম/৫৮১৪]

⊙ মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেনঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি। আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর

রাসূলের সুন্নাত। তোমরা যতক্ষণ তা আঁকড়ে থাকবে ততক্ষণ **পথভ্রষ্ট হবেনা**। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ), তাকদীর অধ্যায়, রেওয়াত নং-৩] বাস্তবেও তাই দেখা যাচ্ছে। মুসলিমরা যতদিন আল্লাহর কুরআন ও মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত আঁকড়ে রেখেছিল ততদিন কোন কিছুই তাদের বিপথগামী করতে পারেনি। কিন্তু কালের পরিক্রমায় মানুষ যখন হিদায়াতের এই দু'টি উৎস হতে বিচ্ছিন্ন হতে শুরু করে তখনই তাদের মধ্যে গোমরাহীর অনুপ্রবেশ ঘটতে থাকে এবং তারা বিপথগামী হতে আরম্ভ করে। বর্তমানকালে ইহা এমন এক পর্যায়ে পৌছে গেছে যে, আমাদের জীবনধারা ও সমাজ ব্যবস্থার অনেক কিছুই দীন ইসলামের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ নয়। আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস, হিদায়াতের এই দুই উৎসের সাথে মুসলিমদের সংযোগ স্থাপিত হলে তারা পুনরায় আল্লাহর পথে চলতে থাকবে এবং গোমরাহীর অন্ধকার দূর করতে পারবে।

ইবাদাত হল আল্লাহর দেয়া বিধানের প্রতি অনুগত হওয়া

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا كَانَ لِمُؤْمِنٍ وَلَا مُؤْمِنَةٍ إِذَا قَضَى اللّٰهُ وَرَسُولُهُ أَمْرًا أَن يَكُونَ لَهُمُ الْخِيَرَةُ مِنْ أَمْرِهِمْ وَمَن يَعْصِ اللّٰهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا مُّبِينًا

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের অমান্য করার কোন অধিকার রাখেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে তো স্পষ্ট পথভ্রষ্ট হবে। [সূরা আহযাব-৩৬]

২। হে মানব মন্ডলী! তোমরা তোমাদের রবের ইবাদত কর যিনি তোমাদেরকে ও তোমাদের পূর্ববর্তীদেরকে সৃষ্টি করেছেন, যেন তোমরা ধর্মভীরু (পরহেজগার) হও। [সূরা বাকারা-২১]

৩। মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফাইসালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মু'মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম, আর তারাই সফলকাম। [সূরা নূর-৫১]

৪। হে আমার মু'মিন বান্দারা! আমার পৃথিবী প্রশস্ত; সুতরাং তোমরা আমারই ইবাদাত কর। [সূরা আনকাবুত-৫৬]

৫। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ বাকারা-২৮৫।

কোন লোক যদি বলে ঃ সালাত আদায় করব, সিয়াম পালন করব ও হাজ্জ করব। কিন্তু শুকরের মাংস খেতে বা মদপান করতে অথবা সুদ খেতে কিংবা শারীয়াতের কোন কিছু যদি আমার মনপূত না হয় তা প্রত্যাখ্যান করতে আমি পারব। তাছাড়াও আমি আল্লাহ ব্যতীত অন্য কোন মতাদর্শ গ্রহণ করব, তাহলে ঐ ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাতকারী নয়। সেই ব্যক্তিও আল্লাহর ইবাদাতকারী নয় যে ইসলামের আনুষ্ঠানিক ইবাদাত পালন করে, কিন্তু ইসলামের শিষ্টাচার ও প্রথা নিজেও মানেনা বা তার পরিবারের লোকেরাও মানেনা। যেমন কোন ব্যক্তি

খাঁটি রেশম ব্যবহার করল বা স্বর্ণের কোন কিছু ব্যবহার করল অথবা পুরুষ হয়ে নারীর সাজে সাজলো কিংবা মেয়ে হয়ে এমন পোষাক পরিধান করল যা দ্বারা তার লজ্জাস্থান প্রকাশ হয়ে পড়ে, শরীরের কিছু অংশ অনাবৃত থাকল, হিজাবের দাবী পূরণ হয়না। সে ব্যক্তিও আল্লাহর ইবাদাতকারী নয় যে মনে করে যে, ইবাদাতের গন্ডি মাসজিদের চার দেয়ালের মাঝে সীমাবদ্ধ। তার যা মনে চায় তাই করে, সে প্রকৃত পক্ষে তার নিজের নাফসের ইবাদাত করল। অন্যভাবে বলা যায়, সে তার প্রবৃত্তির অনুসরণে স্বাধীন অর্থাৎ সে তার কামনা বাসনার গোলাম। আল্লাহর গোলাম নয়।

ইসলামের নামে মৌলবাদী দাবী করা কি হারাম?

১। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাবে কক্ষনো তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

২। সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে রাব্ব হিসাবে আল্লাহকে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। [মুসলিম/৫৮]

মৌলবাদ কাকে বলে? যারা মূলনীতি মেনে চলেন, মূল নীতিমালা আঁকড়ে থাকে তার বাইরে কোন কিছু মানতে রাযি নন, তাদেরকেই মৌলবাদী বলা হয়। মৌলবাদের ইংরেজী প্রতিশব্দ হল "Fundamental" এবং যারা মূলনীতি অনসরণ করেন তারা হলেন মৌলবাদী বা "Fundamentalist"। ইসলাম মহান আল্লাহর মনোনীত ধর্ম, আর আল কুরআন হল মহান আল্লাহ প্রদত্ত ইসলামের মূলনীতি। কুরআনের মূল নীতি বিষয়ক গ্রন্থ যারা মেনে চলেন তারা ইসলামী মৌলবাদী, তারা মুসলিম। যারা মহান আল্লাহ প্রদত্ত কুরআনের মূল নিয়ম-নীতি মান্য করেন, মহান আল্লাহর নিকট সম্পূর্ণ আত্মসমর্পণ করেন তারা হলেন মুসলিম তথা ইসলামী মৌলবাদী। যারা ইসলাম থেকে সরে গিয়ে বিভিন্ন ইমামের অনুসারী, বিভিন্ন জামা'আত, তরীকা, পীর-তন্ত্র মান্য করেন তারাও মৌলবাদী। কথাটা স্পষ্ট করে বলতে গেলে বলতে হয়, বিভিন্ন দল তাদের নিজেদের দলের সকল নিয়ম-নীতি, আইন-কানূন, আদেশ নিষেধ ইত্যাদি যে সকল মূল নীতি আছে, সে সকল মান্য করেন। অতএব বিভিন্ন দলের ভক্তরা তাদের নিজ নিজ ইমামের (দলের) মূল নীতি মান্য করার কারণে তারা ঐ দলপন্থী মৌলবাদী। বিভিন্ন পীরের বিভিন্ন তরীকা (পথ) আছে এবং বিভিন্ন পীরের মূল নীতি আছে। যারা যে পীরের মূল নীতির আনুগত্য করবেন তারা সেই পীরের তরীকার মৌলবাদী। তা ছাড়া প্রত্যেক জাতির, প্রত্যেক পরিবারের, প্রত্যেক সমাজের, প্রত্যেক ব্যক্তির নিজেদের কিছু মূল নীতি অবশ্যই আছে যা তাদের মেনে চলতে হয়। অতএব মৌলবাদী নেই কোথায়?

পূর্ব-পুরুষ, বাপ-দাদাদের রেওয়াজ এবং পীর-দরবেশদের উদ্ভাবনকৃত পদ্ধতি ইসলাম নয়

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قَالُوا بَلْ وَجَدْنَا آبَاءَنَا كَذَٰلِكَ يَفْعَلُونَ

তারা বলল ঃ 'না, তবে আমরা আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে এরকম করতে দেখেছি। [সূরা শু'আরা-৭৪]

২। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা। [সূরা বাকারা-১৭০]

৩। তাদেরকে যখন বলা হয় ঃ আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তার দিকে ও রাসূলের দিকে এসো (তখন) তারা বলে, আমরা আমাদের পূর্ব পুরুষকে যা করতে দেখেছি আমাদের জন্য তাই যথেষ্ট। যদিও তাদের পিতৃপুরুষরা কিছুই জানতনা এবং সঠিক পথপ্রাপ্ত ছিলনা (তবুও কি তারা তাদের পথেই চলবে?)। [সূরা মায়িদা-১০৪]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-২৮, ইউনুস-৭৮, আম্বিয়া-৫৪, শু'আরা-৭৮, লুকমান-১৯, ২১, নাজম-২৩, সাফফাত-৬৭-৭০, হুদ-১০৯ , কাসাস-৩৬,৩৭, মু'মিনূন- ২৩,২৪, যুখরূফ-২২-২৪ ।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাঊদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত নতুন আবিস্কৃত বিষয়সমূহ। সকল বিদ'আতই হল পথভ্রষ্টতা। [মুসলিম/১৮৭৫-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

সারা বিশ্বে মুসলিমদের মধ্যে যে চার দলের (মাযহাবের) প্রচলন রয়েছে তার মধ্যে পাক-ভারত উপমহাদেশে ইমাম আবূ হানীফা (রহঃ) এর দলের (মাযহাবের) অনুসারীর সংখ্যা অধিক। ইমামের অনুসারীদের বিশ্বাস, চার দলের (মাযহাবের) মধ্যে কোন একটি দল (মাযহাব) মানা মুসলিমদের জন্য ফারয। তাদের সাথে কোন মাস'আলা নিয়ে আলোচনা হলে কোন উত্তর না পেলে দলের (মাযহাবের) কথা বলে পাশ কাটিয়ে যায় এবং বলে এটি আমাদের দলে/মাযহাবে নেই। এ কথা মৌলভী সাহেবরাও বলে থাকেন। যেমন তাদেরকে যখন বলা হয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা সালাতের সময় লাইনে ফাঁক বন্ধ কর।" কিন্তু আপনারা তা করেননা কেন? পায়ে পা লাগিয়ে দাঁড়াননা কেন? আপনাদের দু'জনের মধ্যে ফাঁক রাখার

কোন দলীল আছে কি? তখন নিরুত্তর হয়ে বলে, এটি আমাদের হানাফী মাযহাবে নেই। চার দলের (মাযহাবের) মধ্যে কোন একটি দল (মাযহাব) মানা ফার্‌য এই বিশ্বাসেই তারা এ উত্তর দেয় । আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কে মানা ফার্‌য নাকি দল (মাযহাব) মানা ফার্‌য এতটুকু জ্ঞানও অনেক মুসলিমই রাখেনা।

তা ছাড়াও এ দেশের অধিকাংশ লোক একটি দোহাই দিয়ে থাকে যে, অত বড় বড় আলেম, মুফ্‌তিগণ কি কুরআন হাদীস বুঝেনা! তারা তো তোমাদের মত বলেনা বা করেনা। এসব দোহাই দেয়ার একমাত্র কারণ ঐ আলেমগণ সমাজে সঠিক ইসলাম শিক্ষা দেয়নি এবং সঠিক শিক্ষা প্রচার করেনি। তারা যদি সঠিক ইসলাম শিক্ষা দিতেন তাহলে এই দোহাই সমাজের লোক দিতনা। তারা সঠিক ইসলাম প্রচার ও শিক্ষা দিলে এরূপ হতনা। দুনিয়া লাভের উদ্দেশে তারা সমাজে শির্‌ক, বিদ'আত, দলের সুবিধাবাদী মাস'আলা প্রচার করে চলছে। বিশেষ করে কোন কোন ক্ষেত্রে বিদ'আতকে পুণ্যের কাজ বলে প্রচার করে তারা দুনিয়ার সম্মান-সম্পদ সংগ্রহ করছেন। তারা হয়ত ভাবে যে, যদি মিলাদ, কুলখানী, চল্লিশা, উরশ, খতমে কুরআন, খতমে খাজেগান, খতমে ইউনুস ইত্যাদি নামে বিদ'আতী ও শির্‌কী অনুষ্ঠান না করত তাহলে তাদের উপার্জনের পথ কঠিন ও কষ্টসাধ্য হয়ে যাবে । উপরন্তু তারা বাপ/দাদার রসম রেওয়াজ অনুযায়ী অনেক কাজে লিপ্ত রয়েছে যা কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী। কোন রকমে কুরআন পড়া শিখেই তারা বিভিন্ন ফাতওয়া দেয়ায় লিপ্ত হয়। তাদের জানা ছিলনা যে, দোহাই দেয়া ইসলাম বিরোধী কাজ। এই ইসলাম বিরোধী দোহাই তারা তাদের কর্মের দলীলরূপে গ্রহণ করেছে। আজকের সমাজপতিরা ঐ একই কথা বলছেন। যখন বলা হয় ইসলাম ধর্মে মিলাদ নেই, ঈদে মিলাদুন্নবী নেই, জন্ম/মৃত্যু বার্ষিকী পালন নেই, কুলখানি নেই, চেহলাম নেই, চিল্লা নেই, পীর মুরিদী নেই, কাবর পাকা করতে নেই, উরশ, ইছালে সাওয়াব নেই, খানকা দরগাহয় নাযর-মানত নেই, লাখ কালেমা নেই, কাবর পূজা নেই, শাবীনা খতম নেই, নেই শবে বরাত তখন তাদের প্রভাবশালী মাতবরেরা বলে ঃ আমরা এগুলি করব, কেননা আমাদের বাপ-দাদারা কি ভুল করেছেন? একই দোহাই, একই সুর, একই আওয়াজ যুগ যুগান্তরের জাহিলি সমাজেরই অভিন্ন চরিত্র। এরূপ কিছু বিদ'আত ও শির্‌ক এর বর্ণনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

ক) যে সব বিদ'আত ও শির্‌ক সমাজকে গ্রাস করেছে সেগুলির নাম আল্লাহও রাখেননি, আর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও রাখেননি। অথচ সমাজের গন্য মান্য লোকেরাই সেগুলির নাম রেখে তার সেবা দাস হয়ে গেছে। যেমন পীর, খানকা, উরশ, ইছালে সাওয়াব, শাবীনা খতম, কুলখানি, চেহলাম, চিল্লা, ছয় উসূল, গাশ্‌ত, দরগাহ, দরবেশ, ফাকীর, মর্সিয়া, তাজিয়া, শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নবী, মিলাদ, ফাতিহা-ই-ইয়াজদাহ, আখেরী চাহার শোম্বা, হালকায়ে যিক্‌রে জলী, মোরাকাবা, মুশাহিদা, ফানা ফিল্লাহ, বাকা বিল্লাহ, রওশন ইয়াজদানী, কুতুবে রব্বানী ইত্যাদি।

খ) বর্তমান সমাজে বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা রেওয়াজ এমনভাবে শিকড় গেড়ে বসেছে যেগুলি আদৌ ইসলাম নয়, তবুও এ কথা মুসলিমদের বুঝানো রীতিমত কষ্টসাধ্য বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। কেননা স্বল্প আয়েশ ও ক্লেশ দিয়েই সোজা জান্নাতের চাবি যেন হাতের মুঠিতে পাওয়ার ফর্মুলা তাতে রয়েছে। এমন কিছু জোরালো ধারণা বা বক্তব্য দেয়া হচ্ছে । বাপ-দাদা মরে গেছে খানা দিতে হবে, মৌলভী সাহেব এসে বাপকে জান্নাত পাওয়ার শুভ সংবাদ শোনাবে যদিও সে সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, দান-খাইরাত কি পরিমাণ করতেন তার খোঁজ খবর নেয়ার কোন ইচ্ছা নেই। এই যে রেওয়াজ তা নানা দেশে নানা কায়দায় করে ইবলীসের কাজকে সহজ করা হয়েছে।

গ) বড় বড় গাছে ভূত পেত্নি থাকে, দৈত্য দানব থাকে তাই তাদের কবল হতে রেহাই পেতে গরু, ছাগল, হাস-মুরগী, মিষ্টি, মিঠাই, ফল, ফসল ইত্যাদি এবং সিন্নির মানত করে। অতএব আমরা/আপনারা বাপ-দাদার আমলের যে সমস্ত বিদ'আতের অনুসরণ করছি তা পরিহার করে যদি কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল না করি তাহলে আমরা/আপনারা যে ভ্রান্তির মধ্যে থাকব তাতে কোন সন্দেহ নেই। আল্লাহ আমাদের সকলকে সঠিক পথ বুঝার ও মানার ক্ষমতা দান করুন। আমীন।

ইবাদাত করতে হবে কার?

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونِ

আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই ইবাদাত করবে। [সূরা যারিয়াহ-৫৬]

২। জেনে রেখ ঃ সৃষ্টি তাঁর, হুকুমও (চলবে) তাঁর, মহীয়ান, গরীয়ান আল্লাহ বিশ্বজগতের রাব্ব। [সূরা আরাফ-৫৪]

৩। প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। [সূরা নাহল-৩৬]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বানী ইসরাইল-২৩, নিসা-৩৬, আন'আম-১৫১-১৫৩, কাহফ-২৬।

৫। হুমাইদ ইব্ন আবদুর রাহমান (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন (আর অধ্যয়নের মাধ্যমেই ইল্ম অর্জিত হয়)। আমিতো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহই দানকারী। এই উম্মাত কিয়ামাত পর্যন্ত সর্বদাই আল্লাহর হুকুমের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে, বিরুদ্ধবাদীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। [বুখারী/৭১]

ইবাদাত আরাবী শব্দ। শারীয়াতের পরিভাষায় সমস্ত কিছুর সৃষ্টিকর্তা, পালনকর্তা ও প্রকৃত মালিক একমাত্র আল্লাহ। আল্লাহর সকল প্রকার হুকুম বা আদেশ-নিষেধ মেনে চলার নামই হচ্ছে ইবাদাত। সালাত (নামাজ), সিয়াম (রোযা), হাজ্জ, যাকাত, কুরবানী ইত্যাদি সম্পাদন করার জন্য আল্লাহ তাঁর বান্দাদেরকে আদেশ করেছেন। এগুলি সম্পাদন করার নাম হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। অনুরূপভাবে আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য সুদ, ঘুষ, মদ, শুকরের মাংস ইত্যাদি খাওয়া হারাম বা নিষেধ করেছেন। তাই এগুলি থেকে বিরত থাকার নামই হচ্ছে আল্লাহর আনুগত্য। পক্ষান্তরে একমাত্র আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে কারও কোন প্রকার মতামত বা নির্দেশ মেনে চলার নামই হচ্ছে তাগুতের ইবাদাত করা। সকল প্রকার তাগুতের ইবাদাত করা হারাম। কিন্তু অত্যন্ত পরিতাপের বিষয় এই যে, মুসলিম দাবীদার অধিকাংশ লোকই ইবাদাত বলতে শুধু মাত্র সালাত (নামাজ), সিয়াম (রোযা), হাজ্জ, যাকাতই বুঝে থাকে।

বহু লোকে দীর্ঘ দিন ধরে ইসলামের নামে যা পালন করছে তা কুরআন ও সহীহ হাদীস ভিত্তিক কিনা তা যাচাই করে দেখতে হবে

১। আমি তাদের পূর্বে আরও কত মানব গোষ্ঠীকে ধ্বংস করেছি যারা ছিল তাদের অপেক্ষা শক্তিতে প্রবল, তারা দেশ-বিদেশে ভ্রমণ করে ফিরত। পরে তাদের অন্য কোন আশ্রয়স্থল রইলনা। [সূরা কাফ-৩৬]

২। আর এটাই হচ্ছে তোমার রবের সহজ সরল পথ, আমি উপদেশ গ্রহণকারী লোকদের জন্য আয়াতসমূহ বিশদভাবে বর্ণনা করে দিয়েছি। [সূরা আন'আম-২৬]

৩। আর তাদের অধিকাংশ লোক শুধু অলীক কল্পনার পিছনে চলছে; নিশ্চয়ই অলীক কল্পনা বাস্তব ব্যাপারে মোটেই ফলপ্রসু নয়; নিশ্চয়ই আল্লাহ সবই জানেন, যা কিছু তারা করছে। [সূরা ইউনুস-৩৬]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউসুফ-৫৫, ইউনুস-১০৩, আম্বিয়া-২২, আনআম-১১৬।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল, তন্মধ্যে সত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। আর খৃষ্টান জাতি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একাত্তর দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল হবে জান্নাতী এবং বাহাত্তরটি দল হবে জাহান্নামী। জানতে চাওয়া হল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দলটি জান্নাতী? তিনি বললেন ঃ তারা ঐ জামা'আতভুক্ত, যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হবে। [আবূ দাউদ/৪৫২৬, ইব্ন মাজাহ/৩৯৯২, তিরমিযী/২৬৪২]

❑ যে কোন কাজ বহু লোক দীর্ঘদিন ধরে করলেই কি সেটা সত্য হয়ে যায়? মিথ্যার বয়স কত? কু-কথা, অশ্লীলতার বয়স কত? অনৈতিকতা কি এই সে দিনের? বদ অভ্যাস কি মাত্র কিছু দিন হল লোক সমাজে প্রবেশ করেছে? বেপর্দা, বেহায়া, বেশরম কি ইদানিং সমাজে চালু হল? নাস্তিক, বহু ইলাহ এর ধারণা কি মাত্র কিছু দিনের আমদানী? গীবত, পরচর্চা, তোষামোদ, অপবাদ, নিন্দা, ঈর্ষা, হিংসার জন্ম কি বিংশ শতকের? হত্যা, মদপান, ব্যভিচার কি সদ্য সমাজে শুরু হল? নিরক্ষরতা, অশিক্ষা, কুশিক্ষা, কৃপণতা, কাপুরুষতা ও কুটিল স্বভাবের জন্ম কি বেশীদিনের নয়? অহংকার, গর্ব, ঈর্ষা, হেয় এবং নীচুতা, ভীরুতার জন্ম কি আজ কালের? লোভ, লালসা, প্রবৃত্তি পরায়ণতা, স্বার্থপরতা, হীনমন্যতা এগুলি কি সদ্য সমাজে চালু হল? এমন ধরণের অমানবিকতার যাবতীয় উপকরণ অনেক দিনের পুরাতন এবং মানব সমাজে বিদ্যমান। এগুলির প্রাচীনত্ব যেমন অস্বীকার করা যায়না, তেমনি এর লালন-পালন এবং চর্চাও মাত্র গুটি কয়েকজনের মধ্যে সীমিত নয়। কোন না কোন 'কু' কোন না কোন জনের মধ্যে আছেই। তাহলে এগুলি কি দীর্ঘদিন রপ্ত করার কারণে, বহু জনের মধ্যে থাকার কারণে জায়েয হয়ে গেল? মিথ্যা না বলার সংখ্যা শতকরা ক'জন মিলবে? মানুষের মধ্যে আস্তিক থেকে নাস্তিকের সংখ্যাতো অনেক বেশী। এক ঈশ্বরবাদী থেকে তো বহু ঈশ্বরবাদীর সংখ্যা বেশী। পৃথিবীর লোক সংখ্যা ৬৫০ কোটি হলে মুসলিমের সংখ্যা ১৫০ কোটি, আর বাদবাকী সবাইতো অন্য ধর্মের। সংখ্যা গরিষ্ঠতা সত্যের মাপকাঠি হলেতো তাদেরকে সঠিকতার স্বীকৃতি দিতে হয়। তা কি সম্ভব? বহু লোকের বহু দিনের কাজ/মতবাদ হলেই সেটা যে সঠিক হবে তা কিন্তু আদৌ নয়।

তাছাড়া উপরোক্ত হাদীস থেকে আমরা জেনেছি যে, মুসলিমদের ৭৩ (তিহাত্তর) দলের মধ্যে ৭২ (বাহাত্তর) দলই অর্থাৎ অধিকাংশ লোকই জাহান্নামে যাবে এবং ১টি মাত্র দল জান্নাতে যাবে। আর সেই জান্নাতী দলটিই হচ্ছে, যারা সমস্ত তরীকা ও দলীয় আলেমদের মতবাদ বাদ দিয়ে একমাত্র রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা ও আদর্শ অর্থাৎ পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলবে। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ তাদের অধিকাংশই আল্লাহকে বিশ্বাস করে; কিন্ত সাথে সাথে শির্কও করে। [সূরা ইউসুফ-১০৬] আর বাস্তবেও দেখতে পাওয়া যায় যে, বেশীর ভাগ লোকই নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকা ও আদর্শ ছেড়ে বিভিন্ন ব্যক্তিবর্গের তরীকা ও মতাদর্শ অনুসরণ করে চলছে। তাদেরকে যদি কেহ বলে যে, মানুষের তৈরী করা ঐ সমস্ত তরীকা ও দলীয় আলেমদের মতবাদ বাদ দিয়ে আসুন! আমরা পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস মেনে চলি, তখন তারা বলে যে, বড় বড় হুজুরেরা কি কুরআন হাদীস কম বুঝে? দেশের বেশির ভাগ লোকই তো ঐ সমস্ত তরীকা ও দলীয় ইমামগণের মতবাদ মেনে চলছে... তাহলে কি সবাই ভুল করছে? ইত্যাদি ইত্যাদি। এভাবে তারা অধিকাংশ লোকের দোহাই দিয়ে থাকে। অথচ তারা এটা বুঝেনা এবং বুঝার চেষ্টাও করেনা যে, যে অধিকাংশ লোকের মত

অনুসরণ করবে সে আল্লাহর পথ থেকে বিভ্রান্ত হয়ে যাবে, গোমরাহ হয়ে যাবে, মুশরিক হয়ে যাবে। এমনকি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও যদি অধিকাংশ লোকের অনুসরণ করতেন তাহলে তিনিও পথভ্রষ্ট হতেন। [সূরা আনআম-১১৬]

ইনশাআল্লাহ্ কখন বলতে হবে?

১। কোন বিষয় সম্পর্কে কক্ষনো বলনা যে, 'ওটা আমি আগামীকাল করব', 'আল্লাহ ইচ্ছা করলে' বলা ছাড়া। যদি ভুলে যাও (তাহলে মনে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে) তোমার রাব্বকে স্মরণ কর আর বল, 'আশা করি আমার রাব্ব আমাকে এর চেয়েও সত্যের নিকটবর্তী পথে পরিচালিত করবেন। [সূরা কাহফ-২৩-২৪]

২। এ বিষয়ে দেখুন সূরা কালাম-১৭-১৯।

৩। একদা সুলাইমান (আঃ) বলেছিলেন ঃ আমি আজ রাতে নব্বই জন স্ত্রীর সাথে মিলিত হব, তারা প্রত্যেকেই একটি করে সন্তান জন্ম দিবে, তারা হবে অশ্বারোহী; জিহাদ করবে আল্লাহর রাস্তায়। তাঁর একজন সঙ্গী বলল ঃ ইনশাআল্লাহ বলুন। কিন্তু তিনি ইনশাআল্লাহ বললেননা। তিনি তো সকল স্ত্রীর সঙ্গেই মিলিত হলেন। কিন্তু কেবলমাত্র একজন স্ত্রীই গর্ভবতী হলেন, তাও এক অপূর্ণাঙ্গ সন্তান প্রসব করলেন। ঐ মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! তিনি যদি ইনশাআল্লাহ বলতেন তাহলে সকলেই অশ্বারোহী হয়ে আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করত। [বুখারী/৬১৭১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ৬২৫০, ৪৮৫৩, মুসলিম/৪১৩৯]

⧉ ভবিষ্যতে কোন কাজ করার ইচ্ছা করলে তখন ইনশাআল্লাহ বলতে হয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের শিক্ষিত/অশিক্ষিত লোকেরা দীনি নিয়ম কানূন মেনে চলেনা। আল্লাহ আমাদেরকে জানার ও বুঝার তাওফীক দান করুন।

ইসলাম ধর্ম পালন কি অধিক সংখ্যক বা অল্পসংখ্যক লোকের স্বীকৃতির উপর নির্ভর করে?

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ

তুমি যতই চাও না কেন, অধিকাংশ লোকই ঈমান আনার নয়। [সূরা ইউসুফ-১০৩]

২। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহয় বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে। [সূরা ইউসূফ-১০৬]

৩। তারা তাদের পিতৃপুরুষদেরকে পেয়েছিল বিপথগামী। আর তারা তাদের পদাংক অনুসরণে ধাবিত হয়েছিল। তাদের আগেও পূর্ববর্তীদের অধিকাংশ বিপথগামী হয়েছিল। [সূরা সাফফাত-৬৯-৭১]

৪। তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথামত চল তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারাতো শুধু অনুমানের অনুসরণ করে, আর তারা শুধু অনুমানভিত্তিক কথা বলে। [সূরা আন'আম-১১৬]

৫। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। [সূরা আ'রাফ-৩]

৬। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা হবে চরম লাঞ্ছিতদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা মুজাদালাহ-২০]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাবা-১৩, আনফাল-২৪, ইউসূফ-৩২, হাক্কাহ-৪১।

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাত থেকে একদল লোক কিয়ামাতের দিন আমার সামনে (হাউযে কাউসারে) উপস্থিত হবে। এরপর তাদেরকে হাউয থেকে পৃথক করে দেয়া হবে। তখন আমি বলব ঃ হে রাব্ব! এরা আমার উম্মাত। তখন বলা হবে ঃ তোমার পরে এরা ধর্মে নতুন সংযোজনের মাধ্যমে কি সব কীর্তি করেছে এ ব্যাপারে নিশ্চয়ই তোমার জানা নেই। নিশ্চয়ই এরা দীন থেকে পিছনের দিকে ফিরে গিয়েছিল। [বুখারী/৬১২১-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক এমন কতগুলি শারীয়াতের বিধান বা ইবাদাতের পদ্ধতি রয়েছে যা আমাদের দেশে বা সমাজে বিদ্যমান নেই। যখন ওগুলিকে আল্লাহর প্রিয় বান্দারা সমাজে প্রচার করে তখন কতিপয় লোক বলে যে, এতদিন এগুলি শুনলামনা, তোমরা আবার এটা কোথায় পেলে? দেশের এত আলেম, এরা কি এগুলি বুঝেনা? দেখেনা? তাছাড়া তোমরা যা বল তাতো সকল জায়গায় চালু নেই। আর যদি থাকেও তা খুবই কম। অতএব দশজনে যা করে আমরাও তাই করব। রেখে দাও তোমাদের কথা। দশজনে যেটা ভাল বলে, আল্লাহও সেটাকে ভাল জানেন। তাহলে প্রশ্ন করছি ঃ দশজন যদি একটি খারাপ কাজকে ভাল জানে আল্লাহ কি তা ভাল জানবেন? না তা কখনও না। কাফির, বেদীনের সংখ্যা পৃথিবীতে বেশি, তারা তো খারাপকে ভাল বলে, তাই বলে কি ঐ বেদীনদের কথা গহণ করা যাবে? কস্মিনকালেও নয়। এমতাবস্থায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুসরণ ছাড়া কিভাবে আপনি নিজেকে মুসলিম হিসাবে দাবী করবেন তার বিচারের ভার আপনার উপরই রইল।

ইসলামী শারীয়াতে সুন্নাতের উপর আমল অপরিহার্য

১। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের আমলসমূহ বিনষ্ট করনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

২। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা তোমরা গ্রহণ কর এবং যা হতে তোমাদেরকে নিষেধ করে তা হতে বিরত থাকো এবং তোমরা আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে কঠোর। [সূরা হাশর-৭]

৩। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট। [সূরা আহযাব-৩৬]

৪। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ নিসা-৬৫, ১১৩।

৫। **রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু** 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন ঃ কে অস্বীকার করে। তিনি বললেন ঃ যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই অস্বীকার করল। [বুখারী/৬৭৭০-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১, মুসলিম/৪৩৪৩]

⧉ ইসলাম কোন মানব রচিত জীবন ব্যবস্থার নাম নয়, বরং ইহা একটি অহী ভিত্তিক আল্লাহ প্রদত্ত ও মনোনীত জীবন ব্যবস্থা। ইসলামী শারীয়াতের মূল উৎস হল কুরআন ও সুন্নাহ। পবিত্র কুরআন যেমন অহী প্রদত্ত, সুন্নাহও তেমনি অহী প্রদত্ত। সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া যেমন ঈমানদার হওয়া সম্ভব নয়, ঈমানদার হওয়ার পর তেমনি আবার সুন্নাতের অনুসরণ ছাড়া পূর্ণ ইসলাম মানাও সম্ভব নয়। প্রসিদ্ধ তাবিঈ হাসান বাসরী (রহঃ) হতে বর্ণিত, তিনি বলেছেন ঃ একদা সাহাবী ইমরান বিন হুসাইন (রাঃ) কিছু ব্যক্তিসহ শিক্ষার আসরে বসেছিলেন। তাদের মধ্য হতে একজন বললেন ঃ আপনি আমাদেরকে কুরআন ছাড়া অন্য কিছু শোনাবেননা। তিনি (সাহাবী) বললেন ঃ নিকটে এসো, অতঃপর বললেন ঃ তুমি কি মনে কর, যদি তোমাদেরকে শুধু কুরআনের উপরই ছেড়ে দেয়া হয়, তাহলে তুমি কি যুহরের সালাত চার রাকাআত, আসর চার রাকাআত, মাগরিব তিন রাকাআত, প্রথম দুই রাকাআতে কির'আত পাঠ করতে হয় ইত্যাদি সব কুরআনে খুঁজে পাবে? অনুরূপভাবে কাবার তাওয়াফ সাত চক্কর এবং সাফা-মারওয়ায় সায়ী সাত চক্কর ইত্যাদি কি কুরআনে খুঁজে পাবে? অতঃপর বললেন ঃ হে মানব সকল! তোমরা আমাদের (সাহাবীদের) নিকট হতে সুন্নাহর আলোকে ঐসব বিস্তারিত বিধি বিধান জেনে নাও। আল্লাহর শপথ করে বলছি, তোমরা যদি সুন্নাহ মেনে না চল তাহলে অবশ্যই পথভ্রষ্ট হয়ে যাবে। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ আমি তোমাদের মধ্য হতে এরূপ রাসূল প্রেরণ করেছি যে তোমাদের নিকট আমার নিদর্শনাবলী পাঠ করে এবং তোমাদেরকে পবিত্র করে, তোমাদেরকে গ্রন্থ ও বিজ্ঞান শিক্ষা দেয় এবং তোমরা যা অবগত ছিলেনা তা শিক্ষা দান করে। [সূরা বাকারা-১৫১]

ইসলামকে মানতে হলে শুধুমাত্র অহীকে আঁকড়ে ধরতে হবে, অহী'র গন্ডীর মধ্যেই থাকতে হবে। অহী বর্হিভুত কোন রীতি-নীতিকে আঁকড়ে ধরে ইসলাম মানা কখনো সম্ভব নয়"।

সুতরাং জান্নাত পেতে হলে আল্লাহর বাণী আল কুরআনুল কারীম এবং নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীস বা সুন্নাহ উভয়েরই একনিষ্ঠ অনুসারী হতে হবে।

আল্লাহর সন্তুষ্টি ছাড়া অন্য কিছুর নিয়াতে ইবাদাত করা

১। যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দেই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয়না। কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই, এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিস্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে। [সূরা হুদ-১৫-১৬]

২। তাদের অধিকাংশ গোপন পরামর্শের মধ্যে কোন কল্যাণ নেই, কিন্তু কল্যাণ আছে যে ব্যক্তি দান-খাইরাত অথবা কোন সৎ কাজের কিংবা লোকদের মধ্যে মিলমিশের নির্দেশ দেয়। যে কেহ আল্লাহর সন্তুষ্টির উদ্দেশে এমন কাজ করবে, আমি তাকে মহা পুরস্কার দান করব। [সূরা নিসা-১১৪]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১৯৮, তাওবা-৫৮।

৪। যে ব্যক্তি দুনিয়ার কোন স্বার্থ হাসিলের জন্য হিজরাত করবে অথবা কোন মহিলাকে বিয়ে করার জন্য হিজরাত করবে, তার প্রতিদান নিয়াত অনুযায়ী হবে। [বুখারী/১, মুসলিম/৪৭৭৪]

□ অন্তরের নিয়াতের ব্যাপারটি খুবই গুরুত্বপূর্ণ। এর মাধ্যমেই বান্দা কখনও সিদ্দিকীনের স্তরে পৌঁছে যায় আবার কখনও নিকৃষ্টতম পর্যায়ে পৌছে। এ জন্যই কোন কোন মনীষী বলেছেন, ইখলাসের ব্যাপারে আমি যতটুকু নাফসের সাথে জিহাদ করেছি, অন্য কোন ব্যাপারে আমার নাফসের সাথে ততটুকু জিহাদ করিনি। যেমন হাদীসে আছে ঃ যে ব্যক্তি লোক দেখানো সালাত আদায় করল, সে শির্ক করল, যে ব্যক্তি লোক দেখানো সিয়াম পালন করল, সে শির্ক করল এবং যে ব্যক্তি লোক দেখানো সাদাকাহ করল সেও শির্ক করল। বর্তমানে মুসলিম সমাজে এ রকম শির্কের প্রচলন বেশী দেখা যায়।

ইসলামে জ্ঞান অর্জন যরুরী

১। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। [সূরা ফাতির-২৮]

২। বল ঃ যারা জানে আর যারা জানেনা, তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা যুমার-৯]

৩। পরম দয়ালু (আল্লাহ), তিনিই শিক্ষা দিয়েছেন কুরআন, তিনিই মানুষ সৃষ্টি করেছেন, তিনিই শিখিয়েছেন মনের কথা প্রকাশ করতে। [সূরা আর রাহমান-১-৪]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মুজাদালাহ-১১, আলে ইমরান-৭, কাহফ-৬৫, রাদ-১৯, তাহা-১১৪, তাওবা-১২২।

৫। কথা ও আমলের পূর্বে ইল্‌ম যরুরী। [বুখারী/(পরিচ্ছেদ-৫২)]

৬। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবেনা, মানুষকে সুসংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবেনা। [বুখারী/৬৯]

৭। কিয়ামাতের কিছু নিদর্শন হল ঃ ইল্‌ম লোপ পাবে, অজ্ঞতার বিস্তার ঘটবে, মদ্যপান ব্যাপক হবে এবং ব্যভিচার ছড়িয়ে পড়বে। [বুখারী/৮০-আনাস (রাঃ)]

৮। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমাণও হয়। [বুখারী/৩২০৭, তিরমিযী/২৬৬৯]

৯। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জ্ঞান অর্জন করা প্রত্যেক মুসলিমের জন্য ফার্‌য। [ইব্‌ন মাজাহ/২২৪]

১০। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে সর্বোত্তম তারা যারা নিজেরা কুরআন শিখে এবং অন্যকেও শিক্ষা দেয়। [বুখারী/৪৬৫০]

১১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে কোন ইল্‌ম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে জানা সত্ত্বেও যদি তা না বলে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন। [আবূ দাউদ/৩৬১৭, তিরমিযী/২৬৫০]

১২। মু'আয (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আমাকে ইয়ামানের প্রশাসক নিযুক্ত করে পাঠালেন। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তুমি আহলে কিতাব সম্প্রদায়ের কাছে যাচ্ছ। তাদের সাথে সাক্ষাৎ হলে এ কথার আহ্বান জানাবে যে, আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর রাসূল। যদি তারা তা মেনে নেয় তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, দিনে এবং রাতে আল্লাহ তাদের উপর পাঁচ ওয়াক্ত সালাত ফার্‌য করেছেন। যদি তারা তা মেনে নেয়, তাহলে তাদের জানিয়ে দিবে যে, আল্লাহ তাদের উপর যাকাত ফার্‌য করেছেন। ধনীদের থেকে তা আদায় করা হবে এবং দারিদ্রদের মাঝে বন্টন করা হবে। [মুসলিম/২৯]

পাঠ করার পর জানা, তারপর জ্ঞান অর্জন করা এবং বোধশক্তিকে জাগ্রত করা, শাণিত করা এবং তার সাহায্যে কোনটা সত্য আর কোনটা মিথ্যা এটা যাচাই করে সত্যকে গ্রহণ করতে হবে। কুরআনুল কারীম এবং হাদীসে রাসূলকে (সাঃ) দুনিয়ার সকল মায়া, মোহ, আকর্ষণ, লোভ, লালসা, লোক ভয়, সমাজের ভীতি, বাধা-বিপত্তি উপেক্ষা করে গ্রহণ করতে হবে। এই মানসিক দৃঢ়তা যে লেখাপড়ায় সৃষ্টি হবে সেটাই প্রকৃত জ্ঞানার্জন। যার প্রেক্ষিতে ঐ ব্যক্তিই হবেন প্রকৃত জ্ঞানী, পরহিজগার, মুত্তাকী, মু'মিন। যারা লেখাপড়া শিখে জ্ঞানী হয় তারাই আল্লাহর কিতাবের উত্তরাধিকারী হয়। আবার তারাই নাবীদের ওয়ারিশ হয়। কিতাবের উত্তরাধিকারীগণের মধ্যে আল্লাহ তিনটি ভাগ করেছেন।

⊙ আল্লাহ বলেন ঃ অতঃপর আমি কিতাবের অধিকারী করলাম আমার বান্দাদের মধ্যে তাদেরকে যাদেরকে আমি মনোনীত করেছি; তবে তাদের কেহ নিজের প্রতি অত্যাচারী, কেহ মধ্যপন্থি এবং কেহ আল্লাহর ইচ্ছায় কল্যাণের কাজে অগ্রগামী। এটাই মহা অনুগ্রহ। [সূরা ফাতির-৩২]

কত স্পষ্ট অথচ বাস্তবভিত্তিক বিভাজন। বর্তমান সমাজে আলেম-ওলামাদের মধ্যে তো এমনটিই দৃশ্যমান। ইলম অর্জন করেও অনেকে মূর্খের মত আচরণ করছেন। কিতাবের বিরুদ্ধে অবস্থান নেয়। আর কেহ মধ্যপন্থী । আর তারাই অগ্রগামী সফলতার সোপানে আরোহণ করেন যারা স্রষ্টার কৃপায় কল্যাণমুখী কাজে নিয়োজিত ও নিবেদিত। এটাই জ্ঞানের প্রকৃত তাৎপর্য ও স্রষ্টার ঈপ্সিত লক্ষ্য। এই বিশেষিত জ্ঞানে সমৃদ্ধজনেরাই সাধারণ মানুষকে লেখা-পড়ার পরিমন্ডলে নিয়ে আসবেন সত্য সুন্দরের পরিচর্যায়। এটাই হাক্/সত্য।

ধর্মীয় বিষয়ের লেখক যদি ডাক্তার, ইঞ্জিনিয়ার, ব্যারিস্টার, বিচারক, শিক্ষক নাম দেখলেই মৌলভীরা ক্ষেপে উঠে বলেন ঃ "আরে ভাই ! ডাক্তার, ইঞ্জিরিয়ার আবার ধর্মের কি বুঝে, সে কি মাদ্রাসায় পড়েছে, নাকি মাওলানা? রাখেন আপনার কথা ! কুরআনের বাংলা অনুবাদ ও কয়েকটি হাদীস সংগ্রহ করে পড়লেই ইসলামী বই লেখা যায়না। মৌলভীদের এই স্বভাবটা কিন্তু নতুন নয়, কুরআন ও সহীহ হাদীসের কথা বললেই তারা ভীষণ ক্ষেপে যান। তার কারণ মাদ্রাসা পাশ করে তারা যেন ইসলামের একচেটিয়া এজেন্টের স্বত্ত্বাধিকারী হয়ে বসেছেন এবং ইসলামের পরিবর্তন, পরিবর্ধন, কর্তন, পরিবর্জন যা কিছু করা প্রয়োজন তারা তা করার অধিকার পেয়েছেন, এতে যেন অন্য কারো কিছু বলার অধিকার নেই। যদি জানতে চাওয়া হয় আচ্ছা ভাই এই নির্দেশটি যে আপনি দিলেন এ বিষয়ে রাসূলের (সাঃ) হাদীসটি বলুন, তখন তারা রেগে উঠে। কারণ তাঁর মতের স্বপক্ষে কোন আয়াত ও হাদীস বলতে পারেননা। তবুও তারা এটি করা যায় বলে দাবী করে থাকেন। এটাই বর্তমান সমাজের চিত্র। অতএব ইসলামের কোন বিষয়ের উপর কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীসের দলীল যিনি বলতে পারেন এবং সেই মোতাবেক আমল করেন সেই প্রকৃত আলেম। এমতাবস্তায় নিম্নের চারটি বিষয়ে জ্ঞান লাভ করা আমাদের জন্য অবশ্যই কর্তব্যঃ

এক ঃ বিদ্যা–এমন বিদ্যা যার সাহায্যে দলীল প্রমাণসহ আল্লাহ, তাঁর নাবী (সাঃ) এবং দীন-ইসলাম সম্পর্কে জ্ঞান লাভ করা যায়।

দুই ঃ ঐ বিদ্যার বাস্তবায়ন,

তিন ঃ ঐ জ্ঞানের দিকে (জনগণকে) আহ্বান করা,

চার ঃ এই কর্তব্য পালনে সম্ভাব্য কষ্ট ও বিপদ/বিপর্যয়ে ধৈর্য ধারণ করা।

প্রথম ও বড় ইমামের দলকে কি মানতেই হবে?

১। কি আশ্চর্য! যখন তারা কোন অঙ্গীকারে আবদ্ধ হল তখনই তাদের একদল তা ভঙ্গ করল। বরং তাদের অধিকাংশই বিশ্বাস করেনা। [সূরা বাকারা-১০০]

২। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি, মৃত্যুর বিভীষিকাকে এড়ানোর জন্য যারা নিজেদের গৃহ হতে বহির্গত হয়েছিল? অথচ তারা ছিল বহু সহস্র; তখন আল্লাহ তাদেরকে বললেন ঃ তোমরা মর; পুনরায় তিনি তাদেরকে জীবন দান করলেন;

নিশ্চয়ই মানবগণের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহশীল, কিন্তু অধিকাংশ লোক কৃতজ্ঞতা স্বীকার করেনা। [সূরা বাকারা-২৪৩]

৩। আমি যদি তাদের কাছে ফিরিশতা অবতীর্ণ করতাম, আর মৃতরা তাদের সাথে কথা বলত, আর আমি তাদের সামনে যাবতীয় বস্তু হাজির করতাম তবুও আল্লাহর ইচ্ছা ব্যতীত তারা ঈমান আনতনা, মূলতঃ তাদের অধিকাংশই অজ্ঞতাপূর্ণ কাজ করে। [সূরা আনআম-১১১]

৪। আলিফ লাম রা এগুলি কিতাবের আয়াত, আর তোমার রবের নিকট থেকে তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রকৃত সত্য, কিন্তু অধিকাংশ মানুষই ঈমান আনেনা। [সূরা রা'দ-১]

৫। তারা কি বলে যে, সে উন্মাদ? না, প্রকৃতপক্ষে সে তাদের কাছে সত্য নিয়ে এসেছে, কিন্তু তাদের অধিকাংশই সত্যকে অপছন্দ করে। [সূরা মু'মিনূন-৭০]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফুরকান-৪৪, ৫০, মু'মিনূন-৫৭, আম্বিয়া-২৪, সাফ্‌ফাত-৭১, শু'আরা-৮, ৬৭, ১০৩, ১২১, ১৩৯, ১৫৮, ১৭৪, ১৯০, ২২৩, কাসাস-১৩, ৫৭, লুকমান-২৫, যুমার-২৯, তূর-৪৭, ইউনুস-৫৫, ৬০, নামল-৭৩, আ'রাফ-১০, ১৩১, আন'আম-৩৭, ১১৬, বাকারা-১৫৫-১৫৬

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল, তন্মধ্যে সত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। আর খৃষ্টান জাতি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একাত্তর দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিহাত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল হবে জান্নাতী এবং বাহাত্তরটি দল হবে জাহান্নামী। জানতে চাওয়া হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দলটি জান্নাতী? তিনি বলেছেন ঃ তারা ঐ জামা'আতভুক্ত, যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের অনুসারী হবে। [আবূ দাউদ/৪৫২৬, ইব্‌ন মাজাহ/৩৯৯২, তিরমিযী/২৬৪২]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণের (রাঃ) সময় ইসলামের একটি দলই ছিল এবং ওটিই মুসলিমগণের বৃহৎ দল। মুসলিমগণের সেই বৃহৎ দলটি ভাগ হয়ে মাযহাবী, লা-মাযহাবী, খারেজী, রাফেজী, শিয়া, মারজিয়া, মুতাজিলা, মুশাব্বিয়া ইত্যাদি ৭৩ দলে ভাগ হয়েছে। মুসলিম জনগোষ্ঠির মধ্যে কত শতাংশ বে-নামাযী আর কত শতাংশ নামাযী? বড় দল হল বে-নামাযী। তাহলে কি বড় দলে যোগদান করবেন? রেল ষ্টেশনে গিয়ে দেখুন কোন দল বড়, প্রথম শ্রেণী, নাকি দ্বিতীয় শ্রেণী, নাকি তৃতীয় শ্রেণী? বর্তমান বিশ্বে কোন ধর্মের লোক বেশী? ইসলাম ধর্মের লোক কম। তাহলে কি আপনি ইসলাম ধর্মে অবস্থান করবেন নাকি অন্য ধর্ম গ্রহণ করবেন? সংখ্যা গরিষ্ঠের দলের উপর ইসলাম ধর্ম নির্ভর করেনা। এখন চিন্তা ও বিবেক বিবেচনার ভার আপনার উপরই রইল।

ইসলামে বিভিন্ন তরীকা, দল, মত ও পথ এর অবকাশ নেই

১। যারা দীনকে খন্ডে খন্ডে বিভক্ত করেছে আর দলে দলে ভাগ হয়েছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি পুরোপুরি আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। আল্লাহ তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। [সূরা আন'আম-১৫৯]

২। তাঁর অভিমুখী হও, আর তাঁকে ভয় কর, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। [সূরা রূম-৩১]

৩। যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে, প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উৎফুল্ল। [সূরা রূম-৩২]

৪। তোমরা সেই লোকদের মত হয়োনা যারা তাদের নিকট সুস্পষ্ট নিদর্শন পৌছার পরে বিভক্ত হয়েছে ও মতভেদ করছে এবং এ শ্রেণীর লোকদের জন্য আছে মহাশাস্তি। [সূরা আলে ইমরান-১০৫]

মুসলিম সেই যে আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে। আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করা মানে জীবনের সর্ব ক্ষেত্রে শুধুমাত্র আল কুরআন মেনে চলা, অন্য কোন পথ বা মত নয়। আল কুরআন মেনে চলতে হবে সে ভাবে, যে ভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়াসাল্লাম মেনে চলেছেন। আল্লাহ বলেন ঃ "তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করোনা' [আলে ইমরান-১০২]। এই আয়াতটি মুসলিম এবং অমুসলিম সবার জন্য প্রযোজ্য। কারণ মুসলমানের ঘরে জন্ম গ্রহণ করেও যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করেনি তারা সত্যিকারের মুসলিম হতে পারে না, যদিও তাদের কারো নাম আব্দুর রহমান, পিতার নাম মোহাম্মদ ইসহাক, মাতার নাম জান্নাতুল ফিরদাউস।

যাদের সম্পর্ক বিভিন্ন দলের/তরীকার সাথে, যাদের সম্পর্ক গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানের সাথে, যাদের সম্পর্ক বিভিন্ন দলের সাথে তাহলে তারা কি? যারা নিজের দীনকে আলাদা বানিয়ে বিভিন্ন তরীকা, বিভিন্ন দল, বিভিন্ন মত ও পথে বিভক্ত হয়েছে এবং নিজেদেরটা নিয়েই সন্তুষ্ট, কুরআন ও সহীহ হাদীসে সমর্থন আছে কিনা যাচাই করেনা তারাই সত্য পথ প্রত্যাখ্যানকারী। ⊙ আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের অনুসরণ না করে অন্য কারো অনুসরণ করলে নিজেদের আমল নষ্ট হয়ে যাবে। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

বিভিন্ন তরীকার ভাইগণ নিজ নিজ ইমামদের অনুসরণ করেন ও করছেন। পীর পন্থীগণ নিজ নিজ পীর যা বলেন তার অনুসরণ করছেন। কাদিয়ানীরা অনুসরণ করছেন গোলাম আহম্মদ কাদিয়ানীর।

উপরে উল্লিখিত আয়াত হতে বুঝা যায়, আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য ও অনুসরণ না করে অন্য কারো অনুসরণ করলে সমস্ত আমলই বাতিল বলে গন্য হবে। ⊙ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরক্তভাব পোষন করবে তারা আমার দলভুক্ত বা উম্মাত নয়। [বুখারী/৪৬৮৪]

রাসূল (সাঃ) কি ইজমা-কিয়াস করতেন?

❖ কোন বিষয়ে আলেমগণ যখন কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে গবেষণা করে সম্মিলিতভাবে যে রায় প্রদান করেন তাকে বলা হয় 'ইজমা'। সাধারণত ধর্ম সংক্রান্ত কোন বিষয়ে রায় প্রদানের ক্ষেত্রে অনুমান বা সাদৃশ্যমূলক সিদ্ধান্ত দেয়াকেই 'কিয়াস' বলে। মাযহাব অনুসারীগণ ইজমা-কিয়াসকেও শারীয়াতের দলীল হিসাবে মানেন। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু অহীর অনুসরণ করতেন। দীনের ক্ষেত্রে ইজমা, কিয়াস করার অধিকার আল্লাহ তা'আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকেও দেননি।

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَاتَّبِعْ مَا يُوحَى إِلَيْكَ مِن رَّبِّكَ إِنَّ اللهَ كَانَ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرًا

তোমার প্রতি তোমার রবের নিকট হতে যা অহী করা হয় তুমি তার অনুসরণ কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণরূপে অবহিত। [সূরা আহযাব-২]

২। অতএব তোমার প্রতি যা অহী করা হয় তুমি তা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধর। কেননা তুমি তো আছ সরল সঠিক পথে। [সূরা যুখরূফ-৪৩]

৩। তোমার নিকট যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর, আর তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফাইসালা প্রদান করেন। বস্তুতঃ তিনিই হলেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী। [সূরা ইউনুস-১০৯]

৪। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, সেই অনুযায়ী যারা বিচার ফাইসালা করেনা তারাই কাফির। [সূরা মায়িদা-৪৪]

৫। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন সেই অনুযায়ী যারা বিচার ফাইসালা করেনা তারাই যালিম। [সূরা মায়িদা-৪৫]

৬। আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তদনুযায়ী যারা বিচার ফাইসালা করেনা তারাই ফাসিক (সূরা মায়িদা-৪৭)।

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৪৮, নাজম-৩, ৪, অ'রাফ-৩।

⧉ যে বিষয়ে অহী নাযিল হয়নি সেই সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলে তিনি বলতেন, আমি জানিনা অথবা অহী না আসা পর্যন্ত কোন উত্তর দিতেননা। তিনি কিয়াস করে এবং নিজের মতানুসারে কোন কিছু বলতেননা। ⊙ কেননা মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ তোমার প্রতি যা নাযিল করেছেন সেই অনুসারে তাদের ফাইসালা কর। [সূরা মায়িদা-৪৮) ⊙ ইবনে মাসউদ (রাঃ) বলেছেন ঃ রুহ (আত্মা) সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করা হলে, অহী না আসা পর্যন্ত তিনি নীরব ছিলেন। ⊙ জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি একবার অসুস্থ হয়ে পড়ি। অতঃপর (খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও আবূ বাকর (রাঃ) আমাকে দেখতে এলেন। তাঁরা দু'জনই হেটে এসেছিলেন। যখন তাঁরা আমার নিকট এলেন তখন আমি বেহুস অবস্থায় ছিলাম। অতঃপর

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করলেন ও অবশিষ্ট পানি আমার উপর ছিটিয়ে দিলেন। তাতে আমি জ্ঞান ফিরে পেলাম। তখন আমি তাঁকে বললাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার সম্পদের ফাইসালা কিভাবে করব? আমার সম্পদের ব্যবহার কিভাবে করব? তিনি কোন উত্তর দিলেননা। অতঃপর মিরাসের (উত্তরাধিকার সংক্রান্ত) আয়াত নাযিল হল। [বুখারী/৬২৫৫]

উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী এ কথা স্পষ্ট যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজমা-কিয়াস করেননি। মহান আল্লাহ তা'আলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর অহী ব্যতীত নিজ থেকে কোন কিছু বলার বা করার অধিকার দেননি। যেহেতু আল্লাহ বলেন ঃ

⊙ তোমার নিকট যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর, আর তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফাইসালা প্রদান করেন। বস্তুত ঃ তিনিই হলেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী। [সূরা ইউনুস-১০৯]

⊙ আমি তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নির্দশন হাযির করার শক্তি কোন রাসূলের নেই। যাবতীয় বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। [সূরা রা'দ-৩৮]

⊙ আর সে মনগড়া কথাও বলেনা। তাতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নাজম-৩-৪]

⊙ সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। [সূরা হাক্কাহ-৪৪-৪৬]

উপরোক্ত সূরা ইউনুস, সূরা নাজম ও সূরা হাক্কা হচ্ছে মাক্কীহ সূরা অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিজরাত করার পূর্বে মাক্কায় নাযিল হয়েছিল। দেখা যায় হিজরাতের পূর্ব থেকেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্পূর্ণভাবে আল্লাহর অনুসারী ছিলেন। নিজ থেকে ইজমা-কিয়াস করে কোন সিদ্ধান্ত দেয়ার ক্ষমতা আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছিলনা। যে ক্ষেত্রে মানব শ্রেষ্ঠ, সারা বিশ্বের রাহমাত আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন ব্যক্তিগত রায় দিতে পারতেননা, সেখানে বিভিন্ন ইমামের অনুসারীগণ একটা জাল/যঈফ হাদীসকে ভিত্তি করে ইজমা ও কিয়াসকে ইসলামের দলীল বানিয়ে নিয়েছেন। কুরআন ও সহীহ/বিশুদ্ধ হাদীসের বিপরীত (পরিপন্থী) নিজেদের মনগড়া ফাতওয়া দিয়ে চলেছেন।

⊙ এই জাল/যঈফ হাদীসটা হল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর মৃত্যুর পূর্বে দশম হিজরীতে মুআয বিন জাবালকে (রাঃ) ইয়ামানের বিচারক নিযুক্ত করে পাঠানোর সময় জিজ্ঞেস করলেন ঃ তুমি কিভাবে বিচার করবে? মুআয (রাঃ) বললেন ঃ কুরআন অনুযায়ী বিচার করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আবার জিজ্ঞেস করলেন ঃ কুরআনে যদি কোন

নির্দিষ্ট বিষয়ের সমাধান না থাকে তাহলে কি করবে? উত্তরে মুআয (রাঃ) বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত মোতাবেক বিচার করব। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুনরায় জিজ্ঞেস করলেন ঃ যদি সুন্নাতেও উহার সমাধান না পাওয়া যায়? মুআয (রাঃ) উত্তরে বললেন ঃ ইজতিহাদ (গবেষনা) করে উহার সমাধান করব। মুআয (রাঃ) এর উত্তর শুনে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অত্যন্ত খুশী হলেন। [তিরমিযী/১৩৩১]

আল্লামা নাসিরুদ্দিন আলবানী ও অন্যান্য মহান মুহাদ্দিস ও রিজালবিদদের মন্তব্য পেশ করেছেন যে, ঐ হাদীসটি বাতিল ও দলীলের অযোগ্য। এই মহান রিজালবিদদের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত ছিলেন ইমাম বুখারী, ইমাম তিরমিযী, ইমাম দারাকুতনী এবং অন্যান্য। (সিলসিলাতুল আহাদ্দিস যায়ীফাহ, ২য় খন্ড, পৃষ্ঠা-২৭৪ হতে ২৮৫)।

এই হাদীসটি যে জাল/যঈফ তার প্রমাণ হল মহান আল্লাহর কিতাব। উপরে সূরা ইউনুসের ১০৯ নং আয়াত, সূরা নাজমের ৩ ও ৪ নং আয়াত, সূরা হাক্কার ৪৪, ৪৫ ও ৪৬ নং আয়াত এবং সূরা মায়িদার ৪৮ নং আয়াতসমূহের মর্মে বুঝা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাক্কী জীবনে মহান আল্লাহর নির্দেশ বা অহী ছাড়া কোন কিছু বলতে বা করতে পারেননি। যদি কিছু নিজ থেকে বলতেন তাহলে তাঁর কণ্ঠনালী আল্লাহ তা'আলা ছিড়ে ফেলতেন। যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকাল কণ্ঠনালী ছিন্ন করার কারণে হয়নি, তাহলে বুঝা গেল, দীনের ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অহী ব্যতীত নিজ থেকে কোন কথাই বলেননি। সেই ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআয বিন জাবালকে (রাঃ) একটা দেশ শাসনের দায়িত্ব কি করে তাঁর মর্জির উপরে ছেড়ে দেন? ইজমা ও কিয়াস জায়েয করার জন্য এই জাল হাদীসটা তৈরী করা হয়েছে। এ ক্ষেত্রে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চরিত্রের উপর একটা মিথ্যা অপবাদ দেয়া হল। ⊙ মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমার প্রতি তোমার রবের নিকট হতে যা অহী করা হয় তুমি তার অনুসরণ কর। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ পূর্ণরূপে অবহিত। [সূরা আহযাব-২]

আর যদি বলা হয়, আল্লাহ তা'আলা হয়তো রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে অনুমতি দান করেছিলেন যেন মুআয বিন জাবালকে (রাঃ) তাঁর ধারনা/অনুমান দ্বারা বিচার করার অনুমতি দেয়া হোক। তাহলে আমাদের বিশ্বাস করতে হয় আল্লাহ অবস্থা বুঝে কোন কোন সময় দু-রকম কথাও বলেন। (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)। এটা সরাসরি মহান আল্লাহ তা'আলার সিফাতের উপর আঘাত, যেহেতু আল্লাহ বলেন ঃ

⊙ (এটাই) আল্লাহর বিধান, অতীতেও তাই হয়েছে, তুমি আল্লাহর বিধানে কক্ষনো কোন পরিবর্তন পাবেনা। [সূরা ফাত্‌হ-২৩]

⊙ অথচ এ বিষয়ে তাদের কোনই জ্ঞান নেই, তারা **কেবল অনুমানেরই** অনুসরণ করছে, আর প্রকৃত সত্যের মুকাবিলায় অনুমান **কোনই কাজে** আসেনা। [সূরা নাজম-২৮]
⊙ তাদের অধিকাংশই কেবল ধারণার অনুসরণ করে, সত্যের মুকাবিলায় ধারণা কোন কাজে আসেনা। তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আল্লাহ সর্বাধিক অবগত। [সূরা ইউনুস-৩৬]
⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ধারণা/অনুমান থেকে বেঁচে থাক। শুধু ধারণা-অনুমানের ভিত্তিতে কথা বলা সবচেয়ে বড় মিথ্যা। [বুখারী/৫৬২৫, মুসলিম/৬৩০৪]
ব্যতিক্রম ঘটনা যা মানুষ সাধারণভাবে গ্রহণ করেছে যা কাম্য নয়। মুআয বিন জাবাল (রাঃ) ছিলেন একজন প্রথম শ্রেণীর বিখ্যাত সাহাবী, যিনি ছিলেন ৪ জন কুরআন লেখকের মধ্যে একজন। তাঁর পক্ষে নিজের মতামত অনুযায়ী বিচার করা কোন অবস্থায়ই সম্ভব হতে পারেনা। ⊙ কারণ আল্লাহ তা'আলা আমাদের সকলের প্রতি আদেশ করেন ঃ তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূর আ'রাফ-৩]
মুআয বিন জাবাল (রাঃ) এই আয়াতটি নিশ্চয়ই জানতেন এবং তিনি জেনে শুনে মহান আল্লাহর এই আদেশটি অমান্য করেছিলেন বলে কি আমরা বিশ্বাস করব? একজন বিখ্যাত সাহাবীর নামে এত বড় অপবাদ দেয়া কোন ঈমানদারের পক্ষে সম্ভব নয়।
⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে যদি কেহ মিথ্যা কথা বলে তাহলে তার স্থান হবে জাহান্নামে। [বুখারী/১০৭] আর এই মহান সম্মানিত সাহাবীর (রাঃ) নামে কেহ মিথ্যা অপবাদ দিলে তার স্থান কোথায় হবে তা একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই জানেন।
⊙ মুআয বিন জবাল (রাঃ) অবশ্যই জানতেন ঃ যারা আল্লাহর নাযিল করা বিধানে বিচার ফাইসালা করেনা তারা কাফির, যালিম ও ফাসিক [সূরা মায়িদা-৪৪, ৪৫, ৪৭]
তাহলে মুআয বিন জাবাল (রাঃ) কি নিজের বিবেচনা দ্বারা বিচার করেছিলেন এবং আল্লাহর নাযিল করা বিধানে বিচার ফাইসালা না করে নিজের ধারণা/অনুমানের উপর নির্ভর করে দেশ পরিচালনা করে কাফির, যালিম ও ফাসিক হয়ে ইন্তেকাল করেছেন? (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক)
⊙ মুআয বিন জাবাল (রাঃ) থেকে বর্ণিত সহীহ হাদীসটি হল ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে যখন ইয়ামানে পাঠান তখন তিনি বলেন ঃ তুমি যা জান (কুরআন ও হাদীস) তা ছাড়া অবশ্য অবশ্যই কোন সিদ্ধান্ত দিবেনা।[ইব্‌ন মাজাহ-৫৫]
হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারাই বলুন, মুআয বিন জাবালের (রাঃ) কোন হাদীসটি কুরআন ও সহীহ হাদীসের সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ ? ⊙ রাসূলুল্লাহ

সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর বিদায় হাজ্জের ভাষণে বলেছেন ঃ তোমাদের নিকট দু'টি জিনিস রেখে গেলাম, যতক্ষণ পর্যন্ত এ দু'টি জিনিস ধরে রাখবে ততক্ষণ তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। আর তা হল আল্লাহর কিতাব ও আমার সুন্নাহ। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩]

আল কুরআন হল আল্লাহর বাণী এবং সহীহ হাদীস হল রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীসগুলিও আল্লাহর অহী, আল্লাহর বাণী, আল্লাহর নির্দেশ। আর ইজমা ও কিয়াস হল কোন মানুষের চিন্তার প্রসার, মনগড়া (প্রবৃত্তি) ও যুক্তি-তর্কের ফসল। মহান আল্লাহর বাণীর সাথে খুব কমই এর সম্পর্ক আছে। ইসলামের মূল ভিত্তি হল কুরআন ও সহীহ হাদীস। ইজমা-কিয়াস পরবর্তীতে ইসলামে নতুন সংযোজন করা হয়েছে বিধায় বিদ'আত। মাযহাবীদের মতে ইসলামের মূল উৎস ৪টি। (১) কুরআন, (২) সুন্নাহ, (৩) ইজমা, (৪) কিয়াস। আর আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথায় ইসলামের উৎস ২টি ঃ (১) কুরআন এবং (২) রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর সুন্নাহ সহীহ হাদীস।

⊙ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ নিকৃষ্টতম কাজ হল দীনের মধ্যে নতুন সংযোজন, সমস্ত নতুন সংযোজন বিদ'আত, সমস্ত বিদ'আত পথভ্রষ্টতা, সমস্ত পথভ্রষ্টের স্থান জাহান্নাম। [মুসলিম/১৮৭৫]

⊙ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অবাধ্য হয়ে আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করে তাদেরকে আল্লাহ জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন এবং সেখানে চিরকাল রাখবেন, তাদের জন্য রয়েছে লাঞ্ছনাকর শাস্তি। [সূরা নিসা-১৪]

ইজমা-কিয়াস অবশ্যই আল্লাহর নির্ধারিত সীমা লংঘন। যেমন ঃ

⊙ আর যারা আল্লাহর আইনসমূহ লংঘন করবে তারাই যালিম ।[সূরা বাকারা-২২৯]

⊙ মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে আরো বলেন ঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

⊙ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

⊙ যারা এখানে উপস্থিত আছ তারা যেন আমার এ বাণী অনুপস্থিতদের কাছে পৌঁছে দেয়। সম্ভবতঃ যাদের কাছে বাণী পৌঁছে দেয়া হয় তাদের মধ্যে এমন অনেক লোক থাকে যারা শ্রোতাদের চেয়ে তা বেশি স্মরণ ও সংরক্ষিত রাখতে পারে। [বুখারী/১৬২৫]

⊙ তোমার পূর্বে আমি অহীসহ (পুরুষ) মানুষই প্রেরণ করেছিলাম, তোমরা যদি না জান তাহলে জ্ঞানীদেরকে জিজ্ঞেস কর। [সূরা নাহল-৪৩]

⊙ আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে **পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম,** তোমাদের প্রতি আমার নি'আমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে **তোমাদের** দীন হিসাবে কবূল করে নিলাম। [সূরা মায়িদা-৩]
কুরআনে কোন বিষয় সম্বন্ধে বলা নেই এরূপ ধারনা করা কুরআন বিরোধী। সে জন্য ইজমা-কিয়াসে বিশ্বাসী হওয়া ইসলামে বিভ্রান্তি সৃষ্টি করার নামান্তর। উদাহরণ ঃ ⊙ এক ব্যক্তি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলেন ঃ আমি কুরআন মুখস্ত করে রাখতে পারিনা। অতএব আমাকে এমন কিছু শিক্ষা দিন যা কুরআনের পরিবর্তে যথেষ্ট হবে (যাতে আমি সালাত কায়েম করতে পারি)। তখন নাবী **কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া** সাল্লাম বলেন, তুমি বলবে ঃ সুবহানাল্লাহ, আলহাম্‌দুলিল্লাহ, ওয়া **লা ইলাহা** ইল্লাল্লাহু ওয়াল্লাহু আকবার ওয়ালা হাওলা ওয়ালা কুওয়াতা ইল্লা বিল্লা । তখন ঐ ব্যক্তি বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এটা তো আল্লাহর জন্য, আমার জন্য কি ? জবাবে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ তুমি বল, আল্লাহুম্মার হাম্‌নী, ওয়ারযুকনী, ওয়া আফিনী ওয়াহ্‌দিনী। অতঃপর বর্ণনাকারী বলেন ঃ ঐ ব্যক্তি ঐগুলি হাতের আংগুলে গণনা করেন। তখন নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ এই ব্যক্তি উত্তম বস্ত দ্বারা হাত পরিপূর্ণ করেছে। [আবূ দাউদ/৮৩২, নাসাঈ/৯২৭]
এখন সাধারনভাবে বলা যাবে কি যে, কুরআন থেকে না পাঠ করলেও সালাত কায়েম হবে? একইভাবে ইজমা-কিয়াস সাধারণভাবে ইসলামী শারীয়াতের দলীলের উৎস নয়। ইজমা-কিয়াস শারীয়াতের উৎস এধরনের বিশ্বাসী রাখা ভ্রান্ত ধারণা। তাই কেবল কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশ মানতে হবে।
আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ রাসূল তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর। কিন্তু আমরা গ্রহণ করি পীর, আলেম, বুজুর্গান এবং সমাজের ইমামগণের অভিমত। তারা যা দেন তা যাচাই-বাছাই না করেই সর্বান্তকরণে গ্রহণ করে থাকি। আল্লাহ তা'আলা আরো বলেন যে, আমরা যেন আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করি। আর যদি অন্যের আনুগত্য করি তাহলে আমাদের যে আমল আছে তা সব বিনষ্ট হয়ে যাবে। আল্লাহ আরো জানালেন, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) হতে যদি আমরা মুখ ফিরিয়ে নেই এবং অন্যের দিকে মুখ করি অর্থাৎ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আদেশ/নিষেধ না মেনে অন্যের আদেশ/নিষেধ মান্য করি তাহলে আল্লাহর ভাষায় আমরা হব কাফির এবং কাফিরদেরকে আল্লাহ পছন্দ করেননা। আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে বুঝার ও আমল করার তাওফীক দান করুন।

দীনে ইজতিহাদ করা প্রসঙ্গ

❖ ইজতিহাদ অর্থ গবেষণা, অবিস্কার ইত্যাদি।

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانتَهُوا وَاتَّقُوا اللهَ إِنَّ اللهَ شَدِيدُ الْعِقَابِ

রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

২। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাইবে কক্ষনো তা কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

৩। তোমার রবের পক্ষ থেকে যা তোমার প্রতি নাযিল করা হয়েছে তুমি তা অনুসরণ কর এবং আল্লাহকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক অথবা সাহায্যকারী হিসাবে গ্রহণ করনা। তোমরা খুব অল্পই উপদেশ গ্রহণ করে থাকো। [সূরা আ'রাফ-৩]

৪। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৫। তবুও মানুষের মধ্যে এমন আছে যারা জ্ঞান, পথের দিশা ও কোন আলোক প্রদানকারী কিতাব ছাড়াই আল্লাহ সম্পর্কে বিতর্ক করে। [সূরা হাজ্জ-৮]

৬। মু'মিনদেরকে যখন তাদের মাঝে ফাইসালা করার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের দিকে ডাকা হয় তখন মু'মিনদের জওয়াব তো এই হয় যে, তারা বলে ঃ আমরা শুনলাম ও মেনে নিলাম। আর তারাই সফলকাম। [সূরা নূর-৫১]

৭। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে, আল্লাহকে ভয় করে ও তাঁর অবাধ্যতা পরিহার করে চলে তারাই কৃতকার্য। [সূরা নূর-৫২]

৮। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আহযাব-৩৬, নিসা-৫৯, ৬৫, ১১৫, জাসিয়া-১৮,২৩, আন'আম-৭০, ১১৬, বাকারা-৭৯, ৮৫, আলে ইমরান-৩২।

◫ মহান আল্লাহর স্পষ্ট ঘোষণা ঃ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর আনুগত্য করতে হবে। মতভেদের সময় মুসলিমদের উচিত হল আল্লাহর কিতাব ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) সুন্নাহর দিকে ফেরত যাওয়া এবং সেই অনুযায়ী আনুগত্য করা। সাথে সাথে আল্লাহ এবং রাসূলের কথার বাইরে অন্য কারও কথা গ্রহণ করার ব্যাপারে নিজের কাছে কোন রূপ স্বাধীনতা না রাখা। এ ছাড়া ঈমানদার হতে হলে পরিপূর্ণরূপে নিজেকে কুরআন ও সন্নাহর কাছে সোপর্দ করতে হবে এবং অন্তর থেকে সংকীর্ণতা অর্থাৎ কুরআন ও সন্নাতের বিরোধী হয় এমনটি অবশ্যই দূর করতে হবে। তা না হলে আল্লাহর আযাবের সম্মুখীন হতে হবে।

ইসলামী শারীয়াত

১। অতঃপর (হে নাবী!) আমি তোমাকে দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, অতএব তুমি তারই অনুসরণ কর, আর যারা (দীনের বিধি-বিধান) জানেনা তাদের খেয়াল খুশির অনুসরণ করনা। [সূরা জাসিয়া-১৮]

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা যদি আল্লাহকে ভয় কর তাহলে তিনি তোমাদেরকে ভাল ও মন্দের মধ্যে পার্থক্য করার শক্তি প্রদান করবেন, তোমাদের দোষ-ত্রুটি দূর করে দিবেন তোমাদেরকে ক্ষমা করবেন। আল্লাহ বড়ই অনুগ্রহশীল। [সূরা আনফাল-২৯]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আলে ইমরান-১৫, ১৬৪, বাকারা-১৭৯, আন'আম-৮২, হুদ-১০৮, মায়িদা-৩, নাজম-৩-৪, মুহাম্মাদ-৩৩

৪। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করল তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করল তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। [বুখারী/৬৭৭১-জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেই বস্তু দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি হল আল্লাহর কিতাব, অপরটি আমার (রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের) সুন্নাত। [মুসলিম/২৮১৭, আবূ দাউদ/৪৫৩৩, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ), তাকদীর অধ্যায়, রেওয়াত নং-৩]

ইসলামী শারীয়াত হল একটি পথ ও পদ্ধতি যা আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একমাত্র জীবন বিধান হিসাবে নির্ধারণ করে দিয়েছেন। ইসলামী শারীয়াত নামক বিধান আল্লাহর মনোনীত জীবন বিধান। মানুষের যাবতীয় প্রয়োজনের সুষ্ঠ সমাধান, দুনিয়া ও আখিরাতের সুখ-শান্তি নিহিত আছে আল্লাহ প্রদত্ত এই বিধানের মধ্যেই। বুদ্ধিমান লোকেরা সদা-সর্বদা সুখ-শান্তির অনুসন্ধান করে, আর এটা নিশ্চিত যে, সর্ব প্রকার সুখ-শান্তি পেতে হলে পূত-পবিত্র ইসলামী শারীয়াত মতে জীবন-যাপন করতে হবে। আল্লাহর বাণী কখনই মিথ্যা নয় বরং ইজমা-কিয়াস শারীয়াতের মূল ভিত্তি এ কথাই সঠিক নয়। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রমাণিত হয় যে, শারীয়াতের মূল ভিত্তি চারটি নয়, বরং দু'টি। যারা দু'টি থেকে বাড়িয়ে চারটি বলে তারা কুরআন-সুন্নাহর সাধারণ নীতির সীমা অতিক্রম করছে। উপরোক্ত আয়াতসমূহের সাহায্যে নিম্ন লিখিত বিষয়গুলি সংশয়াতীতভাবে প্রমাণিত হয়েছে ঃ

প্রথম ঃ ইসলামী শারীয়াত আবশ্যকতার দিক দিয়ে পূর্ণতা লাভ করেছে।

দ্বিতীয় ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে আরম্ভ করে প্রত্যেক উম্মাতের পক্ষে উক্ত শরীয়াতের অনুসরণ করা অবশ্যই কর্তব্য।

তৃতীয় ঃ শারীয়াতকে পরিহার করে প্রবৃত্তির অনুসরণ করা ও দীনের মধ্যে নূতন সংযোজন করা একই।

চতুর্থ ঃ যারা এরূপ করে তারা প্রবৃত্তির উপাসক, আল্লাহর উপাসক নয়।

পঞ্চম ঃ এরূপ করা আল্লাহর একাত্মবাদের পরিপন্থী এবং যা প্রকৃত সঠিক তা আল্লাহ অবগত আছেন।

আল্লাহ সকল মুসলিমকে শারীয়াতের সীমার মধ্যে থেকে 'আমল করার তাওফীক দান করুণ। আমীন।

ইসলামে জান্নাত প্রাপ্ত দলের মাপকাঠী সম্পদশালী ও সংখ্যাগরিষ্ঠ হওয়া নয়

১। আমি তাদের পূর্বে বহু মানব গোষ্ঠিকে ধ্বংস করেছি যারা উপায় উপকরণে আর বাইরের চাকচিক্যে তাদের অপেক্ষা শ্রেষ্ঠ ছিল। [সূরা মারইয়াম-৭৪]

২। তুমি যদি পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের অনুসরণ কর তাহলে তারা তোমাকে আল্লাহ্র পথ হতে বিচ্যুত করে ফেলবে, তারা তো কেবল আন্দাজ-অনুমানের অনুসরণ করে চলে, তারা মিথ্যাচার ছাড়া কিছু করেনা। [সূরা আন'আম-১১৬]

৩। কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ তোমরা স্পষ্ট বিভ্রান্তিতে আছ। [সূরা ইয়াসীন-৪৭]

৪। তাদের সামনে কুরআনের আয়াত আবৃত্তি করা হলে কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ দুই দলের মধ্যে মর্যাদায় কোনটি শ্রেষ্ঠতর এবং মাজলিস হিসাবে উত্তম? [সূরা মারইয়াম-৭৩] (অর্থাৎ কাফিরেরা দলে ভারী হওয়ার কথা বলবে)।

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১৪৭, ১৫৫, ২৪৩, মায়িদা-৫৯, নিসা-৪৬, আন'আম-১১, আ'রাফ-১০

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের আমলনামা সপ্তাহে দু'বার-সোমবার ও বৃহস্পতিবার পেশ করা হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সেই ব্যক্তিকে নয় যার ভাইয়ের সাথে তার শত্রুতা আছে। তখন বলা হয়, এই দু'জনকে বর্জন কর অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। [মুসলিম/৬৩১৪]

আদম (আঃ) এর শত্রু ছিল শুধু ইবলীস শাইতান। কিন্তু বর্তমান সমাজে আমাদের ইসলামের শত্রু হল মুসলিম নামধারী মুনাফিক, ফাসিক, ইবলীস, ইয়াহুদী, নাসারা এবং আরও অনেক মানবগোষ্ঠি। এখন ঈমান-আকীদাহ ঠিক রাখাই কষ্টকর। আর কেহকেও বিশ্বাস করা চলেনা, কারও কথা মেনে চলাও সহজ নয়। কারণ মুসলিমরা তাদের কুরআন ও সহীহ হাদীস ঠিকমত অধ্যয়ন করেনা বলেই তারা দীন সম্বন্ধে অজ্ঞ এবং না জেনেই ফাতওয়া দিতে অভ্যস্ত এবং তারা বেশী বেশী তর্ক প্রিয়। আল্লাহ মুসলিমদের হিফাযাত করুন।

শারীয়াতে (কুরআন/হাদীস) দলীল গ্রহণ ও অগ্রাধিকারের পদ্ধতি

১। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন। সে তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। [সূরা নিসা-১৪]

২। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [সূরা মায়িদা-৩]

৩। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি শারীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখে এবং সে তার হাত দিয়ে বাধা দিতে সক্ষম হয়, তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখের কথা দিয়ে প্রতিবাদ করবে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতর স্তর। [ইব্‌ন মাজাহ/৪০১৩-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), তিরমিযী/২১৭৫]

☐ কুরআনের বিপক্ষে কোন হাদীস অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা হতে পারেনা। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মহান আল্লাহ তা'আলারই ভাব বা দিক নির্দেশনা। ⊙ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ অতঃপর (রাসূলকে) ইহার (কুরআনের) বিস্তারিত ব্যাখ্যা দান করা আমারই দায়িত্ব। [সূরা কিয়ামাহ-১৯] রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সমস্ত সহীহ হাদীস মহান আল্লাহর অহী এবং কুরআনেরই ব্যাখ্যা। সর্ব প্রথম কুরআন থেকে দলীল গ্রহণ করতে হবে। কুরআন থেকে খুঁজে পাওয়া সম্ভব না হলে প্রথমে সহীহ বুখারী হাদীসে খুঁজতে হবে। বুখারীতে না পেলে সহীহ মুসলিম হাদীসে খুঁজতে হবে। সহীহ মুসলিমে না পেলে অন্যান্য "সুনানে আরবা" হাদীসে খুঁজতে হবে। বুখারী ও মুসলিম হাদীসের বিপক্ষে অন্য কোন হাদীস গ্রহণ করা যাবেনা। যদি কোন কথা কুরআনে কিংবা সহীহ হাদীসে নিশ্চিতভাবে না পাওয়া যায় তাহলে অস্পষ্ট বিষয় থেকে বিরত থাকতে হবে। মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর মহান গ্রন্থ কুরআনের মাধ্যমে দীন ইসলামকে পরিপূর্ণ করেছেন। এ ব্যাপারে নিজেরা একত্রে মিলেমিশে পরামর্শ করে যেটি বেশি সাদৃশ্য পূর্ণ সেটিকে সমাধান হিসাবে গ্রহণ করে নিতে হবে। তবে ইজমা-কিয়াস দ্বারা সাওয়াবের আশায় দীন ইসলামে নূতন কিছু উদ্ভাবন করা যাবেনা। দীন ইসলামে সাওয়াবের আশায় নূতন কিছু সংযোজন করার নামই হল বিদ'আত। ইজমা-কিয়াস দ্বারা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বিধানের পরিবর্তন ও সংযোজন বা বিয়োজন করা যাবেনা। ইসলামে যে বা যারা বিদ'আত আবিস্কার বা চালু করেছিল তারা হল বিদ'আতী। ইসলাম ধর্মের আইন-কানূনে সাওয়াবের আশায় নূতন কিছু সংযোজন করার নামই হল বিদ'আত। নূতন সংযোজিত সব কিছুই মুসলিমরা সাওয়াবের আশায় করে, অন্য কোন ধর্মের লোক এতে অংশ গ্রহণ করেনা। আমাদের বিজ্ঞ আলেম-ওলামাগণ বিদ'আত নিয়ে একটা গোলক ধাঁধাঁর মধ্যে পড়ে বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, এরোপ্লেন, মাইক, ট্রেন, কম্পিউটার ইত্যাদি ছিলনা, এগুলি কি তাহলে

বিদ‘আত? না, এগুলি মোটেই বিদ‘আত নয়। কারণ এগুলি শুধু মুসলিমদের জন্য সাওয়াবের আশায় আবিস্কার করা হয়নি। এ সমস্ত মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। অনেকে বিদ‘আত কাকে বলে তাও ভালভাবে জানেননা। সেই জন্য হিদায়াত-বিদ‘আত, হারাম-হালাল, বৈধ-অবৈধ, আদেশ-নিষেধ, ভাল-মন্দ যাচাই করার জ্ঞানটুকুও অনেকের কাছে সুস্পষ্টভাবে আছে বলে মনে হয়না। বিদ্যুৎ, টেলিভিশন, এরোপ্লেন, মাইক, ট্রেন, কম্পিউটার ইত্যাদি এগুলি অন্য সব ধর্মের লোকেরাও ব্যবহার করে। অন্য ধর্মের লোকেরা কিন্তু মিলাদ, শবে-বরাত, শবে-মিরাজ, মিলাদুন্নাবী, জসনে জুলুস, কুলখানী, ফাতিহা ইয়াযদাম, খতম পড়া ইত্যাদি করেনা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) করতে বলেননি, যেহেতু এসব করার জন্য মহান আল্লাহ তা‘আলা তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নির্দেশ দেননি। আলেম-ওলামাদের কথার উপর বিশ্বাস করে শুধু মুসলিমগণই সাওয়াবের আশায় এ সমস্ত বিদ‘আতী কাজ করে থাকেন। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

ইসলামে অন্ধ বিশ্বাস ও গতানুগতিক রীতির স্থান নেই

১। বল ঃ কে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর রাব্ব? বল ঃ তিনি আল্লাহ! বল ঃ তাহলে কি তোমরা অভিভাবক রূপে গ্রহণ করেছ আল্লাহর পরিবর্তে অপরকে, যারা নিজেদের লাভ বা ক্ষতি সাধনে সক্ষম নয়? বল ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান অথবা অন্ধকার ও আলো কি এক? তাহলে কি তারা আল্লাহর এমন শরীক স্থাপন করছে যারা (আল্লাহর সৃষ্টির মত) সৃষ্টি করেছে, যে কারণে সৃষ্টি তাদের মধ্যে বিভ্রান্ত ঘটিয়েছে? বল ঃ আল্লাহ সকল কিছুর স্রষ্টা, তিনি এক, পরাক্রমশালী। [সূরা রা'দ-১৬]

২। তুমি কি জাননা যে, আকাশ ও পৃথিবীর আধিপত্য আল্লাহরই এবং আল্লাহ ব্যতীত তোমাদের কোন বন্ধুও নেই এবং কোন সাহায্যকারীও নেই? [সূরা বাকারা-১০৭]

৩। রাসূলের আহ্বানকে তোমরা একে অপরের প্রতি আহ্বানের মত গণ্য করনা; তোমাদের মধ্যে যারা চুপি চুপি সরে পড়ে আল্লাহ তাদেরকে জানেন। সুতরাং যারা তাঁর আদেশের বিরুদ্ধাচরণ করে তারা সতর্ক হোক যে, বিপর্যয় তাদের উপর আপতিত হবে অথবা আপতিত হবে তাদের উপর কঠিন শাস্তি। [সূরা নূর-৬৩]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফাতির-১৯, ২০, যুখরুফ-৪০।

৫। ইসলাম শুরুতে অপরিচিত ছিল, অচিরেই তা আবার শুরুর মত অপরিচিত হয়ে যাবে। সুতরাং এরূপ অপরিচিত অবস্থায়ও যারা ইসলামের উপর কায়েম থাকবে তাদের জন্য মুবারাকবাদ। [মুসলিম/২৭০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৩৯৮৬]।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ **অনাড়ম্বর জীবন যাপনই** ঈমান। [ইব্‌ন মাজাহ/৪১১৮-আবূ উমামাহ হারিসী (রাঃ)]

বর্তমান সমাজের লোকদেরকে যখন বলা হয় কুরআন ও সহীহ সুন্নাহর আমলের দিকে ফিরে আসতে এবং তারা যে কুরআন ও সুন্নাহর বিপরীত বিষয়ের উপর আছে তা পরিহার করতে, তখন তারা আপন দলের ইমাম ও তাদের মুরব্বীদের এবং তাদের বাপ-দাদাদের মতাদর্শের অনুসরনের সাক্ষ্য-প্রমাণ উপস্থাপন করে। কেননা আল্লাহতে বিশ্বাসীদের মধ্যে বেশির ভাগ লোক শির্‌ক ও বিদ'আত কাজ-কর্মে কাফিরদের অনুকরণ করছে। যেমন ঃ জন্ম উৎসব পালন, নির্দিষ্ট কাজের উদ্দেশে কিছু কাল ও সপ্তাহ উদযাপন করা, ধর্মীয় কাজ উপলক্ষে ও ব্যক্তিবর্গের স্মরণে সমাবেশ করা, প্রতিকৃতি/মুরাল/মূর্তি তৈরি ও দাঁড় করা, মাতম করা, ধর্মে নতুন পন্থা উদ্ভাবন করা, সহীহ হাদীস মোতাবেক সালাত কায়েম না করা, কাবরের উপর ঘর নির্মাণ করা, আল্লাহ ব্যতীত গাইরুল্লাহর নিকট প্রার্থনা, পূজা, আরাধনা এবং কামনা-বাসনা করা। হিন্দুদের জীবনের সাথে মুসলিমের জীবনকে মিশ্রিত করে পর্দাপ্রথা অমান্য করে পুরুষ ও মহিলারা একসঙ্গে গায়ে হলুদ, গোসল অনুষ্ঠান, গালে ভাত অনুষ্ঠান, বৌভাত অনুষ্ঠান, কপালে টিপ এবং বিভিন্ন প্রকারের জঞ্জাল জড়িয়ে মুসলিমরা বর্তমানে হিন্দু-মুসলিম-বাঙ্গালী সেজে প্রগতির সিড়ি বেয়ে ভদ্রলোকের খাতায় নাম লেখাচ্ছে। কে কোন্ জাতের তা না মরা পর্যন্ত চিনবার উপায় নেই, না নামে, না কামে। আবার মরণের পর লাশের আবার জাত/বিচার থাকতে নেই। তবু ভাগ্য এখনও ভাল যে, কাবর আর শশ্মান নামক দু'টি পৃথক স্থান এখনও আছে।

ইবাদাত মানুষের পুরা অস্তিত্বকেই শামিল করে

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِنَّ فِي خَلْقِ السَّمَاوَاتِ وَالأَرْضِ وَاخْتِلاَفِ اللَّيْلِ وَالنَّهَارِ لآيَاتٍ لأُوْلِي الألْبَابِ

নিশ্চয়ই নভোমন্ডল ও ভূমন্ডল সৃষ্টিতে এবং দিন ও রাতের পরিবর্তনে জ্ঞানবানদের জন্য স্পষ্ট নিদর্শনাবলী রয়েছে। [সূরা আলে ইমরান- ১৯০]

২। যারা আল্লাহকে দন্ডায়মান, উপবিষ্ট এবং শায়িত অবস্থায় স্মরণ করে এবং আসমান ও যমীনের সৃষ্টির ব্যাপারে চিন্তা করে (ও বলে) ঃ 'হে আমাদের রাব্ব! তুমি এসব অনর্থক সৃষ্টি করনি, তুমিই পবিত্র, সুতরাং আমাদেরকে আগুনের শাস্তি হতে রক্ষা কর। [সূরা আলে ইমরান-১৯১]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাদ-২৯, বাইয়্যিনা-৫, আন'আম-১৬২, ১৬৩, আহযাব-৪১, ৪২, আ'রাফ-২৩, ২০৫, নিসা-৪৩, যারিয়াত-২০-২১।

৪। যে ব্যক্তি ইসলামে কোন উত্তম প্রথা চালু করবে সে তার সাওয়াব তো পাবেই উপরন্তু আমলকারীদের সমপরিমাণ সাওয়াবও পাবে। অথচ আমলকারীদের সাওয়াবের পরিমাণ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ধর্মে কোন খারাপ প্রথা প্রচলন করবে তার জন্য তার পাপ তো রয়েছেই উপরন্তু

খারাপ আমলকারীদের সমপরিমাণ পাপও তার জন্য রয়েছে। অবশ্য তাদের পাপ বিন্দুমাত্র হ্রাস করা হবেনা। [নাসাঈ/২৫৫৬-জারীর (রাঃ)]

◫ ইসলামে **ইবাদাত** যেমন মানুষের পুরা জীবনকে শামিল করেছে তেমনিভাবে **মানুষের পুরা অস্তিত্বকেও** শামিল করেছে। এ জন্যই একজন মুসলিম আল্লাহর **ইবাদাত** করবে তার চিন্তা-ভাবনার দ্বারা, আল্লাহর ইবাদাত করবে তার **অন্তঃকরণ** দ্বারা, ইবাদাত করবে তার জিহ্বার দ্বারা, তার শরীরের **অঙ্গ** প্রত্যাঙ্গ দ্বারা, সম্পদ খরচ করার মাধ্যমে, সে আল্লাহর ইবাদাত করবে হিযরাত করার মাধ্যমে। মুসলিমরা আল্লাহর ইবাদাত করবে নিজের সৃষ্টি রহস্যের মাঝে, আকাশ মন্ডলী পর্যবেক্ষণ করার মাধ্যমে, সে চিন্তা করবে আকাশ-পাতাল সৃষ্টির রহস্য, আল্লাহ যা কিছু সৃষ্টি করেছেন সে সম্পর্কে, আল্লাহর নিদর্শনসমূহে এবং এতে কি হিকমাত ও হিদায়াত রয়েছে সে সম্পর্কে। সে দৃষ্টি দিবে বিভিন্ন জাতির পরিণতি ও ইতিহাসের ঘটনাবলী সম্পর্কে এবং এতে কি উপদেশ ও শিক্ষণীয় রয়েছে সেই সম্পর্কে। এসবই একজন মুসলিমকে আল্লাহর নৈকট্য লাভে সহায়তা করবে।

ইসলাম ধর্ম হল ঈমান, আকীদাহ ও বাহ্যিক আমলের সমষ্টি

১। মানুষের মধ্যে এমন লোক আছে যারা বলে ঃ আমরা আল্লাহর প্রতি এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান এনেছি। কিন্তু প্রকৃতপক্ষে তারা মু'মিন নয়। [সূরা বাকারা-৮]

২। লোকেরা কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? [সূরা আনকাবূত-২]

৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ কোন্ আমল উত্তম? তিনি বললেন ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনা। এর পরের আমল হল আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। এর পরের আমল হল মাকবুল হাজ্জ। [বুখারী-২৫]

◫ ইসলাম ধর্ম ঈমান, আকীদাহ ও বাহ্যিক আমলের সমষ্টি।[বিস্তারিত দেখুন ঃ সূরা নিসা-১০২, ১০৩] এককভাবে ঈমানের উল্লেখ করা হলে ইসলামকে তার ভিতর অন্তর্ভুক্ত করতে হবে। দু'টি এক সাথে উল্লেখ করা হলে ঈমানের অর্থ হবে অন্তরে বিশ্বাস করার বিষয়সমূহ, আর ইসলামের অর্থ হবে অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের বাহ্যিক আমলসমূহ। এই জন্যই পূর্ববর্তী যুগের কোন কোন আলেম বলেছেন ঃ ইসলাম প্রকাশ্য বিষয় এবং ঈমান গোপনীয় বিষয়। কারণ তা অন্তরের ভিতরের বিষয়।

ইসলামকে এক শ্রেণীর লোক রুযি-রুটির মাধ্যম হিসাবে গ্রহণ করছে

১। আল্লাহ যা গ্রন্থে অবতীর্ণ করেছেন তা যারা গোপন করে ও তৎপরিবর্তে নগণ্য মূল্য গ্রহণ করে, নিশ্চয়ই তারা অগ্নি ছাড়া অন্য কিছু ভক্ষন করেনা; এবং উত্থান দিনে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা, তাদেরকে পবিত্র করবেননা এবং তাদের জন্য রয়েছে যন্ত্রনাদায়ক শাস্তি। [সূরা বাকারা-১৭৪]

২। আর আল্লাহ যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। [সূরা আলে ইমরান-১৮৭]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৭৮, ৭৯, ১৭৫, হুদ-১৫, ১৬।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মিথ্যা কসমের মাধ্যমে পণ্য বিক্রয় বেশি হতে পারে, কিন্তু তাতে বারাকাত থাকবেনা। [বুখারী/১৯৫২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হালাল এবং হারামের মধ্যে এমন কিছু সন্দেহজনক বিষয়ও আছে যে সম্পর্কে অধিকাংশ লোক কিছুই জানেনা। অতএব যে ব্যক্তি সন্দেহজনক ব্যাপার পরিহার করল, সে যেন তার দীন ও ইয্যাতের সংরক্ষণ করল। আর যে ব্যক্তি সন্দেহজনক বিষয়ে লিপ্ত হল, সে যেন হারামে লিপ্ত হল। [আবূ দাউদ/৩২৯৭-নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ)]

ধর্ম পালন করার প্রধান উদ্দেশ্য অর্থোপার্জন হলে উপার্জিত সেই অর্থ হারামে পরিণত হয়। ধর্ম হৃদয় থেকে পালন না করে কেবল অর্থকরী ব্যবসার পণ্য হিসাবে তা ব্যবহার করা অবশ্যই বৈধ নয়। বৈধ নয় অর্থ কামানোর উদ্দেশে কুরআন-হাদীস শিক্ষা করা ও শিক্ষা দেয়া।

অতীব দুঃখের বিষয় যে, এক শ্রেণীর মানুষ আছে, যারা ধার্মিক নয় অথচ ধর্মীয় কোন কোন প্রতীককে (যেমন দাঁড়ি, টুপি, লম্বা পাঞ্জাবী, হাজ্জ পালন শেষে হাজী নাম দেয়া প্রভৃতিকে) নিজের ব্যবসার টেকনিক হিসাবে ব্যবহার করে অর্থ উপার্জন করে। এরাও যে ধর্মকে হাতিয়ার বানিয়ে মানুষের অর্থ লুটে জমা করে তা বলাই বাহুল্য।

ইসলাম ধর্মে মুসলিম জাতির মাযহাব (দল) প্রসঙ্গ

❖ মাযহাব অর্থ বিশেষ মত ও পথ অবলম্বী দল, সম্প্রদায়, সংঘ ইত্যাদি।

১। নিশ্চয়ই ইসলামই আল্লাহর নিকট একমাত্র ধর্ম। এবং যাদেরকে গ্রন্থ প্রদত্ত হয়েছে তাদের জ্ঞান আসার পরও তারা মতবিরোধে লিপ্ত রয়েছে শুধুমাত্র পরস্পর বিদ্বেষ বশতঃ; এবং যে আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অস্বীকার করে নিশ্চয়ই আল্লাহ সত্বর হিসাব গ্রহণকারী। [সূরা আলে ইমরান-১৯]

২। যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করে দলে দলে ভাগ হয়ে গেছে তাদের কোন কাজের সাথে তোমার কোন সম্পর্ক নেই। তাদের ব্যাপারটি পুরোপুরি আল্লাহর ইখতিয়ারভুক্ত। সময় হলেই তিনি তাদেরকে জানিয়ে দিবেন তাদের কৃতকর্ম সম্পর্কে। [সূরা আন'আম-১৫৯]

৩। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য

হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [সূরা মায়িদা-৩]

৪। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে কক্ষনো মৃত্যু বরণ করনা। আল্লাহর রজ্জুকে সমবেতভাবে দৃঢ়ভাবে ধারণ কর, পরস্পর বিচ্ছিন্ন হয়োনা এবং তোমাদের প্রতি আল্লাহর নি'আমাত স্মরণ কর, যখন তোমরা ছিলে পরস্পর শত্রু, তিনি তোমাদের অন্তরে প্রীতির সঞ্চার করলেন, ফলে তোমরা আল্লাহর অনুগ্রহে পরস্পর ভাই ভাই হয়ে গেলে। তোমরা অগ্নি-গহ্বরের প্রান্তে ছিলে, অতঃপর আল্লাহ তোমাদেরকে তা থেকে রক্ষা করলেন। এভাবে আল্লাহ নিজের নিদর্শনাবলী তোমাদের কাছে স্পষ্টভাবে বর্ণনা করেন যাতে তোমরা সঠিক পথ প্রাপ্ত হও। [সূরা আলে ইমরান-১০২, ১০৩]

৫। তাঁর অভিমুখী হও, আর তাঁকে ভয় কর, সালাত প্রতিষ্ঠা কর, আর মুশরিকদের অর্ন্তভুক্ত হয়োনা যারা নিজেদের দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে, প্রত্যেক দল নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উৎফুল্ল। [সূরা রূম-৩১-৩২]

৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৭। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডান দিকে দু'টি রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু'টি রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে হাত রেখে বললেন ঃ এটা আল্লাহর রাস্তা। এ পথই হল সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবেনা। করলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। [ইব্‌ন মাজাহ/১১]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার দৃষ্টান্ত ও আমার উম্মাতের দৃষ্টান্ত সেই ব্যক্তির ন্যায়, যে আগুন জ্বালিয়েছে ফলে পোকা-মাকড় ও কীট-পতঙ্গ তাতে পড়তে লাগল। আমি তাদের কোমরবন্ধ করে (তোমাদের রক্ষার প্রয়াসে) টানছি আর তোমরা সবেগে তাতে ঝাপিয়ে পড়তে যাচ্ছ। [মুসলিম/৫৭৫৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইয়াহুদী জাতি একাত্তরটি দলে বিভক্ত হয়েছিল, তন্মধ্যে সত্তরটি দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। আর খৃষ্টান জাতি বাহাত্তর দলে বিভক্ত হয়েছিল, তাদের মধ্যে একাত্তর দল জাহান্নামী এবং একটি দল জান্নাতী। সেই মহান সত্তার শপথ যাঁর হাতে মুহাম্মাদের প্রাণ! অবশ্যই আমার উম্মাত তিয়াত্তরটি দলে বিভক্ত হবে। তন্মধ্যে একটি দল হবে জান্নাতী এবং বাহাত্তরটি দল হবে জাহান্নামী। জানতে চাওয়া হল, হে আল্লাহর রাসূল! কোন্ দলটি জান্নাতী? তিনি বলেছেন ঃ তারা ঐ

জামা'আতভুক্ত, যারা আল্লাহর কিতাব এবং তাঁর রাসূলের সুন্নাতের **অনুসারী** হবে। [আবূ দাউদ/৪৫২৬, ইব্‌ন মাজাহ/৩৯৯২, তিরমিযী/২৬৪২]

১০। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কেহকে ফাতওয়া দেয়া হলে তার পাপের ভার ফাতওয়াদাতার উপর বর্তাবে। [ইব্‌ন মাজাহ/৫৩]

১১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমানও হয়। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল। [বুখারী/৩২০৭-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ)]

১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৪৩৪৩, ৪৩৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৪]

১৩। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করল তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করল তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। [বুখারী /৬৭৭১-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

- বর্তমান মুসলিম সমাজে লোক মুখে খুবই প্রচলিত আছে যে, মাযহাব মানতেই হবে এবং যে কোন চার ইমামের এক ইমামকে ও ইমামের মাযহাবকে মান্য করা ফারয। এরূপ মনে করা ভিত্তিহীন, যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে থেকে প্রমাণিত নয়। কারণ কোন ইমাম/আলেম কোন কিছু ফারয করতে চাইলেই তা ফারয হয়ে যায়না। ফারয করার অধিকার একমাত্র আল্লাহরই। যে আল্লাহর ক্ষমতাকে নিজে প্রয়োগ করতে চেষ্টা করে এবং আল্লাহর ক্ষমতাকে অবজ্ঞা করে নিঃসন্দেহে সে ইসলাম ধর্ম প্রত্যাখ্যানকারী রূপে গন্য হবে।

যাদের নামে মাযহাব মানা হচ্ছে তারা কি আদৌ এই মাযহাব সম্পর্কে জানতেন? তারা কি তাদের নামে নিজেরাই মাযহাব তৈরী করেছেন? অথবা তারা কি তাদের নামে অন্যদেরকে মাযহাব তৈরী করতে বলেছেন? প্রচলিত চার মাযহাব চার ইমামের উপর ফারয হয়েছে, এ কথা কি কেহ বলতে পারবেন? নাকি নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মাযহাব ফারয হয়েছে? এ চার মাযহাব চারশত হিজরীর পূর্ব পর্যন্ত কোন যুগে ছিল কি? এ বিষয়ে প্রমাণ দেখুন।

৪০০ হিজরীতে হামীদ বিন সুলাইমান কুফায় হানাফী মাযহাব চালু করেন। দলীল ঃ

১। শাহ অলিউল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী তাঁর হুজ্জাতুল্লাহিল বালেগা, ১ম খন্ড, ১৫২ পৃষ্ঠায় উল্লেখ করেন ঃ চার মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে ৪০০ হিজরীর পরে।

২। "সংক্ষিপ্ত ইসলামী বিশ্বকোষ," দ্বিতীয় খন্ড, ইসলামী ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ, ১৬৮ পৃষ্ঠায় উল্লেখ আছে সূক্ষ্মভাবে বিচার করলে প্রতীয়মান হয় যে, ইমাম আবূ হানিফা (রহঃ) ও ইমাম মালিক (রহঃ) কেহই কোন মাযহাবী সম্প্রদায় প্রতিষ্ঠা করেননি, যা পরবর্তী যুগে সৃষ্ট।

নিম্নে যাঁদের নামে মাযহাব সৃষ্টি হয়েছে, তাঁদের জন্ম/মৃত্যুর একটি ছক দেয়া হল ঃ

এক নজরে চার ইমামের জন্ম-মৃত্যুর চিত্র

মাযহাবের নাম	যাঁদের নামে মাযহাব	জন্ম	জন্মস্থান	মৃত্যু	মৃত্যুস্থান
হানাফী	আবূ হানীফা নু'মান বিন সাবিত (রঃ)	৮০ হি.	কুফা	১৫০ হি.	বাগদাদ
মালিকী	আবূ আবদিল্লাহ মালিক বিন আনাস (রঃ)	৯৫ হি.	মাদীনা	১৭৯ হি.	মাদীনা
শাফিঈ	আবূ আবদিল্লাহ মুহাম্মাদ বিন ইদ্রিস (রহ)	১৫০ হি.	ফিলিস্তিন	২০৪ হি.	মিসর
হাম্বলী	আবূ আবদিল্লাহ আহমাদ বিন মুহাম্মাদ হাম্বল (র)	১৬৪ হি.	বাগদাদ	২৪১ হি.	বাগদাদ

এই ইমামগণ প্রচলিত মাযহাব তৈরী করেননি বা কেহকে তৈরী করতেও বলেননি এবং তাদের উপর চার মাযহাব ফার্‌যও হয়নি। বরং চারশত হিজরীর পর তাদের অনুসারীগন অতি ভক্তির পরিণতির কারণে বিভিন্ন ইমামের দল বা মাযহাবের সৃষ্টি করে। যদি ধরেও নেয়া হয় যে, ইমামগণ চার মাযহাব তৈরী করেছেন, কিন্তু তা ফার্‌য হল কিভাবে? তারাতো নাবী ছিলেননা। তাদের নিকট অহীও আসতনা। এগুলি তাদের নামে মিথ্যা অপবাদ ছাড়া আর কিছুই নয়। তাদের সময় এবং তাদের পূর্বে একটি দল উম্মাতে মুহাম্মাদী ছিল। তারা ঐ একটি মাযহাবকেই মানতেন এবং অন্যকে মানতে বলতেন। ঐ একটি মাযহাবই ফার্‌য যা নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে। উপরোক্ত আলোচনা থেকে প্রতীয়মান হয় যে, চার মাযহাব ফার্‌য এর উপর বিশ্বাস করা বা মানা কোন মুসলিমের কর্তব্য নয়। আল্লাহ সমস্ত মুসলিম জাতিকে মাযহাব সম্বন্ধে সঠিকভাবে জানা/বুঝার তাওফীক দান করুন।

ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ জীবন ব্যবস্থা

১। (স্মরণ কর) যখন আল্লাহ নাবীদের নিকট হতে এ অঙ্গীকার নিয়েছিলেন যে, আমি তোমাদেরকে কিতাব এবং জ্ঞান যা কিছু প্রদান করেছি, অতঃপর তোমাদের কাছে যা আছে তার সমর্থক কোন রাসূল যখন তোমাদের নিকট আসবে, তখন অবশ্যই তোমরা তার প্রতি ঈমান আনবে এবং তাকে সাহায্য করবে। তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'তোমরা অঙ্গীকার করলে তো? এবং যে বিষয়ে আমি তোমাদের নিকট হতে অঙ্গীকার নিলাম, তোমরা তা মানলে তো?'

তারা বলল ঃ 'আমরা অঙ্গীকার করলাম'। আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমরা সাক্ষী থেক এবং আমিও তোমাদের সাথে সাক্ষী থাকলাম'। [সূরা আলে ইমরান-৮১]

২। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন বিষয়ে নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ কিংবা মু'মিনা নারীর সে বিষয়ে কোন সিদ্ধান্তের অধিকার থাকবেনা। কেহ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলকে অমান্য করলে সেতো স্পষ্টই পথভ্রষ্ট। [সূরা আহযাব-৩৬]

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহর নিকট একমাত্র দীন হল ইসলাম। বস্তুতঃ যাদেরকে কিতাব দেয়া হয়েছিল তারা জ্ঞান লাভের পর একে অন্যের উপর প্রাধান্য লাভের জন্য মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর নিদর্শনসমূহকে অস্বীকার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ হিসাব গ্রহণে অতিশয় তৎপর। [সূরা আলে ইমরান-১৯]

৪। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাবে কক্ষনো তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

৫। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [সূরা মায়িদা-৩]

৬। যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সেই আবাস! [সূরা নিসা-১১৫]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাসাস-৪৪, সাফ-৯, তাওবা-৩৩, হাশর-৪, বাকারা-৮৫, ২০৮।

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি পাঁচটি। (১) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল-এ কথার সাক্ষ্য দান। (২) সালাত (নামায) কায়েম করা। (৩) রামাযান মাসে সিয়াম পালন করা। (৪) যাকাত দেয়া এবং (৫) হাজ্জ করা। [বুখারী/৭-ইব্ন উমার (রাঃ), মুসলিম/২০]

◻ পূর্ণাংগ ও ব্যাপক যে জীবন বিধান মানুষের প্রয়োজন, তার সন্ধান লাভ করার জন্য জ্ঞান ও বিবেককে কাজে লাগিয়ে আন্তরিকতার সাথে চেষ্টা করলে আমরা দেখতে পাব, সেই জীবন ব্যবস্থাই হচ্ছে একমাত্র ইসলাম, যার মধ্যে কোন বক্রতা, বৈসাদৃশ্য, বিভ্রান্তি ও অকল্যাণ নেই।

এই ইসলাম সেই মন্ত্রের ইসলাম নয়, যা মুখস্ত পড়লেই দায়িত্ব শেষ হয়, আর না তা কতিপয় আনুষ্ঠানিক ইবাদাতের নাম যা আদায় করলে আর কিছু করার প্রয়োজন হয়না। বরং এ হচ্ছে দুনিয়া ও আখিরাতের সর্বাংগীন ও পূর্ণাংগ এক জীবন ব্যবস্থা। বর্তমানে অধিকাংশ মুসলিমের আচার-ব্যবহার, চাল-চলনেই

কেবল মুসলিম বলা হয়। কারণ তারা চুরি করে, ঘুষ ও সুদের লেনদেন করে, অন্যের মালও ভক্ষণ করে, অন্যকে ঠকায়, নিজকে সমাজে প্রতিষ্ঠিত ও বড়ত্ব দেখানোর জন্য যত রকম অন্যায় কাজ করা দরকার সেগুলো মুসলিমরা করতে দ্বিধা বোধ করেনা, যা মুসলিম নাম ধারন করা লোকের দ্বারা এরূপ কাজ করা উচিত নয়।

ইসলাম কি?

❖ ইসলাম একটি আরাবী শব্দ। এর অভিধানিক অর্থ অনুগত হওয়া, নিজকে সঁপে দেয়া, আত্মসমর্পণ করা। পরিভাষায় ইসলাম হচ্ছে আল্লাহর পক্ষ থেকে আসা দীনের নাম, যা আমাদের রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দাওয়াত ও আমলের কার্যকারিতার মাধ্যমে পরিপূর্ণতা লাভ করেছে।

ইসলামী আকীদা কি?

আকীদা হচ্ছে দৃঢ় ও মযবূত বিশ্বাস। প্রতিশ্রুতি ও চুক্তি। তবে যে কোন বিশ্বাস ও চুক্তিকেই আকীদা বলা হয়না। নির্দিষ্ট কোন ধর্ম, মতবাদ, আদর্শকে মনে-প্রাণে বিশ্বাস করাকেই 'আকীদা' বলা হয়। এ আকীদার সম্পর্ক মানুষের মনের সাথে। আর আকীদার প্রতিফলন ঘটে কর্মের/আমলের মাধ্যমে।

ইসলামী আকীদা হচ্ছে, ইসলামকে আল্লাহর একমাত্র মনোনীত দীন হিসাবে মেনে নিয়ে ইসলামের মৌলিক বিষয়গুলির প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করা। যেমন আল্লাহকে এক ও একক 'রাব্ব' হিসাবে বিশ্বাস করা, তাঁর ক্ষমতা ও সার্বভৌমত্বকে বিশ্বাস করা। আল্লাহ মানুষের হিদায়াতের জন্য নাবী-রাসূল পাঠিয়েছেন, কুরআন নাযিল করেছেন, ফিরিশতারা আল্লাহর আজ্ঞাবহ হয়ে বিভিন্ন কাজ সম্পাদন করেন, পৃথিবী ধ্বংস হয়ে যাবে, আখিরাত হবে, পৃথিবীতে মানুষ যা করছে তার হিসাব নেয়া হবে, যারা আল্লাহকে বিশ্বাস করে ভাল কাজ করছে তাদেরকে জান্নাতে এবং যারা অপরাধ করছে তাদেরকে জাহান্নামে পাঠানো হবে। এসব বিষয়ের প্রতি বিশ্বাস করা ইসলামী আকীদার দাবী।

১। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ইরশাদ করেন ঃ তোমাদের মধ্য কেহ যখন উত্তমরূপে ইসলামের উপর কায়েম থাকে, সে যে সৎ আমল করে তার প্রত্যেকটির বিনিময়ে সাতশ গুণ পর্যন্ত (সাওয়াব) লেখা হয়। আর সে যে মন্দ কাজ করে তার প্রত্যেকটির জন্য তার ঠিক ততটুকুই পাপ লেখা হয়। [বুখারী/৪০]

২। তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ নাজদবাসীর এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে এল। তার মাথার চুল ছিল এলোমেলো। আমরা তার কথার মৃদু আওয়ায শুনতে পাচ্ছিলাম। কিন্তু সে কি বলছিল, আমরা তা বুঝতে পারছিলামনা। সে ইসলাম সম্পর্কে প্রশ্ন করতে লাগল । রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ দিন রাতে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত। সে বলল ঃ আমার উপর এ ছাড়া আরো সালাত কি আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে নাফল আদায় করতে পার।

রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ আর রামাযানের সিয়াম। সে বলল ঃ আমার উপর আরো সাওম আছে? তিনি বললেন ঃ না, তবে নাফল আদায় করতে পার। বর্ণনাকারী বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তার কাছে যাকাতের কথা বললেন। সে বলল ঃ আমার উপর এ ছাড়া আরো দেয়ার আছে কি? তিনি বললেন ঃ না, তবে নাফল হিসাবে দিতে পার। বর্ণনাকরী বলেন ঃ সেই ব্যক্তি এই বলে চলে গেলেন, "আল্লাহর কসম! আমি এর চেয়ে বেশি করবনা এবং কমও করবনা।" তখন রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ সে সফলকাম হবে যদি সত্য বলে থাকে। [বুখারী/৪৪]

☐ ঈমান শব্দের অর্থ বিশ্বাস, আর ইসলাম শব্দের অর্থ আত্মসমর্পণ করা। ইসলামী শারীয়াতের পরিভাষায় আমলের মাধ্যমে ঈমান পূর্ণাঙ্গ রূপে প্রতিষ্ঠা লাভ করে। অনুরূপভাবে আত্মসমর্পনও আমলের মাধ্যমে বিশ্বাসযোগ্যতা লাভ করে। সেই দিক থেকে ঈমান ও ইসলামের মধ্যে পার্থক্য করা দূরহ ব্যাপার যা উপরের আলোচনায় এসেছে। কেহ কেহ ইসলামের বা ইবাদাতের একটি আমলকে নিজের বিবেক খাটিয়ে বেশি অগ্রাধিকার দেয় এবং অপর আমলকে কম অগ্রাধিকার প্রদান করে আলাদা দলের সৃষ্টি করে চলেছে এবং তাতেই সে আনন্দিত। এমন প্রবৃত্তি অর্থাৎ নিজের বিবেক বুদ্ধি খাটিয়ে আমলের পদ্ধতি সংযোজন ও বিয়োজন করে চলছে। তাদের কেহ কেহ বলেন, ওরাতো জিহাদ করেনা। কেহ বলেন, ওরাতো তাবলীগ করেনা। আবার কেহ বলেন, তারা তো যিক্‌র করেনা ইত্যাদি।

এমতাবস্থায় ঈমানী বিষয় যেমন আন্তরিকভাবে সাক্ষ্য ঘোষণা দেয়ার পর কুরআন এবং সহীহ হাদীসের আদেশগুলি সাধ্যমত আমল করা এবং নিষেধগুলি থেকে বিরত থাকা এবং শিরক ও বিদ'আত মুক্ত আমল করার নামই ইসলাম।

ঈদে মিলাদুন্নাবী

১। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

২। আর যে কেহ আল্লাহ ও তদীয় রাসূলকে অমান্য করে এবং তাঁর নির্দিষ্ট সীমাসমূহ অতিক্রম করে তিনি তাকে জাহান্নামে প্রবেশ করাবেন। তন্মধ্যে সে সদা অবস্থান করবে এবং তার জন্য লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি রয়েছে। [সূরা নিসা-১৪]

৩। আর যে কেহ আল্লাহ ও রাসূলের অনুগত হয়, তারা ঐ ব্যক্তিদের সঙ্গী হবে যাদের প্রতি আল্লাহ অনুগ্রহ করেছেন; অর্থাৎ নাবীগণ, সত্য সাধকগণ, শহীদগণ ও সৎ কর্মশীলগণ; এবং এরাই সর্বোত্তম সঙ্গী। [সূরা নিসা-৬৯]

৪। আর যে সব মুহাজির ও আনসার (ঈমান আনায়) অগ্রবর্তী এবং প্রথম, আর যে সব লোক সরল অন্তরে তাদের অনুগামী, আল্লাহ তাদের প্রতি রাযী-খুশি হয়েছেন যেমনভাবে তারা তাঁর প্রতি রাযী হয়েছে, আর আল্লাহ তাদের জন্য এমন উদ্যানসমূহ প্রস্তুত করে রেখেছেন যার তলদেশে নাহরসমূহ বইতে

থাকবে, যার মধ্যে তারা চিরস্থায়ীভাবে অবস্থান করবে, তা হচ্ছে বিরাট কৃতকার্যতা। [সূরা তাওবা-১০০]

৫। উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় বিদ'আত (নতুন আবিষ্কারসমূহ)। সকল বিদ'আতই হল পথভ্রষ্টতা। [মুসলিম/১৮৭৫-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৪৫]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই হাউযে কাউছারের পাশে এমন কিছু লোক আসবে যারা দুনিয়ায় আমার সাহচর্য লাভ করেছিল। এমন কি যখন আমি তাদের দেখতে পাব এবং তাদেরকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হবে তখন আমার নিকট আসতে তাদেরকে বাধা দেয়া হবে। তারপর আমি বলব ঃ হে আমার রাব্ব! এরা আমার সাথী, এরা আমার সাথী। তখন আমাকে বলা হবে ঃ অবশ্যই তুমি জাননা, তোমার পর এরা কিরূপ বিদ'আত করেছে। [মুসলিম/৫৭৯২-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), বুখারী/৬১২১]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৪৩৪৩, ৪৩৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৪]

☐ উপরোক্ত হাদীসগুলি থেকে শিক্ষা পাওয়া গেল যে, ইয়াহুদী-নাসারা বা অন্য কওমের সাথে সামঞ্জস্য পরিহার করতে হবে। কোন কিছু ফারয বললে তার দলীল কুরআন হতে দিতে হবে। ঈদে মিলাদুন্নাবী (জন্ম বার্ষিকী) পালন করা ফারয এর সমর্থন আল কুরআনে কোথাও নেই; এটা কথিত আলেমদের উদ্ভাবন করা বিষয়।

ঈদে মিলাদুনাবী পালন করার আদেশ আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেহকে দেননি এবং নিজেও পূর্ববর্তী কোন নাবীর জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করেননি। নাবী (সাঃ) নিজের জীবদ্দশায় কখনও জন্মবার্ষিকী পালন করেননি। সাহাবাগণও (রাঃ) ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করেননি। আরাব জাহানের লোকেরা ঈদে মিলাদুন্নাবী কি জিনিস তা জানেননা।

এই অনুষ্ঠান ইসলামের নামে পরবর্তী সময়ে সাওয়াব বা পুণ্যের আশায় আবিষ্কার করা হয়েছে বলে এটা "বিদ'আত"। নাসারা (খৃষ্টান) প্রতি বৎসর ২৫ ডিসেম্বর ঈসা (আঃ) এর জন্মদিবস (ঈদে মিলাদুন্নাবী) পালন করে । হিন্দুরা তাদের কথিত দেবতা শ্রী কৃষ্ণের জন্মদিন হিসাবে অষ্টমী পালন করেন। বৌদ্ধরা বোদ্ধপূর্ণিমা পালন করেন। মুসলিমরা অন্য ধর্মের সামঞ্জস্য কোন আমল করবেনা, এটাই ইসলাম। ⊙ যদি তারা অন্য ধর্মের অনুসরণ করে তাহলে সেই কাওমের অনুসারী হবে। [আবূ দাউদ/৩৯৮৯]

সেই কারণে ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন ইসলামী আমল হতে পারেনা। কারণ তারা আল্লাহর পরিবর্তে বিদ'আত পালনকারীর আনুগত্য করল।

রাসূলকে (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) প্রকৃত ভালবাসার পরিচয় তাঁর ব্যাপারে বাড়াবাড়ি, তাঁর অতি প্রশংসা, তাঁকে তাঁর স্বীয় স্তর থেকে উর্ধ্বে

প্রতিষ্ঠিত করা বা তাঁর জন্ম-বার্ষিকী পালন অথবা বিভ্রান্ত ও বিদ'আতপন্থীদের উদ্ভাবিত নানাবিধ অনুষ্ঠান পালনের মধ্যে পাওয়া যায়না। বরং তাঁর প্রতি ভালবাসার প্রকৃত ও সত্যিকার পরিচয় মিলে তাঁর সুন্নাতের সঠিক অনুসরণ, তাঁর প্রবর্তিত শারীয়াতের পূর্ণ বাস্তবায়ন এবং এর প্রতি নিষ্ঠাবান হওয়ার মধ্যে। মুসলিমের সম্পর্ক তাদের নাবীর সাথে কখনও বিচ্ছিন্ন হতে পারেনা। এ সম্পর্ক স্থায়ী ও অব্যাহত। এ সম্পর্ক কোন অবস্থায় ছিন্ন হতে পারেনা। প্রতিটি অঙ্গ-ভঙ্গী ও গতিবিধির মধ্যে তাদের নাবীর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) সাথে তাদের সম্পর্ক বিদ্যমান থাকে। যখন সে সালাত আদায় করে তখন নাবীর অনুসরণের মাধ্যমে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়, যাতে সে তাঁর এই বাণী বাস্তবায়িত করে ঃ ⊙ তোমরা সালাত আদায় কর এমনভাবে, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ। [বুখারী/৬০১] যখন সে হাজ্জ করে তখন নাবীর সাথে তার সম্পর্ক প্রতিষ্ঠিত হয়। ⊙ তাঁর বাণী ঃ আমার নিকট থেকে তোমরা হাজ্জের বিধি বিধান শিখে নাও এর বাস্তবায়নের মাধ্যমে। [মুসলিম/৩০০৩] এভাবে সে যখন সিয়াম পালন করে বা যাকাত আদায় করে তখন এগুলির মধ্য দিয়ে সর্বদা তার সম্পর্ক থাকে তার নাবীর সাথে। তার সকল কাজকর্ম যথা ঃ পানাহার, নিদ্রা, ক্রন্দন, ক্রোধ বা সন্তুষ্টি সর্বাবস্থায় সে তার নাবী মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর অনুসরণ করে এবং কম-বেশী ও ছোট-বড় সর্বপ্রকার কাজকর্মে তাঁরই অনুসরণের চিন্তায় থাকে। নাবী প্রেমিক মুসলিমের অবস্থা এরূপই হয়ে থাকে।

পক্ষান্তরে, নাবী (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর জন্মদিন পালন অথবা অন্যান্য দিবস পালনের মাধ্যমে তাঁর সাথে যে সম্পর্ক প্রতিষ্ঠার দাবী করা হয় তা অত্যন্ত খোঁড়া ও ভঙ্গুর। অনেক দিবস পালন করা হয় যার মধ্যে থাকে নানাবিধ কু-সংস্কার, বিদ'আত, অবৈধ ও ভ্রান্ত বিষয়াদির মহড়া, যেগুলোর হাকীকাত সম্পর্কে আল্লাহ তা'আলাই সর্বাধিক জ্ঞাত। এসব কাজের উদ্যোক্তারা দাবী করে যে, তারা এসব কর্মকান্ডের মাধ্যমে রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এর প্রতি ও তাঁর সুন্নাতের প্রতি সম্মান প্রদর্শন করছে। প্রকৃতপক্ষে, এসব কার্যকলাপের মাধ্যমে তারা রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ও তাঁর সুন্নাত থেকে বহু দূরে সরে যায় এবং নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরবর্তী সম্মানিত খুলাফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সব সাহাবীগণ ভাল করেই জানতেন কবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। তারা সঠিকভাবে জানতেন, তিনি কোন দিন/তারিখ মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করেছেন। তারা নির্দিষ্ট করে জানতেন, তাঁর বিজয়ের দিনগুলিও। তারা সঠিকভাবে জানতেন, কোন তারিখে তার মৃত্যু হয়েছে। এ সব দিন-ক্ষণ সম্পর্কে তাদের খুব ভাল করেই জানা ছিল। এতদসত্ত্বেও তাঁরা ঐ সব দিনগুলিতে এ জাতীয় কাজ/অনুষ্ঠান করেছেন বলে হাদীসে বা ইতিহাসে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। রাসূল (সাঃ) সাহাবীগনের কাছে সর্বাধিক প্রিয়জন ছিলেন এবং তারা তাঁকে সত্যিকার অর্থে

পূর্ণ মাত্রায় ভালবাসতেন। এত কিছুর পরও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে তারা কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেননি বা কোন বিদ'আতের প্রবর্তন করেছেন বলে জানা যায়না। তারাই তো ছিলেন তাঁর জীবন পদ্ধতির সঠিক অনুসরণকারী, তাঁর অনুগত এবং তাঁরই আদর্শে আদর্শবান সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। তাই পরবর্তী মুসলিমদের আচরণও এমনটিই হওয়া উচিত।

ঈমানের স্বাদ কিভাবে পাওয়া যায়? ঈমান হ্রাস-বৃদ্ধির কারণসমূহ

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

أَلَمْ تَرَ كَيْفَ ضَرَبَ اللهُ مَثَلاً كَلِمَةً طَيِّبَةً كَشَجَرةٍ طَيِّبَةٍ أَصْلُهَا ثَابِتٌ وَفَرْعُهَا فِي السَّمَاءِ - تُؤْتِي أُكُلَهَا كُلَّ حِينٍ بِإِذْنِ رَبِّهَا وَيَضْرِبُ اللهُ الأَمْثَالَ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ

তুমি কি লক্ষ্য করনা আল্লাহ কিভাবে উপমা দিয়ে থাকেন? সৎ বাক্যের তুলনা উৎকৃষ্ট বৃক্ষ যার মূল সুদৃঢ় এবং যার প্রশাখা উর্ধ্বে বিস্তৃত। যা প্রত্যেক মওসুমে ফল দান করে তার রবের অনুমতিক্রমে, এবং আল্লাহ মানুষের জন্য উপমা দিয়ে থাকেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। [সূরা ইবরাহীম-২৪, ২৫]

২। তিনটি জিনিস এমন যার মধ্যে সেগুলি পাওয়া যাবে সে ঈমানের স্বাদ পাবে। (১) আল্লাহ ও তাঁর রাসূল তার কাছে অন্য সবকিছু থেকে প্রিয় হওয়া। (২) কেহকে শুধুমাত্র আল্লাহর জন্য ভালবাসা। (৩) জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হওয়াকে যেভাবে সে অপছন্দ করে, তেমনি পুনরায় কুফ্‌রীর দিকে প্রত্যাবর্তন অপছন্দ করে। [বুখারী/৬৪৫৯-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), মুসলিম/৭১, ইব্‌ন মাজাহ/৪০৩৩]

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর জন্য ভালবাসবে এবং আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য দুশমনি করবে; আর দান করবে আল্লাহর জন্য এবং দান করা থেকে বিরত থাকবে আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য, সেই ব্যক্তি তার ঈমান পরিপূর্ণ করেছে। [আবূ দাউদ/৪৬০৭-আবূ উমামা (রাঃ)]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অনাড়ম্বর জীবন যাপনই ঈমান। [ইব্‌ন মাজাহ/৪১১৮-আবূ উমামাহ হারিসী (রাঃ)]

৫। সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে রাব্ব হিসাবে আল্লাহকে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। [মুসলিম/৫৮-আব্বাস ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব (রাঃ)]

◻ কালেমায়ে তাইয়্যিবা তথা ঈমানের কালেমাকে উৎকৃষ্ট ফলজ গাছের সাথে তুলনা করা হয়েছে। উৎকৃষ্ট ফলের স্বাদ হবে উৎকৃষ্ট, ফলের যেমন স্বাদ থাকে, ঈমানেরও অনুরূপ তৃপ্তি আছে। প্রকৃত ঈমানদার ব্যক্তি এ তৃপ্তি আস্বাদন করতে পারে। ঈমানের স্বাদ শুধুমাত্র হৃদয় দিয়েই অনুভব করা যায়। কেহ কোন জিনিসের স্বাদ তখনই পায় যখন সেই জিনিসের প্রতি তার হৃদয়ে অনুরাগ ও আকর্ষণ বদ্ধমূল হয়। কোন জিনিসে যখন ভালবাসা ও আকর্ষণ সৃষ্টি হয়, তখন সেই জিনিস থেকে মনে প্রশান্তি, তৃপ্তি, পুলক ও শিহরণ জাগে। তাই প্রকৃত

ঈমানদার সালাত (নামায), সিয়াম (রোযা) ইত্যাদি **ইবাদাতে তৃপ্তি পায়।** আল্লাহর যিক্‌র, কুরআন তিলাওয়াত, ইসলামের আলোচনা, **ইসলামী জ্ঞান** চর্চায় মনের মধ্যে তৃপ্তি আসে। সে এতে বিশেষ ধরনের আনন্দ অনুভব করে। একজন লোক যখন ভাল কাজে আনন্দ পায় এবং মন্দ কাজ তার কাছে খারাপ মনে হয় তখন সে বুঝবে যে, তার ঈমান আছে। ভাল কাজ করতে যদি উৎসাহ বোধ না করে, আনন্দ না পায়; অপরদিকে মন্দ কাজ যদি তার কাছে খারাপ না লাগে, বরং মন্দ কাজেই তৃপ্তি পায় তাহলে বুঝতে হবে তার ঈমান লোপ পেয়েছে।

ঈমান বৃদ্ধি ও হ্রাসের কারণসমূহ ঃ

বৃদ্ধির কারণসমূহ ঃ

ক) আল্লাহর সমস্ত নাম ও গুণাবলীসহ আল্লাহ তা'আলার পরিচয় সম্পর্কে জ্ঞান অর্জন করা।

খ) সৃষ্টির ভিতর আল্লাহর নিদর্শনসমূহ সম্পর্কে গবেষণা করা এবং আল্লাহ মানব জাতিকে যে জীবন বিধান দিয়েছেন সেই সম্পর্কে গভীরভাবে চিন্তা-ভাবনা করা।

গ) বেশী বেশী সৎ কাজ সম্পাদন করা। সৎ আমল যতই বৃদ্ধি পাবে, ঈমান ততই বৃদ্ধি পাবে।

হ্রাসের (কমার) কারণসমূহ ঃ

ক) আল্লাহর নাম ও গুণাবলী সম্পর্কে অজ্ঞ থাকলে ঈমান কমে যায় ।

খ) সৃষ্টিতে ও শারীয়াত সম্পর্কিত কুরআনের আয়াত সম্পর্কে গবেষণা করা থেকে বিরত থাকা।

গ) সৎ আমল না করা ও পাপের কাজে লিপ্ত হওয়া ঈমান হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ ।

ঈমান কি? ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কারসমূহ

❖ ঈমান অর্থ বিশ্বাস স্থাপন করা। এর মূল অর্থ হচ্ছে প্রশান্তি, নিরাপত্তা। আল্লাহ, রাসূল, আখিরাত ইত্যাদি মৌলিক বিষয়ের প্রতি দৃঢ় বিশ্বাসকে ঈমান বলে। বিজ্ঞজনেরা বলেন ঃ ঈমান হচ্ছে অন্তরে দৃঢ় বিশ্বাস স্থাপন, মুখের স্বীকৃতি ও অঙ্গ-প্রত্যঙ্গের মাধ্যমে কাজ (Practice) করা।

১। যারা অদৃশ্য বিষয়গুলিতে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং সালাত প্রতিষ্ঠা করে এবং আমি তাদেরকে যে উপজীবিকা প্রদান করেছি তা হতে দান করে থাকে এবং তোমার প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে ও তোমার পূর্বে যা অবতীর্ণ হয়েছিল, যারা তদ্বিষয়ে বিশ্বাস স্থাপন করে এবং আখিরাতের প্রতি যারা দৃঢ় বিশ্বাস রাখে, এরাই তাদের রবের পক্ষ হতে প্রাপ্ত হিদায়াতের উপর প্রতিষ্ঠিত রয়েছে এবং এরাই পূর্ণ সফলকাম। [সূরা বাকারা-৩-৫]

২। আর যারা ঈমান আনে ও সৎ 'আমল করে তারাই জান্নাতবাসী, তারা সেখানে চিরস্থায়ী হবে। [সূরা বাকারা-৮২]

৩। মহাকালের শপথ! মানুষ অবশ্যই ক্ষতির মধ্যে রয়েছে। কিন্তু তারা নয়, যারা ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে এবং পরস্পরকে সত্যের উপদেশ দেয় ও ধৈর্য ধারণে পরস্পরকে উদ্বুদ্ধ করে। [সূরা আসর-১-৩]

৪। বেদুঈনরা বলে, 'আমরা ঈমান এনেছি'। বল ঃ 'তোমরা ঈমান আননি, বরং তোমরা বল, 'আমরা আনুগত্য স্বীকার করেছি', এখন পর্যন্ত তোমাদের অন্তরে ঈমান প্রবেশ করেনি। তোমরা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে মান্য কর তাহলে তোমাদের কৃতকর্মের কিছুই কমতি করা হবেনা। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা হুজুরাত-১৪]

৫। মু'মিন তারাই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের উপর ঈমান আনে, অতঃপর কোনরূপ সন্দেহ করেনা, আর তাদের সম্পদ দিয়ে ও জান দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে; তারাই সত্যবাদী। [সূরা হুজুরাত-১৫]

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদিন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জনসমক্ষে বসা ছিলেন, এমন সময় তাঁর কাছে এক ব্যক্তি এসে জিজ্ঞেস করলেন ঃ ঈমান কি?' তিনি বললেন ঃ 'ঈমান হল আপনি বিশ্বাস রাখবেন আল্লাহর প্রতি, তাঁর ফিরিশতাগণের প্রতি, কিয়ামাতের দিন তাঁর সঙ্গে সাক্ষাতের প্রতি এবং তাঁর রাসূলের প্রতি। আপনি আরও বিশ্বাস রাখবেন পুনরুত্থানের প্রতি।' [বুখারী/৪৮, তিরমিযী/২৬১১]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঈমানের শাখা সত্তরটির কিছু বেশি অথবা ষাটটির কিছু বেশি। এর সর্বোচ্চ শাখা হচ্ছে আল্লাহ ব্যতীত কোন ইলাহ নেই এ কথা স্বীকার করা, আর এর সর্বনিম্ন শাখা হচ্ছে রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু অপসারণ করা। আর লজ্জা ঈমানের একটি শাখা। [মুসলিম/৬০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), আবূ দাউদ/৪৬০৩, তিরমিযী/২৬১৫, বুখারী/৮]

ঈমান বিনষ্টকারী কু-সংস্কারসমূহ

প্রথা ও রেওয়াজের ভিত্তিতে যে সব কাজ করা হয় এবং যা শারীয়াত অনুমোদিত ও সমর্থিত নয় এরূপ কাজকে কু-সংস্কার বলা হয়। কু-সংস্কার সমাজ ও জাতির জন্য মারাত্মক ব্যাধি। একে পরিত্যাগ করা অপরিহার্য। কিন্তু আমাদের সমাজ, সভ্যতা, সংস্কৃতি, বিবাহ-শাদী, আচার-অনুষ্ঠান তথা জীবনের বিভিন্ন ক্ষেত্র নানা ধরনের কু-সংস্কারে আচ্ছন্ন। এর মূলে রয়েছে ইসলামী দীনী শিক্ষা, ইয়াকীন এবং তদনুযায়ী আমলের অভাব।

১। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চায় কক্ষনো তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্থদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

২। সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করনা। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। [সূরা মায়িদা-২]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষ (দুনিয়ায়) যে যাকে ভালবাসবে, (আখিরাতে) সে তারই সঙ্গী হবে। [বুখারী/৫৭২৮]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন জাতির অনুসরণ-অনুকরণ করবে, সে তাদের দলভুক্ত হবে। [আবূ দাউদ/৩৫১২]

সমাজে প্রচলিত ইসলাম বিনষ্টকারী কুসংস্কারসমূহ ঃ

ক) খাওয়া দাওয়ায় কু-সংস্কার ঃ

• ইংরেজদের শিখিয়ে যাওয়া নিয়মে বাম হাত দিয়ে খাবার খাওয়া, পানি, চা ইত্যাদি পান করা • নজর লাগবে বলে সামান্য খাবার ফেলে দিয়ে খাওয়া শুরু করা। • খাবার সময় সালাম দেয়া বা নেয়া যাবেনা বলে মনে করা • প্লেটের সম্পূর্ণ খাবার শেষ না করে তথাকথিত ভদ্রতার নামে কিছু রেখে দেয়া • খাবার সময় জিহ্বায় কামড় লাগলে কেহ তাকে গালি দিয়েছে ও কাশি/হাঁচি দিলে কেহ তাকে স্মরণ করেছে বলে মনে করা ইত্যাদি।

খ) মেয়েদের কু-সংস্কার ঃ

• হিন্দু নারীদের ন্যায় কপালে টিপ লাগানো, পায়ে আলতা ব্যবহার • প্রথম সন্তান মেয়ে হলে মন খারাপ করা • প্রথম সন্তান গর্ভধারণের সপ্তম মাসে সাতাশা করা, কোন কোন এলাকায় গর্ভধারণের পর বাধ্যতামূলকভাবে মেয়েদের বাড়ি থেকে ছেলেদের বাড়িতে বিভিন্ন খাদ্য সামগ্রী পাঠানো।

• গর্ভবতী হওয়ার পর সুন্দর বাচ্চার ছবি টানিয়ে রাখা হয়, ঐ ছবি দেখলে বাচ্চা সুন্দর হবে ধারণা করা • গর্ভবতী অবস্থায় কোন কিছু খেতে ইচ্ছা করলে তা না খেলে বাচ্চার লালা পড়বে বলে ধারণা করা • অবিবাহিতা মেয়েদের পর্দাকে অপরিহার্য মনে না করা • গর্ভাবস্থায় সূর্য-চন্দ্র গ্রহণ লাগা দেখলে সন্তান পঙ্গু হবে বলে মনে করা • চোখ না লাগার জন্য বাচ্চার কপালে কালো টিপ দেয়া ইত্যাদি।

গ) বিয়ে-শাদীতে কু-সংস্কার ঃ

• রজব মাসসহ কোন কোন মাসে বিয়ে অনুষ্ঠান না করা • সবার সামনে বর কনেকে সালাত আদায় করানো • কনিষ্ঠ আঙ্গুলি দ্বারা বর-কনে পরস্পর পরস্পরকে ভাতের দানা খাওয়ানো • বরের ঝুঠা বা এঁটে ভাত নিয়ে কনেকে খাওয়ানো • বর ও কনে একে অপরের সাথে মালা বদল করা • গেট ধরে বরের জুতা খুলিয়ে টাকা-পয়সা নেয়া • সিংহাসন বানিয়ে তাতে বরকে বসিয়ে টাকা আদায় করা • গায়ে হলুদের নামে (বিয়ের আগের দিন) নারী পুরুষ একসঙ্গে গায়ে হলুদ মাখানো • বরকে ভাবীদের দ্বারা হলুদ মাখানো ও গোসল দেয়া • স্ত্রীকে নগদ মহোরানা না দিয়ে ইচ্ছাকৃত বাকী রাখা • যৌতুক দাবী করা ও নেয়া • বিয়ে করতে যাওয়ার আগে বরকে পিঁড়িতে দাঁড় করানো, দৈ-ভাত খাওয়ানো, বরের মাথায় হাত দিয়ে মার শপথ করা • গায়ে হলুদের নামে অনুষ্ঠান করে বরের কপালে নারীরা, কনের কপালে পুরুষরা হলুদ লাগানো ও মিষ্টি খাওয়ানো ইত্যাদি।

ঙ) দিবস পালনের নামে কু-সংস্কার ঃ

• জন্মদিবস, মৃত্যু দিবস, ম্যারিজ ডে (বিয়ে দিবস), ভালবাসা দিবস, ১লা বৈশাখ, বসন্ত দিবস, এপ্রিল ফুল দিবস উৎযাপন করা • বিভিন্ন দিবসে কাবরে ও স্মৃতিস্তম্ভে ফুল দেয়া, খালি পায়ে হেঁটে সেখানে গিয়ে নীরবতা পালন করা ও শপথ নেয়া • নতুন বর্ষ শুরু উপলক্ষ্যে পটকা/বোমা ফাটানো ও আতশবাজি করা ইত্যাদি।

চ) দোকানে কু-সংস্কার ঃ

• বছরের প্রথম দিন ক্রেতাকে বাকি না দেয়া • সকালে ও সন্ধ্যার সময় বাকী না দেয়া • প্রথম ক্রেতাকে বাকী না দেয়া • সকাল সন্ধ্যায় নিয়ম করে আগরবাতি জ্বালানো ও পানি ছিটানো • বিক্রয় বৃদ্ধির আশায় মন্দিরের ন্যায় মাসজিদের পানি এনে ছিটানো • সব সময় ক্যাশ খালি না রেখে কিছু না কিছু টাকা-পয়সা রাখা • ক্রেতার সাথে প্রয়োজনে বিক্রির জন্য মিথ্যা বলা জায়েয মনে করা ইত্যাদি।

ছ) ছেলেদের ফ্যাশনে কু-সংস্কার ঃ

• ইয়াহুদী, খৃস্টান ও মুশরিকদের অনুকরণে ছেলেদের কান ছিদ্র করা ও তাতে দুল পরা • হাতে বালা ও স্বর্ণের চেইন পরা • গলায় চেইন পরা • টাইট প্যান্ট পরা • টাখনুর নিচে প্যান্ট পরা • মেয়েদের মত ছেলেদের চুল রাখা • ছবিযুক্ত কাপড় পরা ইত্যাদি।

জ) মেয়েদের ফ্যাশনে কু-সংস্কার ঃ

• কপালে ফোটা বা টিপ লাগানো • ছেলেদের মতো চুল রাখা ও কাটা • পাতলা কাপড় পড়া • গেঞ্জি, শার্ট, প্যান্ট, স্কার্ফ, চিকন ওড়না ও টাইট ফিটিং কাপড় পরিধান করা • পরচুলা বা আলগা খোপা লাগানো, মাথার উপরে মোরগের লেজের মত করে খোপা বাধা • সিনেমা ও নাটকের নায়িকার অনুকরণে কাপড় পরিধান করে বেপর্দায় থাকা • যৌবনে পর্দা করা জরুরী নয় মনে করা ইত্যাদি।

ঝ) ধর্মের নামে কু-সংস্কার ঃ

• কাবরের উপর বাতি জ্বালানো • অলী নামধারী লোকদের মাজারের উপর গম্বুজ তৈরী করা • কামনা-বাসনা পূরণের জন্য মাজারে যাওয়া এবং পানি ও খিচুরী খাওয়া • মাজারের সূতা বা মালা গলায় কিংবা হাতে পরা • কাবর পাকা করা • শবে মিরাজের রাতে বিশেষ ইবাদাত করা • ইসালে সাওয়াবের জন্য রবিউল আউয়াল মাসকে নির্দিষ্ট করা • উরশ পালন করা • মীলাদ ও কিয়াম করা • মাজারে মানত করা ও ফকীরের কাছে ধর্ণা দেয়া ও টাকা দেয়া • পীরের মুরীদ হওয়া বা বাইয়াত নেয়া • ফারয সালাতের পর সম্মিলিতভাবে হাত তুলে মুনাজাত করা • ঈদে মিলাদুন্নাবী পালন করা • শবে বরাত পালন করা • তাবীজ/কবজ ব্যবহার করা ইত্যাদি।

ঞ) রাষ্ট্রীয় কু-সংস্কার ঃ

• মৃত ব্যক্তির জন্য কিছুক্ষণ চুপ করে দাঁড়িয়ে থাকা • অধিকারের নামে নর-নারীর অবাধে মেলামেশা ও কাজকর্ম করা • শিক্ষা প্রতিষ্ঠানে ধর্মহীন শিক্ষা ব্যবস্থা ও সহশিক্ষা চালু রাখা • সুদ ভিত্তিক অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালু রাখাও হারাম ইত্যাদি।

ট) সফর বা যাত্রাকালে কু-সংস্কার ঃ

• যাত্রার সময় পিছন থেকে না ডাকা • শুরুতে বাধাগ্রস্ত হলে যাত্রা অশুভ ভাবা ইত্যাদি।

ঠ) পরীক্ষা সংক্রান্ত কু-সংস্কার ঃ

• পরীক্ষার দিন অথবা পরীক্ষা দিতে যাওয়ার আগে ডিম, মিষ্টি ইত্যাদি গোল জাতীয় খাবার না খাওয়া • কলমে ফুঁ দিয়ে নিয়ে যাওয়া • পরীক্ষায় পাস করার জন্য তাবীজ নেয়া ইত্যাদি।

ড) দিন নিয়ে কু-সংস্কার ঃ

• শনিবার দিন কোথাও যাওয়া ঠিক নয় তাতে অমঙ্গল হবে মনে করা • শনিবার নতুন বউকে মায়ের বাড়িতে যেতে না দেয়া • রবিবার ও বৃহস্পতিবার বাঁশ বাগানে বাঁশ না কাটা ইত্যাদি।

ঢ) মৃত ব্যক্তিকে কেন্দ্র করে কু-সংস্কার ঃ

• মৃত ব্যক্তির রূহ চল্লিশ দিন পর্যন্ত বাড়িতে আসে বিশ্বাস রাখা • মাজারে উরশে দান করা • মৃত ব্যক্তির নামে চল্লিশা করা, মৃত ব্যক্তির নামে কুলখানী করা, খাবার বিতরণ করা • মৃত ব্যক্তির জন্য কাবর পাকা করা ও স্মৃতি স্তম্ভ তৈরী করা • জানাযা নিয়ে যাওয়ার সময় উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌র করা • মৃতের সামনে চিৎকার করে কাঁদা ও কাপড় ছিঁড়া • বাৎসরিক অনুষ্ঠান পালন করা, উক্ত দিনগুলোতে মীলাদ মাহফিলের আয়োজন করা • মৃত দেহের সামনে কুরআন তিলাওয়াত করা • খাতমে কুরআন পড়ানো ইত্যাদি।

ণ) ছোট বাচ্চাদের নিয়ে কু-সংস্কার ঃ

• সন্তান জন্মের পর তার বিছানার নিচে উক্ত সন্তানের মামার পায়ের চামড়ার জুতার টুকরা, লোহা জাতীয় জিনিস ও শুকনো মরিচ ইত্যাদি রাখা, নজর লাগবে বলে কপালে, পায়ে কাজলের ফোটা দেয়া • বাচ্চারা যদি ঘর বা বারান্দা ঝাড় দেয় তাহলে মেহমান আসবে বলে মনে করা • বাচ্চাদের গায়ে লাঠি বা ঝাড়ুর ছোঁয়া লাগলে জ্বর আসবে মনে করা এবং পায়ে পানি ছিটিয়ে দেয়া • ভয় পেলে লবণ পানি খাওয়ানো • বাচ্চাদের টপকে বা ডিঙিয়ে গেলে আর লম্বা হবেনা মনে করা • বাচ্চাদের মন ভোলানোর জন্য মিথ্যা বলা বা মিথ্যা প্রতিশ্রুতি দেয়া ইত্যাদি।

ত) যৌবনে কু-সংস্কার ঃ

• অপরিচিত নর-নারী একে অপরের সাথে প্রয়োজন ব্যতীরেকে টেলিফোনে আলাপ করা, বন্ধুত্ব করা, ঘুরাফিরা করা, আড্ডা দেয়া, ঠাট্টা-মশকরা করা ইত্যাদি।

থ) রাজনৈতিক কু-সংস্কার ঃ

• রাজনীতিতে মিথ্যা বলতে হয় মনে করা।

দ) বাড়িতে কু-সংস্কার ঃ

• ঘরে ও বারান্দায় ছবি লটকানো • সো পিচের মধ্যে মূর্তি সাদৃশ্য প্রাণী সাজিয়ে রাখা • সালাম না দিয়ে বা অনুমতি না নিয়ে বাড়ি কিংবা ঘরে প্রবেশ করা • অন্যের ব্যাঘাত সৃষ্টি করে রেডিও, টিভি, টেপ রেকর্ডার বাজানো ইত্যাদি।

ধ) সংস্কৃতির নামে কু-সংস্কার ঃ

• যুগ ও মনের প্রয়োজনের দোহাই দিয়ে নাচ-গান, বাদ্য-বাজনা, মডেলিং, ফ্যাশন, র‍্যাগডে, নাটক, বর্ষবরণ, বসন্তবরণ, রাখিবন্ধন, মঙ্গল প্রদীপ জ্বালানো ইত্যাদি প্রয়োজন মনে করা।

ন) নাম নিয়ে কু-সংস্কার ঃ

• আধুনিকতা বা আঞ্চলিকতার নামে ছেলে-মেয়েদের নাম তথা ছেলেদের- সান্টু, মন্টু, মিন্টু, নান্টু, পিন্টু, রিন্টু, ঝন্টু, লাল্টু, বল্টু, পল্টু, টিটু, বাপ্পি, অপু, তপু, কালা, ভোলা, রুপু, স্বপন, চঞ্চল, আকাশ, প্রিন্স, বাবন, সুমন, রুমন, নিপন, বিপুল, বিপ্লব, জেমস্, টমাস এবং মেয়েদের- চম্পা, ডেজী, লিলি, বিউটি, লাভলী, মিমি, জসি, শিল্পী, হ্যাপি, পপি, ময়না, কেয়া, ডলি, বেবী, রেবা, সুইটি, রিতা, পাখি, ডায়না, প্রিয়াংকা, বন্যা, বাসন্তী, ড্যানী ইত্যাদি নাম রাখা।

প) বিবিধ কু-সংস্কার ঃ

• আত্মীয়স্বজন ও গুণীদের পা ছুয়ে সালাম করা (কদমবুসি) • পুরুষদের টাখনুর (পায়ের গিরা) নিচে কাপড় পড়া • ঘুম থেকে উঠে অমুকের মুখ না দেখা • ভাগ্য সম্পর্কে জানার জন্য জ্যোতিষীকে হাত দেখানো • জ্যোতিষী বা কারো ভবিষ্যৎ বাণী বিশ্বাস করা • বাজী ধরা • পেঁচা ডাকলে বিপদ আসন্ন মনে করা • দাঁড়িয়ে প্রস্রাব করা ইত্যাদি।

ফ) শরীরের অঙ্গ প্রত্যঙ্গের বিভিন্ন চিহ্ন নিয়ে কু-সংস্কার ঃ

• পায়ে তিল থাকলে বিদেশে যাবার সুযোগ হয় মনে করা • ঘাড়ে তিল থাকলে তার মৃত্যু জবাইয়ের মাধ্যমে হয় • ঠোঁটের নিচে ও কানের নিচে তিল থাকলে অমঙ্গল হয় • চোখ ট্যারা থাকলে ভাগ্যবান হওয়া মনে করা • নাক বোচা থাকলে বেশি করে বিয়ের প্রস্তাব আসে মনে করা • মেয়ের চেহারা বাবার মত হলে ভাগ্যবান হবে বলে মনে করা • হাত চুলকালে টাকা আসবে মনে করা ইত্যাদি।

ঈমান (আমার/আপনার) কতটুকু মযবুত?

১। আর তুমি অন্ধকেও তাদের গুমরাহী থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সৎপথ দেখাতে পারবেনা। তুমি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, কাজেই তারা আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নামল-৮১]

২। লোকেরা কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' **বললেই তাদেরকে অব্যাহতি** দিয়ে দেয়া হবে, আর তাদেরকে **পরীক্ষা করা হবেনা?** [সূরা আনকাবূত-২]
৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে **অংশী স্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই** জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, **আর তার আবাস হল জাহান্নাম**। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা মায়িদা-৭২]
৪। তাঁর অভিমুখী হও, **আর তাঁকে ভয় কর। সালাত প্রতিষ্ঠা কর,** আর মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। [সূরা রূম-৩১]
৫। যারা নিজেদের **দীনকে বিভক্ত করে ফেলেছে এবং বিভিন্ন দলে ভাগ হয়ে গেছে,** প্রত্যেক **দল নিজেদের কাছে যা আছে তাই নিয়ে উৎফুল্ল**। [সূরা রূম-৩২]
৬। নিশ্চয়ই **আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেননা। এ ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন** এবং যে **আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ** আরোপ করল। [সূরা নিসা-৪৮]
৭। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেননা, এ ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে, সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল। [সূরা নিসা-১১৬]
৮। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি শারীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখে এবং সে তার হাত দিয়ে বাধা দিতে সক্ষম হয় তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখের কথা দিয়ে প্রতিবাদ করবে। এতেও যদি সে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে তা অপছন্দ করে। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতর স্তর। [ইব্‌ন মাজাহ/৪০১৩-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), তিরমিযী/২১৭৫]

◳ ঈমান আনলেই যদি জান্নাত পাওয়া যেত তাহলে ইবলীস জান্নাত ছাড়া হল কেন? চিরকাল জাহান্নামে থাকবে কেন, কাফির হল কেন এবং অভিশাপ প্রাপ্ত হল কেন? আদমকে (আঃ) শুধু একটা সাজদাহ না দেয়ার জন্য? দিনে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে (নামাযে) মোট ফারয ১৭ রাক'আত। এই ১৭ রাক'আত সালাতে সাজদাহ হল ৩৪টি। একদিন যদি সালাত আদায় করা না হয় তাহলে ৩৪টি সাজদাহ করার আদেশ অমান্য করা হল। বলুন তো, কাফির হতে আর কতটা সাজদাহর আদেশ অমান্য করা প্রয়োজন?

ইবলীস কি আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেনি? সে কি আল্লাহকে দেখেনি? তাহলে তার এই দশা কেন? যারা সালাত আদায় করেনা তাদের ঈমান আনায় কোন ফল হবেনা, আল্লাহর আদেশ মানতে হবে। মুখে ঈমান আনলাম, সারা জীবন (সিয়াম) রোযা পালন করলামনা, সালাত আদায় করলামনা, অসংখ্য বিদ'আত যেমন মিলাদ, শবে বরাত, উরশ, নির্দেশ বহির্ভূত স্থানে বা সময়ে হাত তুলে মুনাজাত, উচ্চঃস্বরে যিক্‌র, ঈদে মিলাদুন্নাবী ইত্যাদি করে বিদ'আতী হলাম, ধর্মের মধ্যে মতান্তরের সৃষ্টি করে বিভিন্ন দলে বিভক্ত হলাম। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের পরিপন্থী আমল বা ইবাদাত করলাম, আর বুক ফুলিয়ে বললাম ঃ "আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যখন ঈমান এনেছি, তখন আমার নসীব থেকে জান্নাত ঠেকায় কে?

অস্পষ্ট বিষয়, মতভেদী বিষয় ও অনুমানের উপর নির্ভর করে কোন আমল করা বৈধ নয়। আমল করতে হবে আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর সুস্পষ্ট নির্দেশনার বিষয়ের উপর। যেমন (ক) অশ্লীল কাজ করেছেন? আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাওয়ার জন্য বেশি করে ফারয ও নাফল সালাত আদায় করুন। (খ) আল্লাহর সন্তুষ্টি অর্জন করবেন ? বেশী করে যাকাত ও দান করুন। (গ) ভুল করেছেন? তাওবা-ইস্তিগফার করুন। (ঘ) মুত্তাকী হবেন, জান্নাতে যেতে চান? ফারযসহ বেশী করে নাফল সিয়াম (রোযা) পালন করুন। (ঙ) অতীতের পাপ মোচন করবেন? তাহলে হাজ্জ পালন করুন। (চ) দীন শিখবেন? কুরআন ও সহীহ হাদীস পাঠ করুন। (ছ) নাজাতের অসীলা চাচ্ছেন? আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) এর নির্দেশিত ভাল কাজের অসীলা বানান এবং আল্লাহকে ডাকেন, নিজেই ডাকেন, আল্লাহ শুনবেন, কোন মাধ্যম ধরে ডাকা আল্লাহর কাছে পছন্দনীয় নয়। এ বিষয়ে দেখুন সূরা ইউনুস-১৮ নং আয়াত।

ঈমান মযবূত রাখার জন্য মুসলিমদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর আমল করতে হবে এবং বিশ্বাস রাখতে হবে। কুরআন ও সহীহ হাদীসই প্রকৃত দীন।

⦿ আল্লাহ দীন-ইসলামকে পরিপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। [সূরা মায়িদা-৩]

⦿ ইসলামে অনুমানের কোন স্থান নেই, আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের কতক অনুমান পাপের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা হুজুরাত-১২]

উরশ

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

لَقَدْ كَانَ لَكُمْ فِي رَسُولِ اللّٰهِ أُسْوَةٌ حَسَنَةٌ لِّمَن كَانَ يَرْجُو اللّٰهَ وَالْيَوْمَ الْآخِرَ وَذَكَرَ اللّٰهَ كَثِيرًا

তোমাদের জন্য আল্লাহর রাসূলের মধ্যে উত্তম আদর্শ রয়েছে, যারা আল্লাহ ও শেষ দিনের আশা রাখে আর আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে। [সূরা আহযাব-২১]

২। যে ধন-সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিলেন তা আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য আর রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য, যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক, আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৪৩৪৩, ৪৩৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৪]

আল্লাহর দেয়া বিধানে ও শারীয়াতে উরশ জাতীয় অনুষ্ঠান কোথাও নেই। যদি শারীয়াতে উরশ থাকত তাহলে সাহাবাগণ (রাঃ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে উরশ করতেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবশ্যই পূর্ববর্তী নাবীগণের, বিশেষ করে ইবরাহীম (আঃ) এর উরশ অনুষ্ঠান পালন করতেন এবং আরাব ভূখন্ডে এখনও তা পালিত হত। এটা অবশ্যই প্রবৃত্তির অনুসারীদের আবিষ্কার। এই উরশ একটা বিদ'আত, ভ্রান্ত আকিদাহ। এটা অবৈধ পথে অর্থ রোজগারের পথ। অনেকে বলে, এটা শারীয়াত সম্মত উপায়ে পালন করা হয়। এটা কার শারীয়াত? আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) শারীয়াতে উরশ নেই।

শুধু উরশ নয়! অনেকের ঘরে ঘরে মিলাদ, উচ্চঃস্বরে যিক্‌র, ঈদে মিলাদুন্নাবী, জসনে জুলুস পালন করা হয়। কুরআন ও সহীহ হাদীসে এগুলি করার কোন নির্দেশ খুজে পাবেননা।

আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদেরকে এই উরশের অনুষ্ঠান করার হুকুম দেননি, তাই সাহাবাগণ (রাঃ) উরশ অনুষ্ঠান পালন করেননি। বিশ্বের সকল প্রান্ত থেকে মুসলিমগণ রাসূলের (সাঃ) কাবর জিয়ারাত করছেন, কিন্তু উরশ অনুষ্ঠান করছেননা। অতএব এ উরশ যিনি প্রচলন করেছেন, আপনারা আল্লাহর পরিবর্তে তার আনুগত্য করে চলছেন, যা স্পষ্ট শির্‌ক। আবার এ অনুষ্ঠানগুলি করা হয় সাওয়াবের আশায় যার সমর্থন কুরআন, সহীহ হাদীস বা সাহাবাগণের (রাঃ) আমলে নেই। সে জন্য এ অনুষ্ঠান বিদ'আতের অন্তর্ভুক্ত।

কুরআন ও হাদীসে কি নিত্য নতুন সমস্যার সমাধান নেই?

১। আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেহ তা অস্বীকার করেনা। [সূরা বাকারা-৯৯]

২। তারা কি দেখে না আমি তাদের জন্য যমীনকে চার দিক থেকে সংকীর্ণ করে আনছি? আল্লাহ হুকুম দেন, তাঁর হুকুম পিছনে ঠেলে দিবে এমন কেহ নেই। হিসাব গ্রহণের ব্যাপারে তিনি খুবই তৎপর। [সূরা রা'দ-৪১]

৩। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাবে কখনই তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

৪। আর সে মনগড়া কথাও বলেনা। তাতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নাজম-৩, ৪]

৫। আজ তোমাদের জন্য তোমাদের দীন পূর্ণাঙ্গ করলাম, তোমাদের প্রতি আমার অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করলাম এবং ইসলামকে তোমাদের জন্য দীন হিসাবে মনোনীত করলাম। তবে কেহ পাপের দিকে না ঝুঁকে ক্ষুধার তাড়নায় আহার করতে বাধ্য হলে সেগুলি খাওয়া তার জন্য হারাম হবেনা। কারণ নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল ও দয়ালু। [সূরা মায়িদা-৩]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সূরা আলে ইমরান-১৩৮, হিজর-১, আন'আম-৩৮, ১১৪, শু'আরা-১৯৫, যুমার-২৮, যুখরুফ-২, আ'রাফ-৩, নিসা-৪৮, ১১৬, কিয়ামাহ-১৯, মায়িদা-৬৭।

৭। হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ হে কুরআন পাঠক সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হিদায়াত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে। [বুখারী/৬৭৭২]

◻ বর্তমান সমাজের কিছু আলেম বলেন ঃ কুরআন ও সুন্নাহর ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ করে সৎ পথের সন্ধান পেতে চাইলে সৎ পথের চেয়ে পথ ভ্রষ্ট হওয়ার সম্ভাবনাই বেশী থাকবে। দীন থেকে লোকদেরকে বিমুখ করার জন্য তারা বলে ঃ তোমরা কুরআন ও হাদীস ভাল বুঝবেনা, আলেমরা যে সব ধর্মের কথা বলবে সেগুলোকে অনুসরণ করবে। দীনকে ধ্বংস করার এরূপ আচরণ সমাজে চলছে। মানব জীবনে নিত্য-নতুন সমস্যার যে উদ্ভব হবে এটা মহান আল্লাহ তা'আলা না বুঝেই কি ঘোষণা করলেন ‘‘আজ তোমাদের দীনকে আমি পরিপূর্ণ করে দিলাম”? রাসূল সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম সর্বশেষ নাবী এবং কিয়ামাত পর্যন্ত আর কোন নাবী পাঠাবেননা বলেও জানিয়ে দিলেন। এ অমোঘ বাণী যারা অবিশ্বাস করে তারাই এরূপ কথা বলতে পারে যে, মানব জীবনে বহু নিত্য-নতুন সমস্যার উদ্ভব হতে থাকবে, যার সমাধান কুরআন ও সুন্নাহর প্রকাশ্য আয়াতে স্পষ্টভাবে প্রতীয়মান হয়নি। আল্লাহ আমাদের ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে রক্ষা করুন। (আমীন)

কুরআন থেকে মুসলিমের দূরত্ব কত দূর?

১। এ সূরা অবতীর্ণ হওয়ার সময় আল্লাহর রাসূল (সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তা মুখস্থ করার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়লে আল্লাহ অভয় দিয়ে বললেন ঃ তুমি তাড়াতাড়ি অহী আয়ত্ত করার জন্য তোমার জিভ নাড়াবেনা। এর সংরক্ষণ ও পড়ানোর দায়িত্ব আমারই। কাজেই আমি যখন তা পাঠ করি, তখন তুমি সে পাঠের অনুসরণ কর। অতঃপর তা বিশদভাবে ব্যাখ্যা করা আমারই দায়িত্ব। [সূরা কিয়ামা-১৬-১৯]

২। তারা কি কুরআন সম্বন্ধে গভীরভাবে চিন্তা করেনা, নাকি তাদের অন্তরে তালা দেয়া আছে? [সূরা মুহাম্মাদ-২৪]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ সূরা কামার-৩২।

৪। সামুরা ইব্ন জুনদুব (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু ‘আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ গত রাতে আমি স্বপ্নে দেখলাম দু'জন লোক এসে আমার দু'হাত ধরে আমাকে পবিত্র ভূমির দিকে নিয়ে চললো। আমরা চলতে চলতে চিৎ হয়ে শায়িত এক ব্যক্তির পাশে এসে উপস্থিত হলাম। তার শিয়রে পাথর হাতে এক ব্যক্তি দাঁড়িয়ে তা নিক্ষেপ করে তার মাথা চূর্ণ করে দিচ্ছিল। নিক্ষিপ্ত পাথর দূরে গড়িয়ে যাওয়ার ফলে তা তুলে এনে শায়িত ব্যক্তির নিকট ফিরে আসার পূর্বেই চূর্ণিত মাথা পূর্ববৎ জোড়া লেগে যাচ্ছিল। সে পুনরায় মস্তকোপরি

পাথর নিক্ষেপ করছিল। আমি প্রশ্ন করলে তারা বলল ঃ আপনি যার মাথা চূর্ণ করতে দেখলেন সে ঐ ব্যক্তি যাকে আল্লাহ কুরআন শিক্ষা দান করেছিলেন, কিন্তু রাতের বেলায়ও সে কুরআন থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করে নিদ্রা যেত এবং দিনের বেলায়েও কুরআন অনুযায়ী আমল করতনা। তার সাথে কিয়ামাত পর্যন্ত এমনই আচরণ চলতে থাকবে। [বুখারী/১২৯৮]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এটা খুবই খারাপ কথা যে, তোমাদের মধ্যে কেহ বলবে, আমি কুরআনের অমুক অমুক আয়াত ভুলে গেছি। বরং তাকে ভুলিয়ে দেয়া হয়েছে। সুতরাং তোমরা কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক। কেননা তা মানুষের অন্তর থেকে উটের চেয়েও দ্রুত বেগে চলে যায়। [বুখারী/৪৬৫৪-আবদুল্লাহ (রাঃ)]

কুরআনে ১১৪টি সূরা নাযিল হয়েছে জিবরাঈল (আঃ) এর মাধ্যমে। এ পৃথিবীতে কুরআন এসেছে বহুদূর পথ অতিক্রম করে, যে পথের দূরত্ব কত কোটি কোটি মাইল এখনো নভবিজ্ঞানীরা তা নির্ণয় করতে পারেনি। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রথম আসমান থেকে এ দুনিয়ার দূরত্ব ৫০০ বছরের রাস্তা, আর প্রতি আসমানের দূরত্বও অনুরূপ। তারপর সিদরাতুল মুনতাহা। এরপর মহান প্রভুর বিশাল আরশ। আর সেখানের লাওহে মাহফুজ থেকে একটি একটি করে এল ১১৪টি সূরা এ যমীনের সৃষ্টি সেরা মানুষের জন্য। আল্লাহর কি অসীম রাহমাত। এত বড় মর্যাদাপূর্ণ পবিত্র আয়াত যার প্রতিটি হরফ উচ্চারণে দশটি সাওয়াব, আর যে গ্রন্থে আছে মানব কল্যাণের অফুরন্ত ভান্ডার, তা কি কেবল বুক সেলফ বা তাকে তুলে রাখার জন্য? তাবিজ করে ঝাড়-ফুঁক করার জন্য? শাবীনা খতমের জন্য? মৃতের সাওয়াব রেসানীর জন্য? নাকি তারাবী খতমের জন্য? ⊙ অথচ কুরআন যাদের উদ্দেশে এলো তাদেরকে ডাক দিয়ে বলছে ঃ উপদেশ গ্রহণ করার কেহ আছে কি? [সূরা কামার-৩২] ⊙ তবুও তোমরা এ বাণীকে তুচ্ছ গণ্য করবে? [ওয়াকিয়াহ-৮১] কেমন কঠোর সর্তক বাণী। আজ এই মহাগ্রন্থ আল-কুরআনকে সত্যিই তুচ্ছ জ্ঞান করা হচ্ছে ইচ্ছাকৃতভাবে। মানুষের তৈরী সংবিধান লংঘন করলে শাস্তি দেয়া হয় আইন করে, আর সবার মালিক সৃষ্টিকর্তার প্রদত্ত সংবিধান আল-কুরআন লংঘন করলে কিছুই হয়না। উপরন্ত এ সংবিধান বাস্তবায়নের দাবী তুললে জেল, জরিমানা, নির্যাতন, উপহাস, ধিক্কার, যাতনা সহ্য করতে হয় মুসলিম নামক শাসকের নিকট হতে। কি আজব ব্যাপার! এ মহাগ্রন্থে যে চিন্তাশীলদের মূল্যবান খোরাক আছে তাও জানিয়ে দেয়া হল এভাবে ঃ ⊙ এতে অবশ্যই নিদর্শন আছে চিন্তাশীলদের জন্য। তোমরা কি অনুধাবন করবেনা । [সূরা যারিয়াত- ২১, সূরা জাসিয়া-৫]। ⊙ নিদর্শন রয়েছে চিন্তাশীলদের জন্য। তবুও কি তোমরা উপদেশ গ্রহণ করবেনা [সূরা হা মীম আস সাজদাহ-৪] ⊙ কেন তোমরা অনুধাবন করছ না? যদি তোমরা জানতে! [সূরা সাফফ-১১] ⊙ বিভ্রান্ত হয়ে কোথায় চলেছ? [সূরা মুনাফিকুন-৪]। এভাবেই আল-কুরআন মানুষের হৃদয়ের দুয়ার উম্মোচনের জন্য কতবার কতভাবে অনুপ্রেরণা সৃষ্টি করেছে। এই কুরআন পর্বতের উপর

অবতীর্ণ হলে তা স্রষ্টার ভয়ে বিদীর্ণ হয়ে যেত। অথচ মানব হৃদয় এমন শক্ত/কঠিন যে তা গলেনা। যদি বলা হয় আল-কুরআনে কি আছে? তাহলে কুরআন থেকেই উত্তর মিলবে ঃ ⊙ আমি আত্মসমর্পণকারীদের জন্য প্রত্যেক বিষয়ে স্পষ্ট ব্যাখ্যা স্বরূপ, পথ নির্দেশ, দয়া ও সুসংবাদ স্বরূপ তোমার প্রতি এ কিতাব অবতীর্ণ করলাম। [সূরা নাহল-৮৯]

তাহলে আল-কুরআনে কি নেই? সবই আছে।

কুরআনের উপর ঈমান আনা

১। তিনিই তোমার প্রতি গ্রন্থ অবতীর্ণ করেছেন যাতে সুস্পষ্ট আয়াতসমূহ রয়েছে - ওগুলি গ্রন্থের জননী স্বরূপ এবং অন্যান্য আয়াতসমূহ অস্পষ্ট; অতএব যাদের অন্তরে বক্রতা রয়েছে, ফলতঃ তারাই অশান্তি সৃষ্টি ও ব্যাখ্যা বিশ্লেষণের উদ্দেশে অস্পষ্টের অনুসরণ করে; এবং আল্লাহ ব্যতীত ওর অর্থ কেহই অবগত নয়, আর যারা জ্ঞানে সুপ্রতিষ্ঠিত তারা বলে ঃ আমরা ওতে বিশ্বাস করি, সমস্তই আমাদের রবের নিকট হতে সমাগত এবং জ্ঞানবান ব্যতীত কেহই উপদেশ গ্রহণ করেনা। [সূরা আলে ইমরান-৭]

২। কোন মিথ্যা এতে অনুপ্রবেশ করবেনা। অগ্র হতেও নয়, পশ্চাত হতেও নয়। এটা প্রজ্ঞাবান, প্রশংসনীয় আল্লাহর নিকট হতে অবতীর্ণ। [সূরা ফুসসিলাত-৪২]

৩। যাদের নিকট কুরআন আসার পর উহা প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে কঠিন শাস্তি দেয়া হবে। এটা অবশ্যই এক মহিমাময় গ্রন্থ। [সূরা হা মীম আস সাজদা-৪১]

৪। তবে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? নাকি ওদের অন্তর তালাবদ্ধ? [সূরা মুহাম্মাদ-২৪]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নাজম-২-৬, জাসিয়া-৮-৯।

⧉ কুরআনুল কারীমে এবং সহীহ হাদীসে করুণাময় আল্লাহর যে সব গুণ বর্ণিত হয়েছে সেগুলির প্রতি ঈমান আনা অপরিহার্য। সেগুলিকে সর্বান্তকরণে মেনে নেয়া আবশ্যক। সেগুলিকে প্রত্যাখ্যান করা, অপব্যাখ্যা করা, সাদৃশপূর্ণ মনে করা এবং কোন প্রকার তুলনা করা থেকে বিরত থাকা জরুরী।

এ সম্পর্কে কোন বিষয় বুঝতে কষ্ট হলে বা অস্পষ্ট মনে হলে হাদীসের ব্যাখ্যা গ্রহণকারী বিষয়টিকে তাঁর প্রবক্তার (আল্লাহর) এবং বিষয়টির দায় দায়িত্বের বর্ণনাকারী নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর ন্যস্ত করা উচিত। এ বিষয়ে যারা ইল্‌ম ও জ্ঞানের ক্ষেত্রে সুদৃঢ়তা ও পরিপক্কতা অর্জন করেছেন সে সকল আলেমগণের পথ অনুসরণ করব।

কুরআন আল্লাহর বাণী

১। ইহা কোন কবির রচনা নয়; তোমরা অল্পই বিশ্বাস কর। [সূরা হাক্কাহ-৪১]

২। মিথ্যা না এর সামনে দিয়ে আসতে পারে, আর না এর পিছন দিয়ে। এটি অবতীর্ণ হয়েছে মহাজ্ঞানী, সকল প্রশংসার যোগ্য'র (আল্লাহ) পক্ষ হতে। [সূরা হা মীম আস সাজদাহ-৪২]

৩। **বল** ঃ এ কুরআনের মত একটি কুরআন আনার জন্য যদি **সমগ্র মানব আর জিন** একত্রিত হয় তবুও তারা তার মত আনতে পারবেনা, যদিও তারা **পরস্পর** পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। [সূরা বানী ইসরাইল-৮৮]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-২৩, ইউনুস-১৫, আনকাবূত-৪৯।

৫। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে ঐ ব্যক্তি সর্বোত্তম যে কুরআন শিখে এবং অন্যকে শিক্ষা দেয়। [বুখারী/৪৬৪৯]

☐ মহাগ্রন্থ আল কুরআন আল্লাহর বাণী। **ইহা আল্লাহ তা'আলার সুস্পষ্ট কিতাব,** মযবুত রশি এবং তার সরল সঠিক পথ, **বিশ্ব জগতের রবের নাযিল কৃত।** বিশ্বস্ত ফিরিশতা জিবরাঈলের (আঃ) মাধ্যমে **স্পষ্ট আরাবী ভাষায় রাসূলের** (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) উপর অবতীর্ণ হয়েছে। **ইহা সৃষ্ট নয়,** বরং নাযিলকৃত/অবতারিত। আল্লাহর নিকট থেকেই এসেছে, আবার সেখানেই প্রত্যাবর্তন করবে। আর কুরআন হচ্ছে ১১৪টি সুস্পষ্ট সূরা, আয়াত, অক্ষর এবং শব্দসমূহের নাম। যে ব্যক্তি উহা পাঠ করল, বুঝল ও আমল করল তার জন্য প্রতিটি অক্ষরের বিনিময়ে দশটি সাওয়াব দেয়া হবে। তার শুরু আছে এবং শেষও আছে। জিহ্বার সাহায্যে পাঠ করাও যায়। সমস্ত কুরআন মুখস্ত করা যায়, কান দ্বারা শোনা যায়, হাত দ্বারা লেখা যায়। কুরআনে দুনিয়া ও আখিরাতের সকল বিষয় সম্বন্ধে লিপিবদ্ধ আছে। অনুরূপভাবে তাতে সাধারণ ও বিশেষ নির্দেশাবলী এবং আদেশ ও নিষেধ সূচক আয়াতও রয়েছে।

মাসজিদের খতীব, ইমাম, আলেম, ওলামা ও বিত্তবানদের কিছু লোক ছাড়া অন্যেরা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত কাজকে নিষেধ করেনা

১। তারা মিথ্যা কথা শুনতে অভ্যস্ত, হারাম বস্তু খেতে অভ্যস্ত। অতএব তারা যদি তোমার কাছে আসে তাহলে তুমি তাদের মধ্যে মীমাংসা করে দাও, কিংবা তাদের ব্যাপারে নিলিপ্ত থাক, আর যদি তুমি তাদের থেকে নিলিপ্তই থাক তাহলে তাদের সাধ্য নেই যে, তোমার বিন্দুমাত্রও ক্ষতি করে। আর যদি তুমি বিচার-মীমাংসা কর তাহলে তাদের মধ্যে ন্যায়সঙ্গত বিচার করবে, নিশ্চয়ই আল্লাহ ন্যায় বিচারকদেরকে ভালবাসেন। [সূরা মায়িদা-৪২]

২। আর তুমি তাদের মধ্যে অনেককে দেখবে, দৌড়ে দৌড়ে পাপ, যুল্ম ও হারাম ভক্ষণে নিপতিত হচ্ছে; বাস্তবিকই তারা খুব মন্দ কাজ করছে। তাদেরকে আল্লাহওয়ালা এবং আলিমগণ পাপের বাক্য হতে এবং হারাম মাল ভক্ষণ করা হতে কেন নিষেধ করছেনা? তাদের এ অভ্যাস নিন্দনীয়। [সূরা মায়িদা-৬২, ৬৩]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নাহল-১১৫, হা মীম আস সাজদা-৩০, আলে ইমরান-১১০।

৪। তোমাদের মধ্যে কেহ যদি শারীয়াত বিরোধী কাজ হতে দেখে এবং সে তার হাত দিয়ে বাধা দিতে সক্ষম হয় তাহলে সে যেন তা হাত দিয়ে বাধা দেয়। যদি সে এতে সক্ষম না হয় তাহলে মুখের কথা দিয়ে প্রতিবাদ করবে। এতেও যদি

সে সক্ষম না হয় তাহলে সে যেন অন্তর দিয়ে তা **অপছন্দ করে**। আর এটাই হচ্ছে ঈমানের দুর্বলতর স্তর। [ইব্‌ন মাজাহ/৪০১৩-আবূ **সাঈদ খুদরী** (রাঃ), তিরমিযী/২১৭৫]

ক) বর্তমান সমাজের কু-সংস্কার যেন আবর্জনা ও ঘাস-**লতার মত**। জঙ্গল **পরিষ্কার** করার পর আবার তা দেখা দেয় যদি পরিষ্কার করার কাজটি অব্যাহত না রাখা যায়। বর্তমান একবিংশ শতকে সমাজে বহু পংকিলতা জমে গেছে। অহীর রোশনী সেই পঙ্কিলতা ভেদ করতে পারছেনা, তাই সমাজে দারুন অস্থিরতা বিরাজ করছে। বেহায়া, বেপর্দা, অশ্লীলতা ও উচ্ছৃংখলতা বন্যার পানির মত প্রতিটি ঘরে ঢুকছে। সুদ, ঘুষ, রাহাজানি, চুরি, ডাকাতি, সন্ত্রাসী, দালালী ঐ বন্যার সাথী। মদ, জুয়া, গাজা, ভাং, ফেনসিডিল, হিরোইন, পেথিডিন, তামাক, গুল, জর্দা, বিড়ি, সিগারেট প্রভৃতি নেশা জাতীয় দ্রব্য সেবনও সমাজে সব বয়সীদের মধ্যে বিদ্যমান। এই যে নৈতিকতার অবক্ষয় তা রোধ করার জন্য কুরআনের ধারকদেরকে কি এগিয়ে আসতে হবেনা? কোন মৌলভী সাহেব যখন গুল, জর্দা, তামাক সেবনে অভ্যস্থ হয়ে পড়েন তাহলে তিনি অন্যকে বিড়ি, সিগারেট, হুক্কা সেবন বন্ধ করার উপদেশ/খুৎবায় আলোচনা দিবেন/করবেন কিভাবে? কেননা তিনি প্রতিদিন তামাক জাতীয় দ্রব্য থেকে তৈরী জিনিস খাচ্ছেন। তাই ওগুলি বন্ধ করার পূর্বে নিজেদেরকে ঐ সব বদ অভ্যাস ত্যাগ করতে হবে।

খ) দলে দলে সমাজের লোক পীরের মাজারে ভাগ্য উন্নতির জন্য কামনা বাসনা নিয়ে যাচ্ছে। তাদের কাছে মৃত পীরের কিরামতি এত যে, জীবিতদের জন্যও যে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে। অথচ এই বিশ্বাসটুকুই মুশরিক হবার জন্য যথেষ্ট। এভাবে লোকেরা ঈমানকে যুল্‌ম দ্বারা কলুষিত করছে। আজ যদি মৌলভী সাহেব, ইমাম সাহেব এই ঘোষণা দেন যে মাজারে মানত, নাযর, কুরবানী, আর কামনা-বাসনা নিবেদনের জন্য যাওয়া যাবেনা এটা হারাম, তাহলে কি হবে? দারুন এক হৈ চৈ বেধে যাবে মাজার পূজারীদের দ্বারা। হ্যাঁ অবশ্যই এটা বাধবে। কেননা পূর্ব যুগেও নাবী ও রাসূলগণের বেলায়ও খায়েশ পূজারীদের দ্বারা এটা হয়েছে। প্রয়োজন কী এ মুহূর্তে? প্রচন্ড তাওহীদি চেতনার প্রসার ও প্রতিষ্ঠা।

গ) বহু দিন ধরে চলমান সমাজে যে সমস্ত শির্‌ক, বিদ'আতকে ইবাদাত হিসাবে সাওয়াবের আশায় ও পাপ ক্ষমার ভরসায় করা হচ্ছে তা বন্ধ করার উদ্যোগ নিলে মাসজিদের ইমাম বা খতীব সাহেবের যে আর্থিক ক্ষতি ও মর্যাদার হানি ঘটতে পারে তা নিম্নরূপ ঃ • মাসজিদের চাকুরীটা হারানোর সম্ভাবনা • মিলাদ বা ঈদে মিলাদুন্নাবী অনুষ্ঠানের দাওয়াত বন্ধ • ফাতিহাখানি, কুলখানি, লাখ কালেমা, চেহলামের দাওয়াত বন্ধ • মৃতের শিয়রে কুরআন পাঠ, জানাজা, দাফন অনুষ্ঠানের দাওয়াত বন্ধ • জন্ম বার্ষিকী, মৃত্যুবার্ষিকী অনুষ্ঠানের দাওয়াত বন্ধ • শাবীনা খতম, উরশ, ইসালে সওয়াবের দাওয়াত বন্ধ • বাপ, মা, মুরুব্বীদের কাবর জিয়ারাত করানো বন্ধ • খাৎনা, বিয়ে-তালাক, হিল্লা বিয়ে

অনুষ্ঠানের দাওয়াত বন্ধ • ঝাড়-ফুঁক, তাবিজ-কবজ, মাদুলীর ব্যবসা বন্ধ • মুহাররাম, শবে বরাত, শবে মিরাজ, আখেরী চাহার শোম্বা, ফাতিহায়ে ইয়াজদাহমের দাওয়াত বন্ধ • ওয়াজ নাসীহাত এর মাহফিলের দাওয়াত বন্ধ • দোকান, বাসা বা কোন যানবাহন, সড়ক ইত্যাদি উদ্বোধনী অনুষ্ঠানের দাওয়াত বন্ধ • যিক্‌র, হালকায়ে যিকরে দাওয়াত বন্ধ • চিল্লা, গাশ্‌ত, বিশ্ব ইজতিমা, জোড় ইজতিমা, আখেরী মুনাজাতের মেহনত বন্ধ • বাইআত প্রদানের ফাইদা বন্ধ • মুরিদ, খলীফা, পীর হওয়ার মওকা বন্ধ • এর পরিবর্তে যা লাভ হবে তা হল ঃ বিদ্রুপ, ভর্ৎসনা, গালি, কটুক্তি, সমালোচনা, ঈর্ষা ও হিংসার কোপানলে পতিত হওয়া • মৌলবাদী, গোঁড়া, আখ্যা পাওয়া •এবং সর্বোপরি আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের মাধ্যমে পরকালে অশেষ নি'আমাত সমৃদ্ধ জান্নাতের অধিকারী হওয়া। এতদসত্ত্বেও শির্‌ক ও বিদ'আত বন্ধের উদ্যোগ নেই বললেই চলে। অথচ শির্‌ক মানুষের আমল নষ্ট করে দেয় এবং বিদ'আত আমলকে কবূল হতে দেয়না, অর্থাৎ ফলাফল শূন্য।

কুরআনে প্রত্যেকটি বিষয়ে সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা আছে

১। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। [সূরা যুখরুফ-২]

২। ভূ-পৃষ্ঠে বিচরণশীল এমন কোন জীব নেই, আর দু' ডানাযোগে উড্ডয়নশীল এমন কোন পাখি নেই যারা তোমাদের মত একটি উম্মাত নয়। কিতাবে আমি কোন কিছুই বাদ দেইনি। অতঃপর তাদের রবের কাছে তাদেরকে একত্রিত করা হবে। [সূরা আন'আম-৩৮]

৩। আমিতো মানুষের জন্য এই কুরআনে সর্ব প্রকার দৃষ্টান্ত দিয়েছি। তুমি যদি তাদের নিকট কোন নিদর্শন হাজির কর তাহলে কাফিরেরা অবশ্যই বলবে ঃ তোমরাতো মিথ্যাশ্রয়ী। [সূরা রূম-৫৮]

৪। আমি তোমার প্রতি এ কিতাব নাযিল করেছি যা প্রত্যেকটি বিষয়ের সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা, সত্য পথের নির্দেশ, রাহমাত আর আত্মসমর্পণকারীদের জন্য সুসংবাদ স্বরূপ। [সূরা নাহল-৮৯]

৫। এবং আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, ফাসিক ছাড়া অন্য কেহ তা অস্বীকার করেনা। [সূরা বাকারা-৯৯]

৬। আবূ দারদা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম (কুরআন ও হাদীসের জ্ঞান) হাসিলের জন্য কোন রাস্তা অতিক্রম করে, আল্লাহ তাকে জান্নাতের রাস্তা- সমূহের একটি রাস্তা অতিক্রম করান। আর ফিরিশতারা 'তালেবে-ইল্‌ম বা জ্ঞান অন্বেষণকারীর জন্য তাদের ডানা বিছিয়ে দেন এবং আলেমের জন্য আসমান ও যমীনের সব কিছুই মাগফিরাত কামনা করে, এমনকি পানিতে বসবাসকারী মাছও তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে। [আবূ দাউদ/৩৬০২]

⧉ আল্লাহ শপথ করে বলেন ঃ কুরআন সুস্পষ্ট, কুরআনে কোন কিছুই বাদ দেননি, দীন ইসলামের সব কিছুই কুরআনে আছে। যারা ফাসেক, তারাই শুধু কুরআন

ও হাদীসে সব কিছুর সমাধান খুজে পাবেনা। বর্তমান সমাজের আলেমরা ফিকাহ শাস্ত্রের পূর্ণ জ্ঞান অর্জন না করা পর্যন্ত কুরআন ও হাদীস অনুশীলন করা থেকে বিরত থাকেন। ⊙ আলী (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং এই সহিফায় (হাদীসের পান্ডুলিফি) যা লিপিবদ্ধ আছে। এ ছাড়া অন্য এমন কিতাব নেই যা পাঠ করা যেতে পারে। [বুখারী/৬৭৮৯] অনেক আলেম পথভ্রষ্ট হওয়ার ভয়ে কুরআন অর্থসহ পাঠ করেনা। আলেমরা বলেন ঃ কুরআন পড়া, খতম দেয়া বড় ফাযীলাত এবং সাওয়াবের কাজ। তাই জনসাধারণ রামাযানে কুরআন খতম করেন । অর্থ ছাড়া কুরআন পড়ে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জানা যায়না। তাই কুরআন বুঝে আল্লাহর আদেশ-নিষেধ সম্পর্কে জেনে আমল করতে হবে-এটাই আল্লাহর হুকুম। কেননা কুরআন পাঠ করা নাফল ইবাদাত, কিন্তু কুরআনের আদেশ-নিষেধ মানা ফার্‌য। তাই কুরআনের অর্থ নিজ ভাষায় অবশ্যই বুঝতে হবে।

কুরআন ও সহীহ হাদীস শুধু মানতে হবে

১। বরং সীমা লঙ্ঘনকারীরা কোন জ্ঞান ছাড়াই তাদের খেয়াল-খুশির অনুসরণ করে; কাজেই আল্লাহই যাকে পথভ্রষ্ট করেন তাকে সৎপথ দেখাবে কে? তাদের কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা রূম-২৯]

২। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

৩। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেননা, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল। [সূরা নিসা-১১৬]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-১১৬, আরাফ-৩, নিসা-৪৮।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রতি আমি দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি, তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা যতক্ষণ পর্যন্ত এ দুটি জিনিস আঁকড়ে ধরে থাকবে। এ দু'টি জিনিস হল, আল্লাহর কিতাব (কুরআন) এবং আমার সুন্নাহ। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩]।

⧉ বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মুসলিমরা কুরআন ও সহীহ হাদীস অধ্যয়ন করেনা। দীন পরিচালনা ও সকল প্রকার ইবাদাতের ক্ষেত্রে কুরআন এবং হাদীসের সাথে ইজমা ও কিয়াসের ভিত্তিতে আমল করার পক্ষপাতি। মানুষের ইজমা ও কিয়াসকে মান্য করা উচিত নয়। দীনের কোন সমস্যার সমাধান কুরআন ও সহীহ হাদীসে স্পষ্টভাবে না পাওয়া গেলে সেটা ইবাদাত হিসাবে গণ্য হয়না। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন। অত্যন্ত

পরিতাপের বিষয় আল-কুরআনের বঙ্গানুবাদ এবং হাদীসে **রাসূলের বঙ্গানুবাদ** হাতে পাওয়া সত্ত্বেও অধিকাংশ বাংলা ভাষার লোক এগুলি যথেষ্ট **গুরুত্ব** দিয়ে পাঠ করছেনা। বরং তারা পাঠ করছে ঐ বাপ-দাদার আমল থেকে চলে আসা বাংলায় লেখা কিতাব মোকছেদুল মু'মিনীন, বেহেশতী জেওর, নেয়ামুল কুরআন, কাসাসুল আম্বিয়া এবং এ জাতীয় লেখা বই । এগুলির মধ্যে এমন মিথ্যা, বিভ্রান্তিকর, আজগুবী কথা লেখা আছে যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিপরীত, যা পাঠ করা সমীচীন নয়।

কুরআন, হাদীস অধ্যয়ন না করার পরিণতি ঃ

- মুসলিমদের মধ্যে প্রবেশ করেছে শিরক, বিদ'আত।
- অনেক ক্ষেত্রে বিলুপ্ত হয়ে পড়েছে হালাল, হারামের তারতম্য।
- উপেক্ষিত হচ্ছে ফারয-নাফলের পার্থক্য।
- ফারযের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে নাফল।
- হালালের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে হারাম।
- সুন্নাতের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে বিদ'আত।
- তাওহীদের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে শির্ক।
- সত্য, ন্যায় ও আদর্শের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে ব্যক্তি।
- সত্য সন্ধানের চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে পূজনীয় ব্যক্তি ও অন্ধ অনুকরণ।

কুরআন, হাদীস জানা-বুঝার চেয়ে প্রাধান্য পাচ্ছে সহজে সাওয়াব হাসিলের মানসিকতা। প্রাধান্য পাচ্ছে জ্ঞানের চাইতে অজ্ঞতা, আলোর চেয়ে অন্ধত্ব।

কুরআনের শিক্ষা ও ভাবধারা, লোকদের মধ্যে প্রচার করা ফারয

১। আর আল্লাহ যখন যাদেরকে গ্রন্থ প্রদান করা হয়েছে তাদের কাছ থেকে অঙ্গীকার গ্রহণ করেছিলেন যে, তারা নিশ্চয়ই এটি লোকদের মধ্যে ব্যক্ত করবে এবং তা গোপন করবেনা; কিন্তু তারা ওটা তাদের পশ্চাতে নিক্ষেপ করল এবং ওটা অল্প মূল্যে বিক্রি করল। অতএব তারা যা ক্রয় করেছিল তা নিকৃষ্টতর। [সূরা আলে ইমরান-১৮৭]

২। আর আমি যা নাযিল করেছি তার প্রতি ঈমান আন, যা তোমাদের নিকট আছে তার প্রত্যয়নকারী এবং তোমরাই তার প্রথম প্রত্যাখ্যানকারী হয়োনা এবং আমার আয়াতের বিনিময়ে সামান্য মূল্য গ্রহণ করনা, তোমরা কেবল আমাকেই ভয় কর। [সূরা বাকারা-৪১]

৩। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করনা এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করনা। [সূরা বাকারা-৪২]

৪। অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং তারা সৎ পথপ্রাপ্ত। [সূরা ইয়াসীন-২১]

৫। কুরআন নাযিলের উদ্দেশ্য ঃ

(ক) মানব জাতিকে অন্ধকার থেকে আলোতে নিয়ে আসা। [সূরা ইবরাহীম-১]

(খ) মানব জাতিকে জীবন যাপনের সঠিক পথ প্রদর্শন। [সূরা বাকারা-১৮৫]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য **সূরার** আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৪৪, তাওবা-৩৪, বাকারা-১৪০, ১৭৪।

৭। সর্বোত্তম **কালাম হল** আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ **সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি** ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল **কু-সংস্কারসমূহ**। [বুখারী/৬৭৬৮-আবদুল্লাহ ইবন মাসউদ (রাঃ)]

⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিদায় হাজ্জের ভাষণে **বলেছেন** ঃ যারা আমার কথা শোনছ, তোমরা আমার একটি কথা হলেও অন্যদের নিকট পৌঁছে দিবে, যারা এখানে উপস্থিত হতে পারেনি। [ইব্‌ন মাজাহ/২৩২]

মহান আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী লোকদের নিকট প্রচার করার আদেশ আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আমাদের দিয়েছেন। এ আদেশ পালন করার জন্য অর্থ গ্রহণ করার কথা বলা হয়নি। দেশে দেশে ওয়াজ মাহফিল করে অর্থ উপার্জন করাও ঠিক নয়। অর্থের বিনিময়ে যারা ধর্মের কথা বলে তাদেরকে মান্য করা যাবেনা। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ অনুসরণ কর তাদের যারা তোমাদের নিকট কোন প্রতিদান চায়না এবং তারা সৎপথ প্রাপ্ত। [সূরা ইয়াসীন-২১] বর্তমানে ওয়াজ মাহফিলে লক্ষ্য করা যায়, আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) কথার সাথে বক্তারা বানানো কিচ্ছা কাহিনীই বেশী বলে যা কাম্য নয়। কেবলমাত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে লোকদেরকে উপদেশ দিতে হবে। এ বিষয়ে আরও দেখুন সূরা কাফ- ৪৫, সূরা আ'রাফ-২।

কুরআন মানুষকে ইসলামী শিক্ষার ব্যাপক ধারনা দেয়

১। এটা তো কেবল বিশ্ববাসীদের জন্য উপদেশ। [সূরা তাকবীর-২৭]

২। তারা কুরআনে বিশ্বাস করবেনা এবং অতীতে পূর্ববর্তীদেরও এই আচরণ ছিল। [সূরা হিজর-১৩]

৩। আল্লাহ, তিনি ছাড়া সত্যিকারের কোন ইলাহ নেই। অতএব মু'মিনরা আল্লাহরই উপর নির্ভর করুক। [সূরা তাগাবূন-১৩]

৪। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ বাকারা-২৮৬।

৫। হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহ্‌র উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে ডান কিংবা বাম দিকের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা হিদায়াত থেকে অনেক দূরে সরে যাবে। [বুখারী/৬৭৭২]

ইসলামের দৃষ্টিতে আত্মা বিশেষ এক নি'আমাত এবং শরীরের কেন্দ্রবিন্দু ও আল্লাহর সাথে সম্পর্ক বৃদ্ধির বাহন/উপকরণ। ইসলামে আত্মার প্রশিক্ষণ বলতে বুঝায় সমস্ত কাজ, চিন্তা ও সর্বাবস্থায় আল্লাহর সাথে আত্মার সম্পর্ক ও সংযোগ সংঘটিত হওয়া। আল্লাহ মানুষকে অসম্ভব কোন কাজে হুকুম দেননা। কিন্তু বর্তমান সমাজের লোকেরা মুসলিম হয়েও ইসলাম শিক্ষাকে অগ্রাধিকার দিতে

পারছেনা। কোন কোন ক্ষেত্রে ইসলামী শিক্ষা ব্যবস্থাকে সহযোগিতা না করে নিরুৎসাহিত করছে অথবা বাধা দিচ্ছে। যা মুসলিমদের কাম্য নয়।

কুরআন জীবিতদের জন্য, মৃতদের জন্য নয়

১। এটি একটি কল্যাণময় কিতাব তোমার কাছে অবতীর্ণ করেছি যাতে তারা এর আয়াতগুলির প্রতি চিন্তা-ভাবনা করে। আর জ্ঞান-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা সাদ-২৯]

২। তখন রাসূল বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছিল। [সূরা ফুরকান-৩০]

৩। আর এই যে, মানুষ তা'ই পায় যা সে করে। [সূরা নাজম-৩৯]

৪। যাতে সে সতর্ক করতে পারে জীবিতদেরকে এবং যাতে কাফিরদের বিরুদ্ধে শাস্তির কথা সত্য হতে পারে। [সূরা ইয়াসীন-৩০]

৫। কুরআন পাঠে সুদক্ষ ব্যক্তি সৎ আমলকারী, মহান দূতবর্গের (ফিরিশতাকূলের) সঙ্গী। আর যে ব্যক্তি কুরআন পাঠ করে, পাঠ করতে গিয়ে যে তোতলায় এবং কুরআন উচ্চারণ তার কাছে কঠিন মনে হয় তার জন্য দ্বিগুণ সাওয়াব। [মুসলিম/১৭৩২-আয়িশা (রাঃ)]

আল্লাহ কুরআন অবতীর্ণ করেছেন জীবিতদের জন্য, যাতে তারা তাদের জীবিত কালীন সময় আল্লাহর নির্দেশানুসারে পরিচালিত করে। সুতরাং কুরআন মৃত মানুষদের জন্য কোন উপকারী বস্তু নয়। যেহেতু তাদের আমল ও কর্ম বন্ধ হয়ে গেছে, তাই তারা তা পড়তে ও শোনতে পারেনা এবং সেই অনুসারে আমলও করতে পারেনা। আর তাদের নিকট কুরআন পাঠের সাওয়াবও পৌছেনা। অবশ্য আপন সন্তানের নিকট হতে দু'আ তাদের নিকট পৌছে থাকে। কারণ সন্তান পিতা-মাতার স্বকর্ম ও প্রতিপালনের ফল।

মৃত ব্যক্তির নামে কুরআনখানির প্রথা এত ব্যাপক প্রচলিত যে, কুরআন তিলাওয়াত মরণের নিদর্শন ও চিহ্ন হয়ে দাঁড়িয়েছে। সুতরাং বেতার কেন্দ্র বা টিভি কেন্দ্র থেকে একটানা কুরআন তিলাওয়াত কখনও শোনতেই পাওয়া যায়না। যদি কোন দিন অবিরাম তিলাওয়াত শোনেন তাহলে বুঝবেন যে, কোন ক্ষমতাশালী ব্যক্তি মারা গেছে। যদি কোন বাড়ি হতে তিলাওয়াতের শব্দ শোনেন তাহলে বুঝবেন যে, ঐ বাড়িতে কারও মৃত্যুশোক পালিত হচ্ছে।

মৃত ব্যক্তির উপর সূরা ইয়াসীন পাঠ করা হয় ও কাবরস্থানে প্রবেশের পর সূরা ফাতিহা বা অন্য সূরা পড়তে হয়- এ কথা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীগণকে (রাঃ) শিখাননি। তাই কুরআন ও সহীহ হাদীসের বি-পরীতে উপরোক্ত নিয়মে কাবর জিয়ারাত করা উচিত নয়।

কুরআনের মত কোন কিতাব পৃথিবীতে নেই

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বালেন ঃ

قُل لَّئِنِ اجْتَمَعَتِ الإِنسُ وَالْجِنُّ عَلَى أَن يَأْتُواْ بِمِثْلِ هَـذَا الْقُرْآنِ لاَ يَأْتُونَ بِمِثْلِهِ وَلَوْ كَانَ بَعْضُهُمْ لِبَعْضٍ ظَهِيرًا

বল ঃ এ কুরআনের মত একখানা কুরআন আনার জন্য যদি সমগ্র মানব আর জিন একত্রিত হয় তবুও তারা তা আনতে পারবেনা, যদিও তারা পরস্পর পরস্পরকে সাহায্য ও সহযোগিতা করে। [সূরা বানী ইসরাইল-৮৮]

২। তাহলে কি তারা বলে যে, ওটা সে নিজেই রচনা করেছে? তুমি বলে দাও ঃ তাহলে তোমরাও ওর অনুরূপ রচিত দশটি সূরা আনয়ন কর এবং (নিজ সাহায্যার্থে) যে সমস্ত গাইরুল্লাহকে ডাকতে পার ডেকে আন, যদি তোমরা সত্যবাদী হও। [সূরা হুদ-১৩]

৩। আমি আমার বান্দার প্রতি যা নাযিল করেছি তাতে তোমাদের কোন সন্দেহ থাকলে তোমরা তার মত কোন সূরা এনে দাও। আর তোমরা যদি সত্যবাদী হও তাহলে আল্লাহ ছাড়া তোমাদের সকল সাহায্যকারীকে আহ্বান কর। যদি তোমরা না পার এবং কক্ষনো পারবেনা, তাহলে সেই আগুনকে ভয় কর যার ইন্ধন হবে মানুষ এবং পাথর, যা প্রস্তুত রয়েছে কাফিরদের জন্য। [সূরা বাকারা-২৩-২৪]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কুরআন তিলাওয়াত করে তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ লেবুর ন্যায় যা সুস্বাদু এবং সুগন্ধযুক্ত। আর যে ব্যক্তি (মু'মিন) কুরআন পাঠ করেনা তার উদাহরণ হচ্ছে এমন খেজুরের মত যা সুগন্ধহীন কিন্তু খেতে সুস্বাদু। আর ফাসিক-ফাজিল ব্যক্তি যে কুরআন পাঠ করে তার উদাহরণ হচ্ছে রায়হান জাতীয় গুল্মের মত যার সুগন্ধ আছে কিন্তু খেতে বিস্বাদযুক্ত। আর ঐ ফাসিক যে কুরআন একেবারেই পাঠ করেনা তার উদাহরণ হচ্ছে ঐ মাকাল ফলের মত যা খেতেও বিস্বাদ এবং যার কোন সুঘ্রাণও নেই। [বুখারী/৪৬৪২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা অন্য কোন নাবীকে অনুমতি দেননি যা আমাকে দিয়েছেন যে, কুরআন তিলাওয়াত করাই যথেষ্ট। সুফিয়ান (রঃ) বলেন ঃ কুরআনই তার জন্য যথেষ্ট। [বুখারী/৪৬৪৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

◻ কুরআন অবতীর্ণ হওয়ার পর থেকে শত শত বৎসর পর্যন্ত কুরআন তো দূরের কথা, কুরআনের একটি আয়াতের মত আয়াতও কেহ রচনা করতে সক্ষম হয়নি। কিন্তু শত শত বৎসর পর মারগানের অধিবাসী বুরহানউদ্দীন মারগানী হিদায়া নামক কিতাব রচনা করে ঘোষণা দিল ঃ "নিশ্চয়ই হিদায়া কিতাব কুরআনের মত। নিশ্চয়ই এটা তার পূর্ববর্তী রচিত সকল গ্রন্থরাজীকে রহিত করে ফেলেছে।" (হিদায়া, মুকাদ্দামা অধ্যায়, ১ম খন্ড) । পাঠকবৃন্দ একটু চিন্তা

করে দেখুন, কুরআনকে পৃথিবী থেকে মুছে ফেলার জন্য কুরআনের মত কিতাব দাবী করতেও দ্বিধাবোধ করেনি। এমনকি পূর্বের সমস্ত কিতাবও রহিত করে ছেড়েছে। অথচ এই হিদায়ার মধ্যে অনেক হারামকে হালাল এবং হালালকে হারাম ফাতওয়া দেয়া হয়েছে এবং ইমাম আবূ হানীফার নামে মিথ্যা কথা পর্যন্ত লিখেছে। এটা মাযহাব/বিশেষ মত প্রতিষ্ঠার হীনতম চক্রান্ত। কিন্তু আল্লাহর ঘোষণা অনুযায়ী কুরআন আজও নির্ভুল, অপরিবর্তিত অবস্থায় বিদ্যমান আছে। ভবিষ্যতেও থাকবে। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ আমিই কুরআন অবতীর্ণ করেছি এবং আমিই এর সংরক্ষণকারী। [সূরা হিজর-৯] আল্লাহ আমাদেরকে এ সকল দল/মতের কু-চক্রের কবল থেকে রক্ষা করুন। আমীন।

উযূ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত ও স্পর্শ করা

১। আমিতো তোমাকে সমগ্র মানব জাতির প্রতি সুসংবাদ দাতা ও সতর্ককারী রূপে প্রেরণ করেছি। কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। [সূরা সাবা-২৮]

২। কুরআনতো বিশ্ব জগতের জন্য উপদেশ। [সূরা কালাম-৫২, তাকভীর-২৭]

৩। আমি তোমার প্রতি সত্যসহ কিতাব অবতীর্ণ করেছি মানুষের কল্যাণের জন্য; অতঃপর যে সৎ পথ অবলম্বন করে সে তা করে নিজেরই কল্যাণের জন্য এবং যে বিপথগামী হয় সেতো বিপথদামী হয় নিজেরই ধ্বংসের জন্য এবং তুমি তাদের তত্ত্বাবধায়ক নও। [সূরা যুমার-৪১]

৪। এক কল্যাণময় কিতাব, ইহা আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিগণ গ্রহণ করে উপদেশ। [সূরা সাদ-২৯]

৫। (হে মানব জাতি!) তোমাদের কাছে তোমাদের রবের তরফ হতে এমন বিষয় সমাগত হয়েছে যা হচ্ছে নাসীহাত এবং অন্তরসমূহের সকল রোগের আরোগ্যকারী, আর মু'মিনদের জন্য ওটা পথ প্রদর্শক ও রাহমাত। [সূরা ইউনুস-৫৭]

৬। এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসাহ। [সূরা ইবরাহীম-১]

৭। যারা পুতঃ পবিত্র তারা ব্যতীত অন্য কেহ তা স্পর্শ করেনা। [সূরা ওয়াকি'আ-৭৯]

৮। বিনা উযূতে কুরআন পাঠ করা যায়। [বুখারী/১৮৩]

৯। পবিত্রতা ব্যতীত সালাত কবূল হয়না। [মুসলিম/৪২৬, বুখারী/ পরিঃ-৯৭]

১০। মু'মিন অপবিত্র হয়না। [মুসলিম/৭০৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

১১। জানাবাত বা অন্য কোন কারণে অপবিত্র অবস্থায় আল্লাহ তা'আলার যিক্র করা যায়। [মুসলিম /৭১০-আয়িশা (রাঃ), আবূ দাউদ/১৮]

১২। আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাহি ওয়া সাল্লাম পায়খানা-প্রস্রাব থেকে ফিরে আসার পর তাঁর সামনে খাবার পেশ করা হয়। তাঁরা (সাহাবী) জিজ্ঞেস করেন ঃ আমরা কি আপনার জন্য উযূর পানি আনব? তখন তিনি (সাঃ) বলেন ঃ আমাকে তো সালাত আদায়ের সময় উযূ করার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছে। [আবূ দাউদ/৩৭১৮]

🗗 উযূ ছাড়া কুরআনুম মাজিদ পাঠ করা এবং **স্পর্শ করা যাবে** কিনা এ সম্পর্কে মনীষীগণের মধ্যে মতভেদ দেখা যায়। মু'মিনদের তো সব সময়ই কুরআনুম মাজিদ ধরা এবং পাঠের প্রয়োজন হয়। কুরআনুম মাজিদ তো মু'মিনদের জীবন যাপনের ম্যানুয়েল এবং গাইডবুক। সুতরাং তারা এক মুহূর্তও কুরআন থেকে দূরে থাকতে পারেনা। কিন্তু সর্বক্ষণ উযূ ধরে রাখা অত্যন্ত কঠিন, জটিল ও অস্বাভাবিক। আর কুরআনুম মাজিদ ধরে পাঠের জন্যে উযূ যদি জরুরী হত তবে আল্লাহ অবশ্যই কুরআনুম মাজিদে তা বলে দিতেন, যেমন নামাযের (সালাত) জন্যে উযূ করার কথা পরিস্কার করে বলে দিয়েছেন (সূরা মায়িদা - ৬)। তাছাড়াও সূরা ওয়াকি'আ-৭৯ এর আয়াতের ব্যাখ্যায় বলা হয়েছে যে, "বাণী পবিত্রত্মা ফিরিশতাদের মাধ্যমে অবতীর্ন হয়েছে। এর মধ্যে শাইতানের কোন অধিকার নেই।" রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেও তাঁর সুন্নাতের মধ্যে কুরআন পাঠ এবং স্পর্শ করার জন্যে উযূর বিধান স্পষ্টভাবে জারি করতেন, যেভাবে করেছেন সালাতের (নামাযের) জন্যে। মনীষীগণ এ প্রসঙ্গে নিজস্বভাবে যে সব মতামত দিয়েছেন, তাতে তাদের মধ্যে প্রচন্ড মতভেদ লক্ষ্য করা যায়। অন্যদিকে আল কুরআন তো মুসলিম অমুসলিম সকল মানুষের কিতাব। অমুসলিম ও মুশরিকরা কুরআন ধরা ও পাঠ করার জন্যে কিভাবে উযূ করবে? কারণ উযূর বিধান তো শুধু মু'মিনদের জন্যে, অমুসলিমদের জন্যে নয়। নাকি অমুসলিমদেরকে কুরআন থেকে দূরে রাখা হবে এবং তাদেরকে কুরআন ধরতে এবং পাঠ করতে নিষেধ করা হবে? অথচ মহান আল্লাহ আল কুরআন তাদের জন্যেও নাযিল করেছেন, শুধু মুসলিমদের জন্যে নয়। মিলন, স্বপ্নদোষ, কামভাবে শুক্র নির্গত হলে শরীর অপবিত্র হয়। এই অপবিত্রতাকে জানাবাত বলে। এরূপ অপবিত্র অবস্থায় কুরআন স্পর্শ করা উচিত নয়। মানুষের স্বাভাবিক অবস্থায় উযূ ছাড়া কুরআন তিলাওয়াত ও স্পর্শ করা যাবে কিনা এ বিষয়ে ফায়সালা দেয়ার জন্য বিশিষ্ট আলেম ও মনীষীগণকে অবশ্যই এগিয়ে আসতে হবে। আর এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

কুরআন অবশ্যই বুঝে পাঠ করতে হবে এবং নির্দেশনা মানতে হবে

১। তারা যা বলে তা আমি জানি, তুমি তাদের উপর জবরদস্তিকারী নও। সুতরাং যে আমার শাস্তিকে ভয় করে তাকে উপদেশ দান কর কুরআনের সাহায্যে। [সূরা কাফ-৪৫]

২। আর আমি এই কিতাব অবতীর্ণ করেছি যা বারাকাতময় ও কল্যাণময়। সুতরাং তোমরা এর অনুসরণ কর এবং এর বিরোধিতা হতে বেঁচে থাক, হয়ত তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ প্রদর্শন করা হবে। যেন তোমরা না বলতে পার - ঐ কিতাবতো আমাদের পূর্ববর্তী দুই সম্প্রদায়ের প্রতি অবতীর্ণ করা হয়েছিল এবং আমরা তাদের পঠন পাঠনে সম্পূর্ণ অজ্ঞ ছিলাম অথবা তোমরা যেন এ কথাও বলতে না পার, আমাদের প্রতি কিতাব নাযিল করা হলে আমরা তাদের তুলনায় বেশি হিদায়াত লাভ করতাম। এখনতো তোমাদের কাছে তোমাদের রবের পক্ষ থেকে এক সুস্পষ্ট দলীল এবং পথ নির্দেশ ও রাহমাত সমাগত

হয়েছে। এরপর আল্লাহর আয়াতকে যে মিথ্যা প্রতিপন্ন **করবে এবং তা থেকে** এড়িয়ে চলবে তার চেয়ে বড় যালিম আর কে হতে পারে? যারা আমার আয়াতসমূহ এড়িয়ে চলে, অতি সত্তর তাদেরকে আমি কঠিন শাস্তি দিব, জঘণ্য শাস্তি - তাদের এড়িয়ে চলার জন্য! [সূরা আনআম-১৫৫-১৫৭]

৩। এই কিতাব আমি তোমার প্রতি অবতীর্ণ করেছি যাতে তুমি মানব জাতিকে বের করে আনতে পার অন্ধকার হতে আলোর দিকে; তাঁর পথে, যিনি পরাক্রমশালী, প্রশংসা। [সূরা ইবরাহীম-১]

৪। তিনিই তাঁর বান্দার প্রতি সুস্পষ্ট আয়াত অবতীর্ণ করেন, তোমাদেরকে অন্ধকার হতে আলোকে নিয়ে আসার জন্য; আল্লাহতো তোমাদের প্রতি করুণাময়, পরম দয়ালু। [সূরা হাদীদ-৯]

৫। তারা কেন কুরআন সম্বন্ধে গবেষনা করেনা? আর যদি ওটা আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নিকট হতে হত তাহলে তারা ওতে বহু বৈপরিত্য দেখতে পেত। [সূরা নিসা-৮২]

৬। এক কল্যাণময় কিতাব এটা, আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি, যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা সা'দ-২৯]

৭। তাহলে কি তারা কুরআন সম্বন্ধে অভিনিবেশ সহকারে চিন্তা করেনা? তাদের অন্তর তালাবদ্ধ। [সূরা মুহাম্মাদ-২৪]

৮। যখন তাদেরকে বলা হয় যে, আল্লাহ যা অবতীর্ণ করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা ওরই অনুসরণ করব যা আমাদের পিতৃ-পুরুষগণ হতে প্রাপ্ত হয়েছি; যদিও তাদের পিতৃ-পুরুষদের কোনই জ্ঞান ছিলনা এবং তারা সুপথগামীও ছিলনা। আর যারা অবিশ্বাস করেছে তাদের দৃষ্টান্ত ওদের ন্যায় - যেমন কেহ আহ্বান করলে শুধু চীৎকার ও ধ্বনি ব্যতীত আর কিছুই শোনেনা, তারা বধির, মুক, অন্ধ; কাজেই তারা বুঝতে পারেনা। [সূরা বাকারা-১৭০-১৭১]

৯। আমি তাদেরকে যে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিলাম, তোমাদেরকে তা দেইনি; আমি তাদেরকে দিয়েছিলাম কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয়; কিন্তু ঐ কর্ণ, চক্ষু ও হৃদয় তাদের কোন কাজে আসেনি; কেননা তারা আল্লাহর আয়াতসমূহকে অস্বীকার করেছিল। যা নিয়ে তারা ঠাট্টা বিদ্রুপ করত তাই তাদেরকে পরিবেষ্টন করল। [সূরা আহকাফ-২৬]

১০। বস্তুতঃ চক্ষুতো অন্ধ নয়, বরং অন্ধ হচ্ছে বক্ষস্থিত হৃদয়। [সূরা হাজ্জ-৪৬]

১১। তুমি যখন কুরআন পাঠ কর তখন তোমার ও যারা পরলোকে বিশ্বাস করেনা তাদের মধ্যে এক প্রচ্ছন্ন পর্দা টেনে দিই। আমি তাদের অন্তরের উপর আবরণ দিয়েছি যেন তারা উপলব্ধি করতে না পারে এবং তাদেরকে বধির করেছি; তোমার রাব্ব এক, এটা যখন তুমি কুরআন হতে আবৃত্তি কর তখন তারা সরে পড়ে। [সূরা বানী ইসরাইল-৪৫-৪৬]

১২। তার নিকট আমার আয়াতসমূহ আবৃত্তি করা হলে সে বলে ঃ এটাতো পূরাকালীন কাহিনী। না, এটা সত্য নয়, বরং তাদের কৃতকর্মের ফলেই তাদের মনের উপর মরিচা জমে গেছে। [সূরা মুতাফ্ফিফীন-১৩-১৪]

১৩। রাসূল বলবে ঃ হে আমার রাব্ব! আমার সম্প্রদায়তো এই কুরআনকে পরিত্যাজ্য মনে করেছিল। [সূরা ফুরকান-৩০]

□ **আল্লাহ প্রদত্ত জীবন** ব্যবস্থার মধ্যে মানুষের জন্য **ইসলাম একটি পূর্ণাঙ্গ** জীবন **ব্যবস্থা।** এ **জীবন** ব্যবস্থার মূল ভিত্তি ও উৎস হল 'আল **কুরআন**'। কুরআন **বিশ্বের সর্বাধিক** পঠিত গ্রন্থ। আল কুরআন হল মানুষের স্রষ্টা, **মালিক** ও রাব্ব **মহান** আল্লাহর বাণী। এ বাণীতে তিনি গোটা মানব জাতির **জন্যে জীবন** যাপনের হিদায়াত বা নির্দেশিকা প্রদান করেছেন। সুতারাং **মানুষের উচিত** দুনিয়ার যে কোন বই-পুস্তক ও অন্যান্য গ্রন্থের চাইতে আল কুরআনকে **অধিক** গুরুত্ব দিয়ে, অতীব গুরুত্বপূর্ণ মনে করে এবং অপরিহার্য বিধান হিসাবে গ্রহণ করে পাঠ করা, শিক্ষা, বুঝা এবং এর মর্ম উপলব্ধি করা। সেই সাথে জীবনের সকল ক্ষেত্রে আল কুরআনের নির্দেশ বাস্তবায়ন করা। কোন বিষয়কে না বুঝে ঠিক মতো জানা এবং মানাও যায়না। যারা আল্লাহর কিতাব হিসাবে কুরআনের প্রতি ঈমান রাখেন এবং কুরআনকে মানতে ও অনুসরণ করতে চান, সে ক্ষেত্রেও তাদেরকে অবশ্যই কুরআন বুঝতে হবে। কুরআন সম্পর্কে অজ্ঞতা নিয়ে কুরআনের হুকুম, বিধান ও নির্দেশাবলী সঠিকভাবে মানা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই আমাদের উচিত কুরআনের ভাষা শিক্ষার সিদ্ধান্ত নেওয়া। কোন ভাষা শিক্ষার জন্যে বয়স কোন বাধা নয়। প্রয়োজন হল গুরুত্ব অনুভব করার এবং আল্লাহর নির্দেশাবলী জানা ও হিদায়াত লাভ করার তীব্র আকাংখার। সেই সাথে প্রয়োজন হবে একটি বলিষ্ঠ সিদ্ধান্ত নেওয়ার। কিন্তু কুরআন পাঠ করার অর্থ কী? এ বিষয়ে কিছু লোকের মধ্যে সংশয় রয়েছে এবং কিছু লোকের মধ্যে রয়েছে বিভ্রান্তি। এই সংশয় ও বিভ্রান্তিতে বিশেষ করে বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম হাবু-ডুবু খাচ্ছে। এ সকল সংশয়, বিভ্রান্তি ও কু-সংস্কারসমূহ হচ্ছে ঃ

(ক) কিছু লোক মনে করে কুরআন পাঠ করা জরুরি বটে, তবে এ জন্যে কেবল উচ্চারণগত পাঠ শিক্ষাই যথেষ্ট, ভাষা এবং বক্তব্য জানার প্রয়োজন নেই।

(খ) আবার কিছু লোক মনে করে, যেহেতু কুরআন তিলাওয়াত (পাঠ) করলে সাওয়াব হয়, তাই তিলাওয়াত করা, কিংবা বেশী বেশী তিলাওয়াত করাতেই লাভ, অর্থ ও মর্ম বুঝার কোন প্রয়োজন নেই।

(গ) কিছু লোক মনে করে কুরআন বুঝা এবং বুঝানোর দায়িত্ব আলেম-উলামার। অন্যরা এ দায়িত্ব থেকে মুক্ত। অন্যদের জন্যে অবুঝ পাঠই যথেষ্ট।

(ঘ) কিছু সংখ্যক লোক মনে করে মহাজ্ঞানী মুফাসসিররা (!) ছাড়া অন্যদের পক্ষে কুরআন বুঝা সম্ভব নয়। বুঝার চেষ্টা করলেই বিভ্রান্তিতে পড়বে। তাই সাধারণভাবে এ লোকেরা মানুষকে কুরআনের অর্থ ও তাফসীর পড়তে এবং কুরআন বুঝার চেষ্টা করতে নিষেধ করে থাকে। এরাও শুধু অবুঝ পাঠের প্রতিই গুরুত্ব দিয়ে থাকে। আফসোসের বিষয়, এসব ভ্রান্ত ধারণায় সাধারণ নিরক্ষর লোকদের মধ্যেই বিরাজ করছেনা বরং এমন লোকেরাও এসব ভ্রান্ত ধারনায় নিমজ্জিত আছেন যারা বিভিন্ন বিষয়ে দুনিয়াবি বড় বড় ডিগ্রী অর্জন করেছেন এবং বিভিন্ন ব্যবসা ও পেশায় কর্মরত আছেন।

সম্মানিত পাঠক/পাঠিকা ! আপনাদের বিবেকের কাছে প্রশ্ন **করছি সত্যি করে বলুন** দেখি ঃ কোন কিছু পাঠ করার অর্থ কি বক্তব্য না বুঝে ভাষা **উচ্চারণ করা?** অর্থ না বুঝে শব্দ উচ্চারণ করা?

আমি, আপনি, আমরা সবাই আমাদের পাঠ্য বই, কোর্সের বই, গল্পের বই, খবরের কাগজ, ম্যাগাজিন, কর্মক্ষেত্রের গাইড বই, ম্যানুয়াল, বিধিমালার বই, দলিল-দস্তাবেজ, চিঠিপত্র, চুক্তিপত্র, কোটেশন ইত্যাদি যা কিছু আমরা পাঠ করি সেগুলোর অর্থ অবশ্যই আমরা জেনে-বুঝে এবং অনুধাবন-উপলব্ধি করেই পাঠ করি। তাহলে আমরা কি সব ধরনের বই-পুস্তকের প্রতি সুবিচার করব, আর শুধু আল্লাহর কিতাব আল কুরআনের প্রতি করে যাব অবিচার?

তবে কুরআন বুঝার জন্য আরাবী ভাষায় দক্ষ হতে হবে এটা অপরিহার্য নয়। আলহামদুলিল্লাহ। বাংলা ভাষায় কুরআনের অনেক অনুবাদ ও তাফসির প্রকাশ হয়েছে। আপনি কুরআন বুঝার জন্য এসব গ্রন্থের সাহায্য নিন।

প্রকৃত ব্যাপার হল পড়া মানেই বুঝে পড়া, আর পাঠ করা মানেই বুঝে পাঠ করা। কিন্তু অজ্ঞতা, গোড়ামী এবং ইসলামের শত্রুদের ষড়যন্ত্রের শিকার হয়ে আজ একদল মুসলিম এই মহাসত্যকে নির্লজ্জভাবে বিকৃত করে নিয়েছে। তাদের দৃষ্টিতে সকল ক্ষেত্রেই পাঠ করা মানে বুঝা, অনুধাবন করা এবং মেনে চলা, তবে আল কুরআন ছাড়া। কি অদ্ভুত ব্যাপার !

⊙ আল্লাহ বলেন ঃ এই কুরআন মুত্তাকীদের জন্য অবশ্যই এক উপদেশ। আমি অবশ্যই জানি যে, তোমাদের মধ্যে মিথ্যা আরোপকারী রয়েছে এবং এই কুরআন নিশ্চয়ই কাফিরদের অনুশোচনার কারণ হবে। [সূরা হাক্কাহ-৪৮-৫০]

কুরআনখানি

১। এভাবে আমি একে বিধান রূপে নাযিল করেছি আরাবী ভাষায়। তোমার কাছে জ্ঞান আসার পরেও তুমি যদি তাদের খায়েশের অনুসরণ কর তাহলে আল্লাহর বিরুদ্ধে তোমার কোন অভিভাবক থাকবেনা, থাকবেনা কোন রক্ষাকারী। [সূরা রাদ-৩৭]

২। নিশ্চয়ই ইহাতো (কুরআন) তোমার এবং তোমার সম্প্রদায়ের জন্য উপদেশ, তোমাদেরকে অবশ্যই এ বিষয়ে প্রশ্ন করা হবে। [সূরা যুখরূফ-৪৪]

⧉ কুরআনখানি, ফাতিহাখানি, কুলখানি, খতমে কুরআন, শাবীনা পাঠ প্রভৃতির মাধ্যমে সাওয়াব হাসিল করার কোন ভিত্তি শারীয়াতে নেই, বিধায় তা বিদ'আত। কিন্তু সে কথায় কান না দিয়ে, এক প্লেট মাংস-ভাত ও কয়েকটি টাকার লোভে কুরআনকে উপার্জনের মাধ্যম বানিয়ে নেয় এক শ্রেণীর মানুষ। যাদের জন্য দু'আ করা নিষেধ, তাদের জন্যও কুরআনখানি করে, এমনকি অনেকে অমুসলিম রাজনৈতিক নেতাদের নামেও কুরআনখানি করে! করবেই তো। তারা তো আর সেই কাজ মন থেকে করেনা। আসলে তারা ভাড়াটিয়া লোকের মত আচরণ করছে। ওদের মনে মোটেই আল্লাহর ভয় নেই, তারা আবার ভাড়ায় কাজ করতে গিয়েও কাজে ফাঁকি দেয়। গড়গড় করে পড়তে পড়তে জানায়-অজানায় মাঝে মধ্যে স্বল্প সময়ে কুরআন খতম করে।

সমাজে এক শ্রেণীর বোকা মানুষ আছে, তারা মনে করে যে, তাদের আত্মীয় শির্‌ক করেছে অথবা ইসলাম বিরোধী কোন কাজ করেছে অথবা সালাত আদায় না করে বা সিয়াম পালন না করে মারা গেলেও যদি তার নামে কুরআনখানি করিয়ে দেয়া হয়, তাহলে মৃত ব্যক্তিটি সহজে জান্নাতে যাবে। তাহলে ভাড়াটিয়া ঐ শ্রেণীর হুজুরের পিতা-মাতা/আত্মীয়ের মৃত্যুর পর জান্নাতের পথ সহজ করার জন্য কেন তারা কুরআনখানির অনুষ্ঠান করেনা? এ জন্য করেনা যে, তারা জানে, এটা তার পিতা-মাতা বা আত্মীয়ের কোন কাজে আসবেনা। তবুও সমাজের চাপে, সমাজে সুনাম কুড়ানোর উদ্দেশে, সমাজের একটি প্রচলিত রসম-রেওয়াজ, অন্য পাঁচজনের খাতিরে আর দু' চার প্লেট খাবার ও টাকা-পয়সা পাবার লোভে কুরআনখানি করে থাকে। আর এ বিষয়ে উক্ত কাজ যে বৃথা ও মূল্যহীন তা বলাই বাহুল্য, বিধায় এটা বিদ'আত।

কুরআন খতম পড়া

১। তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেনা, আর বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেনা (বিশেষতঃ) যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা নামল-৮০]

২। আর জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শোনান; যারা কাবরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পারবেনা। [সূরা ফাতির-২২]

৩। তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারনা, বধিরকেও শোনাতে পারবেনা আহ্বান যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা রূম-৫২]

৪। যখন কুরআন পাঠ করা হয় তখন তোমরা তা মনোযোগের সঙ্গে শ্রবণ কর, আর নীরবতা বজায় রাখ যাতে তোমাদের প্রতি দয়া ও অনুগ্রহ করা হয়। [সূরা আ'রাফ-২০৪]

৫। কিতাব হতে আল্লাহ যা নাযিল করেছেন, যারা এটা গোপন করে এবং এর বিনিময়ে স্বল্প মূল্য গ্রহণ করে, এরা নিজেদের পেটে একমাত্র আগুন ভক্ষণ করে। ওদের সাথে আল্লাহ কিয়ামাতের দিন কথা বলবেননা এবং ওদেরকে পবিত্রও করবেননা; এবং ওদের জন্য আছে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি। [সূরা বাকারা-১৭৪]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৪৪, নিসা-৫৬, বাকারা-৩৪, ১২১।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ততক্ষণ কুরআন তিলাওয়াত করতে থাক যতক্ষণ এর প্রতি তোমাদের হৃদয়ের আকর্ষণ অব্যাহত থাকে। আর যখন অন্যমনস্ক হয়ে যাও তখন তা থেকে বিরত থাক। [বুখারী/৬৮৫১-জুনদুব (রাঃ), মুসলিম/৬৫৩৫]

৭। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কমপক্ষে সাত দিনে একবার কুরআন খতম কর এবং এর চেয়ে কম সময়ের মধ্যে খতম করনা। [বুখারী/৪৬৭৭-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ)]

⧉ আল্লাহ কর্তৃক রাসূলের (সাঃ) কাছে প্রেরিত সমগ্র মানব জাতির জন্য একটি নির্ভুল ও পূর্নাঙ্গ জীবন বিধানের নাম ইসলাম। আর সেই জীবন বিধানের (দীন) সংবিধান হল আল কুরআন। প্রত্যেক মুসলিমের প্রতিদিন কুরআন তিলাওয়াত করা অবশ্যই কর্তব্য। কুরআন হল আমাদের জীবন-বিধান, আল্লাহর দেয়া

সমস্ত বিষয়ের সমাধান তথা পার্থিব জীবনে আমল করার **মাধ্যমে পরকালের পাথেয়** সংগ্রহের দিক নির্দেশনা। শুধু সুর দিয়ে কুরআন পড়লে তো **আর অর্থ** বুঝা গেলনা। আল্লাহর আদেশ-নিষেধও জানা গেলনা। তাহলে এই পড়ার মূল্য কতটুকু তা আল্লাহ তা'আলাই জানেন। রামাযান মাসে প্রতিযোগিতা করা হয় কে কতবার কুরআন খতম দিয়েছেন। কেহ আলোচনা করেনা আল্লাহ তা'আলা অমুক সূরায় ঐ কথা বলেছেন। কুরআনে আল্লাহ তা'আলা কি বলেছেন তা যদি আমরা না জানি তাহলে আমরা কোন্ ধরণের মুসলিম? ইসলামকে জানতে হলে একমাত্র কুরআনের নির্দেশই মানতে হবে এবং কুরআনের শিক্ষাকে অবশ্যই অন্যকে জানাতে হবে, নিজে মানতে হবে, অন্যকে মানতে **বলতে হবে**। কুরআন পাঠের বিশুদ্ধতার প্রতি লক্ষ্য রেখে স্পষ্ট ও সুবিন্যস্তভাবে **(তারতিল** সহকারে) তিলাওয়াত করতে হবে। কারণ যে মুসলিম আপাততঃ কুরআনের অর্থ বুঝেনা তার শব্দ উচ্চারণের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হওয়া উচিৎ নয়। তবে বুঝা ও মানার জন্য কুরআনের ভাষা শিক্ষা করাও খুব প্রয়োজন। দুনিয়াবী প্রয়োজনে মানুষ বিভিন্ন ভাষা শিক্ষা করে। কিন্তু আখিরাতের কল্যাণের জন্য কুরআনের অর্থ জানা ও মানার জন্য আরাবি ভাষা শিক্ষা করা অতীব জরুরী। আখিরাতের প্রতি সুদৃঢ় বিশ্বাস ও ধর্মভীরুতার সাথে অর্থ জেনে কুরআন তিলাওয়াত করলে অন্তরের মধ্যে ইতিবাচক অনুভুতি তৈরী হবে। ফলে আল্লাহর বিধি-বিধান মেনে চলা সহজ ও সম্ভব হবে। এটাই দাওয়াত যা মুসলিমদের কর্তব্য।

তাছাড়াও একের অধিক মৌলভী একসঙ্গে যখন কুরআন পড়েন (খতম পড়েন) তখন কে কার পড়া শোনেন? সবাইতো পড়েন। উপরে বর্ণিত আয়াতে আল্লাহর নির্দেশটি আলেমগণ মানলেননা। আল্লাহর নির্দেশ না মানলে সে কি আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী নয়? যারা খতম পড়ান তারাও কুরআন শোনার সুযোগ পাননা, তারা সবাই মৌলভীদের আপ্যায়নে ব্যস্ত! কেহ মুরগীর পিছনে দৌড়ায়, কেহ দোকানে যায়, কেহ রান্নায় ব্যস্ত, কেহ থালা-বাসন ধোয়ায় ব্যস্ত! এমনকি মেহমানরাও ব্যবস্থাপনার তদারকিতে ব্যস্ত হয়ে যান। মনোযোগ দিয়ে শোনার সুযোগ কোথায়! আল্লাহর আদেশ পালন করছেননা তারাও। আল্লাহর আদেশ অমান্যকারী হতে তারাও বাকী থাকলেন কি? তবে শিশুরা মৌলভীদের মাথা ঝুকানো বড়ই মনোযোগ সহকারে দেখতে থাকে।

আমাদের দেশে প্রচলিত খতম পড়া হল মৌলভীদের খাওয়া ও নেয়ার পরিবর্তে কারো বাড়ীতে কুরআন তিলাওয়াত করা। বর্তমান সমাজে কুরআনের বিভিন্ন প্রকারের খতম প্রচলিত আছে। যেমন ঃ

ক) সম্পূর্ণ কুরআন এক জনে এক বৈঠকে পড়াকে বলে শাবীনা খতম।
খ) সম্পূর্ণ কুরআন কয়েকজনে মিলে এক সাথে পড়াকে বলে পুরা খতম ।
গ) কুরআনের কিছু কিছু অংশ কয়েকজনে ভাগ করে পড়াকে বলে খতম পড়া।
ঘ) মৃত দিবসে কুরআন পড়াকে বলে কুরআনখানি পড়া।

ঙ) সোয়া লক্ষ বার 'লা ইলাহা ইল্লা আন্তা **সুবহানাকা ইন্নী** কুন্‌তু মিনায যালিমীন' পড়াকে বলে খতমে ইউনুস।

চ) **তারাবীহ** সালাতে কুরআন খতম দেয়াকে বলে খতমে **তারাবীহ**।

খতমে ইউনুস

১। **আর স্মরণ** কর যুন-নূন এর কথা, যখন সে ক্রোধভরে বের হয়ে গিয়েছিল এবং মনে করেছিল আমি তার জন্য শাস্তি নির্ধারণ করবনা; অতঃপর সে অন্ধকার হতে আহ্বান করেছিল ঃ আপনি ছাড়া কোন মা'বূদ নেই; আপনি পবিত্র, মহান; আমিতো সীমা লংঘনকারী। [সূরা আম্বিয়া- ৮৭]

ইউনুস (আঃ) স্বজাতির প্রতি অসন্তুষ্ট হয়ে তাদের এলাকা ছেড়ে যখন নৌকায় আরোহণ করেন এবং নৌকা চলতে গিয়ে ডুবে যাবার উপক্রম হয় তখন আরোহীদের পরার্মশক্রমে নৌকা হালকা করার জন্য একজনকে সমুদ্রে ফেলে দেয়ার সিদ্ধান্ত হল। লটারী করা হল, লটারীতে তিনবারই ইউনুস (আঃ) এর নাম উঠার কারণে ইউনুস (আঃ) নৌকা থেকে লাফিয়ে পড়লেন। সমুদ্রের একটি বিরাট মাছ ইউনুস (আঃ) কে গিলে ফেলল। তখন ইউনুস (আঃ) এ বিপদ থেকে রক্ষা পাবার জন্য মহান আল্লাহর নিকট উপরোক্ত দু'আ করতে লাগলেন ঃ লা ইলাহা ইল্লা আন্তা সুবহানাকা ইন্নী কুন্‌তু মিনায যালিমীন। সাধারণতঃ বিপদ-আপদ হতে মুক্তি পাওয়ার জন্য এই দু'আটি পড়া হয়। দু'আটিতে স্পষ্ট বুঝা যায় "নিশ্চয়ই আমি অত্যাচারীদের একজন ছিলাম" অর্থাৎ যে এ দু'আটি পড়বে আল্লাহ তার প্রতি দয়া করতে পারেন। এই দু'আটি যদি কোনো মৌলভী দ্বারা সোয়া লাখ বার পড়ানো হয় তাহলে বিপদমুক্তি কার হবে? ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ "লাহা মা কাসাবাত ওয়া আলাইহা মাক্‌তাসাবাত। অর্থাৎ যে যা উপার্জন করে তার ফল তারই উপর বর্তাবে। [সূরা বাকারা-২৮৬] আল্লাহর কথায় বুঝা গেল ঃ যে দু'আ করল, যে আমল করল, ফলাফলটি তারই। তাহলে মুন্সি-মৌলভীদের বিপদটা কেটে যাবে। যে পড়ালেন তার আর কিছুই হবেনা। মৌলভীরা বলেন যে, তাদেরও সাওয়াব বখশে দিয়ে দিবেন, অর্থাৎ সাওয়াব ট্রান্সফার করে দিবেন। অথচ কারও সাওয়াব অন্য কারও নামে ট্রান্সফার করা যায়না। ⊙ যদি সাওয়াব ট্রান্সফার করা যেত তাহলে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলইহি ওয়া সাল্লাম বলতেন না ঃ মুহাম্মাদের মেয়ে ফাতিমা! তুমি আমার নিকট হতে যত ইচ্ছা চেয়ে নাও, আল্লাহর কাছে আমি তোমার কোন কাজেই লাগবনা। [মুসলিম/৩৯৭] মৌলভীরা যদি অন্যের নামে সাওয়াব ট্রান্সফার করতে পারেন তাহলে নিশ্চয়ই প্রার্থনা করে তাদের পাপটাও অন্যের নামে ট্রান্সফার করতে পারবে! এই প্রতারণাটা করা হয় জেনে শোনেই। সাওয়াবের জন্য কুরআন পাঠ করে খাওয়া, নেয়া রাসূলুল্লাহ **সাল্লাল্লাহু** 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি। সাহাবাগণও (রাঃ) করেননি। **খতমের** অনুষ্ঠান শারীয়াতে নেই। পরবর্তীতে এই অনুষ্ঠানের আবিস্কার **হয়েছে অর্থ** উপার্জনের জন্য। অতএব এই খতম প্রথা একটা বিদ'আত। বিদ'আত যারা করে তারা বিদ'আতী।

⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন বিদ'আতীকে সাহায্য করল, আল্লাহ তাকে লা'নত করেন। [বায়হাকী]

⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে মুহাম্মাদের বাধ্যতা স্বীকার করল সে আল্লাহর বাধ্যতা স্বীকার করল। আর যে মুহাম্মাদের অবাধ্য হল, সে আল্লাহর অবাধ্য হল। [ইব্ন মাজাহ/৩]

যারা খতম পড়ে এবং যারা পড়ায় উভয়ই বিদ'আতী। ইসলামকে ধ্বংস করার সাহায্য করল উভয়েই। কারণ তারা বিদ'আতীদেরকে শুধু সম্মান নয়, খাওয়া ও দেয়ার কাজটি করে। আল্লাহর লা'নত তাদের উপর। খতম পড়ুয়ারা বাতিল পন্থায় লোকদের ধন-মাল ভক্ষণ করে। কিন্তু কিভাবে তারা জনগণকে আল্লাহর পথ হতে সরিয়ে ফেলে? শোনুন তাহলে! ধনী লোকের বিশ্বাস, মৌলভীদের দ্বারা খতম পড়ালে সাওয়াব পাওয়া যায়। মৌলভী ছাড়া, পীর ছাড়া, নিজেরা করলে কিছু হয়না বলে বিশ্বাস করে। কিন্তু এই মৌলভীরা যদি আল্লাহর আদেশগুলি গোপন না করে লোকদের নিকট প্রচার করতেন আর বলতেন ঃ সুদ-ঘুষ মুক্ত হালাল উপার্জন এবং সালাত, সিয়াম (রোযা) না করলে কারও কোন দু'আয় কাজ হবেনা তাহলে লোকেরা হতাশ হয়ে আল্লাহর পথ খুঁজত। আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী হালাল আয়, সালাত, সিয়াম (রোযা), হাজ্জ পালন করত এবং খতম, শাবীনার প্রতারণায় পড়তনা। মৃত ব্যক্তির বিছানার কাছে বসে, কাবরের পাশে বসে মৌলভীরা কুরআনখানির রেওয়াজ চালু করে অর্থ উপার্জনের পথ ধরলেন। কিন্তু আল্লাহ বলেন ঃ

⊙ তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেনা, আর বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেনা (বিশেষতঃ) যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা নামল-৮০]

⊙ আর জীবিত ও মৃত সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শোনান। যারা কাবরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পারবেনা। [সূরা ফাতির-২২]

⊙ তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারনা, বধিরকেও শোনাতে পারবেনা আহ্বান, যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা রূম-৫২]

আল্লাহ তা'আলার বর্ণিত আয়াত হতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, মৃতরা কারও কোন কথা শোনতে পায়না। তাহলে মৌলভীরা কাকে কুরআন পড়া শোনান? এটা কুরআনের অবমাননা করা, কুরআনের সাথে মস্করা করা নয় কি?

হে আল্লাহ! আমাদেরকে এ সকল বিদ'আতী চক্র ও আমল থেকে রক্ষা করুন।

শাবীনা খতম

১। আল্লাহ বলেন ঃ আর কুরআন আবৃত্তি কর ধীরে ধীরে, স্পষ্ট ও সুন্দরভাবে। [সূরা মুয্যামমিল-৪]।

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি সাত দিনে একবার কুরআন খতম কর এবং এর চেয়ে কম সময়ে কুরআন খতম করনা। [বুখারী/৪৬৭৭]

☐ এখানেও এক শ্রেণীর আলেম আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) আদেশ অমান্য করে বাতিল পন্থায় জনগণের ধন-মাল ভক্ষণ

করলেন। এখানেও প্রতারণা! শাবীনা খতমও দীনের মধ্যে নতুন সংযোজন এবং বিদ'আত। শাবীনা পড়ানোর বেলায় দেখা যায়, মৌলভীসাহেব কয়েক ঘন্টার মধ্যে সম্পূর্ণ কুরআন পাঠ খতম করে ফেলেন, যা হাদীসের নির্দেশের বিপরীত।

কুরবানী সম্পর্কীত

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَلِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنسَكًا لِّيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَىٰ مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ فَإِلَٰهُكُمْ إِلَٰهٌ وَاحِدٌ فَلَهُ أَسْلِمُوا وَبَشِّرِ الْمُخْبِتِينَ

আমি প্রত্যেক সম্প্রদায়ের জন্য কুরবানীর নিয়ম করে দিয়েছি যাতে আমি তাদেরকে জীবনোপকরণ স্বরূপ যে সব চতুস্পদ জন্তু দিয়েছি সেগুলির উপর আল্লাহর নাম উচ্চারণ করে; তোমাদের মা'বূদ একই মা'বূদ, সুতরাং তাঁরই নিকট আত্মসমর্পন কর এবং সুসংবাদ দাও বিনীতজনদেরকে। [সূরা হাজ্জ-৩৪]

২। অতঃপর তোমরা উহা হতে আহার কর এবং দুঃস্থ, অভাবগ্রস্তকে আহার করাও। [সূরা হাজ্জ-২৮]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন (যিলহাজ্জের চাঁদের) প্রথম দশ দিন উপস্থিত হয় আর কারো নিকট কুরবানীর পশু থাকে, যা সে যবাহ করার নিয়ত রাখে, তাহলে সে যেন কুরবানী করার আগ পর্যন্ত তার চুল না ছাটে এবং হাত ও পায়ের নখ না কাটে। [মুসলিম/৪৯৫৬-উম্মে সালামা (রাঃ), আবূ দাউদ/২৭৮২, ইব্ন মাজাহ/৩১৪৯, নাসাঈ/৪৩৬৩-আয়িশা (রাঃ)]

(ক) কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী প্রত্যেক সমর্থবান মুসলিমের কুরবানী করা উচিত।

(খ) ঈদুল আযহার চাঁদ উদয় হওয়ার পর থেকে কুরবানী করার আগ পর্যন্ত চুল ছাটা বা হাত ও পায়ের নখ কাটা উচিত নয়। বর্তমান মুসলিম সমাজের লোকেরা কুরআন ও সহীহ হাদীস পাঠ করেনা বলেই হাদীসটি জানেনা এবং তা মান্য করেনা।

(গ) শহর এলাকায় কুরবানীর গোশ্ত অধিকাংশ লোকেরা শুধু নিজেরাই খায় এবং ফ্রিজ ভর্তি করে সারা বছর খাওয়ার জন্য রাখে। কিন্তু দুঃস্থ ও অভাবগ্রস্থদের নিকট কুরবানীর গোশ্ত পৌছানোর চেষ্টা করেনা, যা প্রত্যেক সমর্থবান লোকের উক্ত কর্তব্য পালন করা উচিত। উদাহরণ স্বরূপ নিজের বাসার নিকট যেমন ভাল স্কুল, কলেজ, ইউনিভার্সিটি নাও থাকতে পারে। তখন আমরা কষ্ট করে হলেও ছেলে/মেয়েদেরকে ঐ স্কুল, কলেজ বা ইউনিভার্সিটিতে প্রতিদিন পৌছানো ও আনার চেষ্টা করি। সেরূপ বৎসরের একটি দিন কুরবানীর গোশ্ত গরীব এলাকায় পৌছানোর চেষ্টা করা আমার/আপনার উপর কুরআনের নির্দেশ।

কুরবানী পশুর শরীকানা প্রসঙ্গ

১। জাবির (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা হুদাইবিয়া নামক স্থানে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে থেকে একটি গরু সাত জনের পক্ষ থেকে এবং একটি উট সাত জনের পক্ষ থেকে কুরবানী করেছি। [তিরমিযী/৯০৬, ১৫০৮, আবূ দাউদ/২৮০০, ইব্‌ন মাজাহ/৩১৩২]

২। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হাজ্জে তামাত্তু আদায় করতাম এবং একটি গাভী কুরবানীতে সাত ব্যক্তি শরীক হতাম এবং আমরা উট কুরবানী করতেও সাত ব্যক্তি শরীক হতাম। [আবূ দাউদ/২৭৯৮, নাসাঈ/৪৩৯৫]

৩। ইমাম মালিক (রঃ) কুরবানীতে শরীক হওয়ার বিষয়টিকে মাকরূহ মনে করতেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)-২য় খন্ড পৃষ্ঠা ৭৮]

৪। আতা ইব্‌ন ইয়াসার (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি আবূ আইউব আনসারীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আপনাদের কুরবানী কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে কোন ব্যক্তি নিজের ও স্বীয় পরিবারের পক্ষ থেকে একটি বকরী কুরবানী করত। তা থেকে তারাও আহার করত এবং অন্যদেরও আহার করাত। পরবর্তী পর্যায়ে লোকেরা কুরবানীকে অহমিকা প্রকাশের বিষয়ে পরিণত করে এবং এখন যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তা তো দেখতেই পাচ্ছ। [ইব্‌ন মাজাহ/৩১৪৭, ৩১৪৮, তিরমিযী/১৫১১]

(ক) উপরোক্ত হাদীস থেকে সফরের সময়ে ভাগে কুরবানী করার হাদীস বর্ণিত হলেও স্থায়ীভাবে বসবাসকারীরা ভাগে কুরবানী দিতে পারবে কিনা এ ব্যাপারে কোন সহীহ হাদীস পাওয়া যায়না। যেহেতু স্থায়ীভাবে বসবাসকারীদের ব্যাপারে ভাগে কুরবানী দেয়ার নিষেধাজ্ঞামূলক কোন হাদীস বর্ণিত হয়নি এবং ভিন্ন কোন হাদীসও বর্ণিত হয়নি তাই অধিকাংশ আলেমের অভিমত এই যে, তারাও ভাগে কুরবানী দিতে পারবেন।

(খ) হাদীস অনুযায়ী একটি পরিবারের পক্ষে একটি পশু যথা ছাগল/ভেড়া/দুম্বা/গরু/উট কুরবানী করা যাবে।

(গ) বর্তমান সমাজের লোকেরা অহংকারের বশবর্তী হয়ে অন্যদেরকে দেখানোর জন্য কে কত টাকা মূল্যের পশু কুরাবানী করতে পারে সে বিষয়ে প্রতিযোগিতা করে, যা উচিত নয়।

(ঘ) তা ছাড়াও গোশ্‌ত খাওয়ার জন্য, স্ত্রী-সন্তানদের সান্ত্বনা দেয়ার জন্য এবং লোকজনদেরকে জানানোর জন্য একটি ছাগল কুরবানী দেয় এবং সঙ্গে গরুর একটি ভাগও দেয়। এরূপ পদ্ধতি সমাজে এখন বেশী দেখা যাচ্ছে।

(ঙ) কুরবানীতে একটি গরুতে ৭জন পর্যন্ত শরীক হওয়া সম্পর্কে কোন মতভেদ নেই। কিন্তু সেই ৭ জনের একই পরিবারভুক্ত হওয়া আবশ্যক নাকি বিভিন্ন পরিবারের ৭ জন ব্যক্তির পক্ষেও সেই গরুতে শরীক হওয়া চলবে এই বিষয়ে

মতভেদ রয়েছে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একই কুরবানীতে তাঁর পরিবারবর্গকে শরীক করেছিলেন, ইহা অকাট্যভাবে প্রমাণিত হয়েছে। সুতরাং পরিবারভুক্তের সংখ্যা সাতের অতিরিক্ত হলেও তাদের সকলের পক্ষ হতে একটি কুরবানী যথেষ্ট হতে পারে, সাতের কম সংখ্যক হলেও কোন ক্ষতির সম্ভাবনা নেই। কারণ ঈদুল আযহার দিন আল্লাহর জন্য যত অধিক রক্ত প্রবাহিত করা হবে ততই সাওয়াব বর্ধিত হবে।

আল্লাহর উদ্দেশেই কেবল পশু কুরবানী করতে হবে

১। অতএব তুমি তোমার রবের উদ্দেশে সালাত আদায় কর এবং কুরবানী কর। [সূরা কাউসার-২]

২। তুমি বলে দাও ঃ আমার সালাত, আমার কুরবানী, আমার জীবন ও আমার মরণ সব কিছু সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহর জন্য। তাঁর কোন শরীক নেই, আমি এর জন্য আদিষ্ট হয়েছি, আর মুসলিমদের মধ্যে আমিই হলাম প্রথম। [সূরা আন'আম-১৬৩]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৭২, ৭৩।

◘ যে ব্যক্তি আল্লাহ ছাড়া অন্যের জন্য পশু যবাহ করবে, তা সে কোন ফিরিশতার উদ্দেশে করুক, বা নবী-রাসূলের উদ্দেশে বা কোন অলী বা আওলিয়াদের উদ্দেশে করুক, সবই শির্‌কে পরিণত হবে এবং এতে লিপ্ত ব্যক্তি মুশরিক বলে গন্য হবে। সুতরাং মুসলিম ব্যক্তির উচিত এ ধরনের শির্‌কে লিপ্ত না হওয়া এবং একমাত্র আল্লাহর উদ্দেশেই কেবল কুরবানী করা ।

কাবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা এবং দু'আ করা প্রসঙ্গ

১। এ এক কল্যাণময় কিতাব, এটা আমি তোমার উপর অবতীর্ণ করেছি যাতে মানুষ এর আয়াতসমূহ অনুধাবন করে এবং বোধশক্তি সম্পন্ন ব্যক্তিরা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা সা'দ-২৯]

২। প্রত্যেক নতুন উদ্ভাবিত কাজই বিদ'আত। প্রত্যেক বিদ'আত ভ্রষ্টতা। আর প্রত্যেক ভ্রষ্টতার পরিণতি হচ্ছে জাহান্নাম। [মুসলিম/১৮৭৫]

◘ মুসলিমদের উচিত নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদিত সুন্নাতের অনুসারী সাহাবায়ে কিরাম ও তাবিঈনের পদাঙ্ক অনুসরণ করা, যাতে তারা কল্যাণ ও হিদায়াত লাভ করতে পারে। কাবরস্থানে কুরআন তিলাওয়াত করা সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা তাঁর সাহাবায়ে কিরাম থেকে কোন প্রমাণ নেই। আর যে ব্যাপারে সহীহ কোন প্রমাণ নেই তা আমাদের নিজেদের পক্ষ থেকে উদ্ভাবন করা জায়েয নয়। কাবরের কাছে দন্ডায়মান হয়ে সাধ্যানুযায়ী মৃতের জন্য দু'আ করতে কোন অসুবিধা নেই । যেমন এরূপ বলবে, "হে আল্লাহ! তাকে ক্ষমা কর। হে আল্লাহ! তাকে দয়া কর। হে আল্লাহ! তাকে জান্নাতে প্রবেশ করাও। হে আল্লাহ! তার কাবরকে প্রশস্ত করে দাও ...ইত্যাদি।

আর কাবরের কাছে নিজের জন্য দু'আ করার উদ্দেশে কেহ যদি সেখানে যায় তাহলে তা বিদ'আত। কেননা শারীয়াতের প্রমাণ ব্যতীত কোন স্থানকে দু'আর জন্য নির্ধারণ করা যাবেনা। আর যে ব্যাপারে কোন নির্দেশনা নেই তা নিজেদের পক্ষ থেকে নির্ধারণ করা বিদ'আত।

কাবর প্রসঙ্গ

১। জানাযার সালাত ছাড়া কাবরকে সামনে রেখে অন্য কোন সালাত আদায় করা জায়েয নয়। [মুসলিম/২১১৯]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবরে পাকাঘর নির্মাণ, কাবরকে বর্ধিতকরণ, চুনকাম করা এবং কাবরের উপর লিখতেও নিষেধ করেছেন। [নাসাঈ/২০৩১-জাবির (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/১৫৬২, ১৫৬৩, তিরমিযী/১০৫২]

৩। কাবরের উপর হাঁটা-চলা এবং বসা নিষেধ। [ইব্‌ন মাজাহ/১৫৬৬, ১৫৬৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

(ক) বিভিন্ন মাজারে দেখা যায় যে, কাবরকে সামনে রেখে লোকেরা সালাত (নামায) আদায় করে।

(খ) শহর/গ্রামের ধনী ব্যক্তিরা নিজের/পিতা-মাতা/নিজের পরিবারের মৃত ব্যক্তিদের কাবরকে চিরস্থায়ী স্মরণ রাখার জন্য কাবরকে পাকা করণ সহ নাম, ঠিকানা, মৃত্যু সন ইত্যাদি উল্লেখ করেন, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত, বিধায় উক্ত কাজ থেকে আমাদের বিরত থাকা উচিত।

(গ) মৃত ব্যক্তিদেরকে কাবরে রেখে তিন মুঠি মাটি দিতে হয়। কিন্তু সে সময় "মিনহা খালাকনাকুম ওয়া ফিহা নঈদুকুম, ওয়া মিনহা নুখরিজুকুম তারাতান উখরা" বলা কোন সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এ ক্ষেত্রে অধিকাংশ আলেমের মতামত হচ্ছে "বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বলেই তিন মুঠি মাটি দিতে হবে।

কাবর জিয়ারাতের উদ্দেশে দেশ/বিদেশ গমণ

১। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মাসজিদুল হারাম (মাক্কা মুকাররামা), মাসজিদুর রাসূল (মাসজিদে নাববী) এবং মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদে (ভ্রমণের উদ্দেশে) গমন করা যাবেনা। [বুখারী/১১১১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/৭০৩]

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবর জিয়ারাতকারী মহিলাদেরকে লা'নত করেছেন। [ইব্‌ন মাজাহ/১৫৭৬–আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

কাবর জিয়ারাত করা জায়েয, কিন্তু তা করতে হবে শারীয়াত সম্মতভাবে। তেমনি কোন নাবী বা অন্য কোন সৎ আমলকারীর কাবর জিয়ারাত করার উদ্দেশে দেশ/বিদেশ সফর করাও জায়েয নয়।

তিনটি মাসজিদ ছাড়া অপর কোন মাসজিদের জন্যে সফর মানত করা হলে তা পূরণ করা সঠিক নয় এবং তা শুদ্ধ হবেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের হাদীসই হচ্ছে সুন্নাত এবং এই অনুযায়ীই আমল করেছেন সাহাবায়ে কিরাম। এমন কি শুধু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাবর জিয়ারাতের জন্যে সাহাবাগণ সফর করেননি এবং তা করা তাঁরা পছন্দও করেননি। এমন কি সাহাবায়ে কিরামদের (রাঃ) কেহ দুনিয়ার একটি কাবরস্থান অথবা অন্য কোন নাবী-রাসূলের কাবর জিয়ারাতের উদ্দেশে সফর করেছেন বলেও প্রমান পাওয়া যায়না।

আবূ বাকর (রাঃ), উমার (রাঃ), উসমান (রাঃ), আলী (রাঃ) এবং তাদের পরবর্তী লোকদের যুগ শেষ হওয়া পর্যন্ত কোন সাহাবী কোন নাবী বা কোন সৎ আমলকারীর কাবর জিয়ারাতের জন্য সফরে দেশ/বিদেশে যাওয়ার বর্ণনা পাওয়া যায়না। সুতরাং কাবর বা নির্দিষ্ট কোন স্থানকে নিজেদের ইচ্ছামত পবিত্র বারাকাতওয়ালা বা শরীফ ইত্যাদি মনে করা, তার জিয়ারাত করার জন্য এবং কাবরস্থ অলী, পীর, দরবেশের নিকট প্রার্থনা বা তাকে অসীলা করার জন্য বিদেশ সফর করা এবং সেখান থেকে বারাকাত হাসিল করতে চাওয়া এসবই জাহিলিয়াতের জামানার মুশরিক লোকদের কাজ এবং এ কাজ দীন ইসলামে সম্পূর্ণ খেলাপ। এ কারণে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ ধরনের কাজ করতে নিষেধ করেছেন।

বর্তমানে এই উপমহাদেশের বিভিন্ন জায়গায় এক শ্রেণীর পীর, অলী, দরবেশের কাবরকে কেন্দ্র করে উরশ এবং অন্যান্য শারীয়াত বিরোধী কার্যকলাপ অনুষ্ঠিত হয়, আর সেখানে তাদের মুরিদরা দলে দলে একত্রিত হয় মৃত পীরের কাবর থেকে পুণ্য লাভের উদ্দেশে। কিন্তু তারা জানেনা যে, এ সবই হচ্ছে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের সম্পূর্ণ খেলাপ, সুন্নাতের বিপরীত এক সুস্পষ্ট বিদ'আত। আর পীর ভক্তির তীব্রতা ও অতিশয্যের কারণে বেশীর ভাগ ক্ষেত্রে তা শির্কে পরিণত হয়। আল্লাহ তা'আলা এই বিদ'আতীদের হিদায়াত দান করুন।

এমন কি, মাক্কার কাবা ঘরে হাজ্জ করতে গিয়ে মাদীনায় যাওয়া যারা বাধ্যতামূলক বলে মনে করেন তাদের উচিত মাসজিদে নাববীতে সালাত আদায়ের নিয়তে সফর করা। মাসজিদে নাববীতে সালাত আদায় করা সুন্নাত। মাসজিদে নাববীতে পৌঁছে গেলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাবর জিয়ারাত করা সুন্নাত। তা শুধু মাত্র পুরুষদের জন্য। মহিলাদের জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাবর জিয়ারাত করা জায়েয নয়।

কাবর এবং পীর পূজা

১। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। [সূরা আহকাফ-৫]

২। কে আর্তের আহ্বানে সাড়া দেন, যখন সে তাঁকে ডাকে এবং বিপদ-আপদ দূরীভূত করেন এবং তোমাদেরকে পৃথিবীতে প্রতিনিধি করেন? আল্লাহর সাথে

অন্য কোন মা'বূদ আছে কি? তোমরা উপদেশ অতি সামান্যই গ্রহণ করে থাকো। [সূরা নামল-৬২]

৩। মৃতকে তো তুমি কথা শোনাতে পারবেনা, বধিরকেও পারবেনা আহ্বান শোনাতে, যখন তারা পিঠ ফিরিয়ে চলে যায়। [সূরা নামল-৮০]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-১৮৮, ১৯৪, হাজ্জ-৭৩, ইউনুস-১০৭, ফাতির-১৩, আন'আম-৯৩, ফাতিহা-১-৭।

কাবর ও পীর পূজারীরা তাদের বুজুর্গ, দরবেশ ও পীরদের তথাকথিত নামধারী অলী-আওলিয়াদের কাবরে গিয়ে কাবরের চারিপার্শ্বে তাওয়াফ করে, হাত দ্বারা কাবর স্পর্শ করে ও সেই হাত কপালে, মুখ ও বুকে ঘষে। আর অনেকেই ইট, পাথর বা কাঠের উপরে চুমা দেয় ও সেখানে মুখমন্ডল ঘষে। অনেকে আবার খুবই ভয়-ভীতি ও বিনয়ের সাথে কাবরের সামনে দাঁড়িয়ে অথবা সালাতের বৈঠকের মত বসে কাবরকে সামনে রেখে সাজদায় গিয়ে খুবই অনুনয়-বিনয় করে চোখের পানিতে বুক ভাসিয়ে নিজ নিজ জীবনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানের জন্য (যেমন ঃ কেহ কঠিন রোগ থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য, কেহ সন্তান লাভের জন্য, কেহ পরীক্ষায় ভাল রেজাল্ট করার জন্য, কেহ ব্যবসায়ে অধিক লাভবান হওয়ার জন্য, কেহ বিদেশে যাওয়ার জন্য, কেহ কোন মেয়েকে বিবাহ করার জন্য ......ইত্যাদি বিষয়ে) এমন কাকুতি মিনতি সহকারে কাবরবাসীর নিকট দু'আ করতে থাকে যা দেখলে অবাক লাগে। অথচ ঐ সমস্ত কাবর ও পীর পূজারীদেরকে মহান আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে কাবর ও জাহান্নামের কঠিন আযাব থেকে মুক্তি পাওয়ার জন্য মহান আল্লাহর কাছে ফরিয়াদ জানিয়ে এমনভাবে কাকুতি-মিনতি সহকারে দু'আ করতে সহজে দেখা যায়না। আর অনেক সময় কাবর পূজারীরা কাবর বাসীকে সম্বোধন করে বলতে থাকে ঃ হে খাজা বাবা! হে দয়াল বাবা! হে আবদুল কাদের জিলানী! হে বাবা শাহজালাল! হে মাইজভান্ডারী ......ইত্যাদি, আমি বহুদূর হতে বহু কষ্ট করে তোমার দরবারে এসেছি বাবা! তুমি আমাকে নিরাশ করনা। বাবা তুমি আমাকে খালি হাতে ফিরিয়ে দিওনা..... ইত্যাদি।

পক্ষান্তরে যারা দাবী করে যে, জীবিত কিংবা মৃত পীর-ফকীর ও অলী-আওলিয়ারা মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখে, দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদের হাত আছে, আর তারা গায়িবের খবর রাখে, তাদের এ সমস্ত ধারণা ও বিশ্বাস মিথ্যা ও কল্পনা প্রসূত। বলা যেতে পারে যে, পাক-ভারত উপমহাদেশে প্রসিদ্ধ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ), খাজা মঈনউদ্দীন চিশতি, শাহজালালসহ আরো অনেক নাম জানা অজানা নামধারী অলী-আওলিয়া ও পীর-ফকীরকে লক্ষ লক্ষ মানুষ শ্রদ্ধা করে, বিপদে-আপদে পড়ে যাদের নাম স্মরণ করে, আশা-আকাংখা পূরণের জন্য যাদের নামে মানত মানে, তাদের কাবরে-মাজারে ও খানকায় গিয়ে অকাতরে টাকা-পয়সা দান করে, গরু-ছাগল যবাহ করে। এমনকি ঐ সমস্ত কাবরের উপরে আতর, গোলাপপানি ও ফুল ছিটানো হচ্ছে, আগরবাতি, মোমবাতি ও বিজলি বাতি জ্বালানো হচ্ছে, ফ্যান ঘুরানো হচ্ছে,

সামিয়ানা টানানো হচ্ছে এবং ফুলের গালিচা বিছানো হচ্ছে ইত্যাদি। নিঃসন্দেহে উল্লিখিত কাজগুলি সবই আল্লাহর সাথে শরীক করা যা মুসলিমদের জন্য হারাম।

আর ঐ সমস্ত মৃত ও জীবিত নামধারী পীর-ফকীর ও অলী-আওলিয়ারা অন্যের উপকার করা তো দূরের কথা, বরং তারা নিজেদের জন্য সামান্যতম ভাল-মন্দ করার ক্ষমতাও রাখেনা। এমতাবস্থায় ঐ সমস্ত নামধারী পীর-ফকীর ও অলী-আওলিয়ারা কিভাবে আপনাকে সাহায্য করবে, কিভাবে আপনাকে গাড়ীর দুর্ঘটনা থেকে বাঁচাবে? কিভাবে নৌকা, লঞ্চ ও জাহাজ ডুবির হাত হতে আপনাকে রক্ষা করবে? কিভাবে আপনার ছেলের পরীক্ষার রেজাল্ট ভাল করে দিবে? কিভাবে আপনার ব্যবসায় সার্বিক ক্ষতির হাত থেকে বাঁচিয়ে আপনাকে লাভবান করে দিবে? কিভাবে আপনাকে সন্তান দান করবে? কিভাবে আপনার চুরি হয়ে যাওয়া বা হারিয়ে যাওয়া জিনিস পত্রের সন্ধান দিবে? কিভাবে আপনাদের স্বামী-স্ত্রীর মাঝে মনের মিল সৃষ্টি করে দিবে? কিভাবে অন্য পুরুষ বা মহিলাকে আপনার বাধ্যগত করে দিবে? এ সমস্ত বিষয়গুলি সম্পর্কে আপনার ঐ সুস্থ বিবেকের কাছে প্রশ্ন করে দেখুন, কী জবাব আসে?

কাবরের আযাব

১। তার থেকে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে অথবা বলে ঃ আমার প্রতি অহী নাযিল হয়; যদিও তার কাছে কিছুই অবতীর্ণ হয়না। আর যে বলে ঃ আল্লাহ যা নাযিল করেন আমি শীঘ্রই তার অনুরূপ নাযিল করব। হায়! যদি তুমি ঐ যালিমদেরকে দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে, আর ফিরিশতারা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে ঃ তোমাদের জানগুলোকে বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে যেহেতু তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা প্রকৃত সত্য নয়, আর তাঁর নিদর্শনগুলির ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে। [সূরা আন'আম-৯৩]

২। সকাল-সন্ধ্যায় তাদেরকে উপস্থিত করা হয় আগুনের সম্মুখে এবং যেদিন কিয়ামাত সংঘটিত হবে সেদিন বলা হবে ঃ ফির'আউন সম্প্রদায়কে নিক্ষেপ কর কঠিনতম শাস্তিতে। [সূরা মু'মিন-৪৬]

৩। তোমরা কাবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কাবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। তোমরা কাবরের আযাব থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা কর। কথাটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বললেন। [মুসলিম/৬৯৪৯]

৪। মু'মিন ব্যক্তি যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে একদল রাহমাতের ফিরিশতা সাদা রেশমী কাপড় নিয়ে এসে (তার) আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলতে থাকেন ঃ "তুমি আল্লাহ তা'আলার রাহমাত এবং সন্তুষ্টির পানে বের হয়ে এসো, আল্লাহ তা'আলা তোমার উপর রুষ্ট নন; তুমি তাঁর উপর সন্তুষ্ট, তিনিও

তোমার উপর সন্তুষ্ট"। তখন আত্মা মিশ্‌কের সুঘ্রাণ অপেক্ষাও অধিক সুঘ্রাণ ছড়াতে ছড়াতে বের হয়ে আসে। তখন ফিরিশতাগণ সম্মানের উদ্দেশে আত্মাকে পর্যায়ক্রমে একজনের হাত থেকে অন্যজনের হাতে দিয়ে আসমানের দরজায় নিয়ে আসেন। সেখানকার ফিরিশতাগণ তখন বলতে থাকেন ঃ "এ সুগন্ধি কত না উত্তম! যা তোমরা পৃথিবী থেকে নিয়ে এসেছ! তাঁরা তাকে মু'মিনদের রূহসমূহের কাছে নিয়ে যান। তোমাদের কেহ প্রবাস থেকে এলে তোমরা যে রূপ আনন্দিত হও, মু'মিনদের রূহও ঐ নবাগত রূহকে পেয়ে ততোধিক আনন্দিত হয়। মু'মিনদের রূহ নবাগত রূহকে জিজ্ঞেস করে যে, অমুক ব্যক্তি দুনিয়ায় কি কাজ করেছে? অমুক ব্যক্তি দুনিয়ায় কি কাজ করেছে? তখন ফিরিশতারা বলেন ঃ তার সম্পর্কে তোমরা কি জিজ্ঞেস করবে? সে দুনিয়ার চিন্তা-ভাবনায় ছিল। নবাগত রূহ বলে ঃ সে কি তোমাদের কাছে আসেনি? তখন আসমানের ফিরিশতারা বলেন ঃ তাকে তার বাসস্থান হাবিয়া (জাহান্নামে) নিয়ে যাওয়া হয়েছে।

আর কাফির যখন মৃত্যুর সম্মুখীন হয় তখন তার কাছে আযাবের ফিরিশতারা চটের ছালা নিয়ে আগমন করে এবং আত্মাকে উদ্দেশ্য করে বলেন ঃ "তুমি আল্লাহ তা'আলার আযাবের পানে বের হয়ে এসো, তুমিও আল্লাহ তা'আলার উপর অসন্তুষ্ট, আল্লাহ তা'আলাও তোমার উপর অসন্তুষ্ট।" তখন সে মুর্দার দুর্গন্ধ থেকেও অধিকতর দুর্গন্ধযুক্ত হয়ে বের হয়ে আসে। যখন ফিরিশতারা তাকে নিয়ে দুনিয়ার আসমানের দরজায় পৌছে তখন তথাকার ফিরিশতারা বলতে থাকেন ঃ এ কি দুর্গন্ধ! এরপর ফিরিশতারা তাকে কাফিরদের আত্মাসমূহের কাছে নিয়ে যায়। [নাসাঈ/১৮৩৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

এমন আরও অনেক দলীল-প্রমাণ রয়েছে যে, কাবরের আযাব হবে রূহের উপরে। শরীরের উপরে নয়। যদি শরীরের উপরে হত এবং তা দেখা যেত, তাহলে বিষয়টি গায়িবের উপর ঈমানের অন্তর্ভুক্ত হতনা। কিন্তু কাবরের আযাবের বিষয়টি আলামে বারযাখের তথা মৃত্যু পরবর্তী জীবনের সাথে সম্পৃক্ত। দুনিয়ার প্রকাশ্য বিষয়াদি দ্বারা এটাকে উপলব্ধি করা যাবেনা।

কাবরবাসীর নিকট দু'আ চাওয়া এবং তাদের জন্য নাযর মানত পেশ করা

১। তোমার রাব্ব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দিব। যারা অহংকারবশতঃ আমার 'ইবাদাত করেনা, নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সূরা মু'মিন-৬০]

২। যে নি'আমাতই তোমরা পেয়েছ তাতো আল্লাহর নিকট হতেই। আর যখন দুঃখ-কষ্ট তোমাদেরকে স্পর্শ করে তখন তাঁর কাছেই তোমরা আকুল আবেদন জানাতে থাক। [সূরা নাহল-৫৩]

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর সাথে ডাকে অন্য ইলাহকে যার নিকট কোন সনদ নেই, তার হিসাব রয়েছে তার রবের নিকট, নিশ্চয়ই কাফিরেরা সফলকাম হবেনা। [সূরা মু'মিনূন-১১৭]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাহফ-১১০, মায়িদা-৭২, যুখরুফ-২৩, ২৪, আহযাব-২১, আলে ইমরান-৩১, আহকাফ-৫, ৬, নাহল-২০, ২১।

◫ বড়ই আফসোসের বিষয় যে, কিছু কিছু ইসলামী দেশে এমন অনেক মুসলিম রয়েছে যারা বিশ্বাস করে যে, কাবরে দাফনকৃত মাটির সাথে মিশে যাওয়া মৃত লোকটি উপকার বা অপকারের ক্ষমতা রাখে অথবা সন্তানহীনকে সন্তান দিতে সক্ষম। এ ধরনের শির্ককে সমর্থন করা, মদ্য পান করা, ব্যভিচার করা এবং অন্যান্য পাপের কাজ সমর্থন করার চেয়েও জঘন্য।

অধিকাংশ মানুষই কাবরবাসীদের কাছে চাওয়ার মাধ্যমে আল্লাহর সাথে শরীক করে থাকে। আল্লাহর কাছে কিছু পাওয়ার আশায় কাবরবাসীর অসীলায় দু'আ করে। কাবরবাসীদের কাছে দু'আ করা এবং বিপদাপদ দূর করার জন্য তাদের কাছে ফরিয়াদ করা বড় শির্কের অন্তর্ভুক্ত, যা মানুষকে ইসলাম থেকে বের করে দেয়। আল্লাহর কাছে দু'আ করি তিনি যেন মুসলিমদেরকে জানা/বুঝার হিদায়াত দান করেন।

আল্লাহ্ এমন সত্তা যিনি প্রয়োজনে কথা বলেন

১। আর নিশ্চয়ই আমি তোমার পূর্বের বহু রাসূলের প্রসঙ্গ তোমাকে বর্ণনা করেছি এবং অনেক রাসূল যাদের কথা তোমাকে বলিনি; আল্লাহ মূসার সাথে প্রত্যক্ষ কথা বলেছেন। [সূরা নিসা-১৬৪]

২। মানুষের এমন মর্যাদা নেই যে, আল্লাহ তার সাথে কথা বলবেন অহীর মাধ্যম ছাড়া, অথবা পর্দার অন্তরাল ব্যতিত, অথবা এমন দূত প্রেরণ ছাড়া যে দূত তাঁর অনুমতিক্রমে তিনি যা চান তা ব্যক্ত করে। তিনি সমুন্নত, প্রজ্ঞাময়। [সূরা শূরা- ৫১]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-১৪৪, তাহা-১২-২৩।

৪। রাসূল (সাঃ) মিরাজে আল্লাহর সাথে অহীর মাধ্যমে কথা বলেছেন। [মুসলিম/৩০৮]

৫। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ জান্নাতীগণ জান্নাতে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে। এ সময় জান্নাতবাসী ও আল্লাহর মাঝে তাঁর মহিমার চাদর ব্যতীত আর কোন অন্তরাল থাকবেনা। [মুসলিম/৩৪৫]

◫ মহান আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে আরও একটি গুণ হচ্ছে যে, তিনি শাশ্বত (চিরস্থায়ী)। কথা বার্তা বলেন (অর্থাৎ ঃ বাণী বা কথা বার্তা আল্লাহর গুণাবলীর মধ্যে একটি গুণ, যা কুরআন ও সুন্নাহ দ্বারা প্রমাণিত সত্য) এবং তাঁর সৃষ্টির মধ্য থেকে যাকে পছন্দ করেন তাকে সেই কথা শোনান। জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে অন্যান্য ফিরিশতা ও রাসূলগণও তাঁর কথা শুনেছেন। আর আল্লাহ সুবহানাহু তা'আলা পরকালে মু'মিনদের সঙ্গে কথা বলবেন এবং তারাও তাঁর সাথে কথা বলবে। তারা আল্লাহর অনুমতি সাপেক্ষে তাঁর সাক্ষাৎ লাভ করবে।

কথা বলা সম্পর্কীত

১। মু'মিনরা সফলকাম হয়েছে। যারা বিনয়- নম্র নিজেদের সালাতে। যারা অসার কথাবার্তা এড়িয়ে চলে। [মু'মিনূন-১-৩]

২। যেদিন তাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে তাদের জিহ্বা, তাদের হাত, তাদের পা তাদের কৃতকর্মের ব্যাপারে। [সূরা নূর-২৪]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফুরকান-২২, কাফ-১২, বানী ইসরাইল-৩৬, হুমাযা-১।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং আখিরাতের প্রতি ঈমান রাখে সে যেন ভাল কথা বলে, নতুবা নীরব থাকে। [বুখারী/৬০১৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৫৫৮০]

৫। মুসলিম সেই ব্যক্তি যার যবান ও হাত থেকে অন্য মুসলিমগণ নিরাপদ। [বুখারী/৬০২৭-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য অপছন্দ করেন গল্প-গুজব করা, অপ্রয়োজনীয় প্রশ্ন করা ও সম্পদ নষ্ট করা। [বুখারী/৫৫৩৭-মুগীরা (রাঃ)]

◻ বাকসংযম খুব সহজ নয়। জিহ্বা এমন এক মন্দ প্রবণ ইন্দ্রিয় যাকে দমন করা এক প্রকার জিহাদ। এ জন্য বলা হয়েছে সর্বশ্রেষ্ঠ মুসলিম সেই ব্যক্তি যার জিহ্বা ও হস্ত হতে অপর মুসলিম নিরাপদ থাকে। উপরন্তু কু-প্রবৃত্তির সাথে জিহ্বার সম্পর্ক খুবই ঘনিষ্ট। আস্বাদন, লালসা এবং বাচন ভঙ্গি ইত্যাদি একই অঙ্গে একত্রিত। লৌহ ও তরবারির আঘাতের জখমের উপশম আছে, কিন্তু বাক্ তরবারি ও কথার তীরের আঘাতের কোন উপশম নেই। ক্ষতস্থানের ব্যান্ডেজ আছে, কিন্তু এর কোন ব্যান্ডেজ নেই। যেহেতু ও আঘাত করে বাহ্যিক অঙ্গে, কিন্তু এ আঘাত করে অন্তরের মর্মমূলে। কারণ 'ব্যাধির চেয়ে মনের বেদনাই হল বড়।' এ জন্যই কথায় বলে "হাড় ভাঙলে জোড়া লাগে, কিন্তু মন ভাঙলে জোড়া লাগেনা"। সুতরাং এমন শত্রুকে দমন করা জিহাদ বৈ কি? বিশেষ করে এ শত্রু মনের খেয়াল-খুশি দ্বারা পরিচালিত।

কথাবার্তায় 'যদি' বলা প্রসঙ্গ

১। তারা এমন সব কথা অন্তরে পোষণ করে যা তোমার কাছে প্রকাশ করেনা। তারা বলে ঃ 'যদি মতামত প্রদানের অধিকার আমাদের কিছুমাত্রও থাকত, তাহলে আমরা এ স্থলে নিহত হতামনা'। বলে দাও, 'যদি তোমরা তোমাদের ঘরেও থাকতে তথাপি যাদের ভাগ্যে মৃত্যু লেখা ছিল, তারা তাদের এ মৃত্যুশয্যার পানে বের হয়ে পড়ত'। এবং এ জন্যও যে আল্লাহ তোমাদের অন্তরের বিষয়গুলো পরীক্ষা করেন এবং তোমাদের অন্তরস্থ বিষয়গুলোকে পরিষ্কার করেন, বস্তুতঃ আল্লাহ সকলের অন্তরের কথা সম্পর্কে বিশেষভাবে অবহিত। [সূরা আলে ইমরান-১৫৪]

২। যারা বসে থেকে নিজেদের ভাইদের সম্বন্ধে **বলতে লাগল**, আমাদের কথামত চললে তারা নিহত হতনা। বল, তোমরা সত্যবাদী **হলে** তোমাদের নিজেদের **উপর থেকে মরণকে** হটিয়ে দাও। [সূরা আলে ইমরান-১৬৮]

৩। **আবু হুরাইরা** (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **বলেছেন** ঃ যে বস্তু তোমার জন্য উপকারী উহা হাসিল করার নিমিত্তে পূর্ণভাবে আগ্রহ দেখাও, আল্লাহর নিকট সাহায্য চাও, কস্মিনকালেও তুমি বলনা যে, "যদি আমি এরূপ করতাম তাহলে এরূপ হত"। বরং তুমি বল ঃ আল্লাহ যা স্থির করেছেন এবং যা ইচ্ছা করেছেন তাই কাজে রূপায়িত করেছেন। কেননা 'যদি' কথাটি শাইতানের আমলের দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়।

এক ঃ "যদি" শব্দের নিন্দনীয় ব্যবহার হচ্ছে, কোন বান্দার পক্ষে কিংবা বিপক্ষে তার অপছন্দনীয় কোন কিছু ঘটলে সে বলে, "আমি যদি এরকম করতাম তাহলে এমন হত"। এ রকম বলা নিন্দনীয় এবং শাইতানের কাজ। কারণ এর দু'টি ক্ষতিকর দিক আছে। একটি হচ্ছে, এ রকম কথা বান্দার অনুতাপ, রাগ এবং দুশ্চিন্তার দ্বার উন্মুক্ত করে দেয়, যা বন্ধ করে দেয়া উচিত। অপরটি হচ্ছে, এতে আল্লাহর প্রতি এবং তাঁর নির্ধারিত তাকদীরের প্রতি অনাস্থা মূলক আচরণ প্রমাণিত হয়। কেননা ছোট-বড় যাবতীয় ঘটনাবলী আল্লাহর ফাইসালা ও তাকদীরের ইঙ্গিতেই সংঘটিত হয়। যা সংঘটিত হয়েছে তা সংঘটিত হওয়ারই বিষয় ছিল, তা রোধ করা কিছুতেই সম্ভব নয়। তাই "যদি" এ রকম হত অথবা এ রকম করতাম, তাহলে এমন হত, বান্দার এ ধরনের কথা আল্লাহর বিরুদ্ধে এক ধরনের প্রতিবাদ এবং তার ফাইসালা ও তাকদীরের প্রতি ঈমানের দুর্বলতা। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, দোষণীয় উক্ত বিষয় দু'টি পরিত্যাগ করা ব্যতীত বান্দার ঈমান ও তাওহীদ পরিপূর্ণ হবেনা।

দুই ঃ প্রশংসনীয় ব্যবহার হচ্ছে ঃ বান্দা "যদি" শব্দকে মঙ্গল কামনার্থে ব্যবহার করবে। যেমন ঃ কোন ব্যক্তির কল্যাণ কামনার্থে এ কথা বলা, আমার যদি অমুকের মত এত সম্পদ থাকত তাহলে আমি অমুকের মত ভাল কাজ করতাম। আমার ভাই মূসা যদি ধৈর্য ধারণ করত তাহলে আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে তাঁদের ঘটনা সম্পর্কে আরও বর্ণনা দিতেন। অর্থাৎ মূসা (আঃ) এর সাথে খিযির (আঃ) এর ঘটনার কথা আরও বর্ণনা করতেন।

অতএব "যদি" শব্দের ব্যবহার যখন কল্যাণ অর্থে হবে তখন এর ব্যবহার প্রশংসনীয় বলে গণ্য হবে। আর যদি খারাপ অর্থে ব্যবহার হয় তাহলে এর ব্যবহার নিন্দনীয় বলে গণ্য হবে। "যদি" শব্দের ব্যবহার ভাল কি মন্দ তা মূলতঃ নির্ভর করে তার ব্যবহারের অবস্থা ও প্রেক্ষিতের উপর । তাই এর ব্যবহার যদি অস্থিরতা, দুশ্চিন্তা, আল্লাহর ফাইসালা ও তাকদীরের উপর দুর্বল **ঈমানের কারণ** এবং অমঙ্গল কামনার্থে হয় তাহলে এর ব্যবহার হবে দোষণীয়। **পক্ষান্তরে** "যদি" শব্দের ব্যবহার যদি কল্যাণার্থে ও সত্য পথ প্রদর্শন এবং **শিক্ষাদানের** উদ্দেশে হয় তাহলে এর ব্যবহার হবে প্রশংসনীয় ।

কল্যাণমূলক সামাজিক কাজও ইবাদাত

১। যারা সৎপথ সন্ধান করে আল্লাহ তাদেরকে অধিক হিদায়াত দান করেন। **আর** স্থায়ী সৎকর্মসমূহ তোমার পালনকর্তার নিকট সাওয়াবের দিক দিয়ে শ্রেষ্ঠ, আর প্রতিদান হিসাবেও শ্রেষ্ঠ। [সূরা মারইয়াম-৭৬]

২। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মু'মিন ব্যক্তির ইন্তিকালের পর যে সব আমল ও সৎ (পুণ্য) কাজ তার আমলনামায় লেখা হবে তা হল (১) 'ইল্‌ম, যা সে অন্যকে শিক্ষা দিয়েছে এবং তার প্রচার প্রসার করেছে (২) তার রেখে যাওয়া সৎ সন্তান এবং (৩) কুরআন যাকে এর উত্তরাধিকারী বানিয়েছে অথবা মাসজিদ নির্মাণ করেছে কিংবা পথিকদের জন্য সরাইখানা তৈরি করেছে, অথবা পানির কূপ খনন করেছে ও জীবদ্দশায় সুস্থ থাকাকালীন দান-খাইরাত করেছে, এই জিনিসগুলির সাওয়াব সে মৃত্যুর পরেও পেতে থাকবে। [ইব্‌ন মাজাহ/২৪২, মুসলিম/৪০৭৭]

◻ সামাজিক কল্যাণমূলক প্রতিটি কাজই ইবাদাত এবং উত্তম ইবাদাত বলে গণ্য হবে যদি এ কাজের সম্পাদনকারী এর দ্বারা প্রশংসা বা সুখ্যাতি না চেয়ে থাকে। যে কাজই দুঃখীর চোখের পানি মুছে দিবে কিংবা বিপদাপদ লাঘব করবে অথবা যার দ্বারা বিপদগ্রস্ত ব্যক্তির বিপদ দূর করতে সাহায্য করবে কিংবা বঞ্চিতদের মুখে গ্রাস তুলে দিবে কিংবা অত্যাচারিতের পাশে সহায়ক হয়ে দাঁড়াবে অথবা বিপদ হালকা করবে কিংবা ঋণ গ্রস্তের ঋণ লাঘব করবে অথবা দীনহীনের হাতকে শক্তিশালী করবে, যে লজ্জায় কারো নিকট চাইতে পারেনা তার হাতকে শক্তিশালী করবে কিংবা পথহারাকে পথের দিশা দিবে কিংবা অশিক্ষিতকে শিক্ষা দিবে অথবা অপরিচিতকে আশ্রয় দিবে কিংবা কারও বিপদে প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াবে নতুবা রাস্তা থেকে কষ্টদায়ক বস্তু সরাবে কিংবা কারও জন্য কল্যাণকর কিছু করবে, এ সবই ইবাদাত এবং নৈকট্য লাভকারী আমল বলে গণ্য হবে, যদি তার নিয়াত সঠিক থাকে। তাছাড়াও রয়েছে গাছপালা লাগানো, পথ-ঘাট তৈরী করা, সরাইখানা, ইয়াতিমখানা, মাসজিদ, মাদ্রাসা, শিক্ষা, চিকিৎসা, বস্ত্র দেয়ার ব্যবস্থা, বাসস্থানের ব্যবস্থা করা, সকল জীব-জন্তুর সেবা করা, সৎ কাজের আদেশ, অসৎ কাজের নিষেধ করা ইত্যাদি।

জীবিকা নির্বাহের জন্য কাজও শর্ত সাপেক্ষে ইবাদাত

১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা মুনাফিকূন-৯]

২। সেই সব লোক, যাদেরকে ব্যবসা-বাণিজ্য এবং ক্রয় বিক্রয় আল্লাহর স্মরণ হতে এবং সালাত কায়েম ও যাকাত প্রদান হতে বিরত রাখেনা, তারা ভয় করে সেই দিনকে যেদিন তাদের অন্তর ও দৃষ্টি বিপর্যস্ত হয়ে পড়বে। [সূরা নূর-৩৭]

৩। তোমরা তোমাদের আত্মার মঙ্গলের জন্য ভাল যা কিছু অগ্রিম প্রেরণ করবে তোমরা তা পাবে আল্লাহর নিকট। উহা উৎকৃষ্টতর এবং পুরস্কার হিসাবে

মহত্তর। আর তোমরা ক্ষমা প্রার্থনা কর **আল্লাহর নিকট**। **নিশ্চয়ই** আল্লাহ **ক্ষমাশীল, পরম** দয়ালু। [সূরা মুয্যাম্মিল-২০]

৪। এ **বিষয়ে অন্যান্য** সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ জুমু'আ-১০, **বাকারা-১৯৮**।

৫। **নিজ হাতে উপার্জিত** জীবিকার চেয়ে উত্তম খাদ্য কখনো কেহ **খায়না**। আল্লাহর **নাবী দাউদ** (আঃ) নিজ হাতে উপার্জন করে খেতেন। [বুখারী/১৯৩৭-মিকদাম (রাঃ)]

৬। **নাবী** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ রশি নিয়ে কাঠ সংগ্রহ করতে বের হলে তা সাওয়াল (ভিক্ষা) করা থেকে উত্তম। [বুখারী/১৯৪০]

⧉ নিম্নোক্ত শর্তাবলী মেনে চললেই একজন মুসলিমের সকল প্রকার কাজ ইবাদাত বলে গণ্য হতে পারে ঃ

ক) কাজটি যেন ইসলামের দৃষ্টিতে বৈধ হয়।

খ) এতে যেন সঠিক নিয়াত থাকে।

গ) কাজ যেন সুষ্ঠু ও সুন্দরভাবে সম্পন্ন হয়।

ঘ) আল্লাহর নির্ধারিত সীমা মেনে চলা ।

ঙ) দুনিয়াবী কাজ যেন তাকে দীনী কাজ থেকে গাফিল না করে ইত্যাদি।

"লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" এর সার কথা

❖ প্রকৃত পক্ষে ঈমানের কালেমা একটি। আর তা হচ্ছে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ'। অর্থ ঃ আল্লাহ ছাড়া (ইবাদাতের যোগ্য) কোন ইলাহ নেই। একে কালেমা তাইয়্যিবা বা কালেমাতুত তাওহীদ বলে। আল্লাহ একে উৎকৃষ্ট গাছের সাথে তুলনা করেছেন। এ ছাড়া কালেমায়ে তামজীদ, রাদ্দে কুফর এ সবের অস্তিত্ব কুরআন হাদীসে কোথাও নেই।

১। যারা শাশ্বত বাণীতে (কালেমায়ে তাইয়্যিবায়) বিশ্বাসী তাদেরকে ইহজীবনে ও পরজীবনে আল্লাহ সুপ্রতিষ্ঠিত রাখবেন এবং যারা যালিম, আল্লাহ তাদেরকে বিভ্রান্তিতে রাখবেন; আল্লাহ যা ইচ্ছা তা করেন। [সূরা ইবরাহীম-২৭]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। [মুসলিম/১৩৬৯-মাহমূদ ইব্নুর রাবী আনসারী (রাঃ)]

৩। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ শ্রেষ্ঠ যিক্‌র হল "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" আর শ্রেষ্ঠ দু'আ হল "আলহামদুলিল্লাহ"। [ইব্ন মাজাহ/৩৮০০, তিরমিযী/৩৩৮৩]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির সর্বশেষ **কালেমা** (কথা) হবে "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [আবূ **দাউদ**/৩১০২-মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ), নাসাঈ/১৮২৯]

৫। **সাঈদ ইব্ন** মুসাইয়্যাব (রাঃ) এর পিতা বলেছেন ঃ আবূ তালিবের যখন মৃত্যু **উপস্থিত হল** তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে **উপস্থিত হলেন** এবং বললেন ঃ আপনি "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমাটি বলুন।

আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার ব্যাপারে এর মাধ্যমে **সুপারিশ করব**। [বুখারী/৬২১১]

মহান আল্লাহর সাথে ওয়াদা করলাম, প্রতিজ্ঞা করলাম, ঈমান আনলাম, কালেমা তাইয়্যিবা পড়লাম এই বলে যে ঃ কোন ইলাহ নেই একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। এই ওয়াদা অবশ্যই রক্ষা করতে হবে। 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' মুখে বললাম, আর কথা শুনলাম পীর, ইমাম, আলেম, বুজুর্গান, অলীদের এরূপ আদেশ কুরআন-হাদীসে উল্লেখ নেই। তারা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথা বলেন তাহলে কোন আপত্তি নেই। কিন্তু তাদের কোন কথা যদি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কথার বিপরীত হয় তাহলে আল্লাহর সাথে **তাদেরকে শরীক করা হল** এবং কালেমা তাইয়্যিবার ওয়াদা ভঙ্গ হয়ে গেল, তখন সে হবে ওয়াদা ভঙ্গকারী। আল্লাহ তা'আলা ওয়াদা ভঙ্গকারীকে মুনাফিক বলেছেন, অর্থাৎ তারা মুখে বলে এক, আর কার্যক্ষেত্রে করে থাকে অন্য। ⊙আল্লাহ তা'আলা বলেন, "মুনাফিকদের স্থান হল জাহান্নামের সর্বনিম্নে।" [সূরা নিসা-১৪৫]

কুরআন/হাদীসের কথা বললে অনেকেই বলেন ঃ দেশের আলেমগণ কি কম বুঝেন? শত শত বৎসর ধরে কি আমাদের পূর্ব পুরুষগণ ভুল করেছেন?

জি না, ভুল করেছেন নাকি ঠিক করেছেন তা আমাদেরকে কুরআন-হাদীসের আলোকে বুঝতে হবে। কারণ যে যা করে সে তা কখনও ভুল জেনে করেনা, সে মনে করে আমি ঠিকই করছি। কিন্তু ইসলামের ক্ষেত্রে ঠিক বেঠিকের দলীল জানতে হবে। আমাদের দোষ হল আমরা কুরআন-হাদীস পড়াকে অপ্রয়োজনীয় মনে করি।

আলেমগণ কুরআন ও হাদীস পড়েননা এ কথা আমরা বলতে পারিনা, তবে অনেক ক্ষেত্রে তাদের কুরআন-হাদীস মানার ব্যাপারে অলিখিত নিষেধ আছে। কারণ আমাদের দেশে বেশীর ভাগ আলেম বিশেষ ইমাম/দলের/মাযহাবের অনুসারী, তথা মুকাল্লিদ।

কুরআন শিক্ষা করে তারা জনসমক্ষে প্রকাশ করতে পারেননা। কারণ তাদের মূল মন্ত্র হল, "কোন নির্দিষ্ট ইমামের রচিত ও সংকলিত মাস'আলার নীতিসমূহ শিক্ষা করে উহাকে শারীয়াত বলে স্বীকার করা এবং সেই অনুসারে আমল করা অর্থাৎ সেই মতে নিজেদের ইবাদাত ও কাজ কর্মের নিয়ন্ত্রণ করা ও উক্ত ইমামের "আখ্যায়িত" নীতির ব্যতিক্রম করা অবৈধ বলে স্বীকার করা।" "আখ্যায়িত নীতি" কথাটি লেখার কারণ এই যে, কোন ইমামই তার নামে কোন দল/মাযহাব তৈরী করে যাননি কিংবা তৈরী করার নাসীহাতও করে যাননি।

মাদ্রাসার বড় বড় কিতাবে পাবেন মাস'আলা-মাসায়েল আর মাস'আলা-মাসায়েল। কদাচিত দু'এক জায়গায় পাবেন 'হাদীসে আছে' কথা লিখা। কিন্তু কোন হাদীস গ্রন্থের নাম উল্লেখ করেননা। শুধু হাদীস বলে চালিয়ে যাচ্ছেন। বিভিন্ন হাদীস রয়েছে যেমন- মিথ্যা হাদীস, জাল হাদীস, যঈফ হাদীস, বানানো

হাদীস, গারীব হাদীস, হাসান হাদীস, সহীহ হাদীস ইত্যাদি। তাদের আবিস্কৃতও অনেক হাদীস আছে। সাহাবীগণের (রাঃ) নামেও হাদীস তৈরী করা হয়েছে। [সহীহ মুসলিম হাদীসের ভূমিকা অধ্যায়ে উল্লেখ আছে জনৈক ব্যক্তি ৩০ হাজার হাদীস জাল করেছেন]

মহান আল্লাহর শারীয়াত হল কুরআন ও সহীহ হাদীস। আর বর্তমানে প্রচলিত সমাজের শারীয়াত হল ইজমা-কিয়াস লব্ধ মাস'আলা-মাসায়েল যা মাযহাবের ইমামগণ রচনা ও সংকলন করেছেন বলে দাবী করা হয়। ইজমা-কিয়াস দ্বারা যতকিছু আবিস্কার করা হয়েছে তার বেশীর ভাগই আল্লাহ তা'আলার রাসূলের (সাঃ) ভাষায় বিদ'আত (ধর্মে নতুন পদ্ধতি চালু করা)। অথচ মাযহাবী/দলীয় ভাষায় এটাই শারীয়াত। যেহেতু বহু পূর্ব হতে আমাদের দেশে ইজমা-কিয়াসকে শারীয়াত হিসাবে মান্য করা হচ্ছে তাই আল্লাহর শারীয়াতকে নূতন মনে হয়। আর আমরা মনে করে আসছি আমরা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশই মানছি। আসলে কি মানছি? এখনও কেহ যাচাই করছিনা। আমাদের পূর্ব-পুরুষদের জামানায় বাংলায় কুরআন ও হাদীস অনুবাদ করা হয়নি। তাই তারা যাচাই বাছাই করতে পারেননি। কিন্তু এখন কুরআন ও হাদীসের বাংলা অনুবাদ থাকা সত্ত্বেও আমরা যাচাই করে দেখছিনা। ফলে মাদ্রাসার আলেমগণের কথার উপর সকলকেই নির্ভর করতে হচ্ছে। যাচাই না করে কোন কিছু মানা যাবেনা, এটা আল্লাহ ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের শিক্ষা। যাচাই করতে হবে কার সাথে? আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রমাণিত সহীহ হাদীসের সাথে। যেহেতু আমরা বাংলা অনুবাদসহ কুরআন ও সহীহ হাদীস পড়িনা, পড়ার অভ্যাস নেই, মৌলভীগণ যা বলেন তাই বাধ্য হয়ে আমাদের মানতে হয়। এভাবেই আমরা ধর্মান্ধ হয়েছি। ⊙ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "যে রাসূলের আনুগত্য করল সে বস্তুতঃ আল্লাহরই আনুগত্য করল।" (সূরা নিসা-৮০) মহান আল্লাহ তা'আলা তাঁর কুরআনে কোথাও বলেননি যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ছাড়া অন্য কারও আনুগত্য করলেও আল্লাহর আনুগত্য করা হবে। তবে হ্যাঁ, যদি কেহ কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে কিছু বলেন তাহলে তা মানা যাবে. এ ক্ষেত্রে প্রকৃত পক্ষে আল্লাহকেই মানা হল।

কাবীরা গুনাহসমূহ হতে বিরত থাকা

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

إِن تَجْتَنِبُواْ كَبَآئِرَ مَا تُنْهَوْنَ عَنْهُ نُكَفِّرْ عَنكُمْ سَيِّئَاتِكُمْ وَنُدْخِلْكُم مُّدْخَلاً كَرِيمًا

তোমরা যদি নিষিদ্ধ কাজের মহাপাপসমূহ হতে বিরত থাক তাহলে আমি তোমাদের ছোট ছোট পাপগুলো ক্ষমা করে দিব এবং তোমাদেরকে এক মহা মর্যাদার স্থানে প্রবেশ করাব। [সূরা নিসা-৩১]

২। নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর সত্বর তাওবাহ করে, এরাই তারা যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবূল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী। [সূরা নিসা-১৭]

৩। এমন লোকদের তাওবাহ নিস্ফল যারা পাপ করতেই থাকে, অতঃপর মৃত্যুর সময় হলে বলে, আমি এখন তাওবাহ করছি এবং (তাওবাহ) তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। [সূরা নিসা-১৮]

৪। আনাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা এমন সব পাপ কাজ করে থাক যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় আমরা এগুলিকে ধ্বংসাত্মক পাপ মনে করতাম। [বুখারী/৬০৩৫]

৫। বড় পাপ (কাবীরা গুনাহসমূহ) হচ্ছে ঃ আল্লাহ তা'আলার সঙ্গে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া, কেহকে হত্যা করা এবং মিথ্যা শপথ করা। [বুখারী/৬২০৬-আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), ৫৮২৬, মুসলিম/১৬২]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পাঁচ ওয়াক্তের সালাত, এক জুমু'আ থেকে আরেক জুমু'আ পর্যন্ত এবং এক রামাযান থেকে অপর রামাযান পর্যন্ত এই সব তাদের মধ্যবর্তী সময়ের জন্য কাফফারা হয়ে যাবে, যদি সে বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ) থেকে বেঁচে থাকে। [মুসলিম/৪৪৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

বর্তমান সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন কাবীরা গুনাহসমূহ নিম্নে দেয়া হল ঃ

■ সালাত আদায় না করা অথবা কোনো ওযর ব্যতীত দেরী করে সালাত আদায় করা ■ যাকাত না দেয়া ■ কোনো ওযর ব্যতীত রামাযান মাসে সিয়াম ভঙ্গ করা ■ হাজ্জ করার সার্মথ্য থাকা সত্ত্বেও তা আদায় না করা

■ পিতা-মাতার অবাধ্যাচারণ করা ■ সব ধরনের নেশা জাতীয় পানীয় যেমন মদ, তাড়ি, হুইসকি, বিয়ার ইত্যাদি পান করা ■ যে কোন ধরনের বিষপান করা, শুকরের মাংস কিংবা কোনো মৃত জন্তু ভক্ষণ করা ।

■ ক্রয় ও বিক্রয়ের মধ্যে ধোকা দেয়া ■ দাম বৃদ্ধির আশায় খাদ্য-শস্য গুদামজাত করা। ■ শির্ক, কুফর, নিফাক ও বিদ'আত কাজ করা ■ আল্লাহর শাস্তি থেকে নিরাপত্তা বোধ করা ■ আল্লাহর রাহমাত থেকে নিরাশ হওয়া ■ তাকদীরে অবিশ্বাস করা, গনক বা জ্যোতিষীর কথা সত্য মনে করা, অশুভ, অমঙ্গল বা অযাত্রায় বিশ্বাস করা ■ মাক্কার হারামে যে কোনো প্রকার অন্যায় করার ইচ্ছা ■ যাদু শিক্ষা ও ব্যবহার ■ আল্লাহ ছাড়া অন্য কারো জন্য যবাহ করা ■ নিজের জীবন, সম্পদ ও সকল মানুষের চেয়ে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কে বেশি ভালবাসায় ত্রুটি থাকা ■ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নামে মিথ্যা হাদীস বলা ■ নিজের পছন্দ-অপছন্দ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর সুন্নাত ও শারীয়াতের অনুগত না হওয়া, আত্মহত্যা করা ■ প্রস্রাব থেকে পবিত্র না হওয়া ■ মিথ্যা বলার অভ্যাস ■ প্রাণীর ছবি তোলা বা আঁকা ■ কৃত্রিম চুল লাগান, শরীরে খোদাই করে উল্কি লাগান ■ পুরুষের জন্য মেয়েলী পোশাক ব্যবহার করা ■ টাখনুর নিচে ঝুলিয়ে পোশাক পরা ■ সোনা ও রেশমের ব্যবহার ■ গোঁফ বেশি বড় করা, দাঁড়ি না রাখা ■ মেয়েদের জন্য পুরষালী পোশাক বা আচরণ, সৌন্দর্য প্রকাশক পোশাক পরিধান করে, মাথা, মাথার চুল বা শরীরের কোনো অংশ অনাবৃত রেখে বা

সুগন্ধি মেখে বাইরে যাওয়া ▪ অহংকার ও গর্ব করা ▪ নিজেকে বড় ভাবা ▪ রিয়া, হিংসা, কোনো মুসলিমকে হেয় বা ছোট ভাবা ▪ ক্রোধ, প্রশংসা ও সম্মানের লোভ, সম্পদের লোভ, কৃপণতা, নিষ্ঠুরতা ▪ দীনী ইল্‌ম পার্থিব উদ্দেশে শিক্ষা করা, ইলম গোপন করা ▪ ইসলামে নির্ধারিত শাস্তি যোগ্য অপরাধে অপরাধীর (চুরি, ডাকাতি, খুন, ধর্ষণ ইত্যাদি) শাস্তি মওকুফের জন্য সুপারিশ বা চেষ্টা করা ▪ আইনের মাধ্যমে বিচার ছাড়া কোনো মানুষকে খুন বা হত্যা করা ▪ রাষ্ট্রপ্রধান, প্রশাসক বা বিচারক কর্তৃক জনগণের দায়িত্ব, সম্পদ বা আমানত আদায়ে অবহেলা বা ফাঁকি দেয়া ▪ নাগরিক কর্তৃক রাষ্ট্রপ্রধান, শাসক, প্রশাসক বা প্রধানকে ধোকা দেয়া বা রাষ্ট্রের ক্ষতিকর কিছু করা ▪ রাষ্ট্র বা সমাজের বিরুদ্ধে বিদ্রোহ বা সশস্ত্র বিদ্রোহ ▪ অন্যায় দেখেও সাধ্যমতো প্রতিকার বা প্রতিবাদ না করা ▪ রাষ্ট্রীয় অনুগত্যের বাইরে থেকে মৃত্যুবরণ করা ▪ রাষ্ট্র প্রশাসনের অন্যায় বা জুল্‌ম সমর্থন বা সহযোগিতা করা ▪ সমাজের মানুষদেরকে কাবীরা গোনাহের কারণে কাফির বলা বা মনে করা ▪ বিচারকের জন্য ন্যায় বিচারে একনিষ্ঠ না হওয়া বা বিচার্য বিষয়ের বাইরে কোনো কিছু দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বিচার করা ▪ আইন প্রয়োগকারীর জন্য আইন প্রয়োগের ক্ষেত্রে পক্ষপাতিত্ব করা ও আপনজনদের জন্য হালকাভাবে শাস্তির প্রয়োগ করা ▪ মিথ্যা সাক্ষ্য প্রদান বা প্রয়োজনের সময় সত্য সাক্ষ্য প্রদান থেকে বিরত থাকা ▪ রাষ্ট্রীয় সম্পদ অবৈধভাবে ভক্ষণ, দখল বা ভোগ করা, তা যত সামান্যই হোক ▪ মুনাফিককে নেতা বলা ▪ জিহাদের মাঠ থেকে পালিয়ে আসা ▪ মুসলিমগণকে কষ্ট প্রদান ও গালি দেয়া ▪ জুলুম, যবরদস্তি, মিথ্যা মামলা বা অবৈধভাবে কোনো মানুষ থেকে কিছু গ্রহণ করা ▪ হাট-বাজার, রাস্তা-ঘাটে অবৈধ টোল আদায় করা বা চাঁদাবাজী করা ▪ মুসলিম সমাজে বসবাসরত অমুসলিম নাগরিককে কষ্ট প্রদান বা তার অধিকার নষ্ট করা ▪ কোন মুসলিম মহিলা বা ইয়াতিমের সম্পদ ভক্ষণ করা ▪ আল্লাহর প্রিয় ধার্মিক বান্দাগণকে কষ্ট প্রদান বা তাদের সাথে শত্রুতা করা ▪ প্রতিবেশীদেরকে কষ্ট প্রদান ▪ কারো স্ত্রী বা চাকর-বাকর কে ফুসলিয়ে সরিয়ে দেয়া ▪ কর্কশ ব্যবহার ও অশ্লীল কথা বলা ▪ কাহকে অভিশাপ বা গালি দেয়া ▪ কোন মুসলিমের দুর্বলতার সুযোগ গ্রহণ করে কিছু অর্থলাভ করা ▪ তিন দিনের অধিক কোনো মুসলিমের সাথে কথবার্তা বন্ধ রাখা ▪ মুসলিমগণের একে অপরকে ভালো না বাসা, তাদের মধ্যে ভালবাসার অভাব থাকা ▪ মুসলিমদের গোপন দোষ খোঁজা, জানা ও বলে দেয়া ▪ নিজের জন্য যা পছন্দ করে অন্যের জন্য তা পছন্দ না করা ▪ কোনো ব্যক্তিকে তার বংশের বিষয়ে অপবাদ দেয়া ▪ পিতামাতার অবাধ্য হওয়া বা তাঁদের কষ্ট প্রদান করা ▪ সুদ গ্রহণ ও প্রদান করা, সুদ লেখা বা সুদের সাক্ষী দেয়া ▪ ঘুঘ গ্রহণ ও প্রদান করা ও ঘুষ আদান প্রদানের মধ্যস্থতা করা ▪ মিথ্যা শপথ করা ▪ হীলা বিবাহ করা বা করানো ▪ আমানতের খেয়ানত করা ▪ কোনো মানুষের উপকার করে পরে খোটা দেয়া ▪ মানুষের গোপন কথা শোনা বা জানার চেষ্টা করা ▪ চোগলখুরী করা বা একজন মানুষের কাছে অন্য মানুষের নিন্দা-মন্দ ও

শত্রুতামূলক কথা বলে উভয়ের মধ্যে সুসম্পর্ক নষ্ট করা ■ গীবত বা পরচর্চা করা। অর্থাৎ যার অনুপস্থিতিতে তার মধ্যে বিরাজমান বাস্তব ও সত্য দোষগুলি উল্লেখ করা ■ অসত্য দোষারোপ করা। অর্থাৎ কারো মধ্যে যে দোষ বিরাজমান নেই অনুমানে বা লোকমুখে শুনে তার সম্পর্কে সেই দোষের কথা উল্লেখ করা ■ জমির সীমানা পরিবর্তন করা ■ পাপ বা বিভ্রান্তির দিকে বা খারাপ রীতির দিকে আহ্বান করা ■ কারো প্রতি অস্ত্র জাতীয় কিছু উঠান বা হুমকি প্রদান ■ নিজের পিতা ছাড়া অন্যকে পিতা বলা ■ জেদাজেদি, ঝগড়া, বিতর্ক, কলহ বা কোন্দল ■ ওজন, মাপ বা দ্রব্যে কম দেয়া বা ভেজাল দেয়া ■ কোনো উপকারীর উপকার অস্বীকার করা বা অকৃতজ্ঞতা প্রকাশ করা ■ নিজের প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি অন্যকে প্রদান থেকে বিরত থাকা ■ কোনো প্রাণীর মুখে আগুণে পুড়িয়ে বা কেঁটে দাগ দেয়া ■ জুয়া, তাস, দাবা, পাশা খেলা ■ অবৈধ ঝগড়া বা গোলযোগে সহযোগিতা করা ■ কথাবার্তায় সংযত না হওয়া ■ ওয়াদা ভঙ্গ করা ■ উত্তরাধিকারীকে উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত করা ■ স্বামী বা স্ত্রী কর্তৃক তাদের একান্ত গোপনীয় কথা অন্য কাহকে বলা ■ কারো বাড়ি বা ঘরের মধ্যে অনুমতি ছাড়া দৃষ্টি দেয়া ■ যা কিছু শোনা হয় বিচার বিশ্লেষণ ও সত্যাসত্য নির্ধারণ না করে তা বলা ■ বঞ্চিত ও দরিদ্রদেরকে খাদ্য প্রদানে ও সাহায্য দানে উৎসাহ না দেয়া ■ ব্যভিচার, সমকামিতা বা যৌন অনাচার ও অশ্লীলতা মূলক কাজ করা, পুং মৈথুন করা ■ নিরাপরাধ মানুষকে অপবাদ দেয়া ■ মুসলিম সমাজে অশ্লীলতা প্রসার করতে পারে এমন কোনো গল্পগুজব বা কথাবার্তা বলা বা প্রচার করা (এর মধ্যে সকল পর্নোগ্রাফিক, ছবি, অশ্লীল উপন্যাস ও গল্প অন্তর্ভুক্ত এগুলির প্রচার, বিক্রয়, আদান প্রদান) সবই কাবীরা গোনাহ । "মনে রাখবেন মাত্র একটি কাবীরা গুনাহ জাহান্নামে যাওয়ার জন্য যথেষ্ট, যদি আল্লাহ ক্ষমা না করেন"।

কিয়ামাতের দিন কারা সুপারিশ করবে?

১। হে বিশ্বাসীগণ! আমি তোমাদেরকে যে উপজীবিকা দান করেছি তা হতে সেদিন সমাগত হওয়ার পূর্বে ব্যয় কর যেদিন ক্রয়-বিক্রয়, বন্ধুত্ব ও সুপারিশ নেই, আর অবিশ্বাসীরাই অত্যাচারী। [সূরা বাকারা-২৫৪]

২। আকাশে কত মালাইকা/ফিরিশতা রয়েছে, তাদের কোন সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা যতক্ষণ আল্লাহ যাকে ইচ্ছা এবং যার প্রতি সন্তষ্ট তাকে অনুমতি না দেন। [সূরা নাজম-২৬]

৩। যাকে অনুমতি দেয়া হয় সে ছাড়া আল্লাহর নিকট কারও সুপারিশ ফলপ্রসু হবেনা। অতঃপর যখন তাদের অন্তর হতে ভয় বিদুরিত হবে তখন তারা পরস্পরের মধ্যে জিজ্ঞাসাবাদ করবে ঃ তোমাদের রাব্ব কি বললেন? তদুত্তরে তারা বলবে ঃ যা সত্য তিনি তাই বলেছেন। তিনি সমুচ্চ, মহান। [সূরা সাবা- ২৩]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ যুমার-৪৪, নাবা-৩৮, আম্বিয়া-২৮, তাওবা-৮০।

৫। কিয়ামাতের দিন নাবী **সাল্লাল্লাহু** 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের **শাফা**'আত লাভকারী ব্যক্তি হবে সে, **যার হাদীসের** প্রতি আগ্রহ বেশী এবং **যে খাঁটি** অন্তরে "লা **ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে**। [বুখারী/৯৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

বর্তমান সমাজের আলেমরা বলেন যে, রাজা-বাদশাহর সাথে সাক্ষাত করতে **হলে** যেমন মন্ত্রীর সুপারিশের প্রয়োজন হয়, অনুরূপভাবে আল্লাহর সাথে **সাক্ষাতের** জন্য কি আওলিয়াদের সুপারিশের প্রয়োজন হবেনা? এরূপ ভ্রান্ত ধারনা প্রমাণ করে আল্লাহর গুণাগুন মানুষের গুণাগুনের মতই (নাউযুবিল্লাহ)। এটা শিরকী আকীদা।

⊙ তাদের সম্মুখে ও পশ্চাতে যা কিছু আছে তা তিনি অবগত; তারা সুপারিশ করে শুধু তাদের জন্য যাদের প্রতি তিনি সন্তুষ্ট এবং তারা তাঁর ভয়ে ভীত সন্ত্রস্ত। [সূরা আম্বিয়া-২৮]

⊙ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি শির্ক বর্জন করে তাওহীদের ওপর জীবন কাটিয়েছে আমার সুপারিশ তার জন্য উপকারী হবে। [মুসলিম/৩৮৭]

বিভিন্ন আয়াত থেকে জানা যায় যে, নূহ (আঃ) নিজ পুত্রের, ইবরাহীম (আঃ) নিজ পিতার, লূত (আঃ) স্বীয় স্ত্রীর, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজ মুশরিক চাচার (আবূ তালিবের) জন্য সুপারিশ করবেননা। দুনিয়ায়ও মুনাফিকদের জন্য রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু'আ গ্রহণ করা হয়নি। মানুষ সাধারণতঃ বিভিন্ন উপায়ে পরস্পরকে সাহায্য করে থাকে। কোন প্রকারেই মানুষ মানুষের জন্য কিয়ামাতের/হাশরের দিন কোনরূপ সুপারিশ বা সাহায্য করতে পারবেনা। না আর্থিক লেনদেনের মাধ্যমে, না বন্ধুর সাহায্যের মাধ্যমে, আর না কোন সুপারিশকারীর সুপারিশের মাধ্যমে। বরং সকল সুযোগই ঐ দিন বন্ধ থাকবে। আল্লাহ ব্যতীত সাহায্য প্রার্থনার স্থল আর কোথাও নেই।

কিয়ামাত অবশ্যই ঘটবে যা স্বীকৃত ও সমর্থিত এবং কিয়ামাতের আলামাতসমূহ

১। তিনিই প্রথমবার সৃষ্টি করেছেন, অতঃপর তিনি এটাকে সৃষ্টি করবেন পুনর্বার; এটা তাঁর জন্য অতি সহজ। আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীতে সর্বোচ্চ মর্যাদা তাঁরই, এবং তিনি পরাক্রমশালী, প্রজ্ঞাময়। [সূরা রূম-২৭, আম্বিয়া-১০৪]

২। মানব সৃষ্টি অপেক্ষা আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিতো কঠিনতর, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা জানেনা। [সূরা মু'মিন-৫৭, আহযাব-৩৩, ইয়াসীন-৮১, ৮২]

৩। প্রত্যেক দৃষ্টি সম্পন্ন ব্যক্তি যমীনকে মৃত অবস্থায় দেখে। [সূরা হা মীম আস সাজদাহ-৩৯]

৪। কুরআনের বর্ণনা বাস্তব ঘটনা যা পুনরুত্থান সম্ভব হওয়ার সত্যতা বহন করে। [সূরা বাকারা-২৫৯]

৫। **প্রতিদান** পাওয়ার জন্য প্রত্যেক ব্যক্তির পুনরুত্থান আবশ্যক। [সূরা তাহা-১৫, **নাহল**-৩৮, ৩৯, ৪০, তাগাবূন-৭]

৬। **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাতের দিন লোকদেরকে একত্রিত করা হবে খালি পা, নগ্ন দেহ এবং খাতনাবিহীন

অবস্থায়। এ কথা শুনে আয়িশা (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! পুরুষ এবং মহিলা এক সাথেই উত্থিত হবে কি? তাহলে তো তারা পরস্পর একে অন্যের প্রতি নজর করবে। তখন তিনি বললেন ঃ হে আয়িশা! তখনকার অবস্থা এত কঠিন ও ভীতিকর হবে যে, তারা একে অন্যের প্রতি নজর করবেনা। [মুসলিম/৬৯৩৪-আয়িশা (রাঃ), তিরমিযী/৩৩৩২, বুখারী/৬০৭০]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের আলামত হল ইল্‌ম উঠিয়ে নেয়া হবে, অজ্ঞতার প্রকাশ ঘটবে, যিনা বিস্তার লাভ করবে, মদ্যপান বিস্তার লাভ করবে, নারীদের আধিক্য ঘটবে, পুরুষের সংখ্যা হ্রাস পাবে। এমনকি পঞ্চাশ জন মহিলার মাত্র একজন তত্ত্বাবধায়ক থাকবে। [তিরমিযী/২২০৮-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), বুখারী/৪৮৪২]

কিয়ামাতের ছোট আলামাতসমূহ ঃ

(১) চন্দ্র দ্বিখন্ডিত হওয়া ঃ [সূরা কামার-১]
(২) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আগমন ও মৃত্যু বরণ ঃ [মুসলিম/৭১৪০]
(৩) বাইতুল মাকদিস (ফিলিস্তীন) বিজয় ঃ [বুখারী]
(৪) ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে ঃ [বুখারী/১৩২৩]
(৫) কিয়ামাতের পূর্বে অনেক ফিতনার আর্বিভাব হবে ঃ [বুখারী/৬৫৮৯, মুসলিম/২১৪]
(৬) ভন্ড ও মিথ্যুক নাবীদের আগমন হবে ঃ [তিরমিযী/২২২১]
(৭) হিজায থেকে বিরাট এক আগুন বের হবে ঃ [বুখারী/৬৬২০]
(৮) আমানাতের খিয়ানাত হবে ঃ (বুখারী/৬০৩৯]
(৯) দীনী ইল্‌ম উঠে যাবে এবং মূর্খতা বিস্তার লাভ করবে ঃ [বুখারী/৬৫৪১]
(১০) অন্যায়ভাবে যুল্‌ম নির্যাতনকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ [মুসলিম/৬৩৪১]
(১১) যিনা (ব্যভিচারী) বৃদ্ধি পাবে ঃ [বুখারী/৯৮১]
(১২) সুদখোরের সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ [আলে ইমরান-১৩০, মুসলিম/৩৯৪৮]
(১৩) গান বাজনা এবং গায়িকার সংখ্যা বেড়ে যাবে ঃ [বুখারী/৫১৭৬]
(১৪) মদ্যপান হালাল মনে করবে ঃ [বুখারী/৫১৭৬, ইব্‌ন মাজাহ/৪০৩৪]
(১৫) মাসজিদ নিয়ে লোকেরা গর্ব করবে ঃ [আবূ দাউদ/৪৪৯]
(১৬) দালান কোঠা নির্মাণে প্রতিযোগিতা করবে ঃ [বুখারী/৪৮]
(১৭) দাসী তার মনিবকে জন্ম দিবে ঃ [বুখারী/৪৮]
(১৮) মারামারি ও হত্যাকান্ড বৃদ্ধি পাবে ঃ [বুখারী/৫৫৯৮]
(১৯) সময় দ্রুত চলে যাবে ঃ [তিরমিযী]
(২০) মুসলিমরা শির্‌কে লিপ্ত হবে ঃ [বুখারী/১১৬১]
(২১) ঘন ঘন হাট-বাজার হবে ঃ [মুসনাদ আহমাদ]
(২২) আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করা হবে ঃ [সূরা মুহাম্মাদ-২২]
(২৩) লোকেরা কালো রং দিয়ে চুল-দাড়ি রাঙ্গাবে ঃ [আবূ দাউদ/৪১৫৫]
(২৪) কৃপণতা বৃদ্ধি পাবে ঃ [বুখারী/১৩১৬]

(২৫) ব্যবসা বানিজ্য ছড়িয়ে পড়বে ঃ [মুসনাদ আহমাদ]
(২৬) ভূমিকম্প বৃদ্ধি পাবে ঃ [মুসনাদে আহমেদ]
(২৭) ভূমি ধ্বস ও চেহারা বিকৃতির শাস্তি দেখা দিবে ঃ [মুসলিম/৭০২১]
(২৮) পরিচিত লোকদেরকেই সালাম দেয়া হবে ঃ [মুসলিম/৬৭]
(২৯) বেপর্দা নারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ [মুসলিম/৫৩৯৭]
(২৯) মু'মিনের স্বপ্ন সত্য হবে ঃ [বুখারী/৬৫০৩]
(৩০) সুন্নাতী আমল সম্পর্কে গাফিলতি করবে ঃ [বুখারী/৪৩১]
(৩১) মিথ্যা কথা বলার প্রচলন বৃদ্ধি পাবে ঃ [বুখারী/৫৮২৬]
(৩২) মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়ার প্রচলন ঘটবে ঃ [বুখারী/২৪৬৮]
(৩৩) মহিলার সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে এবং পুরুষের সংখ্যা কমে যাবে ঃ [বুখারী/৪৮৪২]
(৩৪) হঠাৎ মৃত্যু বরণকারীর সংখ্যা বৃদ্ধি পাবে ঃ [সহীহুল জামে আস সাগীর, হাদীস/৫৭৭৫]
(৩৫) আরাব উপদ্বীপ নদ-নদী এবং গাছ-পালায় পূর্ণ হয়ে যাবে ঃ [মুসলিম]
(৩৬) প্রচুর বৃষ্টিপাত হবে, ফসল হবেনা ঃ [মুসনাদ আহমাদ]
(৩৭) ফুরাত নদী থেকে স্বর্ণের পাহাড় বের হবে ঃ [মুসলিম/৭০০৮]
(৩৮) ফিতনায় পতিত হয়ে মানুষ মৃত্যু কামনা করবে ঃ [বুখারী/৬৬৭১]
(৩৯) কাহতান গোত্র থেকে একজন সৎ লোক বের হবে ঃ [বুখারী/৬৬১৯]

কিয়ামাতের বড় আলামাতসমূহ ঃ

(১) ইমাম মাহদীর আগমন ঃ [ইব্ন মাজাহ/৪০৮২-৪০৮৮]
(২) দাজ্জালের আগমন ঃ [বুখারী /৬৬২৬, ৩০৯৪, মুসলিম/৭০৯৫]
(৩) ঈসা ইব্ন মারইয়াম (আঃ) এর আগমন ঃ [সূরা নিসা-১৫৭-১৫৯, যুখরুফ-৬১, ইব্ন মাজাহ/৪০৭৮]
(৪) ইয়াজুয-মা'জুযের আগমন ঃ [সূরা কাহফ-৯২-৯৯, আম্বিয়া-৯৬-৯৭, বুখারী/৬৬৩৭]
(৫) তিনটি বড় ধরণের ভূমি ধ্বস ঃ [সূরা কাসাস-৮১, মুসলিম/৭০২১]
(৬) বিশাল এক ধোঁয়ার আগমন ঃ [সূরা দুখান-১০-১৫, মুসলিম/৭০২১]
(৭) পশ্চিম আকাশে সূর্যোদয় হবে ঃ [মুসলিম/৬৬১৫]
(৮) দাব্বাতুল আরদ (দাব্বাতুল আরদ নামক এক অদ্ভুত জন্তু) বের হবে ঃ [সূরা নামল-৮২]
(৯) কিয়ামাতের সর্বশেষ আলামাত ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাত কায়েম হবেনা যতক্ষণ না তোমরা দশটি বিশেষ নিদর্শন দেখবে। অতঃপর তিনি ধূম্র, দাজ্জাল, দাব্বা, পশ্চিম দিগন্ত হতে সূর্য উদিত হওয়া, মারইয়াম তনয় ঈসা আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবতরণ, ইয়াজুয-মা'জুয এবং তিনবার ভূমি ধ্বসে যাওয়া তথা পূর্ব প্রান্তে ভূমি ধ্বস, পশ্চিম প্রান্তে ভূমি ধ্বস এবং আরাব উপদ্বীপে ভূমি ধ্বসের কথা উল্লেখ করলেন। এ নিদর্শনসমূহের পর

এক অগ্নি প্রকাশিত হবে যা তাদেরকে ইয়ামান থেকে হাঁকিয়ে হাশরের মাইদানের দিকে নিয়ে যাবে। [মুসলিম/৭০২১-হুযায়ফা ইব্ন আসীদ আল-গিফারী (রাঃ)]

আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) আদেশ অমান্যকারীরা ভুল পথে আছে

১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি অবিশ্বাস করে এবং আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করতে ইচ্ছা করে এবং বলে ঃ আমরা কতিপয়কে বিশ্বাস করি ও কতিপয়কে অবিশ্বাস করি এবং তারা এর মধ্যবর্তী পথ অবলম্বন করতে ইচ্ছা করে ওরাই প্রকৃত অবিশ্বাসী, এবং আমি অবিশ্বাসীদের জন্য অবমাননাকর শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। [সূরা নিসা-১৫০-১৫১]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাওবা-৬৫, ৬৬, ৭৪, আলে ইমরান- ৯৭।

৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার আনুগত্য করল, সে আল্লাহরই আনুগত্য করল । আর যে ব্যক্তি আমার নাফরমানী করল, সে আল্লাহরই নাফরমানী করল। আর যে ব্যক্তি আমার নির্বাচিত আমীরের নাফরমানী করল, সে আমারই নাফরমানী করল। [বুখারী/৬৬৩৯]

◫ এ বিষয়ে সমগ্র আলেম সমাজ তথা শারীয়াতের মনীষীগণ একমত যে, কোন লোক যদি কোন ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সত্য বলে মানে এবং কোন কোন বিষয়ে তাঁকে মিথ্যা জানে তাহলে সে নির্ঘাত কাফির, সে ইসলামে প্রবিষ্টই হতে পারেনা। একই কথা প্রযোজ্য হবে তার উপরেও, যে ব্যক্তি কুরআনের কিছু অংশ বিশ্বাস করল, আর কতক অংশকে অস্বীকার করল, তাওহীদকে স্বীকার করল কিন্তু সালাত যে ফারয তা মেনে নিলনা। অথবা তাওহীদও স্বীকার করল, সালাতও আদায় করল, কিন্তু যাকাত যে ফারয তা মানলনা, অথবা এগুলি সবই স্বীকার করল কিন্তু সিয়ামকে অস্বীকার করল কিংবা ঐগুলি সবই স্বীকার করল কিন্তু একমাত্র হাজ্জকে অস্বীকার করল। পরিনামে এরা সবাই হবে নাফরমান/ফাসিক।

কুফর এবং কুফরীর বৃত্তান্ত

❖ অভিধানে কুফর অর্থ আচ্ছাদন করা ও গোপন করা। আর শারীয়াতের পরিভাষায় ঈমানের বিপরীতকে বলা হয় কুফর। কেননা কুফর বলা হয় আল্লাহ ও তাঁর রাসূলগণের প্রতি ঈমান না আনা, মিথ্যা প্রতিপন্ন করা, যুক্ত থাক বা না থাক বরং সন্দেহ বশতঃ হোক অথবা উপেক্ষা করে বা হিংসা ও অহংকার বশতঃ হোক কিংবা রিসালাতের অনুসরণ করা থেকে বাধা প্রদানকারী প্রবৃত্তির অনুকরণ এ সবই কুফর। যদিও মিথ্যা প্রতিপন্নকারী কুফরী করার দিক দিয়ে বড় এবং অনুরূপভাবে রাসূলগণের সত্যতা বিষয়ে ইয়াকীন থাকা সত্ত্বেও হিংসা বশতঃ অস্বীকারকারীও কাফির বলে গণ্য হয়। এ বিষয়ে দেখুন-

১। মিথ্যার কুফল ঃ [সূরা আনকাবূত-৬৮, বাকারা-৮৫]

২। অস্বীকার ও অহংকারের কুফরী ঃ [সূরা বাকারা-৩৪]

৩। কিয়ামাতের দিনকে অস্বীকার করা ঃ [সূরা কাহ্ফ-৩৬, ৩৭]
৪। ইসলাম যা দাবি করে তা থেকে মুখ ফিরান ঃ [সূরা মুনাফিকুন-৩, বাকারা-৮]
৫। আল্লাহর নি'আমাতের সঙ্গে কুফরী ঃ [সূরা ইবরাহীম-৭০]
৬। দীনের প্রকাশ্য জিনিসকে (যেমন ইসলাম, ইসলামের ভিত্তি, সালাত ত্যাগ করা ইত্যাদি) অস্বীকার করা ঃ [সূরা মায়িদা-৪৪]
৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৯, ১০, ৩৪, আহকাফ-৩, নাহল-১১২, তাওবা-৬৭, নিসা-১৪২, ১৪৫, মু'মিন-৪, আলে ইমরান-৩২।
৮। আমলের ক্ষেত্রে কুফরী ঃ

ক) মুসলিমকে গালি দেয়া ফাসিকী কাজ এবং তাকে হত্যা করা কুফরী। [বুখারী/৬৫৮৩, মুসলিম/১২৫, ১২৬]

খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন যিনাকারী যিনা করে তখন সে আর মু'মিন থাকেনা এবং যখন মদ্যপ থাকে তখন সে আর মু'মিন থাকেনা। [বুখারী/৬৩০]

গ) অন্যত্র নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দা এবং শির্ক ও কুফরের মধ্যে পার্থক্য হচ্ছে সালাত (নামায) ত্যাগ করা। [মুসলিম/১৫০]

ঘ) বংশের প্রতি কটাক্ষ করা এবং মৃতের জন্য উচ্চঃস্বরে বিলাপ করা। [মুসলিম/১৩১]

□ সমাজে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকারের কুফরসমূহ ঃ

ক) আল্লাহ এবং তাঁর ক্ষমতাকে একেবারেই না মানা।

খ) আল্লাহ আছেন মুখে স্বীকার করে, কিন্তু তাঁর নির্দেশ, আদেশ ও বিধানকে মান্য করেনা।

গ) আল্লাহর বিধান মেনে চলে, কিন্তু আল্লাহর বিধান ও আইন মানার উপায় ও মাধ্যম রাসূলুল্লাহকে (সাঃ) না মানা।

ঘ) অন্যান্য নাবী/রাসূলগণের মধ্যে পার্থক্য করে কেহকে মানা এবং কেহকে না মানা।

ঙ) নাবীগণ আল্লাহর পক্ষ হতে আকীদাহ, বিশ্বাস, নৈতিক চরিত্র, শিক্ষা ও আইন কানূন পেশ করেছেন। তার সব কিছু বা একাংশ অগ্রাহ্য করা।

চ) আল্লাহর নির্দেশকে অমান্য করা, অমান্য করতে থাকা এবং আল্লাহর আনুগত্যকে বাস্তব জীবনের ভিত্তি রূপে গ্রহণ না করা।

শির্ক, কুফর ও মুশরিকের মধ্যে পার্থক্য

১। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন তারা বিশুদ্ধ চিত্তে তাদের রাব্বকে ডাকে, অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে স্বীয় অনুগ্রহ আস্বাদন করান তখন তাদের এক দল তাদের রবের সাথে শরীক করে থাকে । [সূরা রূম-৩৩]
২। মানুষকে যখন দুঃখ-দৈন্য স্পর্শ করে তখন সে অনুতপ্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তার রাব্বকে ডাকে। কিন্তু পরে যখন তিনি তার প্রতি অনুগ্রহ করেন তখন সে বিস্মৃত

হয়ে যায়, পূর্বে যাকে সে ডেকেছিল তাঁকে এবং সে আল্লাহর **সমকক্ষ দাঁড়** করায়, অপরকে তাঁর পথ হতে বিভ্রান্ত করার জন্য। বল ঃ **কুফরীর জীবন** অবস্থায় তুমি কিছু কাল উপভোগ করে নাও। বস্তুতঃ তুমিতো জাহান্নামেরই অধিবাসী। [সূরা যুমার-৮]

৩। সমুদ্রে যখন তোমাদেরকে বিপদ স্পর্শ করে তখন শুধু তিনি ছাড়া অপর যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা তোমাদের মন হতে উধাও হয়ে যায়; অতঃপর তিনি যখন স্থলে ভিড়িয়ে তোমাদেরকে উদ্ধার করেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও; বস্তুতঃ মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। [সূরা বানী ইসরাইল-৬৭]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউনুস-১২, আনকাবূত-৬৫, লুকমান-৩২, যুমার-৪৯, বাকারা-১০৫, ২২১, বাইয়িনা-৬, তাওবা-১৭, ৩৬, ১২৩, আলে ইমরান-১৫১।

৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সবচেয়ে বড় পাপ হচ্ছে আল্লাহর সংগে শরীক করা, পিতা-মাতার অবাধ্য হওয়া ও মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া। [বুখারী/৬৪৩৮-ইব্‌ন আবূ বাকার (রাঃ)]

◻ 'কুফর' হচ্ছে আল্লাহকে অস্বীকার করা। আর 'শির্‌ক' হচ্ছে আল্লাহর সাথে অংশীদারিত্বের আকীদা পোষণ করা বা অংশীদার বানানো। কুরআনুম মাজীদে যাদেরকে কাফির বলা হয়েছে, তাদেরকেই আবার মুশরিক বলা হয়েছে। উল্লিখিত আয়াতগুলি থেকে এ বিষয় সুস্পষ্ট যে, কুফর ও শির্‌ক এবং কাফির ও মুশরিকের মধ্যে মৌলিক পার্থক্য নির্ণয় করা দুরূহ ব্যাপার। ঐগুলি প্রায় এক ও অভিন্ন। তবে শির্‌ক সবচেয়ে বড় যুল্‌ম [সূরা লুকমান-১৩]।

কাফিরদের পরিণাম ও প্রতিকার

১। তুমি তাদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা কর বা না কর (উভয়ই সমান), তুমি তাদের জন্য সত্তর বার ক্ষমা প্রার্থনা করলেও আল্লাহ কক্ষনো তাদেরকে ক্ষমা করবেননা। এটা এ জন্য যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের সাথে কুফ্‌রী করেছে। আর আল্লাহ ফাসিক লোকদেরকে সঠিক পথ প্রদর্শন করেননা। [সূরা তাওবা-৮০]

২। যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। [সূরা কালাম-৪৪]

৩। আমি তাদেরকে সময় দেই, আমার কৌশল বড়ই মজবুত। [সূরা কালাম-৪৫]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাওবা-৮৪, ইবরাহীম-১৮, ফাত্‌হ-১৩, আলে ইমরান-২৮।

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের যে ব্যক্তি কোন প্রকার শির্‌ক না করা অবস্থায় মৃত্যুবরণ করবে ইনশাআল্লাহ কিয়ামাত দিবসে সে আমার শাফা'আত পাবে। [মুসলিম/৩৮৭]

<u>প্রতিকারের উপায়</u>

⊙ তুমি কাফিরদেরকে বল ঃ তারা যদি অনাচার থেকে বিরত থাকে তাহলে তাদের পূর্বের অপরাধ যা হয়েছে তা আল্লাহ ক্ষমা করবেন। কিন্তু তারা যদি

অন্যায়ের পুনরাবৃত্তি করে তাহলে পূর্ববর্তীদের দৃষ্টান্ততো রয়েছেই। [সূরা আনফাল-৩৮]

খেয়াল খুশির অনুসরণ করা যাবেনা

১। **এরপর** আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ বিধানের **উপর**। সুতরাং **তুমি** ওর অনুসরণ কর, অজ্ঞদের খেয়াল খুশীর অনুসরণ করনা। [সূরা জাসিয়া- ১৮]

২। যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অনুসরণ করল, তারা আল্লাহর আনুগত্য করল, আর যারা মুহাম্মাদের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) অবাধ্যতা করল, তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। [বুখারী/৬৭৭১]

আমাদের দেশের সাধারণ সরল প্রাণ ধর্মভীরু মানুষের মধ্যে একটি জিনিস সর্বদা কাজ করে। সেটা হল দুনিয়ায় যা কিছু ভাল-মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, হালাল-হারাম, জায়েয-নাজায়েয কাজ বুঝে অথবা না বুঝে করে থাকে, যার উদ্দেশ্য হল সহজে জান্নাতে যাওয়া। এ জন্য অত্যন্ত দুর্বল মুহূর্ত তৈরী করে এবং অন্তরে দারুন ভীতি সৃষ্টি করে সেটাকে কৌশলে ব্যবহার করার জন্য একদল লোক আছে যারা বলে ঃ অলী আওলিয়ার নিকট যাও, তোমার কোন চিন্তা নেই। সে জিন্দা অথবা মুর্দা হোক তার নিকট গেলেই তোমার নাজাতের যাবতীয় বন্দোবস্ত হয়ে যাবে। তারা আল্লাহর অলী, তাই আল্লাহর নিকট সুপারিশ করে পুলসিরাত পার করে দিবে। পুলসিরাত একবার পার হতে পারলে আর ঠেকায় কে? সোজা জান্নাতে গিয়ে হুর এবং আরও কত আরাম আয়েশের ইন্তেজাম। পীর ধরতেই হবে। পীরই তো অলী-আওলিয়া। তা না হলে কে সুপারিশ করবে? আর পীরের মুরিদ না হলে, তার পাগড়ী ধরে বাইয়াত না করলে কেন তিনি তোমার জন্য সুপারিশ করতে যাবেন? আমাদের দেশে যারা অলী বা আওলিয়া রূপে পূজিত হয়ে বিরাট বিরাট উঁচু শানদার গম্বুজওয়ালা কাবরে শায়িত তাদের খিদমতগার বা কাবর পাহারাদারেরা এভাবেই ভয় দেখায় যে, কাবরের নিকট দিয়ে যানবাহনে চড়ে দ্রুত যাবেনা, জুতা পরিধান করে যাবেনা, কাবরকে পিছনে ফিরে যাবেনা, কাবরে বাতি, লোবান জ্বালাবে, সিন্নি দিবে, তা নাহলে তোমার অনেক অনেক শারিরীক, আর্থিক ও মানসিক ক্ষতি হয়ে যাবে কাবরবাসীর বদ দু'আয়। অথচ কাবর পাকা করাই যেখানে হারাম, সেখানে পাহারা দেয়া বা বাতি জ্বালানোর তো প্রশ্নই আসেনা। জ্যান্ত মানুষের নিরাপত্তার জন্য প্রহরী বা পাহারা লাগে, কিন্তু মৃত ব্যক্তির নিরাপত্তার দায়িত্বে যারা পাহারা দেয় তাদের প্রভু কে? তারা কোন নাবীর শারীয়াতের পাবন্দী? মৃত ব্যক্তির জিম্মাদারীতো তার আমল দ্বারাই হয় ইল্লীনে, নয় সিজ্জিনে। যারা ইল্লীন ও সিজ্জিনকে বিশ্বাস করেনা তারা কোন আসমানী কিতাবের অনুসারী?

আল্লাহর গুণাবলী কি মানুষের গুণাবলীর মতই?

১। তিনি আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টিকর্তা, তিনি তোমাদের মধ্য হতে তোমাদের জোড়া সৃষ্টি করেছেন এবং আন'আমের জোড়া; এভাবে তিনি তোমাদের বংশ বিস্তার করেন; কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা শূরা-১১]

২। তারা আল্লাহর যথাযোগ্য মর্যাদা দেয়না। কিয়ামাতের দিন সমগ্র পৃথিবী তাঁর হাতের মুষ্ঠিতে থাকবে, আর আকাশমন্ডলী ভাঁজ করা অবস্থায় থাকবে তাঁর ডান হাতে। মাহাত্ম্য তাঁরই, তারা যাদেরকে তাঁর শরীক করে তিনি তাদের বহু উর্ধ্বে। [সূরা যুমার-৬৭]

৩। সেদিন আমি আকাশকে গুটিয়ে নিব যেমনভাবে (লিখিত) কাগজ-দলীল গুটিয়ে রাখা হয়। যেভাবে আমি প্রথমবার সৃষ্টি করেছিলাম, সেভাবে আবার সৃষ্টি করব। যে ওয়াদা আমি করেছি, তা আমি পূর্ণ করবই। [সূরা আম্বিয়া-১০৪]

৪। কোন মানব-দৃষ্টি তাঁকে দেখতে পারেনা, অথচ তিনি সকল কিছুই দেখতে পান এবং তিনি অতীব সূক্ষ্মদর্শী এবং সর্ব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। [সূরা আন'আম-১০৩]

◻ যে ব্যক্তি এ বিশ্বাস পোষণ করবে যে, আল্লাহর সিফাত তথা গুণাবলী মানুষের গুণাবলীর মতই সে পথভ্রষ্ট। দু'টি জিনিসের নাম ও গুণ এক হলেই জিনিস দু'টি সকল দিক থেকে এক হওয়া জরুরী নয়। এটি একটি গুরুত্বপূর্ণ নীতিমালা। মানুষের মুখ আছে। উটেরও মুখ আছে। দু'টি মুখ কি একই রকম? কখনই নয়। অনুরূপভাবে উটের পা আছে পিপীলিকার পা আছে। উভয়েরই পা কি সমান? তেমনি আল্লাহর চেহারা। তা মাখলুকাতের চেহারায় অনুরূপ নয়। এ জন্যই আল্লাহর কোন সিফাতের ধরন, গঠন বা প্রকৃতি অনুসন্ধান করার জ্ঞান কোন সৃষ্ট জীবের নেই। মানুষের এ রূপ ধারণা করা ঠিক নয় যে, আল্লাহর গুণসমূহ মানুষের গুণাবলির মতই।

গায়িবের খবর আল্লাহ ছাড়া কেহ জানেনা

১। তুমি বল ঃ আমি তোমাদেরকে এ কথা বলিনা যে, আমার কাছে আল্লাহর ধন ভান্ডার রয়েছে, আর আমি অদৃশ্য জগতেরও কোন জ্ঞান রাখিনা, এবং আমি তোমাদেরকে এ কথাও বলিনা যে, আমি একজন মালাক/ফিরিশতা। আমার কাছে যা কিছু অহী রূপে পাঠানো হয়, আমি শুধুমাত্র তারই অনুসরণ করে থাকি। তুমি (তাদেরকে) জিজ্ঞেস কর ঃ অন্ধ ও চক্ষুস্মান কি সমান হতে পারে? সুতরাং তোমরা কেন চিন্তা ভাবনা করনা? [সূরা আন'আম-৫০]

২। তুমি বল ঃ আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ছাড়া আমার নিজের ভাল-মন্দ বিষয়ে আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্য তত্ত্ব ও খবর জানতাম তাহলে আমি রবের কল্যাণ লাভ করতে পারতাম, আর কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা, আমিতো শুধু মু'মিন সম্প্রদায়ের জন্য একজন ভয় প্রদর্শনকারী ও সুসংবাদবাহী। [সূরা আ'রাফ-১৮৮]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ **জিন-২৬, ২৭, আরাফ-১৮৭,** সাবা-১৪।

৪। **যে ব্যক্তি গণকের কাছে এসে কোন কিছু জিজ্ঞেস করল, চল্লিশ দিন পর্যন্ত** তার **সালাত কবূল** হবেনা। [মুসলিম/৫৬২৭]

৫। **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ গায়িবের **চাবি পাঁচটি** যা **আল্লাহ** ছাড়া আর কেহ জানেনা। তা হল (১) আগামী দিন কি হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। (২) মাতৃগর্ভে কি আছে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। (৩) বৃষ্টি কখন আসবে তা আল্লাহ ব্যতীত আর কেহ জানেনা। (৪) কোন ব্যক্তি বলতে পারেনা তার মৃত্যু কোথায় হবে এবং (৫) কিয়ামাত কবে সংঘঠিত হবে তা আল্লাহ ছাড়া আর কেহ জানেনা। [বুখারী/৬৮৬২-ইব্‌ন উমার (রাঃ), ৪৩২৭, মুসলিম/৫]

◻ অদৃশ্য বা গায়িবের খবর কেহই জানেনা। যদি কেহ বিশ্বাস করে যে, জিন, মানুষ, পীর, দরবেশ গায়িবের খবর জানে তাহলে অবশ্যই সে আল্লাহর নাযিলকৃত উপরোক্ত আয়াতগুলি বিশ্বাস করেনা। অর্থাৎ কুরআন বিশ্বাস করেনা। নাবী কারীমের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) গায়িব জানা সম্পর্কে বিদ'আতীদের আকীদা বা বিশ্বাস হল ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর শান মত আল্লাহ তা'আলার সত্তা ও সিফাত সম্পর্কে, অতীত ও ভবিষ্যতের অসংখ্য ঘটনার মধ্যে বারযাখ, কাবরের অবস্থা, হাশরের মায়দানের চিত্র, জান্নাত, জাহান্নামের পরিস্থিতি ইত্যাদি বিষয় সম্পর্কে এমন জ্ঞান প্রদান করা হয়েছে যা কোন নৈকট্য লাভকারী ফিরিশতাকেও দেয়া হয়নি, যার আন্দাজ একমাত্র আল্লাহ তা'আলাই করতে পারেন। সুতরাং দুনিয়া সৃষ্টির শুরু থেকে জান্নাত/জাহান্নামে প্রবেশ পর্যন্ত সকল বিষয়ের পুংখানুপুংখ জ্ঞান নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া' সাল্লামের ছিল-এ ধারণা ঠিক নয়। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আলিমুল গায়িব বা গায়িব জান্তা মনে করা পূর্বোল্লিখিত আয়াতসমূহ এবং হাদীসের সম্পূর্ণ পরিপন্থী। যে গুণ সৃষ্টিকর্তার, সেই গুণ সৃষ্ট জীবের হয়না। এরূপ ধারনা করলে আল্লাহর সমকক্ষ করা হয়। সেই জন্য ঐ রকম গুণ কারো হবেনা। তাছাড়াও জিনেরা গায়িব জানেনা। আল্লাহ ব্যতীত আকাশ-যমীনের কোন মাখলুকই গায়িবের খবর রাখেনা। সুতরাং যে ব্যক্তি 'ইলমে গায়িবের দাবী করবে সে কাফির হয়ে যাবে। আর যে ব্যক্তি কেহকে 'ইল্‌মে গায়িব' জানে বিশ্বাস করবে, সেও কাফির। কারণ আল্লাহ ছাড়া **অন্য কেহ** গায়িবের খবর জানেনা।

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! কুরআনের বাণী মোতাবেক এক আল্লাহ ছাড়া আর **কেহ** গায়িবের খবর জানেনা বরং আল্লাহ বলেন যে, তিনি ইচ্ছা করলে **রাসূলগণের** মধ্যে যাকে পছন্দ করেন তাকেই তিনি কিছু জানান।

আল্লাহর নাযিলকৃত কোন কিছু গোপন করার অধিকার কারও নেই

১। হে রাসূল! তোমার রবের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর। যদি না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলেনা। মানুষ হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে কক্ষনো সৎপথ প্রদর্শন করেননা। [সূরা মায়িদা-৬৭]

২। আর তুমি তোমার কাছে অহীকৃত তোমার রবের কিতাব থেকে পাঠ করে শোনাও। তাঁর কথা পরিবর্তন করে দিবে এমন কেহ নেই, আর তাঁকে ছাড়া তুমি কক্ষনো অন্য কেহকে আশ্রয়স্থল হিসাবে পাবেনা। [সূরা কাফ-২৭]

৩। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ কোন বিষয় গোপন করা নাবীর পক্ষে অসম্ভব। [সূরা আলে ইমরান-১৬১]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাকভীর-২৪ ও ২৫, আলে ইমরান-১৮৭, বাকারা-১৪০, ১৭৪।

৫। আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমাণও হয়। [বুখারী/৩২০৭, তিরমিযী/২৬৬৯]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তিকে আনন্দোজ্জ্বল করুন যে ব্যক্তি আমার নিকট থেকে কিছু হাদীস শুনেছে। অতঃপর যেভাবে যা শুনেছে যথাযথভাবে তা পৌঁছে দেয়। এমন বহু ব্যক্তি আছে যার কাছে পৌঁছানো হলে সে শ্রবণকারী অপেক্ষাও অধিক (হাদীস) সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। [তিরমিযী/২৬৫৮-আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)]

৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যাকে কোন ইল্‌ম বা জ্ঞান সম্পর্কে জিজ্ঞেস করা হয়, আর সে যদি জানা সত্ত্বেও তা না বলে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তার মুখে আগুনের লাগাম পরিয়ে দিবেন। [আবূ দাউদ/৩৬১৭, তিরমিযী/২৬৫০]

হে মুসলিম ভাই ও বোনেরা! কুরআনের বাণী মোতাবেক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামসহ আল্লাহর সকল রাসূল ও নাবীগণ তাদের কাছে প্রেরিত অহীসমূহ লোকদেরকে সঠিক ভাবে পৌছিয়েছেন।

কেহ কেহ বলে থাকে যে, কুরআনের ৩০ পারা জাহেরী যা আমাদের নিকট রয়েছে এবং বাকী ৩০ পারা বাতিনী যা দীলে দীলে চলে আসছে, তা আবার সবাই জানেনা। তাহলে এই বাতিনী ৩০ পারা কার মাধ্যমে নাযিল হয়েছে? যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে নাযিল হয় তাহলে তো তিনি ঠিক ঠিকভাবে লোকদের নিকট পৌঁছানোর হক আদায় করলেননা (নাউযু-বিল্লাহ)। এই বাতিনী আকীদাহ অবশ্যই কুফরী, যা ইবলীস শাইতান তাদের অন্তরে প্রবেশ করিয়ে থাকে।

এ দেশের বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা বলেন ঃ "ইল্‌মে মারিফাত হল গুপ্ত বিদ্যা।" আল্লাহ তা'আলার নাযিলকৃত কোন বিদ্যাই গোপন নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তাঁর প্রতি নাযিলকৃত কোন বিদ্যাই লোকদের নিকট

পৌঁছাতে অবশিষ্ট রাখেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে সিনায় সিনায় যে বিদ্যা বুজুর্গ, পীর, দরবেশ পর্যন্ত এসেছে বলে দাবী করা হয়, তা দাবীই মাত্র। ⊙ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আল্লাহ যার কল্যাণ চান তাকে দীনের জ্ঞান দান করেন, আমি (রাসূল) তো কেবল বিতরণকারী, আল্লাহ দানকারী। [বুখারী/৭১] নির্দিষ্ট করে গুটি কয়েক লোক শুধু বিশেষ ইল্‌ম লাভ করবে এটা নিরপেক্ষ কথা নয়। যারা বুজুর্গ, পীর, দরবেশ নামে পরিচিত তাদের অনেকেই ইসলামী আমলের বিষয়ে বিজ্ঞ নয়, যা আলোচনা ও আমলের নিরপেক্ষতা থেকে সহজেই বুঝা যায়। অতএব এটা অত্যন্ত পরিস্কারভাবে বলা যায় যে, লোকদেরকে ধোকা দিয়ে আল্লাহর পথ থেকে পথভ্রষ্ট করার জন্য সিনায় সিনায় মারিফাতী বিদ্যা চালু করার গোপন বিদ্যা হাওয়া থেকে পাওয়া নিজেদের প্রবৃত্তির অনুসারীদের আবিস্কার। ওটা এক অভিনব পন্থা। হে আল্লাহ! আমাদের আকীদাহ ও বিশ্বাসকে সংশোধন করে হিদায়াত দান করুন।

গান-বাজনা

১। কতক মানুষ আল্লাহর পথ থেকে বিচ্যুত করার উদ্দেশে অজ্ঞতাবশতঃ অবান্তর কথাবার্তা ক্রয় করে আর আল্লাহর পথকে ঠাট্টা-বিদ্রূপ করে। ওদের জন্যই আছে অবমাননাকর শাস্তি। [সূরা লুকমান-৬]

২। তোমার আহ্বানে তাদের মধ্যে যাকে পার সত্যচ্যুত কর, তোমার অশ্বারোহী আর পদাতিক বাহিনী দিয়ে তুমি আক্রমন চালাও, আর তাদের ধন-সম্পদ ও সন্তানাদিতে শরীক হয়ে যাও, আর তাদেরকে প্রতিশ্রুতি দাও। শাইতান তাদেরকে যে প্রতিশ্রুতি দেয় তা ছলনা মাত্র। [সূরা বানী ইসরাইল-৬৪]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ গায়িকা ও দাসী বিক্রি করবেনা এবং ক্রয়ও করবেনা। তাদের গান শিক্ষা দিবেনা। এদের ব্যবসায়ে কোন কল্যাণ নেই। [তিরমিযী/১২৮৫-আবূ উমামা (রাঃ)]

⧉ গান-বাজনা বা মিউজিক শ্রবণে মানুষের আত্মার জন্য কোন প্রশান্তি নেই, বরং এতে ভয়ংকর ধরনের গুমরাহী ও বিপর্যয় নিহিত রয়েছে। এটা আত্মার জন্য মারাত্মক ক্ষতিকর, যেমন মাদক দ্রব্য দেহের জন্য ক্ষতি সাধন করে । তাই গান-বাজনায় উন্মত্ত ব্যক্তিরা মদ্য পানকারীদের অপেক্ষাও অধিক নেশায় উন্মত্ত হয়ে যায় এবং অধিক আমোদ ও ভোগ সম্ভোগে বিভোর হয়ে পড়ে। আমাদের বর্তমান সমাজের চিত্র এরূপ দেখা যাচ্ছে।

কিন্তু সালাত অথবা কুরআন তিলাওয়াতের সময় তাদের এই অবস্থার সৃষ্টি হয়না। কারণ এটি হচ্ছে তাওহীদ ও নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেয়া পদ্ধতি ভিত্তিক ইবাদাত, যা শাইতানকে বিতাড়িত করে। আর গান-বাজনাওয়ালারা যা করে তা হল শাইতানের দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী ইবাদাত যার ভিত্তি শির্‌ক ও বিদ'আতের উপর। তাই তারা শাইতানকে আহ্বান করে। তাছাড়া ইসলাম কোন জিনিসের মধ্যে ক্ষতিকারক কিছু না থাকলে তা হারাম করেনি। গান-বাজনার মধ্যে নানা ধরণের ক্ষতিকর জিনিস রয়েছে। যেমন ঃ যখন গান-বাজনা তাদের আচ্ছন্ন করে ফেলে, তখনই তারা শির্‌কে পতিত হয়।

তখন তারা ফাহেশা কাজ ও যুল্‌ম করতে উদ্যত হয়। যারা গান-বাজনা করে, তারা বেশীর ভাগই মুখ দিয়ে শিস্‌ দেয় ও হাততালি দেয়। তারা সালাত আদায় করা হতে বিরত থাকে। সাংস্কৃতির নামে অবাধ মেলামেশা করে, অশ্লীলতা দেখা দেয়, তারা পর্দা করেনা আল্লাহর স্মরণ থেকে বিমুখ থাকে ইত্যাদি। বিধায় গান-বাজনা করা/শোনার জন্য আল্লাহ আমাদেরকে অবমাননাকর শাস্তি দিবেন। তাই গান-বাজনা করা/শোনা হারাম।

পুরুষের অবশ্যই খাতনা করতে হবে

১। ইসলাম গ্রহণের পর নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম খাতনা করার আদেশ করেছেন। [মুসনাদ আহমাদ]

২। খাতনা হচ্ছে মুসলিম ও খৃষ্টানের মাঝে পার্থক্যের অন্যতম একটি বৈশিষ্ট্য। এমনকি মুসলিমানগণ যুদ্ধ ক্ষেত্রে খাতনার মাধ্যমে নিজেদের নিহত ব্যক্তিদের খুঁজতেন। আর যা বৈশিষ্ট্য হিসাবে গণ্য তা হচ্ছে যরুরী। কেননা মুসলিম ও কাফিরের মাঝে পার্থক্য থাকাও যরুরী। এ কারণেই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাফিরদের সাথে সাদৃশাবলম্বন নিষিদ্ধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ "যে ব্যক্তি কোন জাতির সাদৃশ্য অবলম্বণ করবে সে তাদেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। [আবূ দাউদ/৩৫১২]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইবরাহীম (আঃ) কাদ্দুম বা সূত্রধরদের অস্ত্র দ্বারা নিজের খাতনা করেছিলেন এবং তখন তাঁর বয়স ছিল আশি বছর। [বুখারী/৩১১১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ৫৮৪৮, মুসলিম/৫৯২৮]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মানুষের স্বভাবগত বিষয়গুলির মধ্যে একটি হল খাতনা করা। [বুখারী/৫৮৪৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

◻ খাতনা হচ্ছে পুরুষের গোপনাংগ থেকে কিছু অংশ কর্তন করা। বিনা কারণে শরীরের কোন অংশ কর্তন করা হারাম। আর যরুরী কারণ ছাড়া হারামকে হালাল করা বৈধ নয়। অতএব পুরুষের খাতনা করা রাসূলের (সাঃ) নির্দেশ। খাতনার বিষয়টি কোন কোন মহলে মহা ধুমধামে করা হয় যা শারীয়াত সমর্থিত নয়। খাতনার জন্য কোন আড়ম্বর অনুষ্ঠান করার দলীল নেই, বরং এ ধরণের রেওয়াজ আইয়্যামে জাহিলিয়াতের সময় ছিল। মাক্কার কাফির ও মুশরিক সমাজের ন্যায় বর্তমান মুসলিম সমাজে নব্য জাহিলিয়াত বাসা বেঁধেছে। মাইক দিয়ে, বাজনা বাজিয়ে, দা'ওয়াতী কার্ড ছাপিয়ে বেশ জমকালো অনুষ্ঠান করা হয় উপহার, উপঢৌকনের এবং নিজের নাম ও সুনাম বৃদ্ধির আশায়।

ঘুষ

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَتَرَى كَثِيرًا مِّنْهُمْ يُسَارِعُونَ فِي الإِثْمِ وَالْعُدْوَانِ وَأَكْلِهِمُ السُّحْتَ لَبِئْسَ مَا كَانُواْ يَعْمَلُونَ

তাদের অনেককেই তুমি পাপ, সীমালঙ্ঘন আর হারাম ভক্ষণের প্রতিযোগিতায় ব্যস্ত দেখতে পাবে। তারা যা করে তা কতই না নিকৃষ্ট! [সূরা মায়িদা- ৬২]

২। যে ব্যক্তি অন্যায়ভাবে সম্পদ অর্জন করে তার উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত যে খায় অথচ পরিতৃপ্ত হয়না। [ইব্‌ন মাজাহ/৩৯৯৫]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ঘুষ দাতা এবং ঘুষ গ্রহীতার উপর আল্লাহর লা'নত। [ইব্‌ন মাজাহ/২৩১৩-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ), আবূ দাউদ/৩৫৪২]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারও প্রাপ্য না দেয়া এবং অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া আল্লাহ তা'আলা তোমাদের জন্য হারাম করেছেন। [বুখারী/২২৪১]

◻ কাজটি তার প্রাপ্য অথবা প্রাপ্য নয় এমন কাজ করে দেয়ার জন্য বা কাজ পাইয়ে দেয়ার জন্য অফিস-আদালতে বা অন্যত্র যে অর্থ যুল্‌ম বা অন্যায়ভাবে নেয়া হয় সেটাই ঘুষ। সচরাচর বলা হয় যে, তোমার এ কাজটি আমি করে দিব, এ জন্য তোমাকে এত টাকা দিতে হবে। অথচ ঐ কাজটি করার জন্যই তাকে চাকুরীতে নিয়োগ দেয়া হয়েছে। এই ঘুষ আজ প্রতিটি অফিসে দৈনন্দিন জীবনের অলিখিত একটি ব্যবস্থার মারাত্মক রূপে দেখা দিয়েছে। শত সহস্র কোটি টাকার ঘুষ কেলেংকারীতে জাতি যেন ডুবন্ত । এদের সহায়তা অথবা সমর্থন দিতে দেখা যায় প্রশাসনের মন্ত্রী/রাষ্ট নায়কদের। এমন কিছু দুঃসংবাদ জাতি শোনেছে বিগত বছর ধরে। আর দুর্নীতি নামক এ দৈত্য জাতি, রাষ্ট্রের ঘাড়ে চেপে বসে আছে যুগযুগ ধরে। আমরা মুসলিম অথচ কুরআনের হুশিয়ারী মানছিনা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সতর্কবাণী হচ্ছে ঘুষ দাতা ও ঘুষ গ্রহীতা উভয়ে জাহান্নামী, এটাও আমলে আনছিনা। কত হয়রানী আর পেরেশানী যে ঐ ঘুষ নামক দৈত্যটি জীবনকে আছড়ে মারছে তা টের পাচ্ছে ভুক্তভোগীরা। তবুও নাকি আমরা মুসলিম। এমন মুসলিমের পরিণতি কি হবে ?

চেহ্‌লাম বনাম চল্লিশা

১। সালমাহ ইব্‌ন আকওয়া (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার উপর এমন কথা আরোপ করে যা আমি বলিনি, সে যেন জাহান্নামে তার ঠিকানা বানিয়ে নেয়। [বুখারী/১১০]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ)]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় হল বিদ'আত বা নতুন আবিষ্কৃত বিষয়সমূহ। সকল বিদ'আতই হল পথভ্রষ্টতা। [মুসলিম/১৮৭৫-জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

◻ প্রথমত ঃ চল্লিশা পালন করার প্রথা কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। এটা নব আবিস্কৃত কু-সংস্কার এবং অন্যায়ভাবে মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করার

শামিল। কাজেই এটা বর্জনীয় ও পাপের কাজ। এতে **মৃত ব্যক্তির উপকার** হওয়া কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। চেহলাম অর্থ **চল্লিশতম দিন। মৃত** ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশতম (৪০) দিবসে তার রুহের মাগফিরাতের জন্য **তার** আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের মোল্লা-মুন্সী ও গরীবদেরকে ডেকে সূরা ইখলাস, নির্দিষ্ট সংখ্যায় দুরূদ পাঠ ও ছোলার দানা বা তেঁতুল বিচি সংগ্রহ করে মৃতের নামে সোয়া এক লক্ষবার কালেমা পাঠ করান এবং কুরআনের কিয়দংশ পাঠ করে তা মৃতের নামে 'বখশে' দিয়ে সকলে একত্র হয়ে হাত উত্তোলন করে লম্বা একখানা মোনাজাত করা এবং ভাল মানের খানা-পিনা পরিবেশন করা হয়। এটাই চেহলাম। এটা একটি হিন্দুয়ানী প্রথা। হিন্দু ও বৌদ্ধরা পুনর্জন্মে বিশ্বাসী। তাদের মতে-দেহ নশ্বর, কিন্তু আত্মা অবিনশ্বর। অর্থাৎ জীবের মৃত্যুর পরে তার এই পার্থিব দেহ লয়প্রাপ্ত হয়, কিন্তু আত্মা লয়প্রাপ্ত হয়না। এই জন্মের ভাল বা মন্দ কর্মানুসারে উৎকৃষ্ট বা নিকৃষ্ট জীব রূপে আত্মা আবার জন্ম নেয়। কালের আবর্তে এর সাথে সংযুক্ত হয়েছে (৪০) দিন। আন্তর্জাতিকভাবে ইহা Copy বলে পরিচিত। পাড়া গাঁয়ে চেহলামকে "খানা" বলে, আর হিন্দুরা বলে "শ্রাদ্ধ"। ইসলামের বিভিন্ন ঘটনা কিংবা বিষয়ের সাথে "৪০" সংখ্যার একটি বিশেষত্ব রয়েছে। তাই এ দেশের কতিপয় মৌলভী শ্রাদ্ধের আদলে এটিকে ইসলামী করণের জন্য নাম দিয়েছে চল্লিশা। এ ব্যাপারে সঠিক কথা হল ঃ মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর পরে ৩য় দিনে, ৭ম দিনে, চল্লিশতম দিনে বা জন্ম-মৃত্যুর দিনে খানা-পিনা, দান-খাইরাত, দু'আ-খাইর ইত্যাদি অনুষ্ঠান করা আমাদের দেশের বহুল প্রচলিত ভ্রান্ত রীতি। এ রীতিটি একেবারেই বানোয়াট ও জালিয়াতী। এ সকল দিবসে মৃতের জন্য কোন অনুষ্ঠান করার বিষয়ে কোন প্রকার নির্দেশ কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে মৃতের জন্য সদা-সর্বদা বা সুযোগমত দু'আ করা যাবে। বিশেষ করে সন্তানগণ দু'আ ও দান-খাইরাত করবেন এবং এ সবই হতে হবে অনানুষ্ঠানিক অর্থাৎ রেওয়াজ সৃষ্টি হবে এমন ভাবে নয়।

জান্নাতী এবং জাহান্নামীদের পরিচয়

⊙ আর যে কেহ আনুগত্য করবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের, তিনি তাকে দাখিল করবেন জান্নাতে, যার পাদদেশ প্রবাহিত হয় নাহরসমূহ। সেখানে তারা চিরকাল থাকবে, আর এটা হল মহাসাফল্য ।[সূরা নিসা-১৩]

⊙ আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে। তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে প্রবাহিত হয় নাহরসমূহ। যখনই তাদের সেখানে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে ঃ এতো তাই যা আমাদেরকে এর আগে খেতে দেয়া হত। আসলে তাদের দেয়া হবে তার অনুরূপ। আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র সঙ্গিনী এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। [সূরা বাকারা-২৫]

⊙ তবে হ্যাঁ, যারা পাপ কাজ করে এবং যাদের পাপরাশি তাদেরকে ঘিরে ফেলে তারাই জাহান্নামী, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। [সূরা বাকারা-৮১]

⊙ আর সুপথ প্রকাশিত হওয়ার পর যে রাসূলের বিরুদ্ধাচরণ করে এবং বিশ্বাসীগণের বিপরীত পথের অনুগামী হয়, তাহলে সে যাতে অভিনিবিষ্ট আমি তাকে তাতেই প্রত্যাবর্তিত করাব এবং তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করব; এবং ওটা নিকৃষ্টতর প্রত্যাবর্তন স্থল। [সূরা নিসা-১১৫]

⊙ আমি বহু জিন ও মানুষকে জাহান্নামের জন্য সৃষ্টি করেছি। তাদের হৃদয় রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা উপলব্ধি করেনা; তাদের চক্ষু রয়েছে, কিন্তু তারা তদ্বারা দেখেনা। তাদের কর্ণ রয়েছে, কিন্তু তদ্বারা তারা শোনেনা। তারাই হল পশুর ন্যায়, বরং তা অপেক্ষাও অধিক বিভ্রান্ত। তারাই হল গাফিল বা উদাসীন। [সূরা আ'রাফ-১৭৯]

জান্নাতী লোকদের পরিচয় ঃ

১. যারা দীনের হিফাযাতকারী ঃ [সূরা কাফ-৩১-৩৪]
২. যারা জান-মাল দিয়ে আল্লাহর পথে জিহাদ করে ঃ [সূরা সাফ-১০-১২]
৩. যারা আল্লাহর কাছে আত্মসমর্পণ করে ঃ [সূরা যুখরুফ-৬৮-৭০]
৪. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য করে ঃ [সূরা নিসা-১৩]
৫. যারা দীনের উপর অটল থাকে ঃ [সূরা হা মীম আস সাজদাহ-৩০]
৬. যারা মুত্তাকী ঃ [সূরা আলে ইমরান-১৩৩, মুরসালাত-৪১-৪২]
৭. যারা না দেখে আল্লাহকে ভয় করে ঃ [সূরা মুলক-১২]
৮. যারা পরিণামের ভয় করে এবং আল্লাহকে ডাকে ঃ [সূরা তূর-২৫-২৮]
৯. যারা সবর করে ঃ [সূরা আনকাবূত-৫৮,৫৯]
১০. যারা নিজেদেরকে পবিত্র করেছে ঃ [সূরা নাহল-৩২]
১১. যারা আল্লাহর একনিষ্ঠ বান্দা ঃ [সূরা সাফফাত-৪০-৪২]
১২. যারা সৎকর্ম করে ঃ [সূরা নিসা-১২২]
১৩. যারা শেষ রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় ও ক্ষমা প্রার্থনা করে ঃ [সূরা যারিয়াত -১৫-১৮]
১৪. যারা ধৈর্যশীল, সত্যবাদী এবং বিনয়ী ঃ [সূরা আলে ইমরান-১৫-১৭]
১৫. যারা সব সময় দান-খাইরাত করে ঃ [সূরা বাকারা-২৭৪]
১৬. যারা রাগ দমন করে ও মানুষের ভুল ক্ষমা করে দেয় ঃ [সূরা আলে ইমরান-১৩৩-১৩৪]
১৭. যারা কাবীরা গুনাহ থেকে বেঁচে থাকে ঃ [সূরা নিসা-৩১]
১৮. যারা অহংকার করেনা এবং দুনিয়ায় ফাসাদ করেনা ঃ [সূরা কাসাস-৮৩]
১৯. যারা নাফ্সকে দমন করে ঃ [সূরা নাযিয়াত-৪১]
২০. যারা আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ইল্ম অর্জন করে ঃ [বুখারী/৭১]
২১. যারা ফারযকে গুরুত্ব দেয় এবং বিদ'আত থেকে দূরে থাকে ঃ [বুখারী/৬১২১]
২২. যারা আত্মীয়তার সম্পর্ক রক্ষা করে ঃ [মুসলিম/৬২৯০]
২৩. যারা ফাজর ও আসর সালাতের গুরুত্ব দেয় ঃ [বুখারী/৫৪৪]
২৪. যারা বেশী বেশী মাসজিদে যাতায়াত করে ঃ [বুখারী/৬২৭]
২৫. যারা মাসজিদ নির্মাণ করে ঃ [মুসলিম/১০৭১]
২৬. যারা হাজ্জ ও উমরা পালন করে ঃ [বুখারী/১৬৫১]
২৭. যারা সিয়াম পালন করে ঃ [বুখারী/৬৯৭১]

২৮. যারা আল্লাহর পথে জিহাদ করে ঃ [বুখারী/২৫৮৬]
২৯. যারা আল্লাহর নিরানব্বইটি নাম মুখস্থ করে এবং তদনুযায়ী **আমল করে ঃ** [বুখারী/৫৯৫৫]
৩০. যারা লজ্জাস্থান ও মুখের হিফাযাত করে ঃ [ইব্‌ন মাজাহ/৪২৪৬]
৩১. যারা প্রতিবেশীর সাথে উত্তম আচরণ করে ঃ [মুসলিম/৭৮]
৩২. যারা মুসলিমদের উপর আরোপিত কষ্ট দূর করে ঃ [মুসলিম/৬৩০৯]
৩৩. যারা মুসলিম ভাইয়ের সম্মান রক্ষা করে। [তিরমিযী/১৯৩৭]
৩৪. যারা রোগে ধৈর্যধারণ করে ঃ [তিরমিযী /৯৬৯]
৩৫. ধৈর্যধারণকারী অন্ধ ঃ [বুখারী/৬০১৩]
৩৬. সন্তানের মৃত্যুতে ধৈর্যধারণকারী ঃ [বুখারী/১১৭১]
৩৭. কন্যা সন্তানদের লালন-পালনকারী ঃ [আবূ দাউদ/৫০৫৭]
৩৮. যারা ইয়াতিমের লালন-পালন করে ঃ [বুখারী/৫৫৬৬]
৩৯. যারা ন্যায় বিচার করে ঃ [সূরা মায়িদা/৮]
৪০. যারা রাগ দমন করে ঃ [তিরমিযী/২০২৭]
৪১. যারা প্রতিশোধ না নিয়ে ক্ষমা করে দেয় ঃ [মুসলিম/৬৩৫৬]
৪২. যারা অহংকার, খিয়ানাত ও ঋণ থেকে মুক্ত থাকে ঃ [তিরমিযী/২০০৪]
৪৩. যারা ভিক্ষাবৃত্তি পছন্দ করেনা ঃ [মুসলিম/২২৬৫]
৪৪. যারা তাবিজ-কবজের আশ্রয় নেয়না, শুভ-অশুভ বিশ্বাস করেনা ঃ [বুখারী/ ৫৩২৮, আবূ দাউদ/৩৬]
৪৫. যারা রাসূলের আনুগত্য করে ঃ [বুখারী/৬৭৭১]
৪৬. যারা রোগী দেখতে যায় ঃ [তিরমিযী/৯৭০]
৪৭. যারা পশু-পাখির প্রতি মমতা দেখায় ঃ [বুখারী/৩০৭৯]
৪৮. যারা উত্তম চরিত্রের অধিকারী ঃ [তিরমিযী]
৪৯. যারা নম্র ও বিনয়ী ঃ [তিরমিযী/২০৩৫]
৫০. যাদের অন্তর ভাল ঃ [সূরা ইবরাহীম-৮৮, ৮৯]
৫১. যারা সত্য কথা বলে ঃ [মুসলিম/৬৪০১]
৫২. যারা উত্তম কথা বলে এবং মানুষকে খাদ্য দান করে ঃ [বুখারী/৬০১৮]
৫৩. যারা বেশী বেশী সালাম বিনিময় করে ঃ [মুসলিম/১০০]
৫৪. যারা বেশী বেশী নাফল সালাত আদায় করে ঃ [মুসলিম]
৫৫. যারা ' লা হাওলা ওয়ালা কুউ ওয়াতা' পাঠ করে ঃ [বুখারী/৫৯২৯]
৫৬. যারা উযূর শেষে দু'আ পড়ে ঃ [মুসলিম/৪৪৪]
৫৭. যারা আযান দেয় ঃ [ইব্‌ন মাজাহ/৭২৮]
৫৮. যারা বেশী করে দুরূদ পড়ে ঃ [মুসলিম/৭৩৩]
৫৯. যারা আযান শোনার পর দু 'আ পড়ে ঃ [বুখারী/৫৮৫]
৬০. যারা প্রত্যেক ফারয সালাতের পর আয়াতুল কুরসী পাঠ করে ঃ [বুখারী/৪৬৩৪]
৬১. যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তষ্ট চিত্তে মেনে নেয় ঃ [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]
৬২. যারা সূরা ইখলাসকে ভালবাসে ঃ [বুখারী/৪৬৩৭]

৬৩. যারা ইহকালে প্রশংসনীয় কাজ করে ঃ [বুখারী/১২৭৮]

জাহান্নামী লোকদের পরিচয় ঃ

১. যারা পাপ অর্জন করবে তারা জাহান্নামে যাবে ঃ [সূরা ইউনুস-২৭]
২. যারা কুফরী করে ঃ [সূরা বাকারা-২৫৭]
৩. যারা আল্লাহর নির্দেশনাবলীকে অস্বীকার করে ঃ [সূরা বাকারা-৩৯]
৪. যারা পরকাল বিশ্বাস করেনা ঃ [সূরা বানী ইসরাইল-১০]
৫. যারা আল্লাহর সাথে সাক্ষাৎ করাকে অস্বীকার করে ঃ [সূরা আন্‌কাবূত-২৩]
৬. যারা শির্‌ক করে ঃ [সূরা মায়িদা-৭২]
৭. যারা নিজেকে মা'বূদ বলে দাবী করে ঃ [সূরা আম্বিয়া-২৯]
৮. যারা মুনাফিক ঃ [সূরা তাওবা-৬৮]
৯. যারা নাবীর আদেশ অমান্য করে ঃ [সূরা নূর-৬৩]
১০. যারা পাপাচার কাজ করে ঃ [সূরা সাজদা-২০]
১১. যারা মিথ্যারোপ করে ঃ [বুখারী/১০৭)
১২. যারা দুনিয়ার ভোগবিলাসে ডুবে আছে ঃ [সূরা আহফাক-২০]
১৩. যারা বেশী বেশী পাওয়ার চিন্তায় মগ্ন থাকে ঃ [সূরা তাকাসুর]
১৪. যারা নাবী/রাসূলকে কষ্ট দেয় ঃ [সূরা তাওবা-৬১]
১৫. যারা ধারনা করে, পরকালেও ধন সম্পদ কাজে আসবে ঃ [সূরা মারইয়াম-৭৭-৭৯]
১৬. যারা পাপ বিস্তার হওয়াকে পছন্দ করে ঃ [সূরা নূর-১৯]
১৭. যারা পাপ কাজে নেতৃত্ব দেয় ঃ [সূরা নূর-১১]
১৮. যারা ক্ষমতার বলে পাপ কাজ করে বেড়ায় ঃ [সূরা বাকারা-২০৬]
১৯. যারা অবাধ্যতা করে এবং সীমা লজ্ঘন করে ঃ [সূরা নিসা-১৪]
২০. যারা যমীনে বিদ্রোহ করে ঃ [সূরা শূরা-৪২]
২১. যারা মু'মিনদেরকে নিয়ে হাসি-তামাশা করে ঃ [সূরা সোয়াদ-৬২, ৬৩]
২২. যারা মু'মিনদেরকে কষ্ট দেয় ঃ [সূরা বুরুজ-১০]
২৩. যারা প্রতিবেশীকে কষ্ট দেয় ঃ [মুসলিম/৭৮]
২৪. যারা মু'মিনদের পথ ছেড়ে অন্যদের পথে চলে ঃ [সূরা নিসা-১১৫]
২৫. যারা আল্লাহর অঙ্গীকার রক্ষা করেনা ঃ [সূরা আলে ইমরান-৭৭]
২৬. যারা আল্লাহর ব্যাপারে বিতর্ক করে ঃ [সূরা হাজ্জ-৮, ৯]
২৭. যারা জেনে শুনে দীনী ইল্‌ম গোপন করে ঃ [সূরা বাকারা-১৫৯]
২৮. যারা কুরআনের অপব্যাখ্যা করে ঃ [সূরা ফুসসিলাত-৪০]
২৯. যারা কুরআন প্রচারে গোলযোগ সৃষ্টি করে ঃ [সূরা ফুসসিলাত-২৬, ২৭]
৩০. যারা কুরআনের বাণী শোনেও আমল করেনা ঃ [সূরা লুকমান-৭, আ'রাফ-৩৬]
৩১. যারা আল্লাহর বিধান কিছু মানে, কিছু মানেনা ঃ [সূরা বাকারা-৮৫-৮৬]
৩২. যারা ভাল করে উযূ করেনা ঃ [তিরমিযী/৪১]
৩৩. যারা সালাত আদায় করেনা ঃ [সূরা মুদ্দাসসির-৩৮-৪৭]
৩৪. যারা যাকাত দেয়না ঃ [সূরা তাওবা-৩৪-৩৫]
৩৫. যারা কৃপণতা করে ঃ [সূরা নিসা-৩৭]

৩৬. যারা সিয়াম (রোযা)পালন করেনা ঃ [ইব্ন মাজাহ/১৭১৮]
৩৭. যারা সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও হাজ্জ পালন করেনা ঃ [সূরা আলে ইমরান-৯৭]
৩৮. যারা জিহাদের মায়দান থেকে পলায়ন করে ঃ [সূরা আনফাল-১৫, ১৬]
৩৯. যারা মাসজিদে প্রবেশে বাধা দেয় ঃ [সূরা আনফাল-৩৪]
৪০. যারা কাবা ও অন্যান্য মাসজিদের অসম্মান করে ঃ [সূরা হাজ্জ-২৫]
৪১. যারা সতী নারীদের প্রতি অপবাদ দেয় ঃ [সূরা নূর-২৩]
৪২. যারা মানুষের নিন্দা করে ও তাদেরকে লজ্জা দেয় ঃ [সূরা হুমাযাহ-১-৯]
৪৩. যারা চোগলখোরী করে ঃ [মুসলিম/১৯২]
৪৪. যারা লোক দেখানো আমল করে ঃ [তিরমিযী/২৪২০]
৪৫. যারা অহংকারের উদ্দেশে ইল্‌ম অর্জন করে ঃ [বুখারী/৭৯]
৪৬. যারা অন্যায়ভাবে মানুষ হত্যা করে ঃ [সূরা নিসা-৯৩]
৪৭. যারা সৎ কাজের আদেশ দানকারীকে হত্যা করে ঃ [সূরা আলে ইমরান-২১]
৪৮. যারা আত্মহত্যা করে ঃ [বুখারী/১২৭৬]
৪৯. যারা মদ পান করে ঃ [মুসলিম/৫০৪৯]
৫০. যারা যিনা করে ঃ [সূরা ফুরকান-৬৮, ৬৯]
৫১. বৃদ্ধ ব্যভিচারী, মিথ্যুক বাদশা ও অহংকারী ফাকীর ঃ [মুসলিম/১৯৭]
৫২. যারা মিথ্যা সংবাদ প্রচার করে ঃ [বুখারী/১০৭]
৫৩. যারা অত্যাচার করে ঃ [সূরা ফুরকান-৩৭]
৫৪. যারা জীব-জন্তুর প্রতি যুল্‌ম করে ঃ [মুসলিম/৫৬৫৭]
৫৫. যারা খিয়ানাত করে ঃ [বুখারী/৬০৩৯]
৫৬. যারা অন্যের হক নষ্ট করে ঃ [মুসলিম/৩৪৩]
৫৭. যারা অন্যায়ভাবে অপরের মাল ভক্ষণ করে ঃ [সূরা নিসা-২৯-৩০]
৫৮. যারা গনীমাতের মাল চুরি করে ঃ [মুসলিম]
৫৯. যারা বাইতুল মাল থেকে চুরি করে ঃ [বুখারী]
৬০. যারা ইয়াতিমের মাল ভক্ষণ করে ঃ [সূরা নিসা-১০]
৬১. যারা সুদ খায় ঃ [সূরা বাকারা-২৭৫]
৬২. যারা ছবি তৈরী করে ঃ [বুখারী/৫৫১৩]
৬৩. পানি দিতে বাধাদানকারী, মিথ্যুক ব্যবসায়ী, দুনিয়াবী স্বার্থে বাইআতকারী ঃ [মুসলিম]
৬৪. যারা অহংকার করে ঃ [সূরা নিসা-১৭৩]
৬৫. যারা অযথা প্রশংসা চায় ঃ [সূরা আলে ইমরান-১৮৮]
৬৬. যারা পাজামা, প্যান্ট, লুঙ্গি টাখনুর নীচে পরিধান করে ঃ [বুখারী/৫৩৫৮]
৬৭. খোটা দানকারী ঃ [মুসলিম/১৯৫]
৬৭. যারা আত্নীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করে ঃ [বুখারী/৫৫৪৫]
৬৮. যারা পিতা-মাতার অবাধ্য হয় ঃ [নাসাঈ/২৫৬৪]
৬৯. যারা মাতা-পিতার সেবা করেনা ঃ [মুসলিম/৬২৮০]
৭০. যারা জেনে বুঝে নিজেকে অন্য পিতার সাথে সম্পর্কীত করে ঃ [বুখারী/৬২৯৭]

৭১. দায়ূস এবং পুরুষের সদৃশ ধারণকারী মহিলা ঃ [নাসাঈ/২৫৬৪]
৭২. যারা অধীনস্তদের সাথে প্রতারণা করে ঃ [বুখারী/৫৬২৭]
৭৩. যারা অপরকে ধোঁকা দেয় এবং চক্রান্ত করে ঃ [আবূ দাউদ/৪৭২৬]
৭৪. যারা অসৎ চরিত্রের অধিকারী ও ঝগড়াকারী ঃ [বুখারী /২২৮৮, মুসলিম/৫২১৫]
৭৬. যে সকল পুরুষ স্বর্ণের আংটি ব্যবহার করে ঃ [মুসলিম]
৭৫. যারা সোনা-রূপার প্লেটে পানাহার করে ঃ [বুখারী/৫০১৯]
৭৬. যারা মিথ্যা কথা বলে ঃ [সূরা তূর-১১]
৭৭. যারা অশ্লীল ভাষী ঃ [আবূ দাউদ/৪৫৫৩]
৭৮. যে মহিলা বিনা কারণে তালাক দাবী করে ঃ [তিরমিযী/১১৮৯]
৭৯. যে মহিলা স্বামীর অবাধ্যতা করে ঃ [মুসলিম/১৪৫]
৮০. যারা মৃত্যু উপস্থিত হওয়ার পূর্বে তাওবা করেনা ঃ [সূরা নিসা-১৮]
৮১. যারা শাইতানের পথে চলবে তারাই জাহান্নামী হবে ঃ [সূরা ইয়াসীন-৬০-৬৪]

বেশী সংখ্যায় জাহান্নামী হবে কারা?

১। মানুষের সামনে ও পিছনে পাহারাদার নিযুক্ত আছে যারা আল্লাহর হুকুম মোতাবেক তাকে রক্ষণাবেক্ষণ করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অবস্থা পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেরাই নিজেদের অবস্থা পরিবর্তন করে। আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের অকল্যাণ করতে চাইলে তা রদ করার কেহ নেই, আর তিনি ছাড়া তাদের কোন অভিভাবক নেই। [সূরা রাদ-১১]

২। এটা এ জন্য যে, আল্লাহ কোন সম্প্রদায়ের নিকট দেয়া তাঁর অবদানকে পরিবর্তন করেননা যতক্ষণ না তারা নিজেরাই (তাদের কর্মনীতির মাধ্যমে) তা পরিবর্তন করে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আনফাল-৫৩]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা খুতবা প্রদানের সময় মহিলাদের উদ্দেশ্য করে বলেছেন ঃ হে নারী সমাজ! তোমরা বেশী করে সাদাকাহ কর। কারণ আমি তোমাদের অধিকাংশকেই জাহান্নামে দেখেছি। কেন তারা অধিক হারে জাহান্নামে যাবে এ প্রশ্ন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে করা হয়েছিল। তিনি বলেছেন ঃ তোমরা বেশী পরিমাণে মানুষের উপরে অভিশাপ দিয়ে থাক এবং স্বামীর সদাচরণ অস্বীকার কর। [মুসলিম/১৪৫]

⧉ মহিলারা বেশী পরিমাণে মানুষকে গালি-গালাজ করে, অভিশাপ দেয়, পরনিন্দা ও গীবত করে এবং স্বামীর অকৃতজ্ঞ হয়।

জন্ম নিয়ন্ত্রণ প্রসঙ্গ

১। তোমাদের সন্তানদেরকে তোমরা দারিদ্রতার ভয়ে হত্যা করনা, তাদেরকে এবং তোমাদেরকে আমিই জীবনোপকরণ দিই; তাদেরকে হত্যা করা মহাপাপ। [সূরা বানী ইসরাইল–৩১]

২। তোমরা জীবনোপকরণ কামনা কর আল্লাহর নিকট এবং তাঁরই ইবাদাত কর ও তাঁর কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। তোমরা তাঁরই নিকট প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা আনকাবূত–১৭]

৩। এমন কত জীব-জন্তু রয়েছে যারা নিজেদের খাদ্য মওজুদ রাখেনা; আল্লাহই রিয্ক দান করেন তাদেরকে ও তোমাদেরকে এবং তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা আনকাবূত−৬০]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ যারিয়াহ−৫৮, বাকারা−২০৫, হুদ−৬, হিজর−২০-২১।

মুসলিমরাই শুধু জান্নাতে যাবে, আর অন্য ধর্মের লোকেরা জাহান্নামে যাবে- এটা কি ঠিক? সব মুসলিম কি জান্নাতে যাবে?

১। আর সুসংবাদ দাও তাদের যারা ঈমান আনে এবং সৎ আমল করে যে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত, যার পাদদেশে রয়েছে প্রবাহিত ঝর্ণাসমূহ। যখনই তাদের সেখানে ফলমূল খেতে দেয়া হবে তখনই তারা বলবে ঃ এতো তা-ই যা আমাদের এর আগে খেতে দেয়া হত। আসলে তাদের দেয়া হবে তার অনুরূপ। আর তাদের জন্য রয়েছে সেখানে পবিত্র সঙ্গিনী এবং তারা সেখানে চিরদিন থাকবে। [সূরা বাকারা-২৫]

২। আল্লাহ কাফিরদের জন্য নূহ ও লূতের স্ত্রীর দৃষ্টান্ত উপস্থিত করছেন; তারা ছিল আমার বান্দাদের মধ্যে দুই সংকল্প পরায়ণ বান্দার অধীন। কিন্তু তারা তাদের প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করেছিল, ফলে নূহ ও লূত তাদেরকে আল্লাহর শাস্তি হতে রক্ষা করতে পারলনা এবং তাদেরকে বলা হল ঃ জাহান্নামে প্রবেশকারীদের সাথে তোমরাও তাতে প্রবেশ কর। আল্লাহ বিশ্বাসীদের জন্য উপস্থিত করেছেন ফির'আউন পত্নীর দৃষ্টান্ত, যে প্রার্থনা করেছিল ঃ হে আমার রাব্ব! আপনার সন্নিধানে জান্নাতে আমার জন্য একটি গৃহ নির্মাণ করুন এবং আমাকে উদ্ধার করুন ফির'আউন ও তার দুস্কৃতি হতে এবং আমাকে উদ্ধার করুন যালিম সম্প্রদায় হতে। [সূরা তাহ্রীম-১০, ১১]

◻ জান্নাতে যাওয়ার ব্যাপারে হিন্দু, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, খৃষ্টান, সাদা, কালো, আরাব-অনারাব নেই। কারা জান্নাতে যাবে, আর কারা জাহান্নামে যাবে তা কুরআনুম মাজীদে বলে দেয়া হয়েছে। যে কোনো মানব সন্তানই জান্নাতে যেতে পারবেন। যদি তিনি ঃ

ক) আল্লাহর প্রতি ঈমান আনেন এবং তাঁর সাথে কেহকেও শরীক না করেন;

খ) কুরআন নির্দেশিত অন্যান্য বিষয়ের প্রতি ঈমান আনেন;

গ) আল্লাহর প্রেরিত সকল নাবী/রাসূলগণকে স্বীকার করবেন এবং মুহাম্মাদকে (সাঃ) আল্লাহর সর্বশেষ নাবী ও রাসূল মেনে নেন এবং তাঁকে পরিপূর্ণ অনুসরণ করেন;

ঘ) সালাত, যাকাত, সিয়াম, হাজ্জসহ কুরআন-সুন্নাহর নির্দেশিত ইসলামের সকল বিধান নিষ্ঠার সাথে পালন করেন;

ঙ) আল্লাহ এবং আল্লাহর রাসূলের সকল আদেশ/নিষেধ পালন করেন, হালালকে হালাল হিসাবে গ্রহণ করেন এবং হারামকে হারাম মেনে নিয়ে তা বর্জন করেন;

চ) ইসলামের **গন্ডিতে পরিপূর্ণ** প্রবেশ করেন এবং

ছ) এক **আল্লাহর সন্তুষ্টি** অর্জন আর পরকালীন নাজাত ও সাফল্যকে জীবনের **লক্ষ্য হিসাবে গ্রহণ** করেন।

এই শর্তগুলি পূর্ণ করলে যে কোনো ব্যক্তি জান্নাতে যেতে পারবে।

এই শর্তগুলি মেনে নিয়ে আরাবের মুশরিক, ইয়াহুদী, খৃষ্টান এবং অন্যান্য ধর্মের লোকেরা নাবীর সাথী হয়েছিলেন এবং তারা জান্নাতে যাবেন।

অন্যদিকে এই শর্তগুলো পূরণ না করলে মুসলিমের সন্তান হলেও, এমনকি নাবীর সন্তান হলেও কেহ জান্নাতে যেতে পারবেনা। এ কারণেই-

আমাদের নাবীর (সাঃ) চাচা আবূ তালিব এবং আবূ লাহাব, ইবরাহীম (আঃ)-এর পিতা আযর, নূহ (আঃ)-এর ছেলে কিনান, নূহ (আঃ)-এর স্ত্রী ও লূত (আঃ)-এর স্ত্রী নাবীর নিকটজন হয়েও জান্নাতে যেতে পারবেনা। অথচ শ্রেষ্ঠ কাফির ফিরাউনের স্ত্রী জান্নাতে যাবেন।

ছবি আঁকা প্রসঙ্গ

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ছবি অঙ্কনকারী জাহান্নামের অধিবাসী। তার অংকিত প্রতিটি ছবিতে প্রাণ দেয়া হবে, তখন সেগুলি জাহান্নামে তাকে আযাব দিতে থাকবে। তিনি আরও বলেন ঃ তোমাকে একান্তই যদি তা করতে হয় তাহলে গাছপালা এবং যার প্রাণ নেই সেই সবের ছবি তৈরি কর। [মুসলিম/৫৩৫৯]

২। যে ঘরে কোন প্রাণীর ছবি কিংবা কুকুর অথবা জুনুবী (অপবিত্র) ব্যক্তি থাকে, সেই ঘরে রাহমাতের ফিরিশতারা প্রবেশ করেনা। [বুখারী/৫৫১২, ৫৫২৩, মুসলিম/৫৩৩৩ -আয়িশা (রাঃ), আবূ দাউদ/২২৭, নাসাঈ/২৬২]

৩। এ বিষয়ে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা যুমার-৫৫- ৫৬, বুখারী/৫৫১৩, ৫৫১৪, ৫৫২৫, ১৯৯০, মুসলিম/৫৩৫৫, তিরমিযী/১৭৫৫, ১৭৫৭ ।

(ক) আমাদের সমাজের অধিকাংশ শিক্ষিত লোকের বাসায় গেলে ড্রয়িং রুমে দেখা যায় স্বামী-স্ত্রী, সন্তান ও কন্যাদের ছবি বাধাঁই করে দেয়ালে লটকানো থাকে।

(খ) তাছাড়াও বিভিন্ন মনীষী/পিতা-মাতা/জীব-জন্তুর ছবি প্রায় বাসায়ই দেখা যায়।

(গ) বর্তমানে আমাদের শিশুদের চিত্রাঙ্কন প্রতিযোগিতা করানোর জন্য বিভিন্ন জীব-জন্তুর ছবি অংকনের স্কুলে ভর্তি করান হয়।

(ঘ) স্মৃতি স্বরূপ কারও ছবি যত্ন করে রেখে দেয়াও জায়েয নেই। কাজেই যার **কাছে** এ রকম ছবি রয়েছে তার উচিত এগুলো নষ্ট করে দেয়া, তা সেই ছবি **দেয়ালে** ঝুলন্ত থাকুক কিংবা এ্যালবামের ভিতরে সংরক্ষিত থাকুক অথবা অন্য **কোন স্থানে** থাকুক। কারণ ঘরের মধ্যে ছবি থাকলে ঘরের মালিক রাহমাতের **ফিরিশতাদের** প্রবেশ থেকে বঞ্চিত হবে।

মাসজিদের দেয়ালে, গাড়ীতে, পোষ্টারের একদিকে الله এবং অন্যদিকে محمد লেখা প্রসঙ্গ

১। এভাবে লেখা জায়েয নেই। কুরআন ও সহীহ হাদীসে কোথাও নির্দেশ দেয়া নেই যে, "আল্লাহ" ও "মুহাম্মাদ" বিভিন্ন জায়গায় সাওয়াবের আসায় লেখতে হবে। কেননা এ ধরনের লেখায় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর সমকক্ষ করে দেয়া হয়ে থাকে এবং অজ্ঞ লোকেরা এভাবে লেখা দেখে উভয়কে মর্যাদার দিক থেকে সমান মনে করতে পারে। আবার সুফীরা শুধু আল্লাহু, আল্লাহু যিক্র করে থাকে। সুতরাং গাড়ীতে বা দেয়ালে কিংবা কোথাও আল্লাহু বা মুহাম্মাদ কোনটিই লেখা উচিত নয়।

বালা-মুসিবাত হতে নিস্কৃতি লাভের উদ্দেশে ঝাড়-ফুঁক দেয়া, তাবিজ, বালা, তাগা পরিধান করা

১। আল্লাহ তোমার কোন ক্ষতি করতে চাইলে তিনি ছাড়া কেহ তা দূর করতে পারবেনা। আর তিনি যদি তোমার কল্যাণ করতে চান তাহলে তো সব কিছুই করার তাঁর ক্ষমতা রয়েছে। [সূরা আন'আম-১৭]।

২। আল্লাহ যদি তোমাকে কষ্ট দিতে চান তাহলে তিনি ছাড়া তা দূর করার কেহ নেই, আর আল্লাহ যদি তোমার কল্যাণ করতে চান তাহলে তাঁর অনুগ্রহ রদ করার কেহ নেই। তিনি তাঁর বান্দাদের মধ্যে যাকে চান অনুগ্রহ দিয়ে ধন্য করেন। তিনি বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [সূরা ইউনুস-১০৭]

৩। আসমানে আর যমীনে বহু নিদর্শন রয়েছে, তারা এ সমস্ত কাজ প্রত্যক্ষ করে; কিন্তু তারা এগুলি থেকে বিমুখতা অবলম্বন করে। অধিকাংশ মানুষ আল্লাহতে বিশ্বাস করে, কিন্তু সাথে সাথে শির্কও করে। [সূরা ইউসূফ-১০৫, ১০৬]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হাজ্জ-৩১, ইউনুস-৮৪, ইবরাহীম-১১, সাবা-২২, ২৩, জাসিয়া-২৩, ফুরকান-২৩, নিসা- ৪৮, ইয়াসীন-৬০, বাকারা-২২, হুজুরাত-১০, আম্বিয়া-৪২, হুদ-১৫, ১৬, যুমার-৩৮, মায়িদা- ২৩।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্য থেকে সত্তর হাজার লোক বিনা হিসাবে জান্নাতে প্রবেশ করবে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! এরা কারা? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যারা ঝাড়-ফুঁক করায়না, শুভ-অশুভ লক্ষণ মেনে চলেনা, শরীরে দাগ দেয়না বরং সর্বদাই আল্লাহর উপর নির্ভর করে। [মুসলিম/৪১৮-ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ), বুখারী/৬০১৫]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বিছানায় যেতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাতের তালুতে সূরা ইখলাস, সূরা ফালাক ও সূরা নাস পড়ে ফুঁক দিতেন। তারপর উভয় তালু দ্বারা আপন মুখমন্ডল ও দু'হাত শরীরের যতদূর পৌঁছে ততদূর পর্যন্ত মাসাহ করতেন। [বুখারী/৫৩২৩-আয়িশা (রাঃ)]

৭। আবদুল্লাহ (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মন্ত্র, তাবিজ ও মহব্বাতের তাবিজ করা শির্ক। [আবূ দাউদ/৩৮৪৩, তিরমিযী/২০৭৮, ইব্‌ন মাজাহ-৩৫৩০]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি দাঁড়িতে গিরা দেয়, গলায় তাবিজ ঝুলায়, অথবা চতুষ্পদ জন্তুর মল বা হাড় দ্বারা ইসতিনজা করে, নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) তার উপর অসন্তুষ্ট। [আবূ দাউদ/৩৬-শাইবান আল কিতবানী]

কুরআনের আয়াত অথবা হাদীসে বর্ণিত দু'আ, যিক্‌র লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখার ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন দলীল পাওয়া যায়না। কুরআন বা অন্য দু'আ পড়ে রোগীর শরীরে ফুঁক দেয়ার কথা হাদীসে বর্ণিত আছে। কিন্তু রোগীর গলায় বা হাতে কুরআনের আয়াত লিখে ঝুলিয়ে রাখা কিংবা কুরআনের আয়াত লিখে বালিশের নীচে রেখে দেয়া সম্পূর্ণ নিষেধ। তাছাড়াও কুরআনের আয়াত লিখে মাদুলীতে ভর্তি করে ব্যবহার করা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। আবার কেহ কেহ কুরআন ছাড়া এমন কিছু লিখে গলায় ঝুলিয়ে রাখে যার অর্থ বোধগম্য নয়। এ ধরনের কিছু ব্যবহার করা কোন ক্রমেই বৈধ নয়। কেননা সে লিখিত বস্তুর অর্থ অবগত নয়। কিছু ঝাড়-ফুঁককারী রয়েছে, যারা অস্পষ্ট এবং দুর্বোধ্য ভাষায় লিখে থাকে, যা আপনার পক্ষে বুঝা বা পাঠ করা সম্ভব নয়। এ ধরনের তাবিজ লিখা ও ব্যবহার করা শির্‌ক।

দুঃখ-কষ্ট দূর করার মালিক একমাত্র আল্লাহ। আর বান্দা একমাত্র তাঁর কাছেই ভাল-মন্দের জন্য আশ্রয় প্রার্থনা করবে। আর তিনিই একমাত্র শক্তিধর, যিনি কোন মাধ্যমে বা বিনা মাধ্যমে মঙ্গল, অমঙ্গল সাধনে সক্ষম।

শারীয়াতী মাধ্যম হল, যা আল্লাহ রাব্বুল 'আলামীন সরাসরি কুরআনের আয়াতে বর্ণনা করেছেন এবং সহীহ হাদীসে বর্ণনা রয়েছে। যেমন ঃ দু'আ এবং শারীয়াত সম্মত ঝাড়-ফুঁক। শারীয়াতী মাধ্যমসমূহ আল্লাহর অনুগ্রহে এবং তাঁর ইচ্ছায় বান্দার মঙ্গল সাধন করে বা অমঙ্গল দূর করে।

তাছাড়াও তাবিজ ব্যবহার সম্বন্ধে বলা যায় যে ঃ

ক) তাবিজের ব্যবহার জাহিলি যুগ থেকেই প্রচলিত হয়ে আসছে এবং তাবিজ সম্পর্কে তাদের মধ্যে নানা রকমের কুসংস্কারচ্ছন্ন ধ্যান-ধারণা বদ্ধমূল হয়ে আছে।

খ) তাবিজ ব্যবহারে 'আকিদাহ্-বিশ্বাসে ত্রুটি এবং চিন্তাধারায় ঈমানের দুর্বলতা প্রকাশ করে।

গ) যাদুকর কিংবা তাদের সমতুল্য ভন্ড লোকদের কারণে মানব সমাজে তাবিজের ব্যবহার প্রচলিত রয়েছে।

ঘ) কল্যাণ বা ক্ষতি সাধন দূর করার জন্য তাবিজ শারীয়াত সম্মত কোন মাধ্যম নয় এবং স্বাভাবিক মাধ্যমও নয়।

ঙ) কুরআন ও হাদীসের আলোকে সর্বসম্মত মত এই যে, তাবিজ ব্যবহার নিষিদ্ধ।

চ) বর্তমান সমাজের কিছু লোক পেটের পূজারী হয়ে টাকার বিনিময়ে এ ধরনের রমরমা ব্যবসা চালিয়ে যাচ্ছে এবং দীনকে বিকৃত করছে।

তাওহীদ সম্পর্কীত

❖ তাওহীদ শব্দের অর্থ একাত্মবাদ। কোন জিনিসকে একক গণ্য করা। আকীদার দৃষ্টিতে তাওহীদ হচ্ছে আল্লাহর সাথে সংশ্লিষ্ট সকল বিষয়ে তাঁকে একক ও নিরঙ্কুশ মর্যাদা দেয়া। যেমন তিনিই শুধু স্রষ্টা, আর কেহ নন। বিধান/হুকুম শুধু তাঁরই। তিনিই একমাত্র রাব্ব, আর কেহ নন। উপকার করার ক্ষমতা একমাত্র তাঁরই। বিপদ-সঙ্কট থেকে বাঁচানোর ক্ষমতা তিনি ছাড়া আর কারো নেই। ইবাদাত পাওয়ার অধিকার একমাত্র তাঁর। ভয় করতে হবে শুধু তাঁকেই। নির্ভর করতে হবে শুধু তাঁরই উপর। এভাবে আল্লাহকে বিশ্বাস করার নাম হচ্ছে তাওহীদ।

১। জেনে রাখো, সৃষ্টির একমাত্র কর্তা তিনিই আর হুকুমের একমাত্র মালিক তিনিই, সারা জাহানের রাব্ব আল্লাহ হলেন বারকাতময়। [সূরা আরাফ-৫৪]

২। বিধান দেয়ার অধিকার শুধু আল্লাহরই, তিনি নির্দেশ দিয়েছেন যে, তোমরা শুধুমাত্র তাঁরই ইবাদাত করবে, আর কারো ইবাদত করবেনা, এটাই সরল সঠিক দীন; কিন্তু অধিকাংশ মানুষ এটা অবগত নয়। [সূরা ইউসুফ-৪০]

৩। তিনি (আল্লাহ) ছাড়া তাদের অন্য কোন অভিভাবক নেই ; তিনি কাহকেও নিজ কর্তৃত্বের শরীক করেননা। [সূরা কাহ্ফ-২৬]

৪। এই বাস্তব সত্য তোমার রবের পক্ষ হতে; সুতরাং তুমি সংশয়ীদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। [সূরা বাকারা-১৪৭]

৫। বল ঃ যাবতীয় শাফা'আত (সুপারিশ) আল্লাহরই ইখতিয়ারে, আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সার্বভৌমত্ব আল্লাহরই অতঃপর তারই নিকট তোমরা প্রত্যাবর্তিত হবে। [সুরা যুমার-৪৪]

৬। হে রাসূল! যা কিছু তোমার রবের পক্ষ থেকে তোমার উপর অবতীর্ণ করা হয়েছে, তুমি (মানুষকে) সব কিছুই পৌঁছে দাও; আর যদি এরূপ না কর তাহলে তোমাকে অর্পিত দায়িত্ব পালন করলেনা; আল্লাহ তোমাকে মানুষ (অর্থাৎ কাফির) হতে রক্ষা করবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে সুপথ প্রদর্শন করেননা। [সূরা মায়িদা- ৬৭]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সূরা তাওবা-৩৩, ইউসুফ-১০৬, বাকারা-১২০, নিসা-৬৪, ৮৭, হাশর-৭।

৮। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি সাক্ষ্য দিচ্ছি যে, আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং আমি আল্লাহর প্রেরিত রাসূল- যে ব্যক্তি সন্দেহাতীতভাবে এ কথা দু'টির উপর বিশ্বাস রেখে আল্লাহর কাছে উপস্থিত হবে, সে জান্নাত থেকে বঞ্চিত হবে না। [বুখারী/৪৬]

৯। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ যারা আমার সুন্নাতের প্রতি বিরক্তভাব পোষণ করবে তারা আমার দলভুক্ত বা উম্মাত নয়। [বুখারী/৪৬৮৪]

⧉ তাওহীদের (আল্লাহর একাত্মবাদ) উপর বিশ্বাস করার ক্ষেত্রে উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও হাদীস সমূহকে অনেকেই অমান্য করছে। এবিষয়ে দেখুন

⊙ আল্লাহ বলেন ঃ ইয়াহুদীরা বলে ঃ উযায়ের আল্লাহর পুত্র এবং নাসারারা বলে ঃ মাসীহ আল্লাহর পুত্র, এটা তাদের মুখের কথা মাত্র (বাস্তবে তা কিছুই নয়)... । [সূরা তাওবা-৩০] ⊙ তারা আল্লাহকে ছেড়ে নিজেদের আলেম ও ধর্ম-যাজকদেরকে প্রভু বানিয়ে নিয়েছে ... । [সূরা তাওবা-৩১] ⊙ আর যখন তাদেরকে বলা হয় ঃ আল্লাহর অবতীর্ণ বিধানসমূহের দিকে আস এবং রাসূলের দিকে আস, তখন তারা বলে ঃ আমাদের জন্য ওটাই যথেষ্ট যার উপর আমাদের বাপ-দাদাদেরকে পেয়েছি : যদিও তাদের বাপ-দাদারা না কোন জ্ঞান রাখতো, আর না হিদায়াতপ্রাপ্ত ছিল ; তবুও কি (ওটা তাদের জন্যে যথেষ্ট হবে) ? [সূরা মায়িদা-১০৪] ⊙ এরপর আমি তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করেছি দীনের বিশেষ শারীয়াতের উপর ; সুতরাং তুমি তার অনুসরণ করো, অজ্ঞদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করনা। [সূরা জাসিয়া-১৮] ⊙ আর তারা আল্লাহ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকারও করতে পারেনা এবং উপকারও করতে পারেনা, আর তারা বলে ঃ এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী ... । [সূরা ইউনুস-১৮] ⊙ জেনে রেখো, অবিমিশ্র আনুগত্য আল্লাহরই প্রাপ্য। যারা আল্লাহর পরিবর্তে অন্যকে অভিভাবকরূপে গ্র-হণ করে, (তারা বলে) আমরা তো এদের পূজা এজন্যেই করি যে, এরা আমাদেরকে আল্লাহর সান্নিধ্যে এনে দিবে। তারা যে বিষয়ে নিজেদের মধ্যে মতভেদ করছে আল্লাহ তার ফায়সালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির, আল্লাহ তাকে সৎপথে পরিচালিত করেননা। [সূরা যুমার- ৩]
মনীষীরা তাওহীদকে তিন ভাগে ভাগ করেছেন। যথা ঃ

ক) তাওহীদুর রুবুবিয়্যাহ। অর্থাৎ আল্লাহর কাজ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া। সৃষ্টি, মালিকানা, রিয্ক, জীবিকা দান, বিশ্বজাহানের পরিচালনা ও নিয়ন্ত্রণ, জীবন-মৃত্যু দান, উপকার-অপকারের ক্ষমতা, দুঃখ-কষ্ট, বিপদ-সঙ্কট থেকে পরিত্রাণ দেয়া, সন্তান প্রদান ইত্যাদি অধিকার একমাত্র তাঁরই-এ বিশ্বাস করা।

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাজদাহ-৪, হুদ-৬, আলে ইমরান-২৬, মুলক-২, শূরা-৪৯, ৫০, ইউনুস-১০৭।

খ) আল্লাহকে এককভাবে মানা ও শুধুমাত্র তাঁর দাসত্ব ও গোলামী করাই হচ্ছে তাওহীদুল উলুহিয়্যাত। একে 'তাওহীদুল ইবাদাত' ও বলা হয়। আল্লাহর কাজ, কর্তৃত্ব ও ক্ষমতায় তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া তথা তাঁকে একমাত্র রাব্ব হিসাবে মানার অনিবার্য দাবী একমাত্র তাঁকেই 'ইলাহ' হিসাবে মানা। সকল ধরনের আনুগত্য ও দাসত্বে তাঁকে একক মর্যাদা দেয়া। সাজদাহ শুধু তাঁকেই করতে হবে। দু'আ শুধু তাঁর কাছেই করতে হবে। সাহায্য শুধু তাঁর কাছেই চাইতে হবে। ভরসা শুধু তাঁর উপরই করতে হবে। ভয় শুধু তাঁকেই করতে হবে। কল্যাণ ও মুক্তির আশা শুধু তাঁর থেকেই করতে হবে।
এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১৬৩, আলে ইমরান-১৮।

গ) 'তাওহীদুল আসমা ওয়াসসিফাত' এর **অর্থ হচ্ছে আল্লাহর নাম ও গুণাবলীতে তাওহীদ।**

আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ 'আল্লাহ ছাড়া আর কোন ইলাহ নেই, তাঁর রয়েছে সুন্দর নামসমূহ।' [সূরা তাহা-৮, আ'রাফ-১৮০]

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আলে ইমরান-২, শূরা-১১, হাশর-২৩-২৪।

তাকওয়া বনাম মুসলিম সমাজ

১। মানুষের কাছে সুশোভিত করা হয়েছে নারী, সন্তান, স্তুপীকৃত স্বর্ণ ও রৌপ্য ভান্ডার, চিহ্নযুক্ত অশ্বরাজি, গৃহপালিত পশু এবং শস্যক্ষেত্র। এসব পার্থিব জীবনের সম্পদ। আর আল্লাহ! তাঁরই নিকট রয়েছে উত্তম আশ্রয়স্থল। [সূরা আলে ইমরান-১৪]

২। বল ঃ আমি কি তোমাদেরকে এ সব হতেও অতি উত্তম কোন কিছুর সংবাদ দিব? যারা মুত্তাকী তাদের জন্য তাদের রবের নিকট এমন বাগান রয়েছে যার নিচে নদী প্রবাহিত, তারা তাতে চিরকাল থাকবে। আর রয়েছে পবিত্র সঙ্গী এবং আল্লাহর সন্তুষ্টি। বস্তুতঃ আল্লাহ বান্দাগণ সম্পর্কে সম্যক দ্রষ্টা । [সূরা আলে ইমরান-১৫]

৩। তারা (জান্নাতীরা) ধৈর্যশীল, সত্যবাদী, (আল্লাহর প্রতি) আজ্ঞাবহ, (আল্লাহর পথে) ব্যয়কারী এবং শেষ রাতে ক্ষমা প্রার্থনাকারী। [সূরা আলে ইমরান-১৭]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাওবা-১১৫, ১১৯, ১২৩, আলে ইমরান-১০২, বাকারা-২১, ১৮৩।

৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শির্ক করবে এ ভয় আমি করিনা; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়ার ভোগ-বিলাস অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে। [বুখারী/৬১২৬-উকাবা ইব্ন আমির (রাঃ), বুখারী/৩৭৭৩]

দুনিয়ার মানুষ বেপরোয়া হয়ে যায় ভোগ্যপণ্য পাওয়ার জন্য, চমৎকার জীবন যাপনের নেশায়। সুখ-সম্পদ আহরণের আকাংখায় সে পাগল প্রায়। চাওয়ার যেমন শেষ নেই, পাওয়ায়ও তেমনি তৃপ্তি নেই। তার খেদ আর জেদ সমান ভাবে বেগবান। কেমন করে অন্যকে বঞ্চিত করে নিজের চাহিদা সীমাহীন, মাত্রাহীন ও বলগাহীন করে তুলবে রাত দিনের বিরতিবিহীন চেষ্টা বা অপচেষ্টায়। প্রাপ্তিতে যেমন অতৃপ্ত তেমনি চাহিদাও অফুরন্ত।

এখানে মাত্রা নেই, বিরতি নেই, সীমা নেই, ন্যায়-অন্যায়ের বেড়া নেই, হালাল-হারামের বাঁধন নেই, নেই আপন-পর বিবেচনা। এখানে অনুভূতি ও উপলব্ধি আত্মকেন্দ্রিক, আবেগে সম্পদ আহরণ ও পুঞ্জিভূতকরণে নিবেদিত। অন্যকে বঞ্চিত ও রিক্ত করার মধ্যেই যেন চাহিদার জিহ্বাটা লক্ লক্ করে। হরণ, আহরণ ও আরোহণ যেন প্রাপ্তির বেগটাকে করে মাত্রাতিরিক্ত। কেবল চাই, নারী চাই, সন্তান চাই, রাশিকৃত সম্পদ চাই, চাই মনোহারিনী মনোমোহিনী বিলাস দ্রব্যের দীর্ঘ তালিকা। একতলা, দু'তলা এমনি করে আকাশ ছুঁই ছুঁই সুরম্য

অট্টালিকায় যেন মন ভরেনা। গাড়ী চাই, একটা, দু'টা, আরো সুন্দর, আরো দামী, আরো নামী, তাতেও মন মানেনা। বিলাস দ্রব্যের কি রকমারী আমদানী তাতেও নিত্য বায়নার জের যেন ফুরায়না। তা হলে এগুলি পেতে হলে কি করতে হবে? ক্ষমতা চাই, পদমর্যাদা চাই, চাই শ্রেষ্ঠত্ব আর অহমিকার উঁচু পাহাড়, যেখানে আমি ছাড়া আর কেহ চড়তে পারবেনা। সবার উপরে আমার প্রতাপ, প্রভাব, পরাক্রম আর পরিচিতি যেন অতি দ্রুত গর্বের সিঁড়ি বেয়ে ঐ অহমিকার পাহাড়ের শীর্ষ চূড়ায় পৌঁছায়। এই যে উপরে উঠা, এর মধ্যে থাকবেনা সত্য-মিথ্যা, অশ্লীলতা বা শ্লীলতা, নগ্নতা বা সভ্যতা, সু বা কু এর কোন বাছ-বিচার। আমার নিকট আছে এক, এরপর এগার, একশত এগার এমনি করে একের ডানে এক এক করে বসিয়ে যেতে হবে। সেখানে অন্যের শূন্যটাও যদি প্রয়োজন হয় তাও কেড়ে নিয়ে একের ডানে বসাতে হবে। তা না হলে আমার দশ হবে কি করে। আমি এক থাকতে চাইনা আমার প্রয়োজন দশক, শতক, সহস্র, অযুত, নিযুত, কোটি, লক্ষকোটি এমনি করে আমার আমিত্বকে প্রতিষ্ঠিত করতে চাই। সেখানে অন্যায়, যুল্‌ম, হারাম, বেশরমী, বেহায়াপনা, মিথ্যা, শঠতা, মুনাফিকী, নিমকহারামী পথে চলার বেপরোয়া গতির কোন পরওয়া নেই। এরই নাম হল প্রতিষ্ঠিত হওয়া ! Established এবং Career Building. জীবনকে প্রতিষ্ঠিত করা, যা বর্তমান মুসলিম সমাজে চলছে।

তাকলীদ

❖ তাকলীদ হল দলীলের (কুরআন ও সহীহ হাদীস) সাথে মিল নেই তবুও কারও কথা ও কাজ সঠিক বা সত্য জেনে বিশ্বাস করে অনুসরণ বা পালন করা।

১। এভাবে তোমার পূর্বে কোন জনপদে যখনই কোন সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখন ওর সমৃদ্ধশালী ব্যক্তিরা বলত ঃ আমরাতো আমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে পেয়েছি এক মতাদর্শের অনুসারী এবং আমরা তাদেরই পদাঙ্ক অনুসরণ করছি। [সূরা যুখরুফ-২৩]

২। সেই সতর্ককারী বলত ঃ তোমরা তোমাদের পূর্ব-পুরুষদেরকে যে পথে পেয়েছ, আমি যদি তোমাদের জন্য তদপেক্ষা উৎকৃষ্ট পথ-নির্দেশ আনয়ন করি তাহলেও কি তোমরা তাদের পদাঙ্ক অনুসরণ করবে? তারা বলত ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। [সূরা যুখরুফ-২৪]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-৩, বাকারা-১৭০

৪। সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল কু-সংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবেনা। [বুখারী/৬৭৬৮-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ)]

৫। হুযাইফা (রাঃ) বলেন ঃ হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহ্র উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ

অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হিদায়াত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে। [বুখারী/৬৭৭২]

জাহিলি যুগের লোকেরা তাকলীদের গন্ডিতে বাঁধা ছিল। তারা দীনের ব্যাপারে যাবতীয় চিন্তা-গবেষণা থেকে দূরে থাকত। আর এ জন্যই তারা জাহিলিয়াতের অন্ধ গলিতে যুগ যুগ ধরে ভ্রান্ত পথিকের মত ঘুরে বেড়িয়েছে। একই অবস্থা প্রত্যেক যুগের ঐসব লোকদের জন্য, যারা জাহিলি যুগের লালিত তাকলীদী বন্ধনে নিজেদেরকে আবদ্ধ রেখেছে এবং বাপ-দাদার প্রচলিত রেওয়াজের অন্ধ অনুসারী হয়ে যাবতীয় স্বাধীন চিন্তার দুয়ার ইচ্ছাকৃতভাবে নিজেদের জন্য বন্ধ রেখেছে। বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেক লোক তাকলীদের বা অন্ধ অনুসরণের উপর নির্ভর করে। তারা জীবনের সকল ক্ষেত্রে কুরআন ও সহীহ হাদীস মানেনা। বরং কোন কোন ক্ষেত্রে বুজুর্গদের মনগড়া মতের অনুসরণ করে থাকে।

তাকদীর অস্বীকার করা

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّا هَدَيْنَاهُ السَّبِيلَ إِمَّا شَاكِراً وَإِمَّا كَفُوراً

আমি তাকে পথ দেখিয়ে দিয়েছি, হয় সে কৃতজ্ঞ হবে, না হয় সে অকৃতজ্ঞ হবে। সূরা দাহর-৩]

২। পৃথিবীতে অথবা ব্যক্তিগতভাবে তোমাদের উপর যে বিপর্যয় আসে আমি তা সংঘটিত করার পূর্বেই তা লিপিবদ্ধ থাকে, আল্লাহর পক্ষে এটা খুবই সহজ। [সূরা হাদীদ-২২]

৩। মুশরিকরা (তোমার কথার উত্তরে) অবশ্যই বলবে ঃ আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে আমরা শির্‌ক করতামনা, আর না আমাদের বাপ-দাদারা করত, আর কোনো জিনিসও আমরা হারাম করতামনা। বস্তুতঃ এভাবেই তাদের পূর্ব যুগের কাফিরেরা (রাসূলদেরকে) মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছিল। শেষ পর্যন্ত তারা আমার শাস্তির স্বাদ গ্রহণ করতে বাধ্য হয়েছিল। তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ তোমাদের কাছে কি কোন দলীল প্রমাণ আছে? থাকলে আমার সামনে পেশ কর। তোমরা ধারণা ও অনুমান ব্যতীত আর কিছুরই অনুসরণ করনা, তোমরা সম্পূর্ণ আনুমানিক কথা ছাড়া আর কিছুই বলছনা। [সূরা আন'আম-১৪৮]

৪। সত্য ভিত্তিক পূর্ণাঙ্গ দলীল প্রমাণ তো একমাত্র আল্লাহরই রয়েছে, আল্লাহ যদি চাইতেন তাহলে তিনি অবশ্যই তোমাদের সকলকে সত্য পথে পরিচালিত করতেন। [সূরা আন'আম-১৪৯]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মাঝে এমন কোন ব্যক্তি নেই যার ঠিকানা জাহান্নামে বা জান্নাতে লিপিবদ্ধ করা হয়নি। লোকদের ভিতর থেকে এক ব্যক্তি বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! আমরা কি তাহলে (এর উপর) নির্ভর করবনা? তিনি বলেন ঃ না, বরং আমল কর। কেননা প্রত্যেকের জন্য আমল সহজ করা হয়েছে। [বুখারী/৬১৩৯-আলী (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা মাতৃগর্ভের জন্য একজন ফিরিশতা নির্ধারণ করেছেন। তিনি (পর্যায়ক্রমে) বলতে থাকেন, হে রাব্ব! এখন বীর্য আকৃতিতে আছে। হে রাব্ব! এখন জমাট রক্তে পরিণত হয়েছে, হে রাব্ব! এখন মাংসপিন্ডে পরিণত হয়েছে। এরপর আল্লাহ তা'আলা যখন তার সৃষ্টি পূর্ণ করতে চান তখন (ফিরিশতা) জিজ্ঞেস করেন ঃ পুরুষ, নাকি মহিলা? সৌভাগ্যবান, নাকি দুর্ভাগা? রিয্ক ও বয়স কত? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তার মাতৃগর্ভে থাকতেই তা লিখে দেয়া হয়। [বুখারী/৩১২-আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), বুখারী/৩০৯০, মুসলিম/৬৪৮২]

৭। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সমগ্র সৃষ্টির ভাগ্যলিপি আসমান ও যমীন সৃষ্টির পঞ্চাশ হাজার বছর আগেই লিপিবদ্ধ করেছেন। [মুসলিম/৬৫০৭-আবদুল্লাহ ইব্ন আ'স (রাঃ)]

৮। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিনবার বলেছেন ঃ পাখীর দ্বারা শুভাশুভ (ভাল ও মন্দ) নির্ণয় করা শির্ক। এ ব্যাপারে যদি কারো মনে সন্দেহের সৃষ্টি হয় তাহলে আল্লাহ তাঁর প্রতি ভরসা করার কারণে তা দূর করে দিবেন। [আবূ দাউদ/৩৮৬৯-আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)]

◫ প্রত্যেক মুসলিমের উপর এই আকীদা ও বিশ্বাস রাখা অতীব যরুরী যে, ভাল-মন্দ সমস্তই আল্লাহর নির্ধারিত তাকদীর, জ্ঞান ও ইচ্ছা অনুযায়ী হয়ে থাকে। আর সৎ কাজ করা ও অসৎ কাজ হতে বিরত থাকা বান্দার উপর অপরিহার্য। তার জন্য জায়েয নয় যে, আল্লাহর নাফরমানী করবে এবং বলবে যে এটা তো আল্লাহর লিখনী ছিল। বরং আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে পাঠিয়েছেন এবং তাদের উপর কিতাবসমূহ অবতীর্ণ করেছেন একমাত্র তাদের জন্য পুণ্য ও পাপের পথ সুস্পষ্ট করে দেয়ার জন্য। আল্লাহ মানুষকে জ্ঞান ও চিন্তাশক্তি প্রদান করেছেন এবং সঠিক ও ভ্রান্ত পথও চিনিয়ে দিয়েছেন। বর্তমান যুগের লোকেরা তাদের যাবতীয় কাজ-কর্মের দায়-দায়িত্ব আল্লাহর উপরে ছেড়ে দিয়ে তারা নিশ্চিন্তে নিজেদের অন্যায় অপকর্ম চালিয়া যেতে চায়। অথচ এ কথা তারা বুঝতে নারাজ যে, আল্লাহর ইচ্ছায় সবকিছু সম্পন্ন হলেও বান্দার প্রত্যেক কাজ-কর্মের প্রতিফল হিসাবে শাস্তি বা পুরস্কারের ব্যবস্থা আছে। এ বিষয়ে দেখুন ⊙ সূরা নিসা-১১৫, রাদ-১১, নূর-৫৪।

তাগুত প্রসঙ্গ

❖ তাগুত শব্দটি কুরআনে আট জায়গায় উল্লেখ আছে। তাগুত-এর শাব্দিক অর্থ সীমা লজ্ঘনকারী, অবাধ্য। কুরআন মাজীদে তাগুত শব্দটি ব্যবহার করা হয়েছে একটি পরিভাষা হিসাবে। আল্লাহ ছাড়া আর যাকেই মানা হয় সেটাই তাগুত । এই অর্থে আল্লাহকে বাদ দিয়ে বা আল্লাহর মর্যাদায় বা আল্লাহ প্রদত্ত বিধান বর্হিভূত নিয়মে পরিচালিত ব্যক্তি, সমাজ, রাষ্ট্র, সমাজে প্রচলিত রেওয়াজ যা কিছুই মানা হয় তা'ই তাগুত।

১। প্রত্যেক জাতির কাছে আমি রাসূল পাঠিয়েছি (এ সংবাদ দিয়ে) যে, আল্লাহর 'ইবাদাত কর আর তাগুতকে বর্জন কর। অতঃপর আল্লাহ তাদের মধ্যে কতককে সৎপথ দেখিয়েছেন, আর কতকের উপর অবধারিত হয়েছে গুমরাহী। অতএব যমীনে ভ্রমণ করে দেখ, সত্য প্রত্যাখ্যানকারীদের পরিণতি কী হয়েছিল! [সূরা নাহল-৩৬]

২। হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের 'ইবাদাত করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? [সূরা ইয়াসীন-৬০]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ শূরা-২১, মায়িদা-৪৪ ,নামল-৬৫, বাকারা-২৫৬, নিসা-৬০, হাজ্জ-৬২, শু'আরা-৭৫-৭৭, আম্বিয়া-২৯।

৪। আনাস (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা এমন সব পাপ কাজ করে থাক যা তোমাদের চোখে চুল থেকেও সূক্ষ্ম দেখায়। কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় আমরা এগুলোকে ধ্বংসাত্মক পাপ মনে করতাম। [বুখারী/৬০৩৫]

তাগুত ঐ সমস্ত ব্যক্তিকে বলা হয় যাদের ইবাদাত করা হয় আল্লাহকে ছেড়ে এবং যে তাতে রাযী/খুশি থাকে। তাকে ঐ সমস্ত কাজে অনুসরণ করা হয় যা আল্লাহ ও নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্যের বাইরে। আল্লাহ তা'আলা রাসূলকে পাঠিয়েছেন এই বলে যে, তারা যেন লোকদের এক আল্লাহর ইবাদাত করতে এবং তাগুতদের ইবাদাত করা থেকে বিরত থাকতে বলেন। যে ব্যক্তি তাগুতের কাছে বিধান চায় সে মু'মিন নয়, মুসলিমও নয়। যেমন:

- যে মানুষকে ডাকে আল্লাহ ছাড়া অন্যের ইবাদাতের দিকে।
- ইসলামের বিরুদ্ধে আইন প্রনয়ন করা।
- কেহ কেহ দাবি করে যে, তারা ভবিষ্যৎ সম্বন্ধে জানে ।
- আল্লাহকে বাদ দিয়ে মৃত ব্যক্তির নিকট দু'আ চাওয়া ইত্যাদি।

প্রধান তাগুতী কাজ হচ্ছে শাইতানী কার্যকলাপসমূহ ঃ

১। সে নিজের ইবাদাতের দিকে মানুষকে আহ্বান করে। [সূরা ইয়াসীন-৬০]

২। সে গাইরুল্লাহর ইবাদাতের দিকে আহ্বান করে। [সূরা ইবরাহীম-২২]

৩। শাইতান মানুষের সামনে মিথ্যাকে আকর্ষণীয়ভাবে উপস্থাপন করে। [সূরা তাহা-১২০-১২১, বাকারা-৩৬]

৪। শাইতান মানুষের সাথে মিথ্যা ওয়াদা করে, ধোকা দেয়, বিভ্রান্ত করে। [সূরা আ'রাফ-১৬-১৭]

৫। শাইতান মানুষের মধ্যে শত্রুতা সৃষ্টি করে। [সূরা মায়িদা-৯১, বানী ইসরাইল-৫১]

৬। শাইতান মানুষের শত্রু, আল্লাহর অবাধ্য। [সূরা মারইয়াম-৪৪, ইউসুফ-৫]

তাগুতকে বর্জণ করার পদ্ধতি ঃ

১। তাগুতের ইবাদাত বাতিল এ আকীদা পোষণের মাধ্যমে। [সূরা হাজ্জ-৬২]

২। তাগুতকে পরিত্যাগ ও তাগুত থেকে দূরে থাকার মাধ্যমে। [সূরা নাহল-৩৬]

৩। দুশমনী বা শত্রুতার মাধ্যমে। [সূরা শু'আরা-৭৫-৭৭]

৪। ক্রোধ ও ঘৃণার মাধ্যমে। [সূরা মুমতাহিনা-৪]

৫। অস্বীকার করার মাধ্যমে তাগুতকে বর্জন করতে হবে।

আল্লাহ তাওবাহ কবূল করেন এবং উহার নিয়ম কানূনও বলে দিয়েছেন

❖ তাওবা এর অর্থ পুনরায় পাপ কাজ না করার জন্য সংকল্প, ধর্ম পথে বা সৎ পথে প্রত্যাবর্তন, অনুশোচনা ইত্যাদি।

১। আর যে তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে আর সৎ পথে অটল থাকে, আমি তার জন্য অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল। [সূরা তাহা-৮২]

২। নিশ্চয়ই যারা অজ্ঞতাবশতঃ মন্দ কাজ করে, অতঃপর সত্বর তাওবাহ করে, এরাই তারা যাদের তাওবাহ আল্লাহ কবূল করেন। আল্লাহ মহাজ্ঞানী, মহাবিজ্ঞানী। [সূরা নিসা-১৭]

৩। এমন লোকদের তাওবাহ নিস্ফল যারা পাপ করতেই থাকে, অতঃপর মৃত্যুর মুখোমুখী হলে বলে ঃ আমি এখন তাওবাহ করছি এবং (তাওবাহ) তাদের জন্যও নয় যাদের মৃত্যু হয় কাফির অবস্থায়। এরাই তারা যাদের জন্য ভয়াবহ শাস্তির ব্যবস্থা করে রেখেছি। [সূরা নিসা-১৮]

৪। যারা অজ্ঞতার কারণে খারাপ কাজ করে, অতঃপর তাওবাহ করে ও নিজেদের 'আমল সংশোধন করে, তোমার রাব্ব তাদের জন্য অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নাহল-১১৯]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাওবা-৭৪, বাকারা-১৪৪, ফুরকান-৭০।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবাহ কর। কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশত বার তাওবাহ করে থাকি। [মুসলিম/৬৬১৩-আবূ বুরদাহ (রাঃ)]

৭। পাপ থেকে তাওবাকারীর উপমা হচ্ছে সেই ব্যক্তির মত যার কোন পাপ নেই। [ইব্‌ন মাজাহ/৪২৫০-আবূ উবাইদা ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রঃ)]

⧉ আমরা যেন আমাদের কর্মের জন্য অনুতপ্ত হৃদয়ে মহান আল্লাহর দরবারে তাওবাহ করে ভুল-ভ্রান্তিগুলি কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক সংশোধন করে সঠিকভাবে আমল করতঃ ইসলামী জীবন যাপন করে মহান আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের চেষ্টা করি। আমাদের বর্তমান সমাজে যারা এখনও মহান আল্লাহর সঠিক পথ পাওয়ার ব্যাপারে বিভিন্ন লোকের কথায় বিভ্রান্ত অবস্থায় আছে তাদের অবশ্যই তাওবাহ করে সঠিক পথে আসা উচিত।

দীন ইসলাম বুঝা কঠিন নয়

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَلَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَيْكَ آيَاتٍ بَيِّنَاتٍ وَمَا يَكْفُرُ بِهَا إِلاَّ الْفَاسِقُونَ

আমি তোমার নিকট সুস্পষ্ট আয়াত নাযিল করেছি, ফাসিকরা ছাড়া অন্য কেহ তা অস্বীকার করেনা। [সূরা বাকারা-৯৯]

২। আমি এ কুরআনে মানুষের জন্য সব রকমের দৃষ্টান্ত ও উপমা উপস্থিত করেছি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা যুমার-২৭]

৩। নিশ্চয়ই এ কুরআন সেই পথ দেখায় যা সোজা ও সুপ্রতিষ্ঠিত, আর যারা সৎ কাজ করে সেই মু'মিনদেরকে সুসংবাদ দেয় যে, তাদের জন্য রয়েছে মহা পুরস্কার। [সূরা বানী ইসরাইল-৯]

৪। কুরআন আমি সহজ করে দিয়েছি উপদেশ গ্রহণের জন্য। সুতরাং উপদেশ গ্রহণকারী কেহ আছে কি? [সূরা কামার-১৭, ২২, ৩২, ৪০]

৫। হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর এ দু'য়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয় যা অনেকেই জানেনা। যে ব্যক্তি সেই সন্দেহজনক বিষয়সমূহ থেকে বেঁচে থাকবে সে তার দীন ও মর্যাদা রক্ষা করতে পারবে। [বুখারী/৫০-নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ)]

৬। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইল্‌মের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ তা প্রদান করেন। এ উম্মাতের কর্মকান্ড কিয়ামাত পর্যন্ত, কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত, সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকবে। [বুখারী/৬৮০১-মুআবিয়া (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/২২০]

◘ জনসাধারণের মধ্যে এ কথা ব্যাপকভাবে প্রচলিত আছে ঃ কুরআন ও হাদীস বুঝা অত্যন্ত কঠিন, এ জন্য গভীর জ্ঞানের প্রয়োজন। তাহলে আমরা অজ্ঞ লোকেরা কি করে তা বুঝব এবং কিভাবে তদনুসারে আমল করব? অলী এবং বুজুর্গরাই কেবল এর ওপর আমল করতে পারে, জনসাধারণের এ ধারণা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। এভাবে মানুষকে দীন-ইসলামের জ্ঞান অর্জন করা থেকে বিরত রাখার চক্রান্ত চলছে। এই আচরণের মাধ্যমে দীনের শিক্ষা অর্জনের বিরোধিতা করে আসছে এক শ্রেণীর লোক। কুরআন ও হাদীস বুঝা আদৌ কঠিন নয়, খুবই সহজ। তবে সেই অনুযায়ী আমল করা কঠিন। কেননা প্রবৃত্তিকে বশ মানানো কঠিন বলে প্রতিভাত হয়। তাই নাফরমানরা তা মানেনা। প্রত্যেক মুসলিমের মনে এই ধারনা বদ্ধমূল থাকা উচিৎ যে, কাবরে যেতেই হবে, আল্লাহর সামনে সমস্ত আমলের জবাবদিহি করতেই হবে, সুতরাং কুরআন বুঝে মেনে চলার জন্য আরাবী ভাষা শিখতেই হবে। আর ভাষা শিক্ষা যতদিন সম্ভব না হবে অন্তত কুরআন ও সহীহ হাদীসের অনুবাদ পড়তে হবে। অধ্যয়নের দ্বারা মানুষ অন্তত এতটুকু জ্ঞান অনায়াসে অর্জন করতে পারে যতটুক জ্ঞান মানুষের ধর্মীয় ও পার্থিব প্রয়োজনের সাথে সম্পর্কীত। কুরআনের প্রথম নাজিলকৃত শব্দই হল "পড়"। কারন কোন কিছু সঠিকভাবে পালন করার জন্য জ্ঞানের প্রয়োজন। আর জ্ঞান অর্জনের জন্য পাঠ করা প্রয়োজন।

দীনের ভিতর মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা

১। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে; তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে। [সূরা নাহল-১২৫]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন তখন তাকে বলে দিতেন ঃ তোমরা লোকদেরকে শুভ

সংবাদ দিবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবেনা, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা পরিহার করবে। [মুসলিম/৪৩৭৫-আবূ মূসা (রাঃ), বুখারী/৩৮]

৩। যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানায় তার জন্য সেই পথের অনুসারীদের পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে। এতে তাদের পুরস্কার থেকে কিছু মাত্র কমতি হবেনা। আর যে ব্যক্তি গোমরাহীর দিকে আহ্বান জানাবে তার উপর সেই পথের অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপসমূহ কিছুমাত্র হালকা হবেনা। [মুসলিম/৬৫৬০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/২৬৭৪]

⧉ দীনের ভিতর মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অর্থ এই যে, মানুষ দীনের মধ্যে কোন কিছু বাড়াবেনা, যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত সীমা অতিক্রম করে । এমনিভাবে দীনের কোন অংশ কমাবেনা, যাতে সে আল্লাহর নির্ধারিত দীনের কিছু অংশ বিলুপ্ত করে দেয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবনীর অনুসরণ করাও দীনের মধ্যম পন্থা অবলম্বনের অন্তর্ভুক্ত। তাঁর জীবনাদর্শকে অতিক্রম করা দীনের ভিতর অতিরঞ্জনের শামিল। তাঁর জীবন চরিত্রের অনুসরণ না করা তাঁর শানে ত্রুটি করার অন্তর্ভুক্ত। ⊙ উদাহরণ স্বরূপ বলা যায় যে, একজন লোক বলল ঃ আমি আজীবন রাত্রি বেলা তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করব। রাতে কখনই নিদ্রা যাবনা। কারণ সালাত সর্বশ্রেষ্ঠ ইবাদাত। তাই আমি সালাতের মাধ্যমে বাকী জীবনের রাত্রিগুলি জাগরণ করতে চাই। আমরা তার উত্তরে বলব যে, এই ব্যক্তি দীনের মাঝে অতিরঞ্জিতকারী। সে হকের উপর নেই। ⊙ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে এ রকম হয়েছিল। তিন জন লোক একত্রিত হয়ে একজন বলল, আমি সারারাত সালাত আদায় করব। আর একজন বলল, আমি সারা জীবন সিয়াম পালন করব এবং কখনো তা ছাড়বনা। তৃতীয় জন বলল, আমি কখনও বিয়ে করবনা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এই সংবাদ পৌছলে তিনি বললেন ঃ একদল লোকের কি হল তারা এ রকম কথা বলে থাকে। অথচ আমি সিয়াম পালন করি এবং কখনো সিয়াম পালন থেকে বিরত থাকি। রাতে ঘুমাই এবং আল্লাহর ইবাদাত করি। স্ত্রীদের সাথেও মিলিত হই। এটি আমার সুন্নাত। সুতরাং যে ব্যক্তি আমার সুন্না-হর বিরোধিতা করবে সে আমার উম্মাতের অন্তর্ভুক্ত নয়। [বুখারী/৪৬৮৪] এই লোকেরা দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করার কারণে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের সাথে সম্পর্ক ছিন্নের ঘোষণা করলেন। কেননা তারা সিয়াম পালন করা, রাত্রি জাগরণ করা, স্ত্রীদের সঙ্গে অবস্থান করার ক্ষেত্রে তাঁর সুন্নাতের খেলাফ অর্থাৎ ইবাদাত তথা করনীয় ক্ষেত্রে বাড়াবাড়ি করার কারনে রাসূলের (সাঃ) উম্মাত হিসাবে দাবী করার বৈধতা হারিয়ে ফেলেছে।

দীন-ধর্ম প্রত্যাখ্যানই কি উন্নতির চাবিকাঠি?

১। তিনি তোমাদের জন্য যমীনকে (তোমাদের ইচ্ছার) অধীন করে দিয়েছেন। অতএব তোমরা তার বুকের উপর দিয়ে চলাচল কর, আর আল্লাহর দেয়া রিয্ক

হতে আহার কর, পুনরায় জীবিত হয়ে তাঁর কাছেই ফিরে যেতে হবে। [সূরা মুলক-১৫]

২। পৃথিবীর সবকিছু তিনি তোমাদের জন্য সৃষ্টি করেছেন, তারপর তিনি আকাশের দিকে মনোসংযোগ করেন এবং তা সপ্তাকাশে বিন্যস্ত করেন, তিনি সকল বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত। [সূরা বাকারা-২৯]

৩। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাবে কক্ষনো তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সে ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বেশী ধন-সম্পদ থাকার নাম ধনী হওয়া নয়। বরং মনের দিক থেকে ধনী হওয়ার নামই হল ধনী হওয়া। [তিরমিযী/২৩৭৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৫৯৮৯]

৫। এই ধন-দৌলত হল শ্যামল-মনোরম ও মিষ্টি। যে ব্যক্তি এর হকসহ তা লাভ করে তার জন্য একে বারাকাতময় করে দেয়া হয়। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের এই সম্পদ যে ব্যক্তি তার মনের খাহেশ অনুসারে ব্যবহার করে কিয়ামাতের দিন জাহান্নাম ছাড়া আর কিছুই সে লাভ করবেনা। [তিরমিযী/২৩৭৭]

◻ কুরআন-হাদীস এবং ইতিহাস সম্পর্কে অজ্ঞ, দুর্বল ঈমানদার, ঈমানহীন লোকেরাই কেবল এ ধরনের কথা বলতে পারে। মুসলিম জাতি ইসলামের প্রথম যুগে দীনকে আঁকড়ে ধরেই সম্মান-মর্যাদা এবং শক্তি অর্জন করে পৃথিবীর সকল প্রান্তে তাদের আধিপত্য বিস্তার করেছিল। মুসলিমদের স্বর্ণ যুগের জ্ঞান-বিজ্ঞান থেকেই বর্তমান বিশ্বের অনেক দেশ উন্নতি সাধন করতে সক্ষম হয়েছে। কিন্তু মুসলিম জাতি আজ তাদের সঠিক দীনকে ছেড়ে দিয়ে আকীদাহ ও আমলের ক্ষেত্রে বিভিন্ন বিদ'আত এবং বিজাতিয় কার্যকলাপে লিপ্ত হওয়ার কারণেই অন্যান্য জাতির পিছনে পড়ে আছে। আমরা দৃঢ় বিশ্বাস রাখি যে, মুসলিমরা যদি আবার তাদের দীনের দিকে ফিরে যায় তাহলে তারাই সম্মানিত হবে এবং সমস্ত জাতির উপরে তারা রাজত্ব করতে সক্ষম হবে। আবূ সুফিয়ান যখন রোমের বাদশা হিরোক্লিয়াসের সামনে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দীনের পরিচয় তুলে ধরল, তখন রোমের বাদশা মন্তব্য করে বলল ঃ 'তুমি যা বলছ তা সত্য হলে অচিরেই তাঁর রাজত্ব আমার পা রাখার স্থান পর্যন্ত চলে আসবে।' পাশ্চাত্য দেশসমূহে যে সমস্ত উন্নতি সাধিত হয়েছে, আমাদের দীন তা গ্রহণ করতে বাধা দেয়না। আফসোসের কথা হল মুসলিমরা দীন-দুনিয়া উভয়টিকেই হারিয়ে ফেলেছে। পার্থিব উন্নতি সাধন করতে ইসলাম কখনো বিরোধিত করেনা।

দীনের প্রচারক হিসাবে মুসলিমদের দায়িত্ব ও কর্তব্য

ক) দীন প্রচার করা অতীব জরুরী মনে করা

১। হে রাসূল! তোমার রবের নিকট থেকে যা তোমার প্রতি অবতীর্ণ হয়েছে তা প্রচার কর, যদি না কর তাহলে তুমি তাঁর বার্তা পৌঁছানোর দায়িত্ব পালন করলেনা। মানুষ হতে আল্লাহই তোমাকে রক্ষা করবেন, আল্লাহ কাফির সম্প্রদায়কে কক্ষনো সৎপথ প্রদর্শন করেননা। [সূরা মায়িদা-৬৭]

২। তোমার প্রতি আল্লাহর আয়াত নাযিল হওয়ার পর তারা যেন তোমাকে তা থেকে কক্ষনো বিমুখ না করতে পারে। তুমি তোমার রবের দিকে আহ্বান জানাও, আর কিছুতেই মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। [সূরা কাসাস-৮৭]

৩। তুমি মানুষকে তোমার রবের পথে আহ্বান কর হিকমাত ও সদুপদেশ দ্বারা এবং তাদের সাথে আলোচনা কর সুন্দরভাবে; তোমার রাব্ব ভাল করেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে বিপথগামী এবং কে সৎ পথে আছে। [সূরা নাহল-১২৫]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউসূফ-১০৮, আহযাব-৪৫, আলে ইমরান-১১০, নাহল-৩৬, তাহরীম-৬, লুকমান-১৭, ১৮।

খ) দীন প্রচারের গুরুত্ব অবশ্যই অনুধাবন করতে হবে

১। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হা মীম আস সাজদা-৩৩, ৩৪, তালাক-১৭, আসর-১-৩।

গ) প্রচারক হিসাবে দীন প্রচারের কতিপয় পদ্ধতি জানতে হবে। যেমন-

১। প্রচারককে হিকমাতওয়ালা ও উত্তম উপদেশ দানকারী হতে হবে। [সূরা নাহল-১২৫]

২। প্রচারককে নম্র ও বিনয়ী হতে হবে। [সূরা আলে ইমরান-১৫৯]

৩। প্রচারককে উত্তম পন্থায় যে কোন প্রশ্নের জবাব দিতে হবে। [সূরা হা মীম আস সাজদা-৩৪, আনকাবূত-৪৬, নাহল-১২৫]।

ঘ) প্রচারককে দীনের ব্যাপারে কোন জোর-যবরদস্তি করা চলবেনা

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৭৩, গাশিয়াহ-২১, ২২, আলা-৯, যারিয়াত-৫৫।

ঙ) প্রচারককে প্রচারের কার্যক্রম সর্বদা চালিয়ে যেতে হবে

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নূহ-৫, ৮, ৯, আনকাবূত-১৮, ইসরা-২৯, নাহল-১২।

চ) প্রচারককে অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীসের মাধ্যমে দীনের দাওয়াত দিতে হবে।

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউনুস-১৫, নাজম-২৩, ফাতির-২৮।

ছ) প্রচারকের নিয়াত ও আমল সহীহ হতে হবে

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাইয়্যিনাহ-৫, আন'আম-১৬২।

জ) প্রচারককে ধৈর্যশীল ও আল্লাহর উপর পূর্ণ ভরসাকারী হতে হবে

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আসর-৩, লুকমান-১৭, কাসাস-৫৪, বাকারা-৪৬, ১৪৫, ১৫৫।

ঝ) প্রচারককে দাওয়াত অনুযায়ী আমল করতে হবে

এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ জুমু'আ-২৩, বাকারা-৪৪।

ঞ) প্রচারের ক্ষেত্রে হাক ও বাতিলের সংমিশ্রণ করা যাবেনা

এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৪২, ১৭৪।

ট) প্রচারককে উত্তম চরিত্রের অধিকারী হতে হবে

এ বিষয়ে আয়াত দেখুন ঃ সূরা আহযাব-২১।

ঠ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কোন সাহাবীকে (রাঃ) কোন কাজে প্রেরণ করতেন তখন তাকে বলে দিতেন ঃ তোমরা

লোকদেরকে শুভ সংবাদ দিবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবেনা, **সহজ পন্থা অবলম্বন** করবে, কঠিন পন্থা পরিহার করবে। [মুসলিম/৪৩৭৫-আবূ মূসা (রাঃ)]

ড়) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন যে ব্যক্তি তাঁরই রাস্তায় বের হয়, জিহাদ করে ও শহীদ হয়। [মুসলিম/৪৭০৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

ঢ়) আল্লাহর পথে একটি সকাল অথবা একটি বিকাল অতিবাহিত করা দুনিয়া এবং তার মধ্যে যা কিছু আছে সেই সবের চেয়ে উত্তম। [মুসলিম/৪৭২০-আনাস (রাঃ), তিরমিযী/১৬৫৭, বুখারী/২৫৯১]

ন) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তির পদদ্বয় আল্লাহর পথে ধূলি ধূসরিত হয় সে জাহান্নামের জন্য হারাম হয়ে যায়। [নাসাঈ/৩১২০]

- আমাদের সমাজের আলেমদের বক্তব্য যাচাই বাছাই করে মুসলিমদেরকে সিদ্ধান্ত গ্রহণ করতে হবে। কেননা এক শ্রেণীর নামধারী আলেম ধর্মকে বিকৃত করার জন্য প্রাণপন চেষ্টা করছে। এ ধরনের আলেমই ইসলামের প্রকৃত/সঠিক আমল প্রচারের ব্যাপারে সবচেয়ে বড় প্রতিবন্ধক। তাদের পরকাল ভয়াবহ। দুর্ভাগ্য যে, এ ধরনের আলেমকেই সমাজ বেশী মূল্যায়ন করে।

ইসলাম প্রচারের ক্ষেত্রে কুচক্রীমহলের ষড়যন্ত্রে জাল হাদীসের প্রচলন এত বেশী হয়েছে যে, এ সংক্রান্ত যে কোন বক্তব্য যাচাই-বাছাই না করে ধর্মান্ধের মত গ্রহণ/আমল করা যাবেনা। আমাদের সমাজের ধর্মপ্রাণ মুসলিমরা ইসলাম সম্বন্ধে এতই বেশী উদার ও আবেগ প্রবন যে, নাবী-রাসূলগণের নামে যে কোন কথাই তারা সত্য মনে করে আমল করা শুরু করে দেয়। কিন্তু নাবী (সাঃ) এর নির্দেশিত আমলের বিপরীত করা যে সুন্নাহর বরখেলাপ বা পাপের কাজ তা যে কোন আলেম বা পীরের কথাই হোক না কেন। আমরা নাবী প্রেমের পরিবর্তে মানব প্রেমের খায়েশে ভুলে যাই। কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভাষ্য অনুযায়ী এ ধরনের বক্তারা জাহান্নামের অধিবাসী। অতএব মানুষকে সহজে আকৃষ্ট করার জন্য সহীহ হাদীস বাদ দিয়ে জাল বা ভিত্তিহীন হাদীস, বানোয়াট গল্প-কাহিনী, বুজুর্গানের নামে মিথ্যা গল্প বলে প্রচার বা দা'ওয়াত দেয়া কোন মুসলিমের জন্য সমীচীন নয়। সাহাবীগণ (রাঃ) পবিত্র কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারাই দা'ওয়াত দিয়েছেন। আর এতেই মানুষ দা'ওয়াত কবূল করেছে এবং দীন ইসলাম বিজয়ী হয়েছিল। কেহ যদি মনে করেন, যে কোন পন্থায়ই হোক মানুষকে হিদায়াত করাই আসল উদ্দেশ্য, সেখানে সত্য-মিথ্যা, জাল-যঈফ, মিথ্যা গল্প-কাহিনী যাই থাকনা কেন, এগুলো আমাদের দেখার প্রয়োজন নেই, তাহলে এটা মারাত্মক ভুল এবং এর পরিণতিও ভয়াবহ। সুতরাং কথা বলার সময় মুসলিম হিসাবে বক্তাদের অবশ্যই এদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ⊙ উমার (রাঃ) বলেন ঃ তোমরা নেতৃত্ব লাভের আগেই জ্ঞান হাসিল করে নাও। সাহাবা-গণ বয়োবৃদ্ধকালেও ইল্‌ম শিক্ষা করেছেন। [বুখারী/পরিচ্ছেদ-৫৭]

দীন প্রতিষ্ঠায় দাওয়াত

মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَنْ أَحْسَنُ قَوْلاً مِّمَّن دَعَا إِلَى اللهِ وَعَمِلَ صَالِحاً وَقَالَ إِنَّنِي مِنَ الْمُسْلِمِينَ.

১। ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা কথায় কে উত্তম যে আল্লাহর দিকে মানুষকে আহ্বান করে, সৎ কর্ম করে এবং বলে ঃ আমি তো আত্মসমর্পনকারীদের অন্তর্ভুক্ত। [সূরা হা মীম আস সাজদাহ-৩৩]

২। তুমি উপদেশ দিতে থাক, নিশ্চয়ই উদেশ মু'মিনদের উপকারে আসে। [সূরা যারিয়াত-৫৫]

৩। তোমাদের মধ্যে এরূপ এক সম্প্রদায় হওয়া উচিত- যারা কল্যাণের দিকে আহ্বান করবে এবং ভাল কাজের আদেশ করবে ও মন্দ কাজের নিষেধ করবে আর তারাই সুফল প্রাপ্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-১০৪]

৪। তোমরাই সর্বোত্তম উম্মাত, মানব জাতির কল্যাণের জন্য তোমাদের উদ্ভব ঘটানো হয়েছে, তোমরা সৎ কাজে আদেশ করবে ও অসৎ কাজে নিষেধ করবে এবং আল্লাহর প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করবে; আর যদি গ্রন্থ প্রাপ্তরা বিশ্বাস স্থাপন করত তাহলে অবশ্যই তাদের জন্য মঙ্গল হত; তাদের মধ্যে কেহ কেহ মু'মিন এবং তাদের অধিকাংশই দুস্কার্যকারী। [সূরা আলে ইমরান-১১০]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-৫১, রূম-৩০, ৩১, ৩২, আন'আম-৭০, ১৫৯, ১৬২, ১৬৯, হুদ-১১৬-১১৯, সাদ-৯, যুমার-১১, বাইয়্যিনা-৫ মায়িদা-৩, আলে ইমরান-৩১, ৭৮, আহযাব-৩৬, নিসা-৫৯, ৬৫, ৮৩, নূর-৪৭, ৪৮, ৫১, ৫২, বাকারা-৪২, ৪৪, ইউনুস-১০৫।

৬। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমাণও হয়। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়। [বুখারী/৩২০৭-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর (রাঃ)]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের এ দীনের মাঝে যদি কেহ এমন কিছু উদ্ভাবন করে যা দীনের থেকে নয়, তা পরিত্যাজ্য। [ইব্‌ন মাজাহ/১৪-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৪৩৪৪]

৮। সবকিছু থেকে কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব হিদায়াতের চেয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াতই উৎকৃষ্ট। দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দ কাজ এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী। [ইব্‌ন মাজাহ/৪৫-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), মুসলিম/১৮৭৫]

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে কতল কর। [ইব্‌ন মাজাহ/২৫৩৫-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)]

◻ কুরআনুল কারীমে দীন শব্দটি ৮০ বারেরও অধিক বিভিন্ন আয়াতে উল্লেখ আছে। দীনের অর্থও নানা প্রেক্ষিতে অনেকভাবে বুঝানো হয়েছে। কোন সময় দীনের অর্থ ধর্ম, কোন সময় জীবন সামগ্রী, কোন সময় শারীয়াত, কোন সময়

আহকাম বা বিধান, কোন সময় তাওহীদ, কোন সময় পথ, কোন সময় আকীদা, কোন সময় বিচার বা বিচার দিবস রূপে উপস্থাপন করা হয়েছে। ফলে দীন একটি ব্যাপক অর্থবোধক শব্দ যাকে কেবলমাত্র একটি অর্থে ব্যবহার করার কোন সুযোগ নেই। ইকামাতে দীন অর্থাৎ দীনকে প্রতিষ্ঠা করা।

যে ব্যক্তি কিতাব ও সুন্নাতের দলীলসমূহকে নিজের চাহিদা ও খেয়াল খুশীর পক্ষে ব্যাখ্যা দান করে সেই ব্যক্তি অবশ্যই উপরোক্ত আয়াতের মর্ম অনুযায়ী জিহ্বা বিকৃতকারীদের দলভুক্ত হবে। জ্ঞানী পাঠকদের অবশ্যই জানা আছে যে, বর্তমান যুগে রচিত ধর্মীয় পুস্তকাদির মধ্যে এই ধরণের অসংখ্য মাসায়েল স্থান লাভ করেছে, শারীয়াতে যার কোন ভিত্তি নেই। প্রত্যেক মুসলিমের উচিত বাতিলের ব্যাপক হামলা ও হকের অস্পষ্টতা হতে আল্লাহর নিকট আশ্রয় চাওয়া।

মনগড়া কথা ও কল্প-কাহিনীর মাধ্যমে দীনের দা'ওয়াত দেয়া

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَمَا يَنطِقُ عَنِ الْهَوَى - إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى

আর সে মনগড়া কথাও বলেনা। তাতো অহী যা তাঁর প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নাজম-৩, ৪]

২। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাবে কক্ষনো তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

৩। তাহলে কি তারা আল্লাহর ধর্ম ব্যতীত অন্য কিছু কামনা করে? অথচ নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু আছে, ইচ্ছা ও অনিচ্ছাক্রমে সবাই তাঁর উদ্দেশে আত্মসমর্পণ করেছে এবং তাঁরই দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৩]

৪। আমার বান্দাদেরকে যা উত্তম তা বলতে বল; শাইতান তাদের মধ্যে বিভেদ সৃষ্টির উস্কানি দেয়; শাইতান মানুষের প্রকাশ্য শত্রু। [সূরা বানী ইসরাইল-৫৩]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইবরাহীম -৫, মায়িদা -৬৭, হা মীম আস সাজদা-৩৩, আলে ইমরান-১০৪, ফাতির-২৪, নাহল-১২৫, আহযাব-৪৫, ৪৬, আ'রাফ-৫৯, ৬৫, ৭৩, ৮৫, ইউসুফ-১০৮, নিসা-১১৫।

৬। আমার উম্মাতের একটি জামা'আত (দল) আল্লাহর আদেশের উপর প্রতিষ্ঠিত থাকবে। যারা তাদের সঙ্গ ত্যাগ করবে বা বিরোধিতা করবে তারা তাদের কোন অনিষ্ট করতে পারবেনা। এভাবে আল্লাহর আদেশ তথা কিয়ামাত এসে পড়বে, আর তারা তখনও লোকের উপর বিজয়ী থাকবে। [মুসলিম/৪৮০২-উমায়র ইব্ন হানী (রাঃ)]

৭। আল্লাহর পথে এক সকাল বা এক বিকাল ব্যয় করা অবশ্যই দুনিয়া ও এর সবকিছু থেকে উত্তম। জান্নাতের ধনুক পরিমাণ স্থান দুনিয়া ও এতে যা আছে সব কিছু থেকে উত্তম। [তিরমিযী/১৬৫৭-আনাস (রাঃ), বুখারী/২৫৯২]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমাণও হয়। [তিরমিযী/২৬৬৯-আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), বুখারী/৩২০৭]

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কেহকে ফাতওয়া দেয়া হলে তার পাপের ভার ফাতওয়া দাতার উপর বর্তাবে। [ইব্ন মাজাহ/৫৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

১০। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবেনা, মানুষকে সু-সংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবেনা। [বুখারী/৬৯-আনাস (রাঃ)]

◻ অতীতকাল থেকেই ইসলামের নামে এমন কিছু অলীক, অবাস্তব, মনগড়া, আজগুবি ও বানোয়াট কল্প-কাহিনী বিভিন্ন প্রচার মাধ্যমে প্রচার-প্রসার হয়ে আসছে যার সাথে ইসলামের দূরতম কোন সম্পর্কও নেই। এ সকল বানোয়াট কথা-বার্তা নির্ভেজাল ইসলামের আসল ও বাস্তব চেহারাকে পরিবর্তন করে দিয়েছে।

এসব কাহিনীগুলো তথাকথিত একশ্রেনীর অসতর্ক, বিবেক তাড়িত ও আবেগী পীর-ফকীর, সূফী-সাধক, গাউস-কুতুব, বক্তা, ইমাম, খতীব, মুবাল্লিগ, এমনকি কিছু আন্তর্জাতিক খ্যাতি সম্পন্ন টাইটেলধারী মুহাদ্দিস ও মুফাসসিরগণের বক্তব্যের মাধ্যমে অহরহ প্রচার হয়ে আসছে। আর তাতে বিশেষভাবে বিভ্রান্ত ও ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছে সমাজের স্বল্প শিক্ষিত, কল্যাণকামী ও সরল মানুষ।

এক ধরণের কু-সংস্কারবাদীরা মানুষের মনোরঞ্জন ও অন্তর নরম করার জন্য বুজুর্গদের মনগড়া কল্প-কাহিনী বর্ণনা করে থাকেন, যাতে মানুষের আবেগ আসে। তারা মনে করে, এ সমস্ত মনগড়া কথা ছাড়া মানুষদের হিদায়াত করা সম্ভব নয়, কাজেই ভালো উদ্দেশে বানোয়াট কথা বলা শুধু জায়িযই নয় বরং ভাল কাজ। সাবধান! শাইতান তাদেরকে বুঝতে দেয়নি যে, তাদের সব চিন্তাই ভুল খাতে প্রবাহিত হচ্ছে। 'মিথ্যা কল্প-কাহিনী ছাড়া মানুষকে ভাল পথে আনা যাবেনা ' এ কথা ভাবার অর্থ হল, আল্লাহ প্রদত্ত অহী মানুষের হিদায়াত করতে সক্ষম নয়, কুরআনুল কারীম ও সহীহ হাদীস তার কার্যকারিতা হারিয়ে ফেলেছে, কাজেই বুজুর্গানে দীনদের আজগুবি কিচ্ছা দিয়ে মানুষকে হিদায়াত করতে হবে। কি অবাস্তব চিন্তা! তারা যে কথা ইসলামের পক্ষে মনে করছে প্রকৃত পক্ষে তা ইসলামের সবচেয়ে বেশি ক্ষতি সাধন করছে। অল্প কাজের বহুত সাওয়াব, সামান্য পাপে ঘোরতর শাস্তি, সৃষ্টির বিভিন্ন বিষয় নিয়ে কাল্পনিক কাহিনী, অলৌকিক কাহিনী, বিভিন্ন বানোয়াট ফাযীলাতের কাহিনী ইত্যাদি মুসলিম উম্মাহকে ইসলামের মূল শিক্ষা থেকে বিচ্যুত করছে ও সমাজে অগণিত কু-সংস্কার ছড়াচ্ছে এবং মুসলিমদেরকে ফার্‌য দায়িত্ব ভুলিয়ে দিচ্ছে।

দীন-ইসলাম প্রচার বনাম আমাদের দেশের তাবলীগ

১। ইহা মানুষের জন্য এক বার্তা যাতে এর দ্বারা তারা সতর্ক হয় এবং জানতে পারে যে, তিনি একমাত্র উপাস্য এবং যাতে বোধশক্তি সম্পন্নরা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা ইবরাহীম-৫২]

২। বল ঃ তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর এবং রাসূলের আনুগত্য কর; অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী এবং তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরা দায়ী; এবং তোমরা তার আনুগত্য করলে সৎ পথ পাবে, রাসূলের দায়িত্বতো শুধু স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। [সূরা নূর-৫৪]

৩। তোমরা যদি আমাকে মিথ্যাবাদী বল তাহলে জেনে রেখ যে, তোমাদের পূর্ববর্তীরাও নাবীদেরকে মিথ্যাবাদী বলেছিল। সুস্পষ্টভাবে প্রচার করা ছাড়া রাসূলের আর কোন দায়িত্ব নেই। [সূরা আনকাবূত-১৮]

৪। স্পষ্টভাবে প্রচার করাই আমাদের দায়িত্ব। [সূরা ইয়াসীন-১৭]

৫। তারা যদি মুখ ফিরিয়ে নেয় তাহলে তোমাকেতো আমি তাদের রক্ষক করে পাঠাইনি। তোমার কাজতো শুধু প্রচার করে যাওয়া। আমি মানুষকে যখন অনুগ্রহ আস্বাদন করাই তখন সে উৎফুল্ল হয় এবং যখন তাদের কৃতকর্মের জন্য তাদের বিপদ আপদ ঘটে তখন মানুষ হয়ে যায় অকৃতজ্ঞ। [সূরা শূরা-৪৮]

৬। সেখানে তাদের জন্য তাই আছে যা তারা ইচ্ছা করবে, আর আমার কাছে আরও বেশি আছে। [সূরা কাফ-৩৫]

৭। তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর। অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও, আমার রাসূলের দায়িত্ব কেবল (আমার বাণী) স্পষ্টভাবে পৌঁছে দেয়া। [সূরা তাগাবূন-১২]

৮। বল ঃ আমি তোমাদেরকে একমাত্র (আল্লাহর) অহী দ্বারাই সতর্ক করি, কিন্তু বধিরেরা ডাক শোনবেনা যখন তাদেরকে সতর্ক করা হয়। [সূরা আম্বিয়া-৪৫]

৯। আল্লাহর বাণী পৌঁছানো ও তাঁর আদেশ প্রচার করাই আমার কাজ। যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন; তাতে তারা চিরকাল থাকবে। [সূরা জিন-২৩]

১০। তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা। তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূরা আ'রাফ-৩]

১১। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৬৭, নাহল-৩৫, ৮২।

১২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর কোন সাহাবীকে কোন কাজে প্রেরণ করতেন তখন তাকে বলে দিতেন ঃ তোমরা লোকদেরকে শুভ সংবাদ দিবে, ঘৃণা-বিদ্বেষ ছড়াবেনা, সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা পরিহার করবে। [মুসলিম/৪৩৭৫-আবূ মূসা (রাঃ)]

১৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা সেই ব্যক্তির দায়িত্ব স্বহস্তে তুলে নিয়েছেন যে ব্যক্তি তাঁরই রাস্তায় বের হয়, জিহাদ করে ও শহীদ হয়। [মুসলিম/৪৭০৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

১৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমাণও হয়। কিন্তু যে কেহ

ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়। [বুখারী/৩২০৭-আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ)]

১৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা যার কল্যাণ চান তাকে দীনের গভীর জ্ঞান দান করেন। আমি তো (ইল্‌মের) বন্টনকারী মাত্র; আল্লাহ তা প্রদান করেন। এ উম্মাতের কর্মকান্ড কিয়ামাত পর্যন্ত, কিংবা বলেছিলেন, মহান আল্লাহ তা'আলার হুকুম আসা পর্যন্ত, সত্যের উপর সুদৃঢ় থাকবে। [বুখারী/ ৬৮০১-মুআবিয়া (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/২২০]

☐ আল কুরআনের চিরন্তন বাণীর আলোকেই যাবতীয় বিষয়ে মানুষকে অবহিত করতে হবে। আল-কুরআনের হুকুমগুলি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাদীসের আলোকে বুঝতে হবে কোনটার সাওয়াব কত এবং কোনটা কখন কিভাবে করতে হবে জীবনের পটভূমিতে।

ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন জীবন ব্যবস্থা যখন স্রষ্টার নিকট গ্রহণযোগ্য নয়, আর ইসলামই যখন আল্লাহর নিকট একমাত্র মনোনীত দীন বা জীবন ব্যবস্থা তখন কোন ব্যক্তি, প্রতিষ্ঠান, মতবাদ বা দেশের কোন ইজমই মুসলিমের নিকট গ্রহণযোগ্য নয়। এ চরম সত্যটিও সবাইকে জানতে ও জানাতে হবে। এর জন্যও মেহনত আর কুরবানীর প্রয়োজন। প্রচার না করলে কে জানবে কুরআন ও হাদীসের কানূন? তাই তো মহান স্রষ্টা প্রত্যেক নাবী ও রাসূলকে প্রচারক রূপে প্রেরণ করেছেন। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসীয়াত হল, তার তরফ হতে একটি আয়াত জানলেও তা অন্যকে জানাতে হবে। কোন যুগে কোন জনপদে তাবলীগ বা প্রচারকে ছোট করে দেখা হয়নি।

তাবলীগ অবশ্যই করতে হবে। এটা ফার্‌য। এর কোন বিকল্প নেই। এটা মুখে, কিতাবে, যন্ত্রে, জনসভায়, বেতার কেন্দ্র, ইন্টারনেট হতে শুরু করে পাড়ায়, মহল্লায়, মাসজিদে, জনসমাবেশে মানুষের মধ্যে ছড়িয়ে দিতে হবে। কনফারেন্সে, মাহফিলে, সভা-সেমিনারে, সিম্পোজিয়ামে, লিফলেট, পোষ্টার, ব্যানার, ক্যাসেট এবং জুমু'আর খুতবায় প্রচার করতে হবে। প্রচারের যত ধরণ ও রকম হতে পারে তা গণসচেতনতা, সংস্কার, সংশোধন এবং যথার্থ মূল্যবোধ সৃষ্টির লক্ষ্যে কুরআন ও হাদীসের যথাযথ উদ্ধৃতি দিয়ে বৈধ, শালীন ও শোভনভাবে ব্যবহার করতে হবে। তাবলীগের নিশ্চয়ই সুনির্দিষ্ট লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য থাকবে, যা হল রিসালাত ও খিলাফাতের নিরীখে তাওহীদ ও সুন্নাহ প্রতিষ্ঠা এবং শির্‌ক, বিদ'আত উচ্ছেদ। মানুষ পশু নয়, কিন্তু পাশবিক প্রবৃত্তিকে সে নিজের অজান্তে সযত্নে লালন-পালন করে। আর পশু অনেক সময় সহজাতভাবে মানবিক কিছু কিছু গুণাবলীর প্রমাণ দেয়। তাই মানুষের মধ্যে পশু শক্তিকে তাড়ানোর কাজটি মুবাল্লীগকে করতে হয় নানা কৌশলে ও হিকমাতে। যেমন ব্যবস্থাপত্র দিতে হবে কুরআন ও হাদীসের নিরিখে। প্রথম মূল গ্রন্থ আসমানী কিতাব ছেড়ে বা গৌন করে বা পিছনে ফেলে অন্য যা কিছু প্রধান করা হবে তাতে কল্যাণ অপেক্ষা অকল্যাণ বেশী হবে। প্রতি যুগে মুবাল্লীগদের প্রধান শত্রু ছিল তাগুত, ইবলীস আজও তাই আছে। মুবাল্লীগকে কুরআনী কানূন ও হাদীসে

রাসূল সম্পর্কে স্বচ্ছ, সুস্পষ্ট, সুন্দর ধারণা রাখতে হবে। ঐ দু'টিই প্রধান, আসল-মূখ্য এবং অপরিহার্য। ⊙ এ জন্যই মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবন সায়াহ্নে বলেছেন ঃ আমি তোমাদের জন্য দু'টি জিনিস রেখে যাচ্ছি যা দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরলে কেহ তোমাদের পথভ্রষ্ট করতে পারবেনা। তা হল আল্লাহর কিতাব ও রাসূলের সুন্নাহ। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩, মুয়াত্তা ইমাম মালিক (রহঃ), তাকদীর অধ্যায়, রেওয়াত নং-৩]

তাহলে ঈমান, সালাত, সিয়াম, যাকাত, হাজ্জ, দান, সাদাকাহ, যিকর, তাবলীগ, তানযীম (সংগঠন), তাসনীফ (গ্রন্থ রচনা), তা'লীম (শিক্ষাদান), আদব-কায়দা, হালাল, হারাম, বৈধ, অবৈধ, জায়িয, নাজায়িয ইত্যাদি মানব সামজের ঐক্যবদ্ধ জীবনের চাহিদাকে ঠিক এ দু'টি উৎস হতে যে নির্দেশনা পাওয়া যাবে তাই দুনিয়া ও আখিরাতের মঙ্গল জেনে সানন্দে পালন বা আমল করতে হবে। একক জীবন, ব্যক্তিগত জীবন, পারিবারিক জীবন, সামাজিক জীবন, অর্থনৈতিক ব্যবস্থাপনা, রাজনৈতিক জীবন, সাংস্কৃতিক ও নৈতিক জীবন অর্থাৎ সকল জীবনের মানদন্ড অবশ্যই হতে হবে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের (সাঃ) জীবন ও পদ্ধতি অনুযায়ী। আল কুরআনের এই চিরন্তন বাণীর আলোকেই যাবতীয় বিষয়ে মানুষকে অবহিত করতে হবে। আল কুরআনের হুকুমগুলি মহানবী (সাঃ) এর হাদীস দিয়েই বুঝাতে হবে, কোনটির সাওয়াব কত এবং কোনটি কখন কিভাবে করতে হবে জীবনের সামগ্রিক পটভূমিতে। এটা করলে কোন ব্যক্তি ইমেজ প্রতিষ্ঠার প্রশ্ন আসেনা। ব্যক্তি ইমেজ সৃষ্টি হলেই সেই ব্যক্তির প্রাধান্য অনুসারীদের মধ্যে এমনভাবে ঘুরপাক খেতে থাকে যে, সেখানে উপেক্ষিত হয় অহীর নির্দেশ। ব্যক্তি কেন্দ্রিক মাযহাব বা দল বা সিলসিলায় মনটা সংকীর্ণ হয়ে পড়ে, অন্যেরটা ভাল নয়, নিজেরটাই সব চেয়ে ভাল এই ভক্তির অন্ধবিশ্বাসে। এই জিনিসটা ইসলামের সোনালী যুগে ছিলনা। থাকলে আবূ বাকার সিদ্দিক (রাঃ), উমার ফারুক (রাঃ), উসমান গণি (রাঃ), আলী'র (রাঃ) নামে এক একটি পথ/মত তৈরী হয়ে যেত। কারণ তাদের প্রত্যেকের যে গুণাবলী ছিল তা অনুসরণযোগ্য। কিন্তু কোন সাহাবীর নামে এমনটি হয়নি। তাহলে কেন তাদের তুলনায় যারা অনেক অনেক পিছনে তাদের নামে করা হল? ব্যক্তি হতে আদর্শই প্রধান। তবে মাযহাবের ইমামগণের কেহ তাদের জীবিতকালে তাদের নিজ নামে দল গড়েননি। তাদের মৃত্যুর শত শত বছর পরে তাদের ভক্তরা এটা করেছে।

অথচ তাবলীগ জামা'আতের পথিকৃত বলে খ্যাত মাওলানা ইলিয়াস (রহঃ) তিনি তার জীবদ্দশায় এ দলের নকশা কায়েম করেছেন। মহানবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর নির্দেশিত সহীহ হাদীসের দ্বারা আল কুরআনকে সর্বাগ্রে সামনে রেখে তাবলীগ না করা হলে সেটা কখনই গ্রহণযোগ্যতা পাবেনা। আমরা এমন পদ্ধতি, তরীকা, সিলসিলাহ বা উসুল গ্রহণ করব যেটা আল কুরআনের স্পষ্ট আয়াত ও সহীহ হাদীসের দ্বারা প্রমাণিত হবে। এটাই উম্মাতে মুহাম্মদীর তাবলীগের মানদন্ড আর এ পথেই তাবলীগের লক্ষ্য ও উদ্দেশ্য নিহিত।

দীন-ইসলাম আজ নানা মতবাদে বিপদজনক ভাবে বিভক্ত। বর্তমানে প্রচলিত তাবলীগীদের দাওয়াতের অবলম্বন হল ইসলামের যে সব বিষয় ফাযীলাত দ্বারা বুঝানো সম্ভব, সে সব বিষয়ে সহীহ, যঈফ, জাল-বানোয়াট হাদীসের মাধ্যমে লোকদেরকে সাওয়াবের হিসাব নিকাশ বুঝিয়ে জামা'আতে প্রতি আকৃষ্ট করা।

ফাযীলাতের গুরুত্ব বর্ণনা দিয়ে দলের দাওয়াত দেয়ার উদ্দেশে তারা সিলেবাস প্রণয়ন করেছেন। যার নাম "তাবলীগী নিসাব", বা "ফাযায়েলে আ'মল"। ফাযায়িলের বর্ণনা শোনা ও পাঠের মাধ্যমে এ দেশের বৃহৎ সংখ্যক সহজ-সরল অশিক্ষিত, অর্ধ-শিক্ষিত ও শিক্ষিত ধর্মপ্রাণ মুসলিম এবং পেশা ও পদমর্যাদার অপব্যবহার করে যারা বহু অপরাধ ও অন্যায় করে কিছুটা অনুশোচনা বোধ করেন তাদের জন্য শর্টকাট সুন্দর ব্যবস্থা হল এই জামা'আত। সকল প্রকার অন্যায়, অনাচার ও অপরাধে জড়িত থেকে ফাযীলাতের উপর চড়ে পার হয়ে যাওয়ার সুব্যবস্থা এ দলে আছে। এরা যেমন সবার জন্য উন্মুক্ত, তেমনি এদের জন্য সকল সম্প্রদায়, দেশ ও জাতি উন্মুক্ত। যার ফলে, আশংকা ও উদ্বেগজনক ভাবে এদের সংখ্যা বেড়েই চলেছে। তাদের তাবলীগী নিসাব, ফাজায়েলে আমল ও অন্যান্য বইসমূহ পাঠ করলে কিছু সময়ের জন্য পাঠককে বাস্তবতা ভুলে যেতে হবে স্বপ্নপুরীতে তাবলীগী কেচ্ছা-কাহিনীর গুটি কয়েক পর্বে। তারা শাসক, শোষকের সাথে আপোষের মীমাংসার পথযাত্রী। বিপদের বেলায় সত্যকে এড়িয়ে চলার নীতির ধারক।

এক মহৎ ঐশী বাণীর লক্ষ্যে যদি লক্ষ জনতার কণ্ঠ থেকে তাবলীগের সিলসিলায় গেঁথে তাবলীগী ইজতিমার মাঠে বজ্রনিনাদে উচ্চারিত হত ঃ নেই কোন মাবূদ আল্লাহ ব্যতীত, নেই কোন শাসন কুরআন ও সুন্নাহ ব্যতীত, নেই কোন ইকামাত দীন ঐশী বিধান ব্যতীত, নেই কোন জীবন অহীর কানূন ছাড়া, তাহলে দেখা যেত কত প্রকারের নেতা/নেত্রীর ভীড় ঐ জামা'আতের কাফেলায়।

কিছু সহীহ হাদীসের পাশাপশি মিথ্যা কাহিনী রচনা এবং জাল, যঈফ ও বানোয়াট হাদীস প্রচারের দ্বারা মানুষকে নব উদ্ভুত পন্থায় তাবলীগমুখী করে। এ বিষয়ে তাদের অনেক লিখনি কিতাব আছে। তন্মধ্যে শুধু একটি কিতাবে কয়েকটি অধ্যায়ের কয়েকটি পৃষ্ঠা নং উল্লেখ করা হল। ফাযায়েলে আ'মল, ১ম খন্ড, সংশোধিত সংস্করণ ১৫ মার্চ ২০০২, তাবলীগী কুতুব খানা, চকবাজার ঢাকা কর্তৃক প্রচারিত বইয়ের ফাজায়েলে নামায অধ্যায় পৃষ্ঠা নং-৯০-৯৫, ১১৭, ১২৫। ফাজায়েলে কুরআন অধ্যায় পৃষ্ঠা নং-৮৩, ৮৫, ১০৫। ফাজায়েলে যিকির অধ্যায় পৃষ্ঠা নং-১১৫, ১২৩, ১৩০, ১৪০। ফাজায়েলে রমজান অধ্যায় পৃষ্ঠা নং-৭১, ৭৩ ইত্যাদি। এমন ধরনের কত অলৌকিক অতি প্রাকৃতিক, আজগুবী এবং আশ্চর্যজনক কিচ্ছা কাহিনী আছে যা যুক্তি, বুদ্ধি-বিদ্যা, আর ঈমান আকিদায় কোনটাতে বিশ্বাসযোগ্য নয়। সবকিছু আল্লাহই ভাল জানেন।

দু'আ করার পদ্ধতি

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَإِلَى ثَمُودَ أَخَاهُمْ صَالِحاً قَالَ يَا قَوْمِ اعْبُدُواْ اللّهَ مَا لَكُم مِّنْ إِلَـهٍ غَيْرُهُ هُوَ أَنشَأَكُم مِّنَ الأَرْضِ وَاسْتَعْمَرَكُمْ فِيهَا فَاسْتَغْفِرُوهُ ثُمَّ تُوبُواْ إِلَيْهِ إِنَّ رَبِّي قَرِيبٌ مُّجِيبٌ

অতএব তোমরা তাঁর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর, অতঃপর মনোনিবেশ কর তাঁরই দিকে; নিশ্চয়ই আমার রাব্ব নিকটে রয়েছেন এবং তিনি আবেদন গ্রহণকারী। [সূরা হুদ-৬১]

২। এবং যখন আমার সেবকবৃন্দ (বান্দা) আমার সম্বন্ধে তোমাকে জিজ্ঞেস করে তখন তাদেরকে বলে দাও ঃ নিশ্চয়ই আমি সন্নিকটবর্তী; কোন আহ্বানকারী যখনই আমাকে আহ্বান করে তখনই আমি তার আহ্বানে সাড়া দিই; সুতরাং তারাও যেন আমার ডাকে সাড়া দেয় এবং আমাকে বিশ্বাস করে, তাহলেই তারা সঠিক পথপ্রাপ্ত হতে পারবে। [সূরা বাকারা-১৮৬]

৩। (হে নাবী!) তুমি তাদের মধ্যে থাকা অবস্থায় তাদেরকে শাস্তি দেয়া আল্লাহর অভিপ্রায় নয়, আর আল্লাহ এটাও চাননা যে, তারা ক্ষমা প্রার্থনা করতে থাকবে অথচ তিনি তাদেরকে শাস্তি দিবেন। [সূরা আনফাল-৩৩]

৪। সেই ব্যক্তি অপেক্ষা বিভ্রান্ত কে যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাতের দিন পর্যন্তও তার ডাকে সাড়া দিবেনা? এবং ওগুলি তাদের প্রার্থনা সম্বন্ধে অবহিত নয়। [সূরা আহকাফ-৫]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউনুস-২২, ১০৬, আহকাফ-৬, বানী ইসরাইল-৫৬, ৫৭, ফাতির-১৪, ২২, নাহল-২০, ২১, শু'আরা-৭৮, ৮০, যুমার-৩।

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ কখনো এ কথা বলবে না যে, হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে ক্ষমা করে দিও। হে আল্লাহ! তোমার ইচ্ছা হলে আমাকে দয়া কর। বরং সে দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে দু'আ করবে। কারণ আল্লাহকে বাধ্য করার মত আর কেহ নেই। [বুখারী/৫৮৮৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৭। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের দু'আ কবূল হয়ে থাকে, যদি তাড়াহুড়া না করে। লোকে বলে ঃ আমি দু'আ করলাম, কিন্তু আমার দু'আ তো কবূল হলনা। [বুখারী/৫৮৮৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

দু'আ যে ইবাদাত তা সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে। কোন রাসূল কিংবা অলীর উদ্দেশে যেমন সালাত আদায় করা চলেনা, তেমনিভাবে কোন রাসূল অথবা অলীর নিকট (তাদের মৃত্যুর পর) আল্লাহকে ছেড়ে কোন দু'আ চাওয়া যাবেনা। বর্তমান সমাজের মুসলিমরা পীর, ফকীর, মাজার, দরগাহ, অলী, বুজুর্গ লোকদের নিকট গমন করে আল্লাহর নিকট দু'আ করার সেতু বন্ধন হিসাবে, যা সঠিক নয়। তা ছাড়াও উপরোক্ত আয়াতে আল্লাহ তা'আলা খাস করে কোন

মু'মিন, বুজুর্গ, আলেম, নেককার কিংবা পীরদেরকে অন্যদের পক্ষ হতে আহ্বান করতে বলেননি এবং না তার সাথে অন্যদের "আমীন" বলতে বলেছেন। বরং পাপী অথবা সৎ আমলকারী যে কোন বান্দার অধিকার আছে মহান রবের নিকট যে কোন আবদার নিজেদেরই পেশ করার। মহান আল্লাহ বলেন ঃ তিনি সকলেরই দু'আয় জবাব দেন, কেহ ক্ষমা চাইলে তাকে আযাব দেয়া আল্লাহর নিয়ম নয়। তাহলে অন্যের দ্বারা দু'আ করানোর অর্থ দাড়াল দু'আ প্রার্থীর পক্ষে আল্লাহর নিকট দু'আকারীর উকালতি করা বা সুপারিশ করা। কারো জন্য উকালতি করার অধিকার আল্লাহ তা'আলা কেহকেও দেননি, যেহেতু আল্লাহ ইরশাদ করেন ঃ

⊙ আর আমি মূসাকে কিতাব দিয়েছিলাম, আর সেটাকে করেছিলাম ইসরাইল বংশীয়দের জন্য সত্য পথের নির্দেশক যে, আমাকে ছাড়া অন্যকে কর্ম নিয়ন্তা গ্রহণ করনা। [সূরা বানী ইসরাইল-২]

⊙ আর তুমি কাফির ও মুনাফিকদের কথা শোননা; তাদের নির্যাতন উপেক্ষা কর এবং নির্ভর কর আল্লাহর উপর; কর্মবিধায়ক রূপে আল্লাহই যথেষ্ট। [সূরা আযহাব- ৪৮]

⊙ আসমানে যা আছে, আর যমীনে যা আছে সব আল্লাহরই, কার্যনির্বাহক হিসাবে আল্লাহই যথেষ্ট। [সূরা নিসা-১৩২]

⊙ তোমাদের রাব্ব তোমাদেরকে খুব ভাল করেই জানেন। তিনি ইচ্ছা করলে তোমাদের প্রতি অনুগ্রহ করবেন, আর ইচ্ছা করলে তোমাদেরকে শাস্তি দিবেন। আমি তোমাকে (হে নাবী!) তাদের কাজকর্মের জন্য দায়িত্বশীল করে পাঠাইনি। [সূরা বানী ইসরাইল-৫৪]

আর সুপারিশ করা! সে তো আল্লাহ তা'আলা যাকে সুপারিশ করার অনুমতি দিবেন সেই শুধু সুপারিশ করতে পারবে। এখন কেহ যদি কারো জন্য আল্লাহর নিকট দু'আ করে তা তো অন্যের জন্য আল্লাহর নিকট উকালতি করা হয়ে যায়। ইহা অনধিকার চর্চা। অর্থাৎ খাস করে কারো নাম করে আল্লাহর কাছে হিদায়াতের জন্য দু'আ করা যায়। যেমন উমার (রাঃ) এর জন্য রাসূল (সাঃ) দু'আ করেছিলেন। তবে খাস করে নিজের মাতা-পিতার জন্য দু'আ করতে আল্লাহ তা'আলা প্রত্যেক মুসলিমকে বলেন। যেমন-

⊙ তাদের জন্য সদয়ভাবে নম্রতার বাহু প্রসারিত করে দাও আর বল ঃ হে আমার রাব্ব! তাদের প্রতি দয়া কর যেমনভাবে তারা আমাকে শৈশবে লালন পালন করেছেন। [সূরা বানী ইসরাইল-২৪]

⊙ হে আমাদের রাব্ব! হিসাব প্রতিষ্ঠার দিন আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে আর মু'মিনদেরকে ক্ষমা করে দিও। [সূরা ইবরাহীম-৪১]

⊙ হে আমার রাব্ব! তুমি ক্ষমা কর আমাকে, আমার পিতা-মাতাকে, যারা আমার গৃহে মু'মিন হয়ে প্রবেশ করে তাদেরকে, আর মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারীদেরকে; আর যালিমদের জন্য ধ্বংস ছাড়া আর কিছুই বৃদ্ধি করনা। [সূরা নূহ-২৮]

মুনাজাত করার সময় ইমাম যদি উপরের দু'আগুলি পড়েন এবং আমরা যদি "আমীন" "আমীন" (আল্লাহ গ্রহণ কর) বলি তাহলে আমরা কি পেলাম এবং আমাদের মাতা-পিতাই বা কি পেলেন এবং মু'মিন মুসলিমগণও শুধু এক জনের দু'আ পেলেন। অথচ আল্লাহর নির্দেশ অনুযায়ী সবাই যদি নিজ নিজ দু'আ করেন তাহলে নিজের এবং নিজ পিতা-মাতা দু'আ পাবেন, মু'মিন-মুসলিমগণও বেশী লোকের পক্ষ থেকে দু'আ পাবেন।

যেখানে আল্লাহ হলেন আমাদের উকিল, সেখানে যদি কোন ইমাম কিংবা অন্য কোন ব্যক্তিকে নিজেদের উকিল নিযুক্ত করি তাহলে তো তাদেরকে আল্লাহর সাথে শরীক করা হল। যারা কেহকে আল্লাহর সাথে শরীক করে তারাই হল মুশরিক। আল্লাহ বলেন ঃ ⊙ নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেননা। এ ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। [সূরা নিসা-৪৮]

⊙ আর তারা এই ধারণাই করেছিল যে, কোন শাস্তিই হবেনা, ফলে তারা আরও অন্ধ ও বধির হয়ে গেল, অতঃপর দীর্ঘকাল পর আল্লাহ তাদের প্রতি করুণা করলেন; তবুও তাদের অধিকাংশই অন্ধ ও বধিরই রইল। বস্তুতঃ আল্লাহ তাদের কার্যকলাপসমূহ প্রত্যক্ষ করেন। [সূরা মায়িদা-৭১]

আল্লাহর কুরআন আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীসই হল মুসলিমদের জীবন-বিধান, চলার পথ। এই দু'টি জিনিসকেই আঁকড়ে ধরে রাখতে বলেছেন আমাদের রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম। প্রত্যেকটি 'আমল আমাদেরকে যাচাই-বাছাই করে নিতে হবে যে, কুরআন ও সহীহ হাদীসের সমর্থন আছে কি না। আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ছাড়া আর কারও কথা মানার কোন সুযোগ আল্লাহ তা'আলা রাখেননি। এ বিষয়ে আরও অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মুহাম্মাদ-৩৩, আন'আম-১৫৯, আলে ইমরান-৩১, ৩২, ১০৩, ১৩২, নূর- ৬৩, নিসা-৮০, নাজম-৩-৪, জিন-২৩, তাওবা-৩৪, হাক্কাহ-৪৪-৪৬, মুজাদিলা-২০।

আল্লাহর নিকট দু'আ কবূলের শর্ত

১। তোমার রাব্ব বলেন ঃ তোমরা আমাকে ডাক, আমি (তোমাদের ডাকে) সাড়া দিব। যারা অহংকারবশতঃ আমার 'ইবাদাত করেনা, নিশ্চিতই তারা লাঞ্ছিত অবস্থায় জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [সূরা মু'মিন-৬০]

২। হে রাসূল! পবিত্র বস্তু আহার কর, আর সৎ কাজ কর, তোমরা যা কর সে সম্পর্কে আমি পূর্ণরূপে অবগত। [সূরা মু'মিনূন-৫১]

৩। হে মু'মিনগণ! আমার দেয়া পবিত্র বস্তুগুলি খাও এবং আল্লাহর উদ্দেশে শোকর কর, যদি তোমরা তাঁরই 'ইবাদাত কর। [সূরা বাকারা-১৭২]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সেই ব্যক্তির কথা উল্লেখ করলেন যে দীর্ঘ সফর করে এলোমেলো কেশ ও ধূলা মিশ্রিত পোশাক নিয়ে অত্যন্ত ব্যাকুলভাবে আকাশের দিকে দু'হাত তুলে ডাকতে থাকে ঃ হে রাব্ব! হে রাব্ব!!

অথচ সেই ব্যক্তির পানাহার সামগ্রী হারাম উপার্জনের, পোশাক-পরিচ্ছদ হারাম পয়সায় সংগৃহীত, এমতাবস্থায় কি করে তার দু'আ কবূল হতে পারে? [মুসলিম/২২১৫]

৫। তোমাদের কেহ দু'আয় তাড়াহুড়া না করলে তার দু'আ কবূল হয়ে থাকে। সাহাবীগণ জিজ্ঞেস করলেন ঃ কিভাবে তাড়াহুড়া করা হয়ে থাকে? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ বান্দা বলে থাকে ঃ কত দু'আ করলাম, কিন্তু কবূল তো হচ্ছেনা। [বুখারী/৫৮৮৮]

⧉ দু'আ কবূল না হওয়ার কারণ হল তার খাদ্য-পানীয়, পোশাক হালাল নয় । এ জন্যই নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিভাবে তার দু'আ কবূল করা হবে? দু'আ কবূলের শর্তগুলি পালন না করলে দু'আ কবূলের কোনই সম্ভাবনা নেই। শর্তগুলি বিদ্যমান থাকার পরও যদি দু'আ কবূল না হয় তাহলে কি কারণে দু'আ কবূল হয়নি, হয়তো উপার্জনের পদ্ধতি অনুসরণ করায় কমতি আছে। অথবা আল্লাহ তার দু'আ কবূলের পরিবর্তে কোন বিপদ দূর করবেন। অথবা এও হতে পারে যে, কিয়ামাতের দিনের জন্য তার দু'আকে সঞ্চয় করে রাখা হয়েছে এবং সেদিন তাকে অধিক পরিমাণে বিনিময় দান করবেন। কেননা কোন ব্যক্তি দু'আ কবূলের সকল শর্ত বাস্তবায়ন করে আল্লাহর কাছে দু'আ করার পরও দু'আ কবূল করা হয়নি এবং তার উপর থেকে বড় কোন বিপদও দূর করা হয়নি এমন হতে পারেনা। হয়ত বান্দা দু'আ কবূলের সকল শর্ত পূরণ করে দু'আ করেছে। কিন্তু দ্বিগুণ পুরস্কার দেয়ার জন্য তার দু'আ কবূল করা হয়নি। একটি পুরস্কার দু'আ করার কারণে এবং অন্য একটি পুরস্কার বিপদ দূর না করার পর ধৈর্য ধরার কারণে। সুতরাং তার জন্য দু'আ কবূলের চেয়ে মহান জিনিস তার জন্য সঞ্চয় করে রাখা হবে। আল্লাহই সবকিছু ভাল জানেন।

সমস্যা সমাধানের জন্য দু'আ বা প্রার্থনার হকদার কে?

১। তাঁকে (অর্থাৎ আল্লাহকে) ছাড়া যাদেরকে তোমরা ডাক, তারা তোমাদেরকে সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা, পারেনা নিজেদেরকেও সাহায্য করতে। [সূরা আরাফ-১৯৭]

২। তারা যখন নৌযানে আরোহণ করে তখন বিশুদ্ধ অন্তঃকরণে একনিষ্ঠ হয়ে তারা আল্লাহকে ডাকে। অতঃপর তিনি যখন তাদেরকে নিরাপদ স্থলে পৌঁছে দেন তখন তারা (অন্যকে আল্লাহর) শরীক করে । [সূরা আনকাবূত-৬৫]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১৮৬, আ'রাফ-২৯ ।

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অধিকাংশ সময়ই এ দু'আ করতেন ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদের দুনিয়ায় কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর। [বুখারী/ ৫৯৩৪-আনাস (রাঃ)]

⧉ দুঃখের বিষয় বর্তমানে কালেমা পাঠকারী মুসলিমরা নৌযানে সফরকালে ঝড়, তুফান বা নৌযান ডুবে যাওয়া থেকে বাঁচার জন্য আল্লাহকে মনে প্রাণেই ডাকে; অতঃপর আল্লাহ যখন তাদেরকে ঐ বিপদ থেকে মুক্তি দেন, তখন শুকরিয়া স্বরূপ পীরের মাজারে সিন্নি দেয়, খান জাহান আলীর মাজারের কুমীরকে

খাসী/মুরগী দেয় বা মিলাদের আয়োজন করে ইত্যাদি। এগুলো শিরকী আকিদা এবং কুরআন ও সুন্নাহ বিরোধী।

আল্লাহ্ আপনাকে দীর্ঘজীবি/চিরস্থায়ী করুন বলা প্রসঙ্গ

১। পৃথিবী পৃষ্ঠে যা আছে সবই ধ্বংসশীল। কিন্তু চিরস্থায়ী তোমার রবের চেহারা (সত্তা)- যিনি মহীয়ান, গরীয়ান। [সূরা আর রাহমান-২৬-২৭]

২। তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে চিরস্থায়ী করিনি। তুমি যদি মারা যাও তাহলে তারা কি চিরস্থায়ী হবে? [সূরা আম্বিয়া-৩৪]

◫ শিরোনামে বর্ণিত বাক্যটি বলা ঠিক নয়। বরং এটি দু'আর মধ্যে সীমা লঙ্ঘন করার শামিল। কারণ আল্লাহ ব্যতীত কোন কিছুই দীর্ঘজীবি নয় । তা ছাড়াও আপনি দীর্ঘজীবি হোন, সাধারণভাবে এ কথাটি বলা ঠিক নয়। কারণ হায়াত দীর্ঘ হওয়া কখনো ভাল হয় আবার কখনো মন্দ হয়। ঐ ব্যক্তি সবচেয়ে নিকৃষ্ট, যার বয়স বাড়ল, কিন্তু আমল মন্দ হল। যদি বলে আল্লাহর আনুগত্য করার তাওফীক দান করুন, তাহলে কোন অসুবিধা নেই।

দুনিয়ার জীবন কত দিনের?

১। আল্লাহ বলবেন ঃ 'পৃথিবীতে কয় বছর তোমরা অবস্থান করেছিলে? তারা বলবে ঃ আমরা একদিন বা এক দিনের কিছু অংশ অবস্থান করেছি, অতএব তুমি গণনাকারীদের জিজ্ঞেস কর। তিনি বলবেন ঃ তোমরা অল্প সময়ই অবস্থান করেছিলে, তোমরা যদি জানতে! [সূরা মু'মিনূন-১১২-১১৪]

২। যেদিন তারা তা দেখবে সেদিন তাদের মনে হবে, যেন তারা (পৃথিবীতে) এক সন্ধ্যা বা এক সকালের বেশি অবস্থান করেনি। [সূরা নাযিয়াত-৪৬]

৩। তারা কি যমীনে ভ্রমণ করেনা? তাহলে তারা হৃদয় দিয়ে বুঝতে পারত, আর তাদের কান শুনতে পারত। প্রকৃতপক্ষে চোখ অন্ধ নয়, বরং বুকের ভিতর যে হৃদয় আছে তাই অন্ধ। [সূরা হাজ্জ-৪৬]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হা মীম আস সাজদা-৫, কাহফ-২৫, মা'আরিজ-৪-৭।

◫ উপরোক্ত আয়াতে দিবালোকের ন্যায় প্রকাশ পেল যে, এ জীবন কত দিনের, কত সময়ের এবং এর জন্য মানুষ কিই না করছে। অনন্ত কালের আখিরাত বা পরকালের জীবনের তুলনায় দেখা গেল যে, দুনিয়ার জীবনতো অল্প সময় মাত্র। কেননা গড়ে ৬০, ৭০, ৮০ বছর দুনিয়ার কর্মমুখর, কর্মক্লান্ত, ছুটন্ত বেচারার অবসরহীন জীবন কেটে গেল কি চরম পেরেশানীতে অথচ সেই পরকালের তুলনায় এত সময়ের হিসাব মাত্র এক সকাল বা এক সন্ধ্যা। একদিন বা দিনের একাংশ। আর এ জন্যই হানা-হানি, মারা-মারি স্বার্থের দ্বন্দ্বে দুনিয়ার জীবনটা কি বিষময় করে তুলছি। এ কথা ভাবার সময় পান কত জনে? হাজারে একজনও কি মিলবে? মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হুশিয়ারী ঃ জান্নাতে যাবে হাজারে একজন, আর নয়শত নিরানব্বই জনই ঐ অনন্ত কালের দাউ দাউ করা প্রজ্জ্বলিত অনলে জ্বলবে। সে কি অসহায় জীবন! তা প্রত্যেক মুসলিমকে অবশ্যই চিন্তা করতে হবে।

দান খাইরাত প্রসঙ্গ

(ক) দান খাইরাত কি অবশ্যই করতে হবে ?

১। হে ঈমানদারগণ! আমার দেয়া জীবিকা থেকে খরচ কর সেদিন আসার পূর্বে যেদিন কোন দর কষাকষি, বন্ধুত্ব এবং সুপারিশ কাজে আসবেনা। বস্তুতঃ কাফিরেরাই অত্যাচারী। [সূরা বাকারা-২৫৪]

২। তোমরা আল্লাহকে যথাযথ ভয় কর, শোন, আনুগত্য কর ও ব্যয় কর তোমাদের নিজেদেরই কল্যাণে; যারা অন্তরের কার্পণ্য হতে মুক্ত তারাই সফলকাম। [সূরা তাগাবুন-১৬]

☐ তাহলে ঈমান আনা আর সালাত কায়েম করা যেমন ফার্‌য, তেমনি যাকাত দেয়াও ফার্‌য।

খ) দানের উপকারিতা

১। যে ধন-সম্পদ আল্লাহ জনপদবাসীদের কাছ থেকে নিয়ে তাঁর রাসূলকে দিলেন তা আল্লাহর জন্য, তাঁর রাসূলের জন্য আর রাসূলের আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, মিসকীন ও পথিকদের জন্য যাতে তা তোমাদের মধ্যকার সম্পদশালীদের মধ্যেই আবর্তিত না হয়। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

২। যাদের ধন-সম্পদে সুবিদিত অধিকার আছে প্রার্থী এবং বঞ্চিতদের। [সূরা মা'আরিজ-২৪-২৫]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মুদ্‌দাস্‌সির-৪২-৪৪, বাকারা-২৬১, হাদীদ-৭।

গ) যে সব বস্তু দান করতে হবে

১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের উপার্জিত উত্তম সম্পদ থেকে এবং তোমাদের জন্য ভূমি থেকে যা উৎপন্ন করেছি তা থেকে ব্যয় কর এবং নিকৃষ্ট বস্তু ব্যয় করার নিয়াত করনা। বস্তুতঃ তোমরা তা গ্রহণ করনা, যদি না তোমাদের চক্ষু বন্ধ করে থাক। আর জেনে রেখ, আল্লাহ অমুখাপেক্ষী, প্রশংসিত। [সূরা বাকারা-২৬৭]

২। তোমরা যা ভালবাস তা হতে ব্যয় না করা পর্যন্ত তোমরা কখনই কল্যাণ লাভ করতে পারবেনা; এবং তোমরা যা কিছুই ব্যয় কর, আল্লাহ তা জ্ঞাত আছেন। [সূরা আলে ইমরান-৯২]

ঘ) কখন, কোন্ সময়ে কিভাবে দান করতে হবে?

১। যদি তোমরা প্রকাশ্যভাবে দান কর তাহলে তা উৎকৃষ্ট এবং যদি তোমরা তা গোপন কর ও দরিদ্রদেরকে প্রদান কর তাহলে ওটাও তোমাদের জন্য উত্তম, এবং এর দ্বারা তোমাদের কিছু পাপ (এর কালিমা) বিদূরিত হবে; বস্তুতঃ তোমাদের কার্যকলাপ সম্বন্ধে আল্লাহ বিশেষ রূপে খবর রাখেন। [সূরা বাকারা- ২৭১]

২। যারা রাতে ও দিনে, গোপনে ও প্রকাশ্যে নিজেদের ধন-সম্পদ ব্যয় করে তাদের রবের নিকট তাদের পুরস্কার রয়েছে, তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুঃখিত হবেনা। [সূরা বাকারা-২৭৪]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফাতির-২৯, ইবরাহীম-৩১, রাদ- ২২।

ঙ) কি পরিমান অর্থ থাকলে দান করবে?

১। যারা সচ্ছল ও অসচ্ছল অবস্থায় (আল্লাহর পথে) ব্যয় করে এবং যারা ক্রোধ সংবরণকারী এবং মানুষের প্রতি ক্ষমাশীল, আল্লাহ সৎকর্মশীলদের ভালবাসেন। [সূরা আলে ইমরান- ১৩৪]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হা মীম আস সাজদাহ-১৬, আনফাল-৩-৪।

চ) কি পরিমান দান করতে হবে ?

১। আর যখন তারা ব্যয় করে তখন অপব্যয় করেনা, আর কৃপণতাও করেনা; এ দু'য়ের মধ্যবর্তী পন্থা গ্রহণ করে। [সূরা ফুরকান-৬৭]

২। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ সূরা বাকারা-২৫৬।

ছ) দান কোথায় এবং কাকে দিতে হবে

১। সাদাকাহ হচ্ছে শুধুমাত্র গরীবদের এবং অভাবগ্রস্তদের, আর এই সাদাকাহর (আদায়ের) জন্য নিযুক্ত কর্মচারীদের এবং (দীনের ব্যাপারে) যাদের মন রক্ষা করতে (অভিপ্রায়) হয় (তাদের), আর গোলামদের আযাদ করার কাজে এবং কর্জদারদের কর্জে (কর্জ পরিশোধে), আর জিহাদে (অর্থাৎ যুদ্ধ সরঞ্জাম সংগ্রহের জন্য) আর মুসাফিরদের সাহায্যার্থে। এই হুকুম আল্লাহর পক্ষ হতে নির্ধারিত, আর আল্লাহ মহাজ্ঞানী, অতি প্রজ্ঞাময়। [সূরা তাওবা-৬০]

২। তোমাকে লোকে জিজ্ঞেস করছে, কী ব্যয় করবে? বলে দাও, সৎকাজে যাই ব্যয় কর তা তোমাদের মাতা-পিতা ও নিকটাত্মীয়, ইয়াতীম ও অভাবগ্রস্থ মুসাফিরদের প্রাপ্য। তোমরা যা কিছু সৎ কাজ কর, নিশ্চয়ই আল্লাহ সে বিষয়ে বিশেষভাবে অবহিত। [সূরা বাকারা-২১৫]

জ) দান করার পর খোটা দেয়া যাবেনা

১। যারা আল্লাহর পথে নিজেদের ধন ব্যয় করে নিজেদের দানের কথা মনে করিয়ে দেয়না, আর (দান গ্রহীতাকে) কষ্ট দেয়না, তাদের প্রতিদান তাদের রবের নিকট নির্ধারিত আছে। তাদের কোন ভয় নেই এবং তারা দুর্ভাবনাগ্রস্তও হবেনা। [সূরা বাকারা-২৬২]

২। যে দানের পর ক্লেশ দেয়া হয় তার চেয়ে ভাল কথা ও ক্ষমা উত্তম; বস্তুতঃ আল্লাহ অভাবমুক্ত ও পরম সহিষ্ণু। [সূরা বাকারা-২৬৩]

ঝ) লোক দেখান দান নিকৃষ্ট

১। এবং যারা লোকদের দেখানোর জন্য স্বীয় ধন সম্পদ ব্যয় করে এবং আল্লাহর প্রতি ও আখিরাতের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করেনা, আর যাদের সহচর শাইতান - সে নিকৃষ্ট সঙ্গীই বটে। [সূরা নিসা-৩৮]

ঞ) দান করতে কে নিষেধ করে

১। শাইতান তোমাদেরকে গরীব হয়ে যাওয়ার ভয় দেখায় এবং লজ্জাকর বিষয়ের নির্দেশ দেয় এবং আল্লাহ নিজ পক্ষ হতে তোমাদের সাথে ক্ষমার ও অনুগ্রহের ওয়াদা করছেন এবং আল্লাহ প্রাচুর্যের অধিকারী, মহাজ্ঞানী। [সূরা বাকারা-২৬৮]

২। যারা কৃপণতা করে ও লোকদের কার্পণ্য শিক্ষা দেয় এবং আল্লাহ স্বীয় অনুগ্রহে যা দান করেছেন তা গোপন করে, বস্তুতঃ আমি সেই অবিশ্বাসীদের জন্য অপমানজনক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। [সূরা নিসা-৩৭]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বানী ইসরাইল-১০০, ইয়াসীন-৪৭।

ট) কাদের দান কবুল হয়না

১। বল ঃ স্বেচ্ছায় দান কর আর অনিচ্ছায়, তোমাদের থেকে কক্ষনো তা গ্রহণ করা হবেনা; তোমরা হলে এক ফাসিক সম্প্রদায়। [সূরা তাওবা-৫৩]

ঠ) কাদের দান নেয়া যাবেনা

১। তাদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য গ্রহণ নিষিদ্ধ করার কারণ এ ছাড়া আর কিছু নয় যে, তারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অস্বীকার করে, আর তারা সালাত অলসতার সাথে ছাড়া আদায় করেনা, আর দান করলেও করে অনিচ্ছা নিয়ে। [সূরা তাওবা-৫৪]

ড) দান না করার শাস্তি

১। হে মু'মিনগণ! অধিকাংশ আহবার এবং রুহবান (ইয়াহুদ ও খৃষ্টানদের আলেম ও ধর্ম যাজক) মানুষের ধন-সম্পদ শারীয়াত বিরুদ্ধ উপায়ে ভক্ষণ করে এবং আল্লাহর পথ হতে বিরত রাখে, আর যারা স্বর্ণ ও রৌপ্য জমা করে রাখে এবং তা আল্লাহর পথে ব্যয় করেনা, তুমি তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক এক শাস্তির সুসংবাদ শুনিয়ে দাও। [সূরা তাওবা-৩৪]

২। যেদিন জাহান্নামের আগুনে তা উত্তপ্ত করা হবে আর তা দিয়ে তাদের কপালে, পার্শ্বদেশে ও পিঠে দাগ দেয়া হবে, (আর তাদেরকে বলা হবে) 'এটা হল, যা তোমরা নিজেদের জন্য স্তুপীকৃত করেছিলে, কাজেই যা জমা করেছিলে তার স্বাদ গ্রহণ কর। [সূরা তাওবা-৩৫]

৩। ফিরিশতাদেরকে (মালাইকা) বলা হবে ঃ ধর ওকে, গলদেশে বেড়ি পরিয়ে দাও। অতঃপর নিক্ষেপ কর জাহান্নামে। পুনরায় তাকে শৃংখলিত কর সত্তর হাত দীর্ঘ এক শৃংখলে। সে মহান আল্লাহয় বিশ্বাসী ছিলনা এবং অভাবগ্রস্তকে খাদ্যদানে উৎসাহিত করতনা। অতএব সেদিন সেখানে তার কোন সুহৃদ থাকবেনা এবং কোন খাদ্য থাকবেনা, ক্ষতনিঃসৃত স্রাব ব্যতীত। [সূরা হাক্কাহ-৩০-৩৬]

ঢ) দান খাইরাত সম্পর্কে হাদীস

১। তোমাদের প্রত্যেকের উচিত এক টুকরা খেজুর (সাদাকাহ) দিয়ে হলেও যেন আগুন থেকে আত্মরক্ষা করে। যদি কেহ তাও না পারে তাহলে যেন মিষ্টি কথা দিয়ে হলেও সে তা করে। [বুখারী/১৩২৫]

২। তুমি খরচ কর অথবা ছড়িয়ে দাও অথবা ঢেলে দাও, আর গুনে রেখনা। তাহলে আল্লাহও তোমাকে গুনে গুনে দিবেন। [মুসলিম/২২৪৪-আসমা বিনত আবূ বাকর (রাঃ)]

৩। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল এ কথা যেন তারা মনে না করে। [ইব্ন মাজাহ/১৭৮৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)]

৪। আল্লাহ যাদেরকে সম্পদশালী করেছেন, অথচ তারা সেই সম্পদ নিয়ে কার্পণ্য করছে তাদের ধারণা করা উচিৎ নয় যে, সেই সম্পদ তাদের জন্য কল্যাণ বয়ে আনবে, বরং উহা তাদের জন্য অকল্যাণকর হবে। অচিরেই কিয়ামাত দিবসে, যা নিয়ে কার্পণ্য করছে তা দিয়ে তাদের গলদেশ শৃংখলাবদ্ধ করা হবে। [বুখারী/১৩১৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। তুমি (সম্পদ) কুক্ষিগত করে রেখনা, (যদি এমনটি কর) তাহলে আল্লাহ তোমার রিয্‌কের দ্বার রুদ্ধ করে দিবেন। [বুখারী/১৩৪৫-আবূ শায়বা (রাঃ)]

৬। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যতদিন রাতের প্রভাতে মানুষের জাগরণে পৃথিবী কোলাহল মুখর হতে থাকবে, ততদিন প্রত্যহ প্রত্যুষে দু' জন ফিরিশতা অবতরণ করতে থাকবেন। তাদের একজন বলবেন ঃ হে আল্লাহ! দাতাকে তার দানের উত্তম প্রতিদান দাও। অপরজন বলবেন ঃ হে আল্লাহ! কৃপণকে ধ্বংস কর। [বুখারী/১৩৫৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

দুরূদ পাঠের উদ্দেশ্য/গুরুত্ব/পদ্ধতি

১। তিনি তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ বর্ষণ করেন, আর তাঁর ফিরিশতারা তাঁর অনুগ্রহ প্রার্থনা করে তোমাদেরকে অন্ধকার থেকে বের করে আলোতে আনার জন্যে। মু'মিনদের প্রতি তিনি পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব-৪৩]

২। আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁর ফিরিশতামন্ডলী নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যথাযথ শ্রদ্ধাভরে সালাম জানাও। [সূরা আহযাব-৫৬]

৩। ইব্‌ন লাইলা (রাঃ) এবং উযরা (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনাকে সালাম কিভাবে পাঠাতে হয় তা তো আমরা জানি, কিন্তু (আপনার উপর) দুরূদ কিভাবে পাঠ করব? তিনি বললেন ঃ তোমরা বলবে-

اَللّٰهُمَّ صَلِّ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا صَلَّيْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ. اَللّٰهُمَّ بَارِكْ عَلَى مُحَمَّدٍ وَعَلَى آلِ مُحَمَّدٍ كَمَا بَارَكْتَ عَلَى إِبْرَاهِيْمَ وَعَلَى آلِ إِبْرَاهِيْمَ إِنَّكَ حَمِيْدٌ مَّجِيْدٌ.

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা সাল্লাইতা 'আলা ইবরাহীমা ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। আল্লাহুম্মা বারিক 'আলা মুহাম্মাদিওঁ ওয়া 'আলা আলি মুহাম্মাদিন কামা বারাক্‌তা 'আলা ইবরাহীম ওয়া 'আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামীদুম মাজীদ। [নাসাঈ/১২৯২, বুখারী/৫৯০৪, ৩১২৪]

৪। দুরূদ পাঠ না করা পর্যন্ত দু'আ আসমান ও জমিনের মাঝে ঝুলন্ত অবস্থায় থাকে এবং এর কিছুই আল্লাহর দরবারে পৌঁছায়না। [তিরমিযী/৪৮৬]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমার প্রতি একবার দুরূদ পাঠ করবে, আল্লাহ তার প্রতি দশবার রাহমাত বর্ষণ করবেন। [মুসলিম/৭৯৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/৪৮৫]

৬। যে ব্যক্তি একবার দুরূদ পাঠ করবে তাঁর উপর দশটি রাহমাত নাযিল হবে। আর যে ব্যক্তি রাসূলুল্লাহু সাল্লালাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর একবার সালাম পাঠাবে তার উপর দশটি শান্তি নাযিল হবে। [নাসাঈ/১২৮৬-আবূ তালহা (রাঃ)]

৭। আলী (রাঃ) হতে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইরশাদ করেন, যার সামনে আমার নাম নেয়া হয়, অথচ দুরূদ পাঠ করেনা, সে বখীল অর্থাৎ কৃপণ।"[তিরমিযী]

৮। যে সব ক্ষেত্রে দুরূদ পাঠ করতে হবে ঃ

(ক) সালাতের শেষ বৈঠকে আত্তাহিয়্যাতুর পরে দুরূদ পাঠ করতে হয়। [নাসাঈ/১২৯২

(খ) জানাযার সালাতে দ্বিতীয় তাকবীরের পর দুরূদ পাঠ করতে হয়। [নাসাঈ/১২৯২]

(গ) আযান শোনার পর দু'আ পাঠ করার পূর্বে দুরূদ পাঠ করতে হয়। [বুখারী/৫৮৫]

(ঘ) জুমু'আর দিন রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বেশি বেশি দুরূদ পাঠ করতেন। [নাসাঈ/১৩৭৭]

(ঙ) দু'আ করার সময় প্রথমে আল্লাহর প্রশংসা ও গুণগানের পর দুরূদ পাঠ করতে হয়। [তিরমিযী/৪৮৬]

(চ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাম শোনা, পড়া ও লেখার সময় দুরূদ পাঠ করতে হয়। [বাইহাকী]

(ছ) কোন মাজলিসে বসলে সেখানে যিক্র ও দুরূদ পাঠ করতে হয়। [তিরমিযী/৩৩৮০]

৯। ইমাম ইব্নুল কাইউম আল জাউযিয়াহ (রহঃ) তাঁর প্রণীত জালা-উল আফহাম নামক গ্রন্থে নাবী (সাঃ) এর প্রতি দুরূদ পাঠের ৪১টি ক্ষেত্র ও অবস্থা বর্ণনা করেছেন। তার কয়েকটি উল্লেখ করা হল ঃ-

(ক) মাসজিদে প্রবেশের সময়;
(খ) মাসজিদ থেকে বের হবার সময়;
(গ) সালাতের ইকামতের সময়;
(ঘ) সকাল-সন্ধ্যায় যিক্র হিসাবে;
(ঙ) দু'আ কুনুতের শেষে;
(চ) কাবর জিয়ারাতের সময়;
(ছ) জুমু'আ ও ঈদাইনের খুৎবায়;
(জ) হাজ্জ-উমরাহ কালে সাফা-মারওয়া পাহাড়ের উপর চড়ে;
(ঝ) যে কোন দুশ্চিন্তা ও বিপদাপদের সময়;

(ঞ) ক্ষমা ও তাওবাহর জন্য ইত্যাদি।

১০। যে সমস্ত অবস্থায় দরূদ পাঠ করা নিষিদ্ধ বা অপছন্দনীয় ঃ-

(ক) নাপাক জায়গায় ও অবস্থায়;

(খ) যে কোন বিদ'আতী উপলক্ষ ও অনুষ্ঠানে যেমন মিলাদে, ঈদে মিলাদুন্নাবী, কুলখানী, জন্মবার্ষিকী ও মৃত্যুবার্ষিকী ইত্যাদিতে।

☐ ইসলাম ধর্মে বিদ'আত বা নূতন আবিষ্কৃত আমলের প্রচলন আজ নিত্য নৈমিত্তিক ব্যাপারে রূপ নিয়েছে। তবে বিশেষ করে যিক্‌র ও অযিফাসমূহে অতিরিক্ত শব্দ/বাক্য যোগ করা হয়েছে যা সুন্নাত নয়, এমন সব কথা শামিল করা হয়েছে। ফলে সহীহ সুন্নাতী দু'আ ও যিকরসমূহ ভুলের স্তুপে চাপা পড়ে গেছে। অন্যান্য আমল চালু করা এবং সুন্নাত নয় এমন যিক্‌র ও অযিফাসমূহের ন্যায় দুরূদ ও সালামেও অনুপ্রবেশ ঘটেছে। যেমন দুরূদে তাজ, দুরূদে লাখী, দুরূদে মুকাদ্দাস, দুরূদে নারিয়া, দুরূদে আকবার, দুরূদে মাহী এবং দুরূদে তাঞ্জীনা ইত্যাদি। এতে প্রত্যেক প্রকারের দুরূদ পাঠের পদ্ধতি ও সময় পৃথক পৃথকভাবে বর্ণনা করা হয়েছে। আর এ সবের উপকারিতা (যা অধিক দুনিয়াবী) হাদীস নামের বিভিন্ন পুস্তকায় লিপিবদ্ধ করা হয়েছে। উল্লেখিত দুরূদসমূহের মধ্যে এমন একটিও দুরূদ নেই যার শব্দাবলী রাসূলে আকরাম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হতে প্রমাণিত। অতএব সুন্নাতের বিপরীত রূপে প্রমাণিত এ সকল দুরূদ পড়ার পদ্ধতি ও উপকার লাভের বর্ণনা আপনা হতেই বাতিল সাব্যস্ত হয়। দুরূদে ইবরাহীম ব্যতীত অন্যান্য যে সমস্ত দুরূদ বিভিন্ন নামে পরিচিত ওগুলো যেহেতু রাসূল (সাঃ) থেকে প্রমাণিত নয় কাজেই তা পাঠ করা সুন্নাতের বিপরীত হওয়ায় তা বিদ'আত । আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে তাঁর রাসূলের অনুসরণ করার তাওফীক দান করুণ।

ধর্ম নিরপেক্ষতা

১। ওরাই তারা, পার্থিব জীবনে যাদের প্রচেষ্টা পন্ড হয়, যদিও তারা মনে করে যে, তারা সৎ কাজ করছে। ওরাই তারা, যারা অস্বীকার করে তাদের রবের নিদর্শনাবলী ও তাঁর সাথে তাদের সাক্ষাতের বিষয়। ফলে তাদের কাজ নিস্ফল হয়ে যায়; সুতরাং কিয়ামাত দিবসে তাদের জন্য কোন ওযনের ব্যবস্থা রাখবনা। জাহান্নাম- এটাই তাদের প্রতিফল, যেহেতু তারা কুফরী করেছে এবং আমার নিদর্শনাবলী ও রাসূলগণকে গ্রহণ করেছে বিদ্রূপের বিষয় স্বরূপ। [সূরা কাহফ-১০৪-১০৬]

২। উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় বিদ'আত (নতুন আবিষ্কারসমূহ)। সকল বিদ'আতই হল পথভ্রষ্টতা। [মুসলিম/১৮৭৫-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৪৫]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৪৩৪৩, ৪৩৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৪]

- ধর্ম নিরপেক্ষতাবাদ ইংরেজী সেকিউলারিজম শব্দের বাংলা অনুবাদ। ধর্মীয় প্রবণতাকে মানুষের ব্যক্তি জীবনে সীমাবদ্ধ রেখে সমাজ জীবনের সকল দিক ও বিভাগকে ধর্মের বিধি বিধান থেকে মুক্ত রাখার নামই ধর্মনিরপেক্ষতা। রাষ্ট্রিয়, সামাজিক, রাজনৈতিক, অর্থনৈতিক ও আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে ধর্মকে পরিত্যাগ করাই এর লক্ষ্য। সামাজিক পরিসরে কেহ চাইলে সে তার ধর্ম পালন করবে, তবে অপরের ব্যাপারে দা'ওয়াত দিবেনা এবং হস্তক্ষেপও করবেনা।

দীন/ধর্ম সম্বন্ধে হাসি-ঠাট্টা করা

১। আর যদি তাদেরকে জিজ্ঞেস কর তাহলে তারা বলে দিবে ঃ আমরাতো শুধু আলাপ আলোচনা ও হাসি তামাশা করছিলাম। তুমি বল ঃ তাহলে কি তোমরা আল্লাহ, তাঁর আয়াতসমূহ এবং তাঁর রাসূলের প্রতি হাসি তামাসা করছিলে? [সূরা তাওবা-৬৫]

২। তোমরা এখন অজুহাত দেখিয়োনা, তোমরাতো ঈমান আনার পর কুফরী করেছ, যদিও আমি তোমাদের মধ্য হতে কতককে ক্ষমা করে দিই, তবুও কতককে শাস্তি দিবই। কারণ তারা অপরাধী ছিল। [সূরা তাওবা-৬৬]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফুরকান-৪০, ৪১, আলে ইমরান-৮৫, হা মীম আস সাজদাহ-২২।

৪। যে ব্যক্তি আল্লাহকে রাব্ব হিসাবে, ইসলামকে দীন হিসাবে এবং মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে নাবী হিসাবে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নেয়, তার জন্য জান্নাত অবধারিত হয়ে যায়। [নাসাঈ/৩১৩৫-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)]

৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (দীনের ব্যাপারে) সহজ পন্থা অবলম্বন করবে, কঠিন পন্থা অবলম্বন করবেনা, মানুষকে সু-সংবাদ শোনাবে, বিরক্তি সৃষ্টি করবেনা। [বুখারী/৬৯-আনাস (রাঃ)]

- বিভিন্ন গোত্রের বহু লোককে দেখা যায় যে, অনেকেই ধর্মের ব্যাপারে ইঙ্গিতসূচক বিদ্রুপ করে। যেমন বাঁকা চোখে দেখা, জিহ্বা বের করা, ঠোঁট বাঁকা করা এবং কুরআন অথবা হাদীস তিলাওয়াতের সময় ও সৎকাজের আদেশ ও অসৎ কাজ থেকে নিষেধ করার সময় হাত দ্বারা টিপ্পনি মারা ইত্যাদি। আবার কেহ কেহ বলে ঃ নিশ্চয়ই ইসলাম বিংশ শতাব্দীর জন্য প্রযোজ্য নয় বা বর্তমান বিশ্বের উপযোগী নয়। এটি একমাত্র মধ্যযুগসমূহের জন্য চলে এবং এটি প্রগতিশীল নয়। এতে শাস্তি বিধানের ব্যাপারে কঠোরতা ও বর্বরতা রয়েছে এবং এতে নারীদেরকে তাদের অধিকার থেকে বঞ্চিত করা হয়েছে। তাদের কথা ঃ মানব রচিত আইন, মানুষের জন্য ইসলামের আইনের চেয়ে উত্তম। তাওহীদের দিকে আহ্বান জানানো এবং কাবর ও সমাধিস্থলে ইবাদাত করা অস্বীকার করলে তার মর্মে তারা বলে ঃ এ ব্যক্তি বিচ্ছিন্নতাবাদী অথবা মুসলিম জামা'আতকে বিভক্ত করতে চায়। অথবা বলে ঃ এ ব্যক্তি ওহাবী বা পঞ্চম মাযহাবী। এ ধরনের যত কথা বলা হয় সবই দীনকে ও দীনের ধারকদেরকে গালি দেয়া এবং সঠিক আকীদাহকে বিদ্রুপ করা। আর যারা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতকে আঁকড়ে ধরে থাকে

তাদেরকে আরও বেশী বিদ্রুপ করা হয় । তারা বলে ঃ ধর্ম শুধু লম্বা দাঁড়ির মধ্যেই সীমিত নয়। এটা লম্বা দাঁড়িকে বিদ্রুপ করে বলা হয় অথচ দাঁড়িসহ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যে কোন সুন্নাতকে কটাক্ষ করার অর্থ হল ঈমানহারা হয়ে কাফির হয়ে যাওয়া। এ ধরণের লজ্জাহীন আরও অনেক কথা তারা বলে।

আল্লাহ তা'আলার রিসালাত, অহী এবং দীনের বিভিন্ন বিষয় অত্যন্ত পবিত্র। এগুলির কোন একটি নিয়ে ঠাট্টা করা বৈধ নয়। যে এরূপ করবে সে ইসলাম বিদ্বেষী। কারণ তার কাজটি আল্লাহ, তাঁর রাসূল, কিতাব এবং শারীয়াতকে হেয় প্রতিপন্ন করার প্রমাণ বহন করে। যারা এ ধরনের কাজ করবে তাদের উচিত আল্লাহর দরবারে তাওবা করা এবং ক্ষমা চেয়ে নিজকে সংশোধন করে আল্লাহর প্রতি ভয় ও সম্মান দিয়ে অন্তরকে পরিশুদ্ধ করা ।

মুসীবাতের সম্মুখীন হলে ধৈর্য ধারণের নির্দেশ

❖ মুসীবাত অর্থ বিপদ, দুর্যোগ ইত্যাদি

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের আনুগত্য কর, পরস্পর ঝগড়া বিবাদ করনা। তা করলে তোমরা সাহস হারিয়ে ফেলবে, তোমাদের শক্তি-ক্ষমতা বিলুপ্ত হবে। আর ধৈর্য ধারণ করবে, আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সঙ্গে আছেন। [সূরা আনফাল-৪৬]

২। মানুষের মধ্যে কেহ কেহ আল্লাহর ইবাদাত করে দ্বিধার সাথে; তার মঙ্গল হলে তাতে তার চিত্ত প্রশস্ত হয় এবং কোন বিপর্যয় ঘটলে সে তার পূর্বাবস্থায় ফিরে যায়; সে ক্ষতিগ্রস্ত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে; এটাইতো সুস্পষ্ট ক্ষতি। [সূরা হাজ্জ-১১]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ যুমার-১০, কাসাস-৫৪, কালাম-৪৮, বাকারা-৪৫।

৪। কোন মুসলিম বিপদাপদে পতিত হলে তার বিনিময়ে আল্লাহ তা'আলা তার পাপ মোচন করেন। এমন কি শরীরে একটি কাঁটা বিঁধলেও তার বিনিময়ে পাপ ক্ষমা করা হয়। [বুখারী/৫২২৫]

৫। মু'মিনের অবস্থা খুবই অদ্ভুত। তার সমস্ত কাজই কল্যাণকর। মু'মিন ব্যতীত অন্য কেহ এ কল্যাণ লাভ করতে পারেনা। তারা স্বচ্ছলতা লাভ করলে শুকরিয়া জ্ঞাপন করে, আর অস্বচ্ছলতায় আক্রান্ত হলে ধৈর্য ধারণ করে, এটাও তার জন্য কল্যাণকর। [মুসলিম/৭২২৯-সুহাইব (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ধৈর্য হল জ্যোতি। [মুসলিম/৪২৫-আবূ মালিক আশআরী (রাঃ), তিরমিযী/৯৮৮]

৭। যে ব্যক্তি ধৈর্য ধারণের তাওফীক চায় আল্লাহ তাকে সাবরের (ধৈর্য ধারণের) তাওফীক দিয়ে দেন। ধৈর্য ধারণের চেয়ে ভাল এবং বিপুল কোন সম্পদ কেহকে প্রদান করা হয়নি। [তিরমিযী/২০৩০-আবূ সাঈদ (রাঃ), বুখারী/৬০১৩]

☐ হতাশা প্রকাশ করা এবং ধ্বংস হয়ে যাওয়ার দু'আ করাও নিষিদ্ধ। গাল চাপড়ানো, জামা-কাপড় ছিঁড়া, মাথার চুল টেনে ছিঁড়ে ফেলা ইত্যাদি সবই

নিষিদ্ধ এবং ধৈর্য ধারণের বিপরীত। বর্তমান সমাজে বিপদ-আপদে পড়লে মানুষেরা এরূপ করে।

ঐশ্বর্যের ধোকা

১। যখনই আমি কোন জনপদে সতর্ককারী প্রেরণ করেছি তখনই ওর বিত্তশালী অধিবাসীরা বলেছে ঃ তোমরা যা সহ প্রেরিত হয়েছ আমরা তা প্রত্যাখ্যান করি। [সূরা সাবা-৩৪]

২। তারা আরও বলত ঃ আমরা ধনে জনে সমৃদ্ধশালী; সুতরাং আমাদেরকে কিছুতেই শাস্তি দেয়া হবেনা। [সূরা সাবা-৩৫]

৩। বল ঃ আমার রাব্ব যার জন্য চান রিয্ক প্রশস্ত করেন বা সীমিত করেন, কিন্তু (এর তাৎপর্য) অধিকাংশ লোকই জানেনা। [সূরা সাবা-৩৬]

৪। হে মু'মিনগণ! তোমাদের ধন-সম্পদ আর তোমাদের সন্তানাদি তোমাদেরকে যেন আল্লাহর স্মরণ হতে গাফিল করে না দেয়। যারা এমন করবে তারাই ক্ষতিগ্রস্ত। [সূরা মুনাফিকুন-৯]

৫। তোমাদের ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পরীক্ষা মাত্র । আর আল্লাহ এমন যাঁর কাছে আছে মহাপুরস্কার। [সূরা তাগাবূন-১৫]

৬। যেদিন ধন-সম্পদ ও সন্তান-সন্ততি কোন কাজে আসবেনা। সেদিন উপকৃত হবে শুধু সে, যে আল্লাহর নিকট আসবে বিশুদ্ধ অন্তঃকরণ নিয়ে। [সূরা শু'আরা-৮৮-৮৯]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাসাস-৭৬, ৭৮ তাকাসুর-১-৫, হা মীম আস সাজদাহ-৪৯, আহযাব-৩৭, নাজম-৪৮, হুদ-১৫, ১৬।

৮। কল্যাণ একমাত্র কল্যাণকেই বয়ে আনে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধনদৌলত ন্যায় ও সৎভাবে উপার্জন করবে এবং ন্যায় ও সৎ কাজে ব্যয় করবে, কিয়ামাতের দিন তা সাহায্যকারী হবে। আর যে ব্যক্তি তা অন্যায়ভাবে উপার্জন করবে সেটা তার জন্য এ রকম খাদ্য হবে যে, সে তা খাবে কিন্তু পরিতৃপ্ত হবেনা। [বুখারী/৫৯৭১-আবূ সাঈদ (রাঃ), নাসাঈ/২৫৮৩]

৯। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন ঃ যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা পরিমাণ সম্পদ দেয়া হয় তথাপিও সে এরকম দ্বিতীয়টার জন্য আকাংখী হবে। আর এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেয়া হয় তাহলে সে তৃতীয় আরও একটার জন্য আকাংখা করতে থাকবে। মানুষের পেটের ক্ষুধা মাটি ছাড়া আর কিছু দ্বারা ভরাতে পারবেনা। [বুখারী/৫৯৮২]

১০। তিনটি বস্তু মৃত ব্যক্তির সঙ্গী রূপে তার সাথে যায়। দু'টি তো ফিরে আসে এবং একটি তার সঙ্গে থেকে যায়। সঙ্গে গমন করে তার আত্মীয় স্বজন, ধন-সম্পদ এবং তার আমল। তার আত্মীয় স্বজন ও ধন-দৌলত ফিরে আসে, আর থেকে যায় শুধু আমল। [মুসলিম/৭১৫৫-আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ)]

☐ উপরোক্ত আয়াতসমূহ দ্বারা জানা যায় যে, ধনের প্রাচুর্য, দুনিয়াবী আরাম-আয়েশ ও স্বচ্ছলতা, পরকালীন জীবনে নাজাতের জন্য কোন সহায়ক নয়। বরং আল্লাহর ভালবাসা ও তাঁর সন্তুষ্টি হাসিলের একমাত্র পথ হল তাঁর

আনুগত্য করা ও তাঁর রাসূলের অনুসরণ করা এবং দীনে হক পরিপূর্ণ ও সহজভাবে কবূল করা।

অতএব জাহিলি আরাবদের মধ্যে যে ধারণা প্রচলিত ছিল যে, দুনিয়ায় সম্পদশালী হওয়া আল্লাহর নৈকট্য লাভকারী বান্দা হওয়ার একটি প্রমাণ এ যুক্তি একেবারেই বাতিল। যাদের সামান্য বোধশক্তি আছে, এ কথা বুঝতে তাদের মোটেই কষ্ট হবার কথা নয়।

ধূমপান কি বিষপান?

❖ ধূমপান নেশাদার বস্তু। আর সকল নেশাদার বস্তুই হারাম। ⊙ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ প্রত্যেক নেশার বস্তুই হারাম। [বুখারী/৫৬৮২] ⊙ তা ছাড়াও যা অধিক পরিমানে পান করলে নেশার সৃষ্টি হয় তা অল্প পরিমাণে পান করাও হারাম। [আবূ দাউদ/৩৬৪০]

ধূমপান হারাম হওয়ার দলীলসমূহ নিম্নরূপ ঃ

১। **আর ধূমপান একটি ক্ষতিকারক, অপবিত্র ও দুর্গন্ধময় বস্ত ঃ** আল্লাহ তাদের জন্য পবিত্র জিনিসসমূহ হালাল করেন, আর অপবিত্র জিনিসসমূহ হারাম করেন। [সূরা আ'রাফ-১৫৭]

২। **ধূমপান ক্যান্সার, যক্ষ্মা প্রভৃতি ধ্বংসাত্মক রোগের কারণ ঃ** 'এবং স্বীয় হস্ত ধ্বংসের দিকে প্রসারিত করনা।' [সূরা বাকারা-১৯৫]

৩। **ধূমপান নিজে নিজেকে ধ্বংস করে দেয় ঃ** 'তোমরা নিজেদের হত্যা করনা।' [সূরা নিসা-২৯]

৪। **ধূমপানের মধ্যে কোনই উপকার নেই ঃ** 'এর পাপ (গুনাহ), লাভের (উপকারের) চেয়ে অনেক বড়।' [সূরা বাকারা-২১৯)

৫। **ধূমপান করার অর্থই হচ্ছে অপচয় (খরচ), যা শাইতানী কাজের অন্তর্গত ঃ** 'তোমরা অপব্যয়, অপচয় করনা, নিশ্চয়ই অপব্যয়কারী লোকেরা শাইতানের ভাই।' [সূরা বানী ইসরাইল-২৬-২৭]

৬। **আর ধূমপান এমনই একটি বিষয় যা নিজের ক্ষতির সাথে পার্শ্ববর্তী লোকের কষ্টের কারণ হয়ে দাঁড়ায় এবং ধন-সম্পদেরও অপচয় হয় ঃ** 'তোমরা নিজেদের ক্ষতি করনা এবং অপরের ক্ষতি সাধন করনা।' [মুসনাদ আহমাদ]

৭। **ধূমপান সম্পদ ধ্বংসকারী যা আল্লাহ তা'আলা পছন্দ করেননা ঃ** আল্লাহ তোমাদের জন্য সম্পদ বিনষ্ট করা হারাম করেছেন। [ইব্ন মাজাহ/২৪১১]

৮। **ধূমপানকারী মন্দ সাথী যে আগুনে ফুঁক দিয়ে থাকে ঃ** ভাল এবং মন্দ সাথীর উদাহরণ এরূপ যেমন আতর বিক্রয়কারী এবং কামার শালার হাঁফরে ফুঁকদানকারী ব্যক্তি। [বুখারী/৫১২৩]

৯। **ধূমপান ত্যাগ করার জন্য তাওবা করা উচিত নইলে তাদের ক্ষমা নেই ঃ** রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কোন ব্যক্তি হারানো পশু পাওয়ার পর যে পরিমান খুশী হয়, তোমাদের তাওবা করার পর আল্লাহ তা'আলা এর চেয়েও বেশী খুশি হন। [মুসলিম/৬৭০১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/৪২৪৭, বুখারী/৫৮৫৭]

১০। **অথচ সিগারেট বা ধূমপানের গন্ধ, রসুন ও পিয়াজের চেয়ে অধিকতর দুর্গন্ধময়** ঃ 'যে ব্যক্তি কাঁচা রসুন অথবা পিয়াজ খাবে, সে যেন আমাদের থেকে এবং মাসজিদ থেকে আলাদা হয়ে নিজ ঘরেই বসে থাকে।' [বুখারী/৮০৯, মুসলিম/১১৩৪]

- অনেক আলেম ও মনীষীরা ধূমপানকে হারাম বলেছেন। আর যারা হারাম বলেননি তারা আসলে ধূমপানের নতুন ধ্বংসাত্মক ক্রিয়া ক্যান্সার ইত্যাদি সম্বন্ধে অনবহিত। আমাদের সমাজে আবার অনেকে বলে যে, ধূমপান করলে স্মার্ট হওয়া যায় এবং পরস্পর সহজেই বন্ধুত্ব করা যায়।

একটু ভেবে দেখুন ঃ যদি কেহ একটি টাকা জ্বালিয়ে দেয় তাহলে আমরা তাকে বলব এই লোকটি পাগল হয়ে গেছে। তাহলে শত শত টাকাকে ধূমপানের জন্য জ্বালিয়ে দেয়াকে কি বলতে পারি? অথচ এর দ্বারা আর্থিক ও শারীরিক ক্ষতির সাথে পার্শ্ববর্তী ব্যক্তিরও কষ্ট হয়ে থাকে। অতএব হুক্কা, সিগারেট এবং বিড়ি দ্বারা লোকদের কষ্ট দেয়া এবং পবিত্র ও মুক্ত বায়ুকে দূষিত করা সাংস্কৃতিক দিক দিয়ে কিভাবে ঠিক হতে পারে? আর মনে রাখবেন যে, বায়ুকে দূষিত করা পানিকে দূষিত করারই নামান্তর।

আর আমরা যদি কোন ধূমপানকারীকে জিজ্ঞেস করি যে, কিয়ামাতের দিন সিগারেট, হুক্কা, তামাক, বিড়ি, জর্দা সাওয়াবের পাল্লায় রাখা হবে না কি পাপের পাল্লায়? তখন সে নিশ্চয়ই জবাব দিবে পাপের পাল্লায়।

ধূমপান বর্জন করার জন্য আল্লাহর নিকট সাহায্য চান । যে ব্যক্তি কোন খারাপ কাজ আল্লাহর সন্তুষ্টির জন্য ত্যাগ করার প্রতিজ্ঞা করে, আল্লাহ তাকে সাহায্য করেন। আর ধৈর্য ধারণ করুণ, কেননা আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে থাকেন। সালাতের মধ্যে ও অন্যান্য সময়ে এই বলে দু'আ করুনঃ হে আল্লাহ! আমাদের অন্তরে ধূমপানের প্রতি ঘৃণা (বিতৃষ্ণা) সৃষ্টি করে দিন এবং এটা খারাপ মনে করে আমাদেরকে এ থেকে বেঁচে থাকার তাওফীক দান করুন।

বদ নজরের প্রভাব ও উহার প্রতিকার

১। কাফিরেরা যখন কুরআন শুনে তখন তারা যেন তাদের দৃষ্টি দিয়ে তোমাকে আছড়ে ফেলবে। আর তারা বলে, সে তো অবশ্যই পাগল। [সূরা কলম১-৫১]

২। বদ নজরের প্রভাব সত্য। কোন জিনিস যদি তাকদীরকে অতিক্রম করতে পারত তাহলে বদ নজর তাকে অতিক্রম করত। তোমাদেরকে গোসল করতে বলা হলে তোমরা গোসল করবে এবং গোসলে ব্যবহৃত পানি দিয়ে রোগীর চিকিৎসা করবে। [মুসলিম/৫৫১৪]

৩। বদ নজর এবং বিচ্ছুর বিষ নামানোর ঝাড়-ফুঁক ব্যতীত কোন ঝাড়-ফুঁক নেই। [বুখারী/৫৩১৩, ৫৩১৬]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ছোঁয়াচে ও শুভ-অশুভ বলতে কিছু নেই। অমঙ্গল তিন বস্তুর মধ্যে ঃ নারী, ঘর ও জানোয়ার। [বুখারী/৫৩২৮-ইব্‌ন উমার (রাঃ)]

বদ নজর লাগার আগেই সতর্কতামূলক ব্যবস্থা নেয়ায় কোন দোষ নেই। এটা আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থি নয়। কারণ আল্লাহর উপর পরিপূর্ণভাবে ভরসা স্বরূপ বান্দা বৈধ উপকরণ অবলম্বন করে বদ নজর ইত্যাদি থেকে বেচেঁ থাকার চেষ্টা করবে এবং সেই সাথে আল্লাহর উপর ভরসা করবে। ⊙ আল্লাহ বলেন, বল ঃ হে আমার রাব্ব! আমি আপনার আশ্রয় প্রার্থনা করি শাইতানের প্ররোচনা থেকে। [সূরা মু'মিনূন-৯৭, ৯৮]

নাম রাখার ক্ষেত্রে মুসলিমদের করণীয়

১। তোমরা একে অপরের প্রতি দোষারোপ করনা এবং তোমরা একে অপরকে মন্দ নামে ডেকনা, ঈমানের পরে মন্দ নামে ডাকা গর্হিত কাজ। যারা এ ধরনের আচরণ পরিত্যাগ করেনা তারাই অত্যাচারী। [সূরা হুজুরাত-১১]

২। তোমরা তাদেরকে ডাক তাদের পিতৃ-পরিচয়ে, আল্লাহর দৃষ্টিতে এটা অধিক ন্যায়সংগত। যদি তোমরা তাদের পিতৃ-পরিচয় না জান তাহলে তারা তোমাদের দীনি ভাই এবং বন্ধু। [সূরা আহ্যাব-৫]

৩। আবূ দারদা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন তোমাদের ডাকা হবে তোমাদের স্ব-স্ব নাম ও পিতার নাম সহকারে। অতএব তোমরা ভাল নাম রাখবে। [আবূ-দাউদ/৪৮৬৪]

৪। আনাস (রাঃ) বলেছেন ঃ বাকী নামক স্থানে এক ব্যক্তি আর এক ব্যক্তিকে ডাক দিল, হে আবুল কাসিম! তখন রাসূল (সাঃ) তার দিকে তাকালেন। সে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি আপনাকে উদ্দেশ্য করিনি; আমি তো অমুককে ডেকেছি। তখন রাসূল (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ। তবে আমার কুনিয়াত অনুসারে তোমরা কুনিয়াত নামকরন করনা। [মুসলিম/৫৪০১]

৫। জাবির (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের এক ব্যক্তির একটি ছেলে জন্ম গ্রহণ করল। সে তার নাম রাখলো 'কাসিম'। তখন লোকেরা বলল, আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস না করে তাঁকে এ কুনিয়াতে ডাকবনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রেখ, কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারও কুনিয়াত রেখনা। [বুখারী/৫৭৪১]

৬। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ আনসারী (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা আমার নামে নাম রাখ। কিন্তু আমার কুনিয়াতে কারো কুনিয়াত রেখনা। কারণ আমিই কাসিম। আমি তোমাদের মধ্যে (আল্লাহর দেয়া নি'আমাত) বন্টন করি। আনাস (রা.) নাবী (সাঃ) থেকে হাদীসটি রেওয়ায়াত করেছেন। [বুখারী/৫৭৫০]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলার নিকট কিয়ামাত দিবসে ঐ ব্যক্তির নাম সব চেয়ে ঘৃণিত যে তার নাম ধারণ করেছে 'রাজাধিরাজ'(শাহজাহান)। [বুখারী/৫৭৫৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৮। নাম পরিবর্তন করে পূর্বের নামের চেয়ে উত্তম নাম রাখা যাবে। [বুখারী/৫৭৪৫]

পরিচয়ের জন্য নামের উদ্ভব। অসংখ্য সৃষ্টি বস্তুর নামের প্রয়োজন হয়েছে সনাক্ত করণের তাগিদেই। কুরআনে দেখা যায় ⊙আল্লাহ তা'আলা সর্ব প্রথম আদমকে সমস্ত নাম শিক্ষা দিয়েছেন। "আল্লামা আদামাল আসমাআ কুল্লাহা।" [সূরা বাকারা-৩১] প্রত্যেক নাম বিশেষ অর্থ এবং সেই বস্তুর বৈশিষ্ট্যর ইঙ্গিত বহন করে। আল্লাহ মানুষের নাম দিয়েছেন আদাম ও ইনসান - যা তার পরিচয় ও বৈশিষ্ট্যর সাথে সামঞ্জস্যপূর্ণ।

ইসলামী প্রথা অনুযায়ী মুসলিম নাম সাধারণতঃ পাঁচভাগে বিভক্ত - ইস্‌ম, কুনিয়া, নাসব, নিসবা ও লাকব। ইস্‌ম-এর পূর্বে বসে কুনিয়া, বাকীগুলো পরে। যেমন আবুল কাসিম মুহাম্মাদ ইব্‌ন আবদুল্লাহ আল-মাদানী আর-রাসূল। এখানে আবুল কাসিম (কুনিয়া), মুহাম্মাদ (ইস্‌ম), আবদুল্লাহ্ (নাসব), আল-মাদানী (নিসবা) আর রাসূল (লাকব)। ইসলামী নামের এই শ্রেণীবিভাগের কোন একটা বা একাধিকের দ্বারা কেহবা পরিচিত। শুধুমাত্র ইসমের দ্বারা পরিচিত নাবীগণ। যেমন- আদম, নূহ, ইবরাহীম, মূসা, ঈসা, মুহাম্মাদ (সাঃ) ইত্যাদি। নাম ছাড়া শুধু কুনিয়ায় পরিচিত ঃ আবূ বাকার, আবূ হুরাইরা, আবূ দাউদ আরও অনেকে। শুধু নাসবে পরিচিত ঃ ইব্‌ন আব্বাস, ইব্‌ন উমার, ইব্‌ন তাইমীয়া প্রমূখ। শুধুমাত্র নিসবাতে পরিচিত ঃ বুখারী, জীলানী, বাগদাদী। লাকবে পরিচিত ঃ সালাহউদ্দীন (আইয়ূবী), শাইখুল ইসলাম (ইব্‌ন তাইমীয়া) ও আরও অনেকে। নীচে ইসলামী নামগুলির বিস্তারিত আলোচনা করা হল।

কুনিয়া (উপনাম)

সন্তানের নামের পূর্বে আবূ (পিতা) বা উম্মু (মাতা) যোগ করে ডাকাকে কুনিয়া বলে, যেমন আবুল কাসিম (কাসিমের পিতা) রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কুনিয়া। উম্মুল হাসান (হাসানের মা) ফাতিমার (রাঃ) কুনিয়া। আবূ বাকার (বাকারের পিতা) আবূ বাকার সিদ্দীকের (রাঃ) কুনিয়া।

আরাবদের মধ্যে বরাবরই কুনিয়ার প্রচলন ছিল এবং এই রেওয়াজ আরাব সংস্কৃতির মধ্যে এমনই প্রাধান্য লাভ করে যে নিজের সন্তান ছাড়া অন্য বস্তুর নামে কুনিয়া ব্যবহৃত হয়। যেমন আবূ তুরাব-আক্ষরিক অর্থে মাটির পিতা, কিন্তু ভাবার্থে মাটিওয়ালা বা মাটির উপর শয়নকারী, আলী ইবন আবী তালিবের (রাঃ) কুনিয়া। আবূ হুরাইরা- আক্ষরিক অর্থে বিড়ালের পিতা, কিন্তু ভাবার্থে বিড়ালওয়ালা বা বিড়াল স্নেহকারী। আবদুর রাহমান দাউসী ছিল তার ইসম; কিন্তু আবূ হুরাইরা কুনিয়াতেই তিনি বিখ্যাত। মুশরিকদের মধ্যে আবূ লাহাব (নাম আবদুল ওয্‌যা), আবূ জাহল (নাম 'আমর ইবনে হিশাম) কুনিয়াতেই কুখ্যাত। আরাবী ভাষায় পশু-পাখির নামেরও কুনিয়া শোনা যায়।

কুনিয়ার জন্য তাই শর্ত নয় যে, যাকে ডাকা হয় তার সন্তানের নামেই তা হতে হবে; আবূ বাকার সিদ্দীকের 'বাকার' নামে কোন সন্তানই ছিলনা। আবূ হাফস উমার ইবন খাত্তাব 'হাফসা' নামে কোন সন্তানের পিতা ছিলেননা। আবূ যার গেফারীরও 'যার' নামে কোন পুত্র ছিলনা। সুতরাং কুনিয়ার জন্য সে নামের কোন পুত্র সন্তানের পিতা হতে হবে এমন কোন

শর্ত নয়। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) আয়িশা সিদ্দীকাকে (রাঃ) 'উম্মু আবদুল্লাহ' (আবদুল্লাহর মা) কুনিয়ায় ডাকতেন। এই আবদুল্লাহ (রাঃ) ছিলেন আসমা বিনত আবূ বাকার (রাঃ) ও যুবায়ির ইব্‌ন আওয়ামের (রাঃ) পুত্র। পরে তিনিই ইব্‌ন যুবায়ির নাসবে ইতিহাসে খ্যাত। রাসূলুল্লাহর (সাঃ) অন্য স্ত্রী যাইনাব বিন্‌ত জাহাশ'র (রাঃ) 'উম্মুল মাসাকীন' (মিসকীনদের মা) কুনিয়াত ছিল। কুরআনে দেখা যায়, ঈসার (আঃ) মা মারইয়ামকে উখত হারূন (হারুণের বোন) কুনিয়ায় খেতাব দেয়া হয়েছে।

ভারতীয় উপমহাদেশে কুনিয়ার প্রচলন নেই বললেই চলে। তবে আবুল ফজল, আবুল কাসিম, আবুল হাসান, আবূ সায়ীদ, আবুল কালাম ইত্যাদি কুনিয়াগুলো নাম হিসাবে আমাদের দেশে ব্যবহৃত হয়। যেমন আবূ বাকার, আবূ দাউদ ইত্যাদি। গ্রামের মানুষের মধ্যে বড়দের সম্মানে আবদুল্লাহর আব্বা, হারেছের বাপ, ফাতিমার মা ইত্যাদি কুনিয়ায় সীমিত প্রচলন দেখা যায়।

ইস্‌ম (নাম)

ব্যাকরণবিদের মতে নামের সংক্ষিপ্ত বিশ্লেষণ হল এক শব্দ, মিশ্র শব্দ, গৃহীত শব্দ, উদ্ভাবিত শব্দ ইত্যাদি। সে কারণে একই শব্দ থেকে বিভিন্ন নামকরণ করা সম্ভব। যেমন 'হাম্‌দ' শব্দ - তা থেকে মুহাম্মাদ, আহমাদ, মাহমূদ, হামদী, হামাদা, হামদান, হুমায়েদ, হাম্মাদ ইত্যাদি।

যৌগিক নাম ঃ আল্লাহর নামের পূর্বে 'আব্‌দ শব্দ যোগে নামকরণ। যেমন আবদুল্লাহ, আবদুর রাহমান, আবদুল খালেক, আবদুস সামাদ ইত্যাদি।

আল্লাহর নামের পূর্বে অন্য শব্দের যোগ- যেমন আতাউল্লাহ, হিবাতুল্লাহ, আবীদুল্লাহ ইত্যাদি।

নাবীদের নামকরণ যেমন ইবরাহীম, মূসা, ইসহাক, ইসমাইল ইত্যাদি।

নাসব (বংশসূচক নাম)

পিতা বা পূর্ব পুরুষের নামের পূর্বে ইব্‌ন (পুত্র) অথবা বিন্‌ত (কন্যা) যোগ করে নামকরণকে নাসব বলা হয়। নাসবের আড়ালে অনেকের আসল নাম চাপা পড়ে গেছে এবং তারা শুধুমাত্র নাসবেই পরিচিত। যেমন ইব্‌ন উমার (আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার), ইব্‌ন মাসউদ (আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ), ইব্‌ন তাইমীয়া (আহমাদ ইব্‌ন আবদুল হালীম), ইব্‌ন কাইয়্যিম (মুহাম্মাদ ইবন আবী বাকরা ইবন কাইয়্যিম) প্রমুখ। আরাবগণ পূর্ব পুরুষের নামের প্রতি এতই শ্রদ্ধাশীল যে, তারা যে কোন মৃত আত্মীয়ের নামে নবজাতকের নামকরণ করে থাকে। পিতা ছাড়া পূর্ব পুরুষের নামেও নাসব হতে পারে। রাসূলুল্লাহ (সাঃ) নিজেকে ইব্‌ন আবদুল মুত্তালিব বলে পরিচয় দিয়েছেন।

'ইব্‌ন' শব্দ যোগে নামকরণের সুবিধা হল সনাক্তকরণের অসুবিধা এড়ানো। তাই নামের পর ইব্‌ন ফুলান (অমুকের পুত্র) যোগ হলে একাধিক সমনামের ব্যক্তিদের সনাক্তকরণের সুবিধা হয়। যেমন মুহাম্মাদ ইবন আবদুল্লাহ (সাঃ), খাদীজা বিনত খুয়াইলেদ (রাঃ), উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ), আলী ইব্‌ন আবী তালিব (রাঃ) ইত্যাদি। সুতরাং এভাবে নামকরণ রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এবং তাঁর সাহাবীদের সুন্নাহ।

আফ্রিকা ও অন্যান্য দেশে 'ইব্ন' শব্দ যোগের প্রচলন নেই, কিন্তু ইস্‌মের (নাম) পর সরাসরি নাসব যুক্ত হয়। যেমন মুহাম্মাদ আলী (আলীর পুত্র মুহাম্মাদ), জামাল আবদুন নাসির (আবদুন নাসেরের পুত্র জামাল), ইয়াসির আরাফাত (আরাফাতের পুত্র ইয়াসির) ইত্যাদি।

এভাবে ইস্‌মের (নাম) পর পিতা বা পূর্ব পুরুষের নাম যোগে নামকরণও করা চলে। আমাদের বাংলাদেশের মহিলারা বিবাহের পরে তাদের নামের সঙ্গে স্বামীর নাম যোগ করে যা যুক্তিযুক্ত নয়। যেমন খালেদা রশিদ (আবদুর রশিদের মেয়ে খালেদা), রহিমা ওয়াজিদ (আবদুল ওয়াজিদের মেয়ে রহিমা) ইত্যাদি বুঝায়।

ইরানে 'ইব্ন' শব্দের পরিবর্তে 'ই' যোগে নামকরণ হয় যেমন হাসান-ই-সাব্বাহ (সাব্বাহ'র পুত্র হাসান), বানী-ই-সদর (সদরের পুত্র বানী)। তুর্কীরা ইব্‌নের পরিবর্তে যোগ করে 'জাদা'। কাজীজাদা (কাজীর ছেলে), পীরপাশাজাদা (পীরপাশার ছেলে), শারীহ আল্ মানারজাদা (মানারের ব্যাখ্যাকারীর পুত্র)।

নিসবা (সম্বন্ধসূচক নাম)

নিস্‌বা হল জন্মস্থান, বাসস্থান, পেশা, বংশ, গোত্র ইত্যাদির বিশেষণ যোগে সম্বন্ধসূচক নাম। যেমন সালমান ফারসী (ফারসী-পারস্যে যার জন্ম), হাসান বাসরী (বাসরার বাসিন্দা)। পেশাগত নিসবা মুহাম্মাদ কুতবী, আহমাদ সাররাফী, কাজী নজরুল ইসলাম। কুতবী (বই বিক্রেতা), সাররাফী (টাকা পরিবর্তনকারী), কাজী (বিচারক)। কেহ কেহ বংশগতভাবে উমাইয়া, আব্বাসী, ফাতিমী, আলীয়াভী, অলীদ, কুরেশী, হাশেমী ইত্যাদি। বাসস্থান হিসাবে মাক্কী, মাদানী ইত্যাদি।

কেহ কেহ শুধুমাত্র নিসবাতেই বিখ্যাত। যেমন ইমাম বুখারী তার নাম আবূ আবদুল্লাহ মুহাম্মাদ ইবন ইসমাইল ইবন ইবরাহীম-খুব কম মুসলিমই তা জানে। বুখারী নিসবাতেই তিনি বিখ্যাত। অনেকে আবার ইসমের পর নিসবা যোগে পরিচিত। আবদুল কাদের জিলানী, আল-খাতীব বাগদাদী, আবুল হাসান সিন্ধী। নাসবের পর নিসবাতে ইব্‌ন হাজর আসকালানী।

ভারতীয় উপমহাদেশে নিসবা'র প্রচলন রয়েছে। যেমন শাহ ওয়ালীউল্লাহ দেহলবী, আশরাফ আলী থানবী, হুসেন মাদানী, আবদুল হাই লক্ষ্মৌবী, সানাউল্লাহ অমৃতসরী।

উর্দু কবিদের মধ্যে আকবর এলাহাবাদী, শায়ির লুধিয়ানী, জিগর মুরাদাবাদী প্রমুখ। আলেমদের মধ্যে শাইখ নাসীরুদ্দীন আলবানী, আবুল হাসান নাদবী, আবূ মুহাম্মাদ আলীমুদ্দীন নদীয়াভী, আবূ তাহের বর্ধমানী প্রভৃতি ব্যক্তিগণ নামের পর নিসবা যোগে পরিচিত ছিলেন।

লাকব (উপাধি/টাইটেল)

লাকব হচ্ছে সম্মানিত উপাধি যা কোন ব্যক্তির সুমহান কর্মফল বা গুণগত উৎকর্ষতায় লোকের দেয়া বিশেষণ। মানব প্রজন্মের ইতিহাস থেকেই লাকবের প্রচলন। তাই আদি পুরুষ আদম (আঃ) আবুল বাশার (মানবজাতির পিতা)

লাকবে সম্মানিত। নূহ (আঃ) নাবীউল্লাহ, ইবরাহীম (আঃ) খালীলুল্লাহ, ঈসা (আঃ) রূহুল্লাহ এবং মুহাম্মাদ (সাঃ) রাসূলুল্লাহ। আবূ বাকারের (রাঃ) সুগভীর বিশ্বাসের মূল্যায়নে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) তাঁকে সিদ্দীক (বিশ্বাসী) লাকব দেন। উমার ইব্ন খাত্তাবের (রাঃ) সত্য প্রীতির কারণে উপাধি পেলেন আল-ফারূক (সত্য মিথ্যার পার্থক্যকারী)। উসমান ইবন আফ্ফান (রাঃ) তাই গানী (ধনী), আলী ইব্ন আবী তালিব হলেন ওসী (বিশ্বাসযোগ্য), খালিদ ইব্ন ওয়ালীদ হলেন সাইফুল্লাহ (আল্লাহর তলোয়ার)। পরবর্তী ইতিহাসে ইউসূফ আইয়ুবীর অবিস্মরণীয় বিজয়ের জন্য উপাধিপ্রাপ্ত হন সালাউদ্দীন (ধর্মের সংস্কারক), ইব্ন তাইমীয়া ইসলামের সর্ব বিষয়ে সুগভীর পান্ডিত্যের জন্য উপাধি লাভ করেন 'শাইখুল ইসলাম'। পৃথিবীর অন্যান্য দেশের মত পাক-ভারত উপমহাদেশেও লাকব (উপাধি/টাইটেল) এর প্রচলন দেখা যায়।

কুরআন ও হাদীসে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, নামের পর পিতার নামের সংযুক্তি কত গুরুত্বপূর্ণ। প্রত্যেক মুসলিমের সেই গুরুত্ব অনুধাবন করা উচিত নয় কি? আল্লাহ তা'আলা ও তাঁর প্রিয় নাবী (সাঃ) যা আদেশ করেছেন তা পালনের মধ্যে সর্বকালের মঙ্গল আছে।

নামের পর পিতার নামের সংযুক্তির সুবিধা হল সনাক্তকরণের সুবিধা। একই নামের একাধিক ব্যক্তির নামের পর পিতার নাম সংযুক্ত হলে পরিচয়ে কোনই অসুবিধা হয়না। সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে শতাধিক নাম ছিল আবদুল্লাহ, আবদুর রাহমান, উমার, আলী ইত্যাদি। নামের সাথে পিতার নাম যুক্ত না হলে সনাক্তকরণের অসুবিধা হওয়া স্বাভাবিক। তাই আত্মীয় বা পরিচিতদের মধ্যে 'আবদুল্লাহ, 'আবদুর রাহমান, মুহাম্মাদ, আহমাদ ইত্যাদি নাম থাকলে সে নামে আর অন্য জনের নামকরণে অনিহা দেখা যায় । অথচ এই নামগুলি আল্লাহর কাছে প্রিয় এবং মুবারাক নাম। অজ্ঞতার কারণে মুবারাক নাম থেকে সন্তানদের বঞ্চিত করা হয়।

নামের সাথে পিতার নামের সংযুক্তি না করার কারণে অন্য কিছু যোগ করার প্রয়োজন অনুভুত হয় । যা অধিকাংশ ক্ষেত্রেই অর্থহীনতায় পর্যবসিত যেমন মুহাম্মাদ, আহম্মেদ, আলী, হাসান, হুসাইন, রাহমান, হক ইত্যাদি। নামের পর ঐ ধরণের বা অন্য কিছু যোগ করা নামকরণের সুন্নাতী নিয়ম মুতাবেক হয়না। নামের সাথে অকারণে মুহাম্মাদ, আহমাদ যোগ করার উদ্দেশ্য যদি 'বারাকাত হত তাহলে বারাকাত হওয়ার প্রমাণ শারীয়াতে পাওয়া যেত, বরং তা সুন্নাত বিরোধী। তাহলে কিভাবে বারাকাত হবে? মুহাম্মাদ, আহমাদ হল পূর্ণাঙ্গ নাম বা ইস্ম।

অনেক সাহাবীর ছেলের নাম ছিল মুহাম্মাদ। যেমন মুহাম্মাদ ইব্ন আবূ বাকার সিদ্দীক (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবন আলী ইবন আলী তালিব (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবন তালহা ইব্ন উবাইদুল্লাহ (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবন সা'দ ইবন আবূ ওয়াক্কাস (রাঃ), মুহাম্মাদ ইবন আশয়াছ (রাঃ) ইত্যাদি।

নামের শেষে আলী, হাসান, হুসাইন যোগ করা যুক্তিহীন, ভিত্তিহীন এবং অনভিপ্রেত। নামের শেষে আলীর (রাঃ) নাম যুক্ত হলে শিরক হতে পারে যেমন কারও নাম বান্দা অর্থাৎ আব্‌দ বা দাস। শেষে ফারসী কায়দায় আলী যোগে হয়েছে- বন্দে আলী অর্থাৎ আলীর বান্দা বা দাস। আবেদ আলী (আলীর উপাসক)। অনেকে বলতে পারেন- এই আলী তো আল্-আলীউও হতে পারে। তা যদি হয় তবে উচ্চারণ সঠিক হওয়া চাই এবং তাহলে জায়েয। কিন্তু যদি নাম 'আবেদ হুসাইন, সাজেদ হুসাইন, হাসান ইত্যাদি হয় তাহলে অর্থ দাড়ায় হুসাইনের আবেদ বা ইবাদতকারী, হুসাইনের সাজদাকারী; প্রকাশ্য অর্থে তা হারাম। এভাবে আবেদ মুহাম্মাদ/আহমাদ, সাজ্জাদ আহমাদ/মুহাম্মাদ ইত্যাদি নাম অর্থের দিক থেকে হারাম যদি তা সম্বন্ধ পদের হয়। অন্য নিয়াতে হলে সে বিচার করবেন আল্লাহ তা'আলা।

নামের শেষে অকারণে অন্য একটা পূর্ণাঙ্গ নাম যুক্ত করলে অধিকাংশ ক্ষেত্রে আপত্তিজনক, অর্থহীন, হাস্যকর হতে পারে। খলীলুর রাহমান অর্থাৎ আর-রাহমান বা আল্লাহর বন্ধু। আল্লাহ তা'আলা একমাত্র ইবরাহীমকেই (আঃ) এই উপাধিতে ভূষিত করেছেন। অন্য কোন নাবীকেও এই লাকব দেননি। সাধারণ মানুষ কিভাবে সে নাম গ্রহণ করতে পারে? এ নাম অন্য কোন বান্দার জন্য যথার্থ নয়। কেহ যদি নাম রাখে সাদীকুর রহমান (আল্লাহর সাথী) তা আপত্তিজনক; কিন্তু সিদ্দীকুর রহমান (আল্লাহর প্রতি গভীর বিশ্বাসী) নাম পছন্দনীয়। এ জন্য নামকরণে অর্থ জানা প্রয়োজন। নামের শেষে 'নাহার' (দিন) যোগে নাম হল কামারুন্নাহার অর্থ দিনের চাঁদ। দিনের বেলায় চাঁদের উদয় দেখেছে কি কেহ কখনও। মেয়ের নাম শামসুন্নাহার (দিনের সূর্য)। সূর্যকে পৌরুষ ও বীর্যতার প্রতীক হিসাবে ধরা হয় যা পুরুষ নামের জন্য সামঞ্জস্যপূর্ণ। কোন মেয়ের এ ধরণের নাম কতটুকু যুক্তিযুক্ত? তাই অর্থহীন, আপত্তিজনক, উদ্ভট, অতি বিশেষণমূলক নিষিদ্ধ নামের পাপ থেকে রক্ষাকবচ হল নামের শেষে পিতার নামের সংযুক্তি। তা হলে নামের সাথে অন্য একটা নাম যোগ করার প্রয়োজন হয়না। ফলে এ ধরণের নামের উৎপত্তি হবেনা।

ইদানীং নামকরণের প্রবণতা লক্ষ্য করা যাচ্ছে যে, এমন নাম চাই যা কারও নেই, অন্তত পাড়ায় বা মহল্লায় নেই, কোথাও মিলবেনা। প্রতিযোগিতামনস্ক মধ্যবিত্তের অনন্য হবার সাধ স্বপ্ন এভাবেই উদ্ভট, বিচিত্র, দুর্বহ নামকরণকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। এই প্রবণতা বাড়তে বাড়তে কখনও কখনও অর্থহীনতায় পর্যবসিত হয়। মেয়ের নাম রাখা হল অনিকেতা, জারিনা, রুবিনা রোজিনা- তা নাকি শুনতে ভাল এবং এ নাম কোথাও কেহ রাখেনি। এভাবে পিতা-মাতা প্রতিবেশীকে, পরিচিত মহলকে টেক্কা দিতে গেলেন বটে; কিন্তু ভেবে দেখলেন না নামটার মানে কী হল, একটি মেয়ের পক্ষে তা বাঞ্ছনীয় হলো কিনা? এই করতে গিয়েই নাম রাখা হয়েছে নিভা যার কোন অর্থ হয়না যা কামারুন্নাহার (দিনের চাঁদ) এর মতো হাস্যকর। মেয়ের নাম 'শেলী'-এমন কি শুনতে ভাল 'মমি'র মতো বিষন্ন নামও শোনা যায়। এসব নাম শ্রুতিসুখদ, কিন্তু বরণীয় নয়।

নামকরণের ক্ষেত্রে গোটা কতক সাধারণ ইসলামী উসূল (নিয়মাবলী) মেনে চললে হাস্যকর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়না। এ যুগে রাজা-বাদশা যখন সব দেশেই অন্তর্হিত, তখন শাহ আলম (জগতের বাদশা), জাহাঙ্গীর (জাহানের বা জগতের করায়ত্তকারী), শাহ জাহান (জগতের সম্রাট) ইত্যাদি নাম নিয়ে টানাটানি করে লাভ নেই। স্বর্ণই যখন অধিকাংশ লোকের ধরা ছোঁয়ার বাইরে তখন আলমাস (হীরা), মারজান (মুক্তা, প্রবাল) ইত্যাদি নামকরণ অলীক নয় কি? মোট কথা অবাস্তব, কাল্পনিক, অতি বিশেষণমূলক নামকরণ না করাই ভাল। জানি স্নেহ অন্ধ, কল্পনা বল্লাহীন; কিন্তু তারও একটা কান্ডজ্ঞান ও মাত্রাজ্ঞান থাকা প্রয়োজন। 'আরাবী ভাষায় অজ্ঞতার কারণে আপত্তিকর ক্ষেত্র বিশেষে হারাম, শির্কী এবং বিশেষণের সবিশেষ এবং হাস্যকর নাম প্রচলনের হঠকারিতা দেখা যায়। নামকরণের পূর্বে আলেমদের নিকট থেকে নামের অর্থ পরিজ্ঞাত হওয়া কিংবা দলীল সমৃদ্ধ কোন বই দেখে নাম নির্বাচন করলে অপ্রীতিকর পরিস্থিতির উদ্ভব হবেনা।

গোসল প্রসঙ্গ

১। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সালাতের উযূর ন্যায় উযূ করতেন। [বুখারী/২৭০]

২। উযূর শুরুতে 'বিসমিল্লাহ' বলতে হয়। [ইব্ন মাজাহ/৩৯৯]

৩। মাইমূনা (রাঃ) বলেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জন্য পর্দা করেছিলাম, আর তিনি জানাবাতের (অপবিত্রতার) গোসল করেছিলেন। তিনি প্রথমে দু'হাত ধৌত করলেন। তারপর ডান হাত দিয়ে বাম হাতে পানি নিয়ে লজ্জাস্থান এবং যেখানে কিছু লেগে ছিল তা ধুইয়ে ফেললেন। তারপর মাটিতে বা দেয়ালে হাত ঘষলেন এবং দু'পা ছাড়া সালাতের উযূর মতই উযূ করলেন। তারপর তাঁর সমস্ত শরীরে পানি পৌঁছালেন। তারপর একটু সরে গিয়ে দু'পা ধুইলেন। [বুখারী/২৭৭]

৪। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের কারো জানাবাতের গোসলের প্রয়োজন হলে সে দু'হাতে পানি নিয়ে তিনবার মাথায় ঢালত। পরে হাতে পানি নিয়ে ডান পাশে তিনবার এবং আবার অপর হাতে পানি নিয়ে বাম পাশে তিনবার ঢালত। [বুখারী/২৭৪)]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমুহ দেখুন ঃ [বুখারী/২৭৬, মুসলিম/৫০৭, ৬৩৫, ৬৪১, ৬৪৭, তিরমিযী-১০৫, ৬০৫, ৯৯৩, নাসাঈ/২৩৪]

◻ উপরোক্ত হাদীসের বর্ণনা মোতাবেক গোসল না করলে পবিত্র হওয়া যাবেনা। ফলে অপবিত্র অবস্থায় যদি ইবাদাত করা হয় তা আল্লাহর দরবারে কবূল হবেনা। তাই মুসলিম হিসাবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেখানো পদ্ধতিতে গোসল করাই উত্তম/কাম্য।

অজানা অবস্থায় কাপড়ে নাপাকি নিয়ে বা ফার্য গোসল না করেই সালাত আদায় করা প্রসঙ্গ

১। হে আমাদের পালনকর্তা! আমরা যদি ভুলে যাই বা ভুলক্রমে কোন কিছু করে ফেলি তাহলে আমাদেরকে পাকড়াও করবেননা। [সূরা বাকারা-২৮৬]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্রতা ব্যতীত কোন সালাত কবূল করা হবেনা। [মুসলিম/৪২৬]

৩। সালাত সম্পন্ন করার পর জানা গেলে যে, কাপড়ে নাপাকি ছিল। অথবা কাপড়ে নাপাকি থাকার কথা আগে থেকেই জানতো, কিন্তু ভুলে গেছে, সালাত শেষ হওয়ার পর সে কথা স্মরণ হল। এ অবস্থায় তাদের সালাত বিশুদ্ধ হবে। পুনরায় সালাত আদায় করার দরকার নেই। কেননা সে তো এই নিষিদ্ধ কাজে লিপ্ত হয়েছে না জেনে অথবা ভুলক্রমে। [আবূ দাউদ/৩৮৮]

৪। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুতা পায়ে দিয়ে সালাত আদায় করছিলেন, কিন্তু তাতে ছিল নাপাকি। তিনি তা জানতেননা। জিবরাঈল (আঃ) সে ব্যাপারে তাঁকে অবহিত করলে সালাত অবস্থায়ই তিনি তা খুলে ফেলেন। [আবূ দাউদ/৬৫০]

এ ক্ষেত্রে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) নতুন করে সালাত আদায় করেননি। এ থেকে প্রমাণিত হয়, সালাত অবস্থায় যদি নাপাকির ব্যাপারে জানতে পারে তাহলে সালাত অবস্থায়েই তা বিদূরিত করার চেষ্টা করবে, যদি তা বিদূরিত করতে গিয়ে সতর ঢেকে রাখার ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হয়। অনুরূপভাবে যদি ভুলে যায়, আর সালাত রত অবস্থায় তা স্মরণ হয় তাহলে সতরের ক্ষেত্রে কোন অসুবিধা না হলে সালাত ছেড়ে না দিয়েই উক্ত কাপড় খুলে ফেলবে। কিন্তু যদি সালাত শেষ হওয়ার পর স্মরণ হয় বা নাপাকি সম্পর্কে জানতে পারে তাহলে সালাত বিশুদ্ধ হবে, পুনরায় আদায় করার দরকার হবেনা। কেহ যদি ভুলক্রমে উযূ না করে সালাত আদায় করে এবং সালাত শেষে স্মরণ হয় যে, সে বিনা উযূতে সালাত আদায় করেছে তখন তার উপর যরুরী হচ্ছে উযূ সম্পাদন করে পুনরায় সালাত আদায় করা।

⊙ অনুরূপভাবে কেহ যদি অজ্ঞতাবশত বা ভুলক্রমে শরীরে নাপাকি নিয়ে সালাত আদায় করে, অতঃপর কাপড়ে বীর্য দেখে জানতে পারে বা নাপাকির কথা স্মরণ হয় তাহলে যত রাকা'আত সালাত সে অপবিত্রাবস্থায় আদায় করেছিল সবই পুনরায় আদায় করবে [আবূ দাউদ/২৩৫]।

হায়িয প্রসঙ্গ

১। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের কারও হায়িয হলে, পবিত্র হওয়ার পর রক্ত রগড়িয়ে পানি দিয়ে কাপড় ধুইয়ে সেই কাপড়েই সালাত আদায় করতাম। [বুখারী/৩০২]

২। হায়িয দেখা দিলে সালাত ছেড়ে দাও, আর হায়িযের সময় শেষ হয়ে গেলে রক্ত ধুইয়ে নাও এবং সালাত আদায় কর। [বুখারী/৩২৪-আয়িশা (রাঃ)]

৩। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা বাকারা-২২২, বুখারী/২৯৩, ৩১৫, নাসাঈ/২৭৫, মুসলিম/৬৫৪, তিরমিযী/১৩৫।

⧉ আমাদের বর্তমান সমাজের মা-বোনেরা উপরোক্ত হাদীসগুলি লক্ষ্য করুন ঃ

(ক) কখন আপনাদের সালাত আদায় করা নিষেধ এবং কোন সময়ে পুনরায় সালাত আরম্ভ করতে হবে তার নির্দেশ দেয়া আছে।

(খ) হাদীসের নির্দেশ মোতাবেক মহিলারা সালাত আদায় না করলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অমান্য করা হবে।

(গ) ঋতু সম্পর্কীত মাস'আলা-মাসায়েল না জানার কারণে মহিলারা সালাতের (নামাযের) ব্যাপারে অনেক ভুল করে। অথচ কেহ যদি কোন ওয়াক্তের সালাতের সামান্য সময় থাকতে পবিত্র হয়, যে সময়টুকুতে গোসল করে এসে সালাতের এক রাক'আত আদায়ের সময় পায় তাহলেও তার উপর সেই ওয়াক্তের সালাত ফারয হয়ে যায়। আদায় না করলে সেই ওয়াক্তের সালাত তার দায়িত্বে থেকে যায়। ⊙ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উদয়ের পূর্বে ফাজর সালাতের এক রাক'আত পায় সে ফাজর সালাত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্তের পূর্বে আসর সালাতের এক রাক'আত পায় সে আসরের সালাত পেল। [বুখারী/৫৫০]। আর সালাতের শেষ সময়ে কারো ঋতু রক্ত বন্ধ হয়ে গেলে সে গোসল করতে গড়িমসি করায় যদি সালাতের ওয়াক্ত পার হয়ে যায় তাহলে সালাত কাযা করার দায়ে কবীরা গুনাহ হবে। এ থেকে রক্ষা পাওয়ার একমাত্র উপায় হচ্ছে ঋতু সম্পর্কীত মাস'আলা মাসায়েল ভালভাবে জেনে নেয়া। তা দুইভাবে হতে পারে। ওলামায়ে কেরাম থেকে জিজ্ঞেস করে অথবা সহীহ হাদীস অধ্যয়নের মাধ্যমে ।

সালাতের সময় হওয়ার পর হায়িয/ঋতু শুরু হলে তখন করণীয় প্রসঙ্গ

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

فَإِذَا قَضَيْتُمُ الصَّلاَةَ فَاذْكُرُواْ اللّهَ قِيَاماً وَقُعُوداً وَعَلَى جُنُوبِكُمْ فَإِذَا اطْمَأْنَنتُمْ فَأَقِيمُواْ الصَّلاَةَ إِنَّ الصَّلاَةَ كَانَتْ عَلَى الْمُؤْمِنِينَ كِتَاباً مَّوْقُوتاً

নিশ্চয়ই নির্দিষ্ট সময়ে সালাত আদায় করা মু'মিনদের উপর ফারয করা হয়েছে। [সূরা নিসা-১০৩]

২। যে ব্যক্তি সূর্যাস্তের পূর্বে আসরের এক রাক'আত সালাত আদায় করতে পারল সে আসর সালাত পেয়ে গেল। [বুখারী/৫৪৫]

৩। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ হায়িযের সময় আমাদেরকে কেবল সিয়াম (রোযা) কাযা করার নির্দেশ দেয়া হত, সালাত কাযা করার নির্দেশ দেয়া হতনা। [মুসলিম/৬৫৪, বুখারী/৩১৫]

⧉ সালাতের সময় শুরু হওয়ার পর যদি কোন নারীর ঋতুস্রাব শুরু হয়, যেমন উদাহরণ স্বরূপ যুহরের সালাত শুরু হওয়ার আধঘণ্টা পর ঋতুস্রাব আরম্ভ হল

তাহলে পবিত্র হওয়ার পর এ ওয়াক্তের সালাত কাযা আদায় করবে। কেননা সে পবিত্র থাকাবস্থায় তার উপর সালাত আদায় করা আবশ্যক হয়েছিল।

কোন নারী যদি এমন সময় পবিত্র হয় যখন সালাতের এক রাক'আত বা ততোধিক রাক'আত আদায় করা সম্ভব, তখনই সে সেই সালাত আদায় করে নিবে। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেন ঃ যদি আসরের শেষ সময়ে পবিত্র হয় এবং সূর্যাস্তের জন্য এতটুকু সময় অবশিষ্ট থাকে যখন এক রাক'আত সালাত আদায় করা সম্ভব, অথবা সূর্যোদয় হওয়ার পূর্বে পবিত্র হয় যখন কমপক্ষে ফাজরের এক রাক'আত সালাত আদায় করা সম্ভব, তাহলে উভয় অবস্থায় তাকে গোসল করার পর আসর বা ফাজরের সালাত আদায় করা উচিৎ।

প্রস্রাব-পায়খানা করার নিয়মাবলী

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইসতিনজায় পানি ব্যবহার করতেন। [বুখারী/২১৭]

২। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের স্বামীদের পানির সাহায্যে শৌচক্রিয়া সম্পাদন করতে বলবে, আমি নিজে তাদের সে কথা বলতে লজ্জাবোধ করি যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও এরূপ করতেন। [তিরমিযী/১৯, নাসাঈ/৪৬]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ [বুখারী/১৪৪, ১৫৫, ১৬২, ২১৮, ২২২, ৩৮৬, মুসলিম/৪৫১, ৪৯৭, ৫০১, ৫০৬, ৫০৯, ৫৫৩, ৫৬৮, ৭১৫, নাসাঈ/১৯, ২০, ৩১, ৩৪, ৩৬, ৪০, ৩০৫, ইব্‌ন মাজাহ/৩০০, ৩৪২, ৩৪৮, আবূ দাউদ/৩৭৭, তিরমিযী/১৪২।

⧉ প্রচুর পানি থাকার পরও ঢিলা কুলুখ ব্যবহার করার কথা কোন সহীহ হাদীসে নেই। তদুপরি আমাদের সমাজের পুরুষ লোকেরা ঢিলা কুলুখ নিয়ে পায়খানা/প্রস্রাবখানা থেকে বের হয়ে নির্লজ্জের মত কাপড়ের নীচে হাত রেখে রাস্তায় জনসম্মুখে হাঁটাহাঁটি, পা কুচি মারা, কুথ ও কাঁশির মাধ্যমে অন্যের দৃষ্টি আকর্ষন করার মত বেহায়াপনার আচরণ করতে দেখা যায়। শোনা যায়, যত বৎসর বয়স, তত কদম নাকি হাঁটা চাই। আরও শোনা যায়, এ ঢিলা নাকি হাশরের দিন সাওয়াবের পাল্লায় রাখা হবে। এই সমস্ত অর্থহীন কথাবার্তা আল্লাহ তা'আলার দীন ইসলামের অন্তর্ভুক্ত নয়। এ সব কথা ইসলাম বিকৃতির নামান্তর।

আরও বলা হয়ে থাকে, পুরুষের প্রস্রাব করার পরও ২/১ ফোটা প্রস্রাব ভিতরে আটকে থাকে এবং তা কিছুক্ষণ পর বের হয়ে শরীর ও কাপড় নাপাক করে দেয়। তাই ঢিলা নিয়ে বিভিন্ন কায়দায় লজ্জার মাথা খেয়ে বহু কসরত করে আটকে থাকা ২/১ ফোটা প্রস্রাব বের করে আনে। বলা হয়, প্রস্রাবের ফোটা এমনি আটকে না, শাইতান সালাত নষ্ট করার জন্য আটকে রাখে।

প্রস্রাব-পায়খানার পূর্বে আমরা যখন মহান আল্লাহর নিকট **খুবুছ খাবায়েছ নামক** শাইতান হতে পানা চাই (আল্লাহুম্মা ইন্নী আউযুবিকা মিনাল **খুবুছি ওয়াল** খাবায়িছ) তখন তো আর শাইতানের কোন প্রভাব থাকতে পারেনা। [বুখারী/১৪৪]

প্রস্রাব করার পর কিছু পরিমাণ প্রস্রাব ভিতরে আটকে থাকে কি থাকেনা, পরে বের হয় কি হয়না, এটাকি মহান আল্লাহর অজানা? আল্লাহ সব কিছু জেনে শুনেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মাধ্যমে প্রস্রাব-পায়খানা হতে পবিত্রতা অর্জনের বিধান আমাদেরকে জানিয়ে দিয়েছেন।

ঢিলা নিয়ে এই কসরত কার আদেশে করা হচ্ছে? নিশ্চয়ই আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশে নয়। সাবধান! অন্যের আদেশ মান্য করলে আমরা সত্য প্রত্যাখ্যানকারী রূপে গন্য হব।

উযূ সম্পর্কীত

১। আল্লাহ বলেন ঃ হে মুমিনগণ! যখন তোমরা সালাতের জন্য প্রস্তুত হবে তখন তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত কনুই পর্যন্ত ধৌত করবে এবং তোমাদের মাথা মাসাহ করবে এবং পা গ্রন্থি পর্যন্ত ধৌত করবে। [সূরা মায়িদা-৬]

২। সেই ব্যক্তির সালাত হয়না, যার উযূ নেই। [ইব্ন মাজাহ/৩৯৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৩। যে ব্যক্তি আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক উযূ সম্পন্ন করবে তার পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের মধ্যবর্তী সময়ের পাপসমূহের জন্য তা কাফফারাস্বরূপ গণ্য হবে। [নাসাঈ/১৪৫]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কিভাবে উযূ করতেন ঃ 'আবদুল্লাহ ইব্ন যাইদ (রাঃ) বললেন ঃ তিনি (রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পানি আনালেন। হাতের উপর পানি ঢেলে দু'বার তাঁর হাত ধুইলেন। তারপর কুলি করলেন এবং তিনবার নাকে পানি দিয়ে ঝেড়ে পরিষ্কার করলেন। এরপর মুখমন্ডল তিনবার ধুইলেন। তারপর দু'হাত কনুই পর্যন্ত দু'বার করে ধুইলেন। তারপর দু'হাত দিয়ে মাথা মাসাহ করলেন। অর্থাৎ হাত দু'টি দ্বারা মাথার সম্মুখভাগ থেকে শুরু করে উভয় হাত পিছন পর্যন্ত নিলেন। তারপর আবার মাথার পিছন থেকে মাসাহ করে উভয় হাত যেখান থেকে নিয়েছিলেন সেখানে ফিরিয়ে আনলেন। তারপর দু'পা ধুইলেন। [বুখারী/১৮৫, মুসলিম/৪৪৬, তিরমিযী/৩২, নাসাঈ/৯৮]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/১৩৪, ১৩৭, ১৩৮, ১৫৯, ১৬০, ১৬১, ২৪৫, ২৬৭, ২৮৪, মুসলিম/৪২৮, ৪৩১, ৪৩৯, ৪৪৪, ৪৬৭, ৪৬৯, ৪৭০, ৪৭৭, ৫০৭, ৫৮৬, ৫৯১, ৬৮৭, নাসাঈ/৯৫, ১৩৫, ১৪৯, ১৫১, ৩৪৪, তিরমিযী/৩, ২৭, ৩১, ৩৬, ৩৮, ৪১, ৫০, ৬৪, ৮২, ১১৪, ৬১১, ৯৯৩, আবূ দাউদ/১৭৩, ইব্ন মাজাহ/৪৩৯, ১২২২।

ক) উযু আরম্ভ করার সময় 'বিসমিল্লাহ' বলতে হবে [ইব্ন মাজাহ/৩৯৯]। উযূ করার মাঝে আর কোন দু'আ নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, উযু শেষ করে কালেমা শাহাদাৎ পড়তে হবে।

খ) বর্তমান সমাজের আলেম ও লোকদের মুখে খুবই প্রচলন আছে যে, মাথার এক চতুর্থাংশ পরিমান মাসাহ করা ফারয। কেহ বলেন হাতের তিন অঙ্গুলি পরিমান মাসাহ করলেই চলবে, কেহ কেহ বলেন, 'সম্পূর্ণ মাথা মাসাহ করা উযূর মুস্তাহাব, এটাই হচ্ছে সুন্নাত।

গ) উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও ক্রমিক নং-৪ এর হাদীসের নির্দেশ অমান্য করে ১/৪ ভাগ অথবা হাতের তিন অঙ্গুলি পরিমান মাথা মাসাহ ফারয মনে করা যুক্তিযুক্ত নয়।

উযূতে ঘাড় মাসাহ করা

১। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। [সূরা নিসা –১৪]

◻ উযূতে ঘাড় মাসাহ করার নির্দেশ কোন সহীহ হাদীসের কিতাবে নেই, এটা নতুন সংযোজন, ঘাড় মাসাহ করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অন্তর্ভুক্ত নয়, অনুগ্রহ করে এটা উযূর অংশ হিসাবে গ্রহণ করবেননা। কুরআন ও সহীহ হাদীসে শুধু মাথা মাসাহ করার কথা উল্লেখ আছে। ঘাড় মাসাহ করার কথা এমনকি সহীহায়িন এবং সুনানে আরবা হাদীস গ্রন্থেও উল্লেখ নেই।

তায়াম্মুম প্রসঙ্গ

১। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যদি পীড়িত হও অথবা সফরে থাক অথবা তোমাদের কেহ শৌচাগার (প্রস্রাব-পায়খানার স্থান) হতে আগমন করে, অথবা তোমরা স্ত্রীর সঙ্গে মিলিত হও এবং পানি না পাও তাহলে পবিত্র মাটি দ্বারা তায়াম্মুম করবে এবং তোমাদের মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ করবে। আল্লাহ তোমাদের কষ্ট দিতে চাননা, বরং তিনি তোমাদের পবিত্র করতে চান ও তোমাদের প্রতি তাঁর অনুগ্রহ সম্পূর্ণ করতে চান, যাতে তোমরা কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন কর। [সূরা মায়িদা-৬]

২। তায়াম্মুম করার সময় উভয় হাত মাটিতে মেরে তারপর তা ঝেড়ে ফেলে মুখমন্ডল একবার মাসাহ করতে হয় ও উভয় হাতের কব্জি পর্যন্ত প্রথমে বাম হাতের তালু দিয়ে ডান হাতের পিঠ মাসাহ করতে হবে। তারপর ডান হাতের তালু দিয়ে বাম হাতের পিঠ মাসাহ করতে হবে। [বুখারী/৩৪০, মুসলিম/৭০৪, ৭০৫-আবদুর রাহমান ইবন আবযা (রাঃ), তিরমিযী/১৪৪]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৩৩১, বুখারী/পরিচ্ছদ-২৩৫, মুসলিম/৭০৪, আবূ দাউদ/৩৩৬, ৩৩৮।

◻ হাতের কুনই হতে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগকে আরাবীতে বলে "যেরা"। কেহ কেহ কনুইসহ হাত মাসাহ করার পক্ষে। কেহ আবার হাত বলতে বগল পর্যন্ত হাত বুঝে, ফলে বগলসহ মাসাহ করার পক্ষে মতামত দিয়েছেন। হাদীসে আছে "মুখমন্ডল ও হাত মাসাহ করা"। কারও যুক্তি হল তায়াম্মুম যেহেতু উযূর পরিবর্তে আল্লাহ তা'আলার অনুগ্রহ, তাই উযূর মতই হাত কনুইসহ মাসাহ

করতে হবে বলে মতামত দেন। এমতাবস্থায় উপরোক্ত **ক্রমিক নং-২এর হাদীস** অনুযায়ী তায়াম্মুম করা সর্বোত্তম। আল্লাহই ভাল জানেন।

মোজার উপর মাসাহ

১। মুগীরা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে এক সফরে ছিলাম। (উযূ করার সময়) আমি তাঁর মোজাদ্বয় খুলতে চাইলে তিনি বললেন ঃ ও দু'টি থাকুক, আমি পবিত্র অবস্থায় ও দু'টি পরিধান করেছিলাম (উযূ করার পর অর্থাৎ উযূ থাকা অবস্থায়) এই বলে তিনি তার উপর মাসাহ করলেন । (হাতের অঙ্গুলি ভিজিয়ে পায়ের অঙ্গুলির মাথা হতে টাখনু পর্যন্ত টেনে মুছে ফেলাই হল মোজার উপর মাসাহ। (মোজা অবশ্যই পাক পবিত্র থাকতে হবে)। [বুখারী/২০৬, মুসলিম/৫২৩]

২। মোজার উপর মাসাহ করার সময়সীমা মুসাফিরের জন্য তিন দিন তিন রাত নির্দিষ্ট এবং মুকীমের জন্য একদিন এক রাত। [মুসলিম/৫৩০-শুরায়হ ইব্ন হানী (রঃ), নাসাঈ/১২৮ আলী (রাঃ)]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করার সময় কাপড়ের মোজার উপর মাসাহ করেছেন। [তিরমিযী/৯৯-মুগীরা ইব্ন শু'বা (রাঃ)]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/২০৫, মুসলিম/৫২৮, তিরমিযী/৯৬, ৯৯, নাসাঈ/১২৭, আবূ দাউদ/১৬২।

(ক) বর্তমান সমাজে অফিস/আদালতে যারা মোজা/জুতা পরিধান করেন তারা অনেক সময় পা ধৌত করার অসুবিধার কারণে সালাত আদায় করেননা।

(খ) তাছাড়াও কেহ কেহ ফাতওয়া দেন যে, সূতি মোজার উপর মাসাহ করা যাবেনা, যা সঠিক নয়। অবশ্যই যে কোন পবিত্র মোজার উপর মাসাহ করা যাবে।

মানবীয় অভ্যাস সম্পর্কীয়

১। দশটি কাজ ফিতরাতের (সৃষ্টিগত স্বভাব) অন্তর্ভুক্ত যথা ঃ গোঁফ (মোচ) খাটো করা, দাঁড়ি লম্বা রাখা, মিসওয়াক করা, নাকে পানি দেয়া, নখ কাটা, নাক ও কানের ছিদ্র এবং আঙ্গুলের গিরাসমূহ ধোয়া, বগলের পশম উপড়ে ফেলা, নাভির নিচের পশম কাটা এবং পানি দ্বারা ইসতিনজা করা। হাদীসের বর্ণনাকারী মুস'আব (রাঃ) বলেন ঃ দশম কাজটির কথা আমি ভুলে গেছি। সম্ভবতঃ সেটি হবে কুলি করা। [বুখারী/৫৪৫৫, ৫৪৫৬, ৫৪৫৭, মুসলিম/৪৯৫-আয়িশা (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/২৯৩]

২। আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ) বলেন ঃ আমাদের জন্য গোঁফ (মোচ) ছাঁটা, নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা এবং নাভির নিচের পশম কাটার সময় নির্ধারণ করে দেয়া হয়েছিল, তা চল্লিশ দিনের অধিক যেন না হয়। [মুসলিম/৪৯০]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৫৪৫৮, আবূ দাউদ/৪১৫০।

(ক) আমাদের দেশে বর্তমানে যারা ব্যবসা-বানিজ্য, চাকরি, রাজনীতি বা বিভিন্ন পেশায় উচ্চ শিখরে অবস্থান করছেন তাদের অধিকাংশই দাঁড়ি রাখেননা। প্রতিদিন দাঁড়ি সেভ করেন, কিন্তু গোঁফ কেহ কেহ রাখেন। তাতে দেখা যায় উপরোক্ত হাদীসের বিপরীতে গোঁফ বড় দেখা যায় এবং দাঁড়ি ছোটও দেখা যায়না।

(খ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাফির ও মুশরিকদের বিপরীত করবে ঃ তোমরা গোঁফ বেশী ছোট করবে এবং দাঁড়ি লম্বা রাখবে। [বুখারী/৫৪৫৯-ইব্‌ন উমার (রাঃ), ৫৪৬০]

(গ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মোচ ছোট করো এবং দাঁড়ি লম্বা করো, অগ্নি পুজকদের বিরোধিতা করো। [আহমাদ]

(ঘ) যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি মোচ কাটবেনা সে আমাদের সুন্নাতের উপর নেই। [আহমাদ]

(ঙ) তা ছাড়াও নখ কাটা, বগলের পশম উপড়ে ফেলা ও নাভির নিচের পশম ৪০ দিনের মধ্যে কাটার নির্দেশ থাকলেও আমরা অনেকেই তা না জানার কারণে অথবা অবহেলায় অমান্য করে চলেছি।

মহিলা/পুরুষদের সৌন্দর্য বৃদ্ধি করা প্রসঙ্গ

১। শরীরে উল্কি অঙ্কনকারিণী ও অঙ্কনপ্রার্থিণী নারী, কপাল, ভ্রুর চুল উৎপাটনকারিণী ও উৎপাটনকারী নারী এবং সৌন্দর্য সুষমা বৃদ্ধির মানসে দাঁতের মাঝে (সুদৃশ্য) ফাঁক সৃষ্টিকারিণী, আল্লাহর সৃষ্টিতে বিকৃতি সাধনকারিণী, এদের সবাইকে আল্লাহ তা'আলা লা'নত করেন। [বুখারী/৫৪৯৪, ৫৫০৫, ৫৫১১, মুসলিম/৫৩৮৮]

২। এক আনসারী তরুণীর বিয়ে হল। সে রোগাক্রান্ত হলে তার চুল পড়ে গেল। তখন তার পরিবারের লোকেরা তাকে পরচুলা লাগানোর ইচ্ছা করল। তাই তারা এ বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে জিজ্ঞেস করল। তিনি তখন চুল সংযোজনকারিণী ও সংযোজনপ্রার্থী নারীকে লা'নত করলেন। [বুখারী/৫৪৯৬, মুসলিম/৫৩৮৫-আয়িশা (রাঃ)]

৩। মাক্কা বিজয়ের দিন আবূ কুহাফাকে (রাঃ) নিয়ে আসা হল, তাঁর চুল-দাঁড়ি ছিল সাদা। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ ওটা কোন কিছু দিয়ে পরিবর্তন করে দাও, তবে কাল রং বর্জন করবে। [মুসলিম/৫৩৩১-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

৪। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা নূর-৫৪, আলে ইমরান-৩১, মুসলিম/৫৩৩২, ৫৩৯৭, তিরমিযী/২৮১১, বুখারী/৩২০৮, আবূ দাউদ/৪১৪৭, ৪১৫৫, ৪১৫৭, ইব্‌ন মাজাহ/৩৭২।

(ক) আমাদের বর্তমান সমাজে প্রায়ই মহিলাদেরকে দেখা যায় কপাল ও ভ্রুর চুল উৎপাটন করে ও পরচুলা ব্যবহার করে, যা উপরোক্ত সহীহ হাদীসের বিপরীত কাজ।

(খ) অনেক সময় পুরুষ ও মহিলাদেরকে তাদের পোশাক ও চুল দেখে চিনা খুবই কষ্ট হয়ে যায়।

কুকুর এবং বিড়াল পালন প্রসঙ্গ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পশুচারণে পাহারা কিংবা শিকারের উদ্দেশে অথবা শস্যক্ষেত পাহারা দেয়ার কাজে নিয়োজিত কুকুর ছাড়া যে ব্যক্তি অন্য কোন কারণে কুকুর পালন করবে তার সাওয়াব থেকে প্রতিদিন এক কিরাত করে সাওয়াব হ্রাস পাবে। [মুসলিম/৩৮৮৭, তিরমিযী/১৪৯৬- আবু হুরাইরা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৩২০৪, বুখারী/৩০৮২] (এক কিরাত হল উহুদ পাহাড়ের সমান)

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুকুর ও বিড়ালের মূল্য গ্রহণ করতে নিষেধ করেছেন। [আবূ দাউদ/৩৪৪৩-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/১৭৩, মুসলিম/৫৩৯, ৫৪৪, ৫৩৬৪।

(ক) বর্তমানে শিক্ষিত সমাজে ও বড় বড় শহর এলাকার মুসলিম লোকেরা সখের বশবর্তী হয়ে বিভিন্ন নামী-দামী বিদেশী কুকুর লালন-পালন করেন এবং ওগুলি নিয়ে সকাল-বিকাল হাটা-হাটি করেন।

(খ) তাছাড়াও শহরের বিভিন্ন এলাকায় কুকুর, বিড়াল বেচা-কেনার দোকানও আছে, যা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী।

মিসওয়াক ব্যবহার প্রসঙ্গ

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের জন্য যদি কষ্টকর মনে না করতাম তাহলে প্রতিবার উযূর সময় অথবা প্রত্যেক সালাতের সময় আমি তাদের মিসওয়াক করার নির্দেশ দিতাম। [বুখারী/অনুঃ ৮৫৬, মুসলিম/৪৮০, নাসাই/৫, তিরমিযী/২২, ২৩, ইব্‌ন মাজাহ/২৮৭, নাসাঈ/৭]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/২৪৩, ২৪৪, ৮৫৭, মুসলিম/৪৮৪, নাসাঈ/২, ৩, ৮।

আমরা (পুরুষ/মহিলা) মাসজিদে/বাসায় মুসলিম হিসাবে প্রতিদিন সালাত আদায় করি। ১০০ জনের মধ্যে ৯০ জন লোকই উযূর সময়/সালাতের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করিনা। আমাদের উচিত প্রত্যেক উযূ বা সালাতের সময় মিসওয়াক ব্যবহার করা।

মুসলিমদের পোশাক, টুপি ও পাগড়ী প্রসঙ্গ

১। হে আদম সন্তান! আমি তোমাদেরকে পোষাক-পরিচ্ছদ দিয়েছি তোমাদের লজ্জাস্থান আবৃত করার জন্য এবং শোভা বর্ধনের জন্য। আর তাকওয়ার পোশাক হচ্ছে সর্বোত্তম পোশাক। ওটা আল্লাহর নিদর্শনসমূহের মধ্যে একটি যাতে তারা উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা আরাফ-২৬]

২। হে আদম সন্তান! প্রত্যেক সালাতের সময় তোমরা সাজসজ্জা গ্রহণ কর, আর খাও, পান কর কিন্তু অপচয় করনা, অবশ্যই আল্লাহ অপচয়কারীদেরকে পছন্দ করেননা। [সূরা আ'রাফ-৩১]

৩। তোমরা আমার এ জামাটি (কামিজ) নিয়ে যাও এবং এটা আমার পিতার মুখমন্ডলের উপর রেখ, তিনি দৃষ্টি শক্তি ফিরে পাবেন, আর তোমরা তোমাদের পরিবারের সকলকেই আমার নিকট নিয়ে এসো। [সূরা ইউসুফ-৯৩]

৪। এক কাপড় পরে সালাত আদায় করার সময় উভয় কাঁধ আবৃত না করে সালাত আদায় করা নিষেধ। [বুখারী/৩৫২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্নিত ঃ এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে দাঁড়িয়ে এক কাপড়ে সালাত আদায়ের হুকুম জিজ্ঞেস করল। তিনি বললেন ঃ তোমাদের প্রত্যেকের কাছে কি দু'খানা করে কাপড় আছে? এরপর এক ব্যক্তি উমারকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ আল্লাহ যখন তোমাদের সামর্থ্য দিয়েছেন তখন তোমরাও নিজেদের সামর্থ্য প্রকাশ কর। লোকেরা যেন পুরো পোশাক একত্রে পরিধান করে অর্থাৎ মানুষ তহবন্দ (লুঙ্গি) ও চাদর, তহবন্দ ও জামা (কামিজ), তহবন্দ ও কা'বা, পাজামা ও চাদর, পাজামা ও জামা (কামিজ), পাজামা ও কাবা পরে সালাত আদায় করে। [বুখারী/৩৫৮]

৬। ইযারের (কাপড়, লুঙ্গি, পাজামা, প্যান্ট ইত্যাদি) যে পরিমাণ টাখনুর নিচে যাবে, সেই পরিমাণ জাহান্নামে যাবে। [বুখারী/৫৩৫৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন শরীরের এক পাশ খোলা রেখে অন্য পাশ ঢেকে কাপড় পরিধান করতে। আর এক কাপড়ে পুরুষকে এমনভাবে ঢেকে বসতে যাতে তার লজ্জাস্থানের উপর ঐ কাপড়ের কোন অংশ থাকেনা। [বুখারী/৫৩৯২-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রেশমের পোশাক এবং স্বর্ণ ব্যবহার আমার উম্মাতের পুরুষদের জন্য হারাম এবং মেয়েদের জন্য তা হালাল করা হয়েছে। [তিরমিযী/১৭২৬-আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)]

৯। আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ) বলেছেন ঃ এক ব্যক্তি বলল ইয়া রাসূলুল্লাহ ! মুহরিম লোক কি কি পোশাক পরবে? রাসূলুল্লাহ (সাঃ) বললেন ঃ তোমরা ইহরাম অবস্থায় জামা (কামিজ), পাগড়ী, পাজামা, টুপি ও মোজা পরবেনা। তবে যে ব্যক্তির জুতা নেই, সে কেবল মোজা পরতে পারবে। কিন্তু উভয় মোজা টাখ্‌নুর নীচ থেকে কেটে ফেলবে। আর যাফরান ও ওয়ারস রং যাতে লেগেছে এমন কাপড় পরিধান করবেনা। [বুখারী/৫৩৭৪, ৫৩৭৭]

১০। যে ব্যক্তি গর্ব ও অহংকার প্রকাশের জন্য পোশাক পরিধান করে, কিয়ামাতের দিন আল্লাহ তাকে ঐ ধরনের পোশাক পরাবেন, এরপর তাতে জাহান্নামের আগুন লাগিয়ে দিবেন। [আবূ দাউদ/৩৯৮৭-ইব্‌ন উমার (রাঃ)]

১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মহিলাদের পোশাক পরিধানকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের পোশাক পরিধানকারিণী মহিলাদের উপর লা'নত করেছেন। [আবূ দাউদ/৪০৫৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৫৪৫২]

১২। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'ধরনের পোশাক পরতে নিষেধ করেছেন। প্রথমতঃ শরীরের সাথে কাপড় এমনভাবে লেপ্টে থাকে যাতে শরীরের ভাঁজ দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ এমনভাবে কাপড় পরা যাতে সতর খোলা থাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়)। [ইব্‌ন মাজাহ্/৩৫৬১]

১৩। উম্মে সালমাকে (রাঃ) প্রশ্ন করা হল যে, মহিলারা কি কি বস্ত্র পরিধান করে সালাত আদায় করবে? তিনি বলেন ঃ ওড়না এবং জামা পরিধান কর, যা দ্বারা পায়ের পাতাও ঢেকে যায়। [আবূ দাউদ/৬৩৯-মুহাম্মাদ ইব্‌ন কুনফুয]

১৪। আয়িশা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা ওড়না ছাড়া সালাত (নামায) আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে কবূল হবেনা। [বুখারী/৩৬৫, আবূ দাউদ/৬৪১]

১৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দনীয় পোষাক ছিল কামিজ। [আবূ দাউদ/৩৯৮৪]

১৬। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/১৬৯, ৩৫৪, ৩২৩১, ৫৩৫৯, মুসলিম/১৯৫, ৬৫৯, ৫২১৫, ৫২৮৪, ৫২৯২, ৫৩২৯, তিরমিযী/১৭৩৬, ১৭৯০, ২৮১০, ২৮১৭, নাসাঈ/২৫৬৬, ইব্‌ন মাজাহ/৩৫৬৭, ৩৫৭৩, ৩৬০৫, ৩৬১৬, আবূ দাউদ/৬৩৮, ৩৯৮৯, ৪০১৭, ৪০৫০ ।

◻ আল্লাহর নির্দেশপ্রাপ্ত হয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে সমস্ত কাজের আদেশ কিংবা নিষেধ করেছেন, অহীর নির্দেশানুযায়ী নিজে করেছেন, অন্যের কাজে সম্মতি দিয়েছেন ঐগুলিই হল দীন ইসলামে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত, যা সমস্ত মু'মিন মুসলিমকে মানতে হবে। পোশাক পরিধান করা মানব সভ্যতার একটি অংশ। সব সভ্য মানুষই পোশাক পরিধান করে থাকে। তবে দেশভেদে বিভিন্ন দেশের পোশাক বিভিন্ন হয়ে থাকে। আরাব দেশে যে পোশাক পুতুল পুঁজারী, নাসারা, ইয়াহুদী, কাফির, মুশরিকরা পরিধান করত, দেশীয় প্রচলিত পোশাক হিসাবে আমাদের নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও তা পরিধান করতেন। অহীপ্রাপ্ত হওয়ার পর আমাদের নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পুরাতন পোশাক ছেড়ে দিয়ে নতুন নিয়মের, নতুন ডিজাইনের কোন পোশাকের ব্যাপারে আদিষ্ট হয়ে তা পরিধান করতে শুরু করেননি। নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নাবুওয়াত প্রাপ্তির পূর্বে ৪০ বৎসর ধরে যে পোশাক পরিধান করেছেন নাবুওয়াত প্রাপ্তির পরও তিনি তা জীবনের বাকী ২৩টি বৎসর পরিধান করে গেছেন। তিনি নিজের জন্য কিংবা তাঁর সাহাবী অথবা উম্মাতের জন্য কোন নির্দিষ্ট ধরণের পোশাক নির্ধারণ করে দেননি। কারণ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা সমগ্র মানব জাতির জন্য রাসূল করে পাঠিয়েছেন। তাই নির্দিষ্ট পোশাক আল্লাহ তাঁর বান্দাদের জন্য নির্ধারণ করে দেননি। নির্দিষ্ট কোন দেশের পোশাক অন্য কোন দেশের জন্য ব্যবহারযোগ্য নাও হতে পারে। এ দেশের এক শ্রেণীর মানুষের/মৌলভীদের

পরিধানকৃত পাঞ্জাবী যদি সুন্নাতী পোশাক হিসাবে ধরে নেয়া হয় তাহলে সাইবেরিয়ার মত শীত প্রধান এলাকার লোকদের জন্য এ পোশাক মৃত্যু ডেকে আনত। আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক মৌলভী/ধর্মান্ধ লোক বহু ক্ষেত্রেই সহীহ হাদীসে বর্ণনা থাকা সত্ত্বেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বহু আদেশ নিষেধ মানেননা। অথচ পোশাকের মধ্যে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত আবিস্কার করেন। লম্বা কলিদার কোর্তা/পাঞ্জাবীকে তারা সুন্নাতী পোশাক বলে দাবী করেন।

স্বাধীনতা পূর্বকালে হিন্দু জমিদাররা পাঞ্জাবী পরিধান করত। বর্তমানেও ভারতের হিন্দু রাজনীতিবিদসহ অনেক অমুসলিম ভারতবর্ষের পোশাক হিসাবে পাঞ্জাবী পরিধান করে । ১৪০০ বৎসর পূর্বে আরাবের কোথাও পাঞ্জাবীর প্রচলন ছিলনা কিংবা বর্তমানেও এর প্রচলন নেই। তাই পাঞ্জাবীকে সুন্নাতী পোশাক বলে চালিয়ে দিতে চাইলে তা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা অপবাদ দেয়া হবে। ⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে আমার প্রতি সেচ্ছায় মিথ্যা আরোপ করে সে যেন তার স্থান জাহান্নামে করে নেয়। [বুখারী/১০৭]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ভিক্ষা করা পছন্দ করতেননা। কিন্তু ভিক্ষুকরা তথাকথিত মৌলভীদের সুন্নাতী পোশাক পাঞ্জাবী ও টুপিকে ভিক্ষাবৃত্তির উপায়/মাধ্যম বানিয়ে নিয়েছে। আমাদের দেশের অনেক মৌলভী সাহেবকে দেখা যায় তথাকথিত এই সুন্নাতী পোশাক নামক পাজামা, পাঞ্জাবী, টুপি পরিধান করে মিলাদ, শবে বরাত, চল্লিশা, শাবীনা খতম, কুরআনখানী ইত্যাদি নামে বিদ'আতী কাজ চালিয়ে যাচ্ছেন। তাদের এই অনৈসলামিক পোশাককে ইসলামী খেতাবী করণের ফলে ইসলামের ফাযীলাত ও বারাকাত কমে যাওয়ায় তথাকথিত কতিপয় বুদ্ধিজীবি নাস্তিকরাও ঢালাওভাবে তথাকথিত সুন্নাতী পোশাকধারীদেরকে ফাতওয়াবাজ, মৌলবাদী ইত্যাদি বলে কটাক্ষ করার সাহস পাচ্ছে।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সময় আরাব দেশে মুসলিমদের সংখ্যা ছিল খুবই কম। মুসলিম, ইয়াহুদী,-খৃষ্টান, মূর্তিপূজক, কাফির, মুশরিক প্রভৃতি আরাববাসী এখন যে পোশাক পরিধান করছে প্রায় ১৪০০ বৎসর পূর্বেও ঐ পোশাক পরিধান করত। তাহলে স্পষ্টতই এই পোশাক সংখ্যাগরিষ্ঠের পোশাক; শুধু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের একার পোশাক ছিলনা। পৃথিবীর আর কোন মুসলিম দেশ সুন্নাতী পোশাক আবিস্কার করেনি। ইউরোপ, আমেরিকা, অষ্ট্রেলিয়া, জাপান, মিশর, ইরাক, ইরান, মালয়েশিয়া, ইন্দোনেশিয়া ও অন্যান্য দেশের মুসলিমগণ তাদের দেশের ঐতিহ্যবাহী জাতীয় পোশাক পরিধান করে, সুন্নাতী পোশাকের আবিস্কার করেনি। সুন্নাতী নামের পোশাক শুধু ভারতবর্ষের মৌলভী ও পীরেরাই আবিস্কার করে ফেললেন। অষ্টম শতাব্দিতে মোহাম্মাদ ইব্ন কাশিম সিন্ধুর রাজা দাহীরকে পরাজিত করে ঐ প্রদেশে প্রকাশ্যে ইসলাম প্রচার শুরু করেছিলেন। ইসলামের মূল নীতি "সবাই

ভাই ভাই, মুসলিমদের মধ্যে কোন ভেদাভেদ নেই" এই শ্লোগানের প্রতি আকৃষ্ট হয়ে নিম্ন বর্ণের হিন্দুরা দলে দলে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করতে থাকে। হিন্দুদের ভগবানের কাছে আরাধনা পৌঁছানোর জন্য তাদের বিভিন্ন গোত্রের পৃথক পৃথক ধর্মযাজক, গুরু, গোসাই, ঠাকুর, পুরোহিত রয়েছে। ইবাদাত করে আল্লাহর কাছে পৌঁছানোর জন্য মুসলিমদের এরূপ কোন ঠাকুর/পুরোহিত প্রথার ব্যবস্থা ইসলামে নেই। তাই তাদের নির্দিষ্ট কোন ডিজাইনের বা আকারের পোশাকও নেই। বরং ইসলামী বা শারীয়াতী পোশাক হল উহাই যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়েছে।

বর্তমানে ভারতের ঠাকুর গোসাইদের স্থান দখল করে নিয়েছে এক শ্রেণীর কতিপয় মুসলিম নামধারী পীর ও মৌলভী। এই পীর, মৌলভী হিন্দু গুরু/ঠাকুরদের কায়দায় একটি পৃথক পোশাকের প্রয়োজন উপলব্ধি করলেন এবং উহা সুন্নাতী পোশাক বলে চালিয়ে দিলেন। এই তথাকথিত সুন্নাতী পোশাকধারী পীর ও মৌলভীরা ঠাকুর-গোসাইদের অনুকরণে অর্থ রোজগারের জন্য ইজমা, কিয়াস এবং নিজেদের রায় দ্বারা মিলাদ, খত্মে কুরআন, মৃত্যু দিবসে কুরআনখানী, শাবীনা খতম, শবে বরাত, ঈদে মিলাদুন্নাবী, জসনে জুলুস, উরশ, আশেকে রাসূলুল্লাহ ইত্যাদি বিদ'আতী অনুষ্ঠানের প্রচলন করে দিলেন। ঐ সমস্ত অনুষ্ঠানের মাধ্যমে তারা একদিকে ধর্মীয় অনুশাসন থেকে দূরে থাকা নীতিবিবর্জিত ভাবে আয় করা লোকদের সহজভাবে জান্নাত পাওয়ার পথ দেখানোর মিথ্যা প্রলোভন দেখাতে সক্ষম হল এবং অন্যদিকে তারা তাদের পেট পুঁজারীর ব্যবস্থা করে পকেট ও পেটকে স্ফীত করার সুযোগ করে নিল।

তাদের রোজগারকে নিশ্চিত করার জন্য এ নিয়মও বেঁধে দেয়া হল যে, ইসলামের নামে ঐ সমস্ত বিদ'আতী অনুষ্ঠানগুলো মাদ্রাসা পড়ুয়া মৌলভী কিংবা গজিয়ে উঠা ভূঁইফোর পীরদের দ্বারা সমাধা করতে হবে, যেমনভাবে ঠাকুর/গোসাই ছাড়া পূজা-পার্বনের পৌরোহিত্য করার অধিকার একজন সাধারণ হিন্দুর নেই। ঠাকুর, পুরোহিতদের মত মৌলভীদেরকেও টাকা-কড়ির সাথে সাথে ভুড়িভোজের মাধ্যমে সন্তুষ্ট করতে হচ্ছে।

আমাদের দেশে যে এক ধরণের পোশাক সুন্নাতী বলে প্রচলিত আছে তা যদি কেহ পরিধান না করে তাহলে তাকে ফাসিক বলে বিবেচনা করা হয় এবং এমন লোক যদি ইমাম হয় তাহলে তার পিছনে সালাত আদায় করা জায়েয হবেনা বলেও কেহ কেহ অভিমত ব্যক্ত করে থাকেন। এ ধারণার ফলশ্রুতিতে হয়ত সমাজের এক বিশেষ শ্রেণীর লোক-মৌলভী, পীরগণ এ ধরণের লম্বা কোর্তা, পাঞ্জাবী পরিধান করাকে সুন্নাত বলে মনে করেন এবং সুন্নাতী পোশাক বলে প্রচার করেন। শুধু তারা নিজেরাই তা পরিধান করেননা, বরং তাদের ছাত্র, শিষ্য/মুরিদদেরও অনুরূপ ডিজাইনের ও লম্বা মাপের কলিদার কোর্তা, বিভিন্ন প্রকার ও আকারের টুপি, পাগড়ী পরিধান করতে বাধ্য করেন।

আমরা উপরোক্ত কুরআনের আয়াত ও সহীহ হাদীস হতে জানতে পারলাম যে, পোশাক এমন হতে হবে যা মানুষের লজ্জাস্থানকে আবৃত করে রাখবে। দ্বিতীয়

কথা হল ঃ সেই পোশাককে ভূষন হতে হবে। পোশাক পরিধান করলে যেন দেখতে সুন্দর দেখায়, বদসুরত যেন না হয় সেদিকে খেয়াল রাখতে হবে। ভূষন ও শোভার ব্যাপারে মানুষের রুচি পরিবর্তনশীল এবং স্থান, কাল ও মানসিক অবস্থার প্রেক্ষিতে রুচির ক্ষেত্রে অনেক পার্থক্য ও পরিবর্তন সূচিত হতে পারে। অতএব কুরআনের মতে পোশাকের ধরণ ও আকৃতি পরিবর্তনশীল। তবে তা অবশ্যই রুচিশীল এবং শালীনতাযুক্ত হতে হবে । বেহায়াপনা ও উচ্ছৃঙ্খলময় পোশাক কখনও ইসলামী পোশাক হতে পারেনা।

মনে রাখতে হবে যে, তদানীন্তন আরাব সমাজে সাধারণতঃ একখানি কাপড় দিয়েই সমস্ত শরীর ঢাকার রীতি চালু ছিল। কখনও এমন একটি কোর্তা পড়া হত যা শরীরের উপরের অংশ থেকে নীচের অংশ পর্যন্ত ঢেকে ফেলতো। এমন কি, বর্তমানেও আরাবদের পোশাক এ রকমই। নীচে ছোটখাট একটি হাফ প্যান্ট অথবা জাঙ্গিয়া পড়ে তার উপর দিয়ে পায়ের গিরার উপর পর্যন্ত একটি লম্বা কোর্তা পরিধান করে থাকে। এটাই আরাবদের নিত্যদিনের পোশাক। ⊙ এক কাপড় পরিধান করা লোকদের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ তার দুই কাঁধ না ঢাকা পর্যন্ত এক কাপড়ে যেন সালাত আদায় না করে। [বুখারী/৩৫২]

কুরআন হাদীসের বাইরে এরূপ যে সমস্ত মনগড়া কথা ধর্মের নামে চালু রয়েছে তা হল তথাকথিত মৌলভী/পীরদের সৃষ্ট ইজমা, কিয়াস নামক অবৈধ বিষয়, যার অনুশাসন মেনে চলার যেমন যুক্তি নেই, তেমনি নেই কোন বাধ্য বাধকতা। বরং শারীয়াতে সুন্নাত প্রমাণিত নয় এরূপ একটি পোশাককে সুন্নাতী লেবাস বলে চালিয়ে দেয়া বা মানুষের উপর চাপিয়ে দেয়া একটি জঘন্য বিদ'আত।

জনসাধারণের মধ্যে টুপি-পাগড়ী নিয়েও বিদ'আতী আকীদা চালু আছে। টুপি, পাগড়ী মাথায় দিলে ভাল লাগে, সুন্দর লাগে; অতএব তা ব্যবহার করুন এবং সব সময়েই ব্যবহার করুন, তাতে আপত্তি নেই। কিন্তু টুপি, পাগড়ী পড়া সুন্নাতী কাজ মনে করলে কিংবা সাওয়াবের আশা করলে তা হবে বিদ'আত। কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম টুপি, পাগড়ী ব্যবহারের জন্য কোন নির্দেশ দেননি। অনেকে আবার মনে করে থাকে যে, টুপি ছাড়া সালাত আদায় করলে তা হয়না এবং টুপি, পাগড়ী পড়ে সালাত আদায় করলে বহু গুণ বেশী সাওয়াব পাওয়া যাবে। অথচ এর কোনটাই সত্য নয়, সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণীতও নয়। সালাতে মাথা ঢাকার কথাও কোন সহীহ হাদীসে নেই।

আমাদের দেশে যে টুপি পরা হয় তাকে কিস্তি টুপি বলা হয়। তালের আঁশের বা নাইলনের জাল ধরণের গোল টুপি, পাঁচ তালিওয়ালা টুপি, রুমি টুপি, জিন্নাহ্ টুপি, জহরলালী টুপি, গোল তালিওয়ালা ছাদ মার্কা টুপি ইত্যাদি বহু প্রকার টুপি আমাদের দেশে দেখা যায়। বিভিন্ন শ্রেণীর পীর সাহেবগণ বিভিন্ন আঁকার ও প্রকারের টুপি আবিস্কার করে তাদের মুরিদ বা শিষ্যদেরকে উহা পরিধান করার আদেশ করেন এবং বলেন, এটা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতী পোশাক। কিন্তু এ সমস্ত টুপি আরাব দেশে ১৪০০ বৎসর আগেও ছিলনা

এবং এখনও নেই। অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং সাহাবীগণ (রাঃ) এ সমস্ত টুপি ব্যবহার করেননি। মুহাম্মাদী টুপির আঁকার, প্রকার, কাটিং এর কোন প্রকার দলীল কোন সহীহ হাদীসে পাবেননা। সাহাবী (রাঃ), তাবিঈন, তাবী তাবিঈনগণও মুহাম্মাদী টুপি বলে কোন টুপির রেওয়াজ প্রবর্তন করেননি। যে টুপি পীর সাহেব আবিস্কার করলেন তা পীর সাহেবের নামকরণের টুপি হতে পারে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতী টুপি নয়। সুন্নাতী বলতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ত কোন কাজ, আদেশ, নিষেধ ইত্যাদিকে বুঝায়। এ সকল টুপিকে সুন্নাতী পোশাক বলাও ঠিক নহে।

এরপর পাগড়ী হলো সুদান, আফগানিস্তান, ইরান আর ভারতের শিখদের পোশাক। পাগড়ী পরে সালাত আদায় করায় বেশী সাওয়াব এবং ফাযায়েলে পাগড়ীর যত হাদীস বর্ণিত আছে তা সবই জাল ও দুর্বল।

হাজ্জের সময় ইহ্‌রাম বাঁধা অবস্থায় মাথায় পাগড়ী, টুপি এমন কি প্রখর রোদের তাপ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য এক টুকরা কাপড় মাথায় জড়িয়ে রাখাও নিষেধ। ইহরাম বাধা অবস্থায় সালাত আদায় করার কিংবা আরাফাত ময়দানে (যে ময়দান দু'আ কবূল হওয়ার স্থান) সালাত আদায় করার সময় মাথায় টুপি ব্যবহার করা নিষেধ। অতএব টুপি ছাড়া সালাত আদায় করা যাবেনা কিংবা সাওয়াব কম হবে এরূপ ধারনা করা কিংবা প্রচারণাও একটি মিথ্যা কথা এবং বিদ'আতী আকীদাহ। এমনও দেখা যায় যে, কেহ কেহ সব সময় মাথায় টুপি ব্যবহার করে, অথচ তারা সালাতই আদায় করেনা। কেহ কেহ সব সময় টুপি পকেটে রাখে, শুধু সালাত আদায় করার সময় মাথায় পরে নেন। এতে বুঝা যায় সালাতের (নামাযের) জন্য টুপি পরাও একটি শর্ত। শিক্ষিত সমাজে লক্ষ্য করা যায় যে, কোন সময় যদি কাপড় পাল্টানোর কারণে পকেটে টুপি না থাকে এবং রুমালও না থাকে তাহলে সে সালাতই আদায় করেনা। "টুপি মাথায় না দিলে সালাত হয়না বা ঐ সালাত আদায়কারী ব্যক্তি রাসূলুল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরীকার উপর নেই" এরূপ কথা বলে প্রচার করা ঠিক নহে। ⊙রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "কোন ব্যক্তির মিথ্যাবাদী সাব্যস্ত হওয়ার জন্য এতটুকুই যথেষ্ট যে, সে যা শুনে তা অন্যের কাছেও বলে বেড়ায়।" (মুসলিম, ১ম খন্ড, মুকাদ্দামা, পৃষ্ঠা ১৬)

সর্বশেষ কথা হল, যে কোন ডিজাইনের কিংবা আকারের পোশাক পরিধান করা যাবে, যদি ঐ পোশাক গর্হিত, অসুন্দর, অশালীন এবং অমর্যাদাপূর্ণ না হয়। কিন্তু কোন নির্দিষ্ট পোশাককে তথাকথিত সুন্নাতী পোশাক বলা যাবেনা। আপনার সম্বল আছে তো দামী পোশাক পরিধান করুন এবং মাথায় টুপির সাথে রুমাল ইত্যাদি যত খুশি ব্যবহার করুন; কেহ কোন আপত্তি করবেনা। তবে প্রয়োজনের তুলনায় অতিরিক্ত কাপড় পোশাকের জন্য ব্যবহার করা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিষেধ আছে। তদুপরি সুন্নাতী পোশাক বলাই আপত্তি। কারণ কোন নির্দিষ্ট পোশাককে সুন্নাতী পোশাক বলাই হল

বিদ'আত। আপনাদের নিকট আমার অনুরোধ, নিজেদের জীবনকে সঠিক পথে পরিচালিত করার জন্য শুধু পীর ও মৌলভীদের কাছে ধর্ণা না দিয়ে নিজেরা কুরআন, হাদীস পড়তে শিখুন এবং নিজে, নিজ পরিবার এবং নিকটজনদেরসহ অন্যদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করার চেষ্টা করুন। যে কেহ দীনের ব্যাপারে কোন কথা বললেই তা মেনে না নিয়ে ঐ কথার দলীল সে কোথা থেকে নিয়েছে তা জেনে নিন। যদি কুরআন এবং সহীহ হাদীস থেকে কোন দলীল পেশ করতে না পারে তাহলে তা মেনে চলা কোন মু'মিন লোকের উচিত নয়। কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল বহির্ভূত অন্য কারো কথা মানলে সে সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হবে। তাছাড়াও সমাজে শিক্ষিত/অশিক্ষিত লোকদেরকে প্রায়ই দেখা যায় তারা মাসজিদের ভিতর শুধু প্রবেশ করেই টাখনুর উপরে প্যান্ট/পাজামা/লুঙ্গি গুটিয়ে রাখেন এবং মাসজিদ থেকে বের হয়েই টাখনুর নিচে কাপড় নামিয়ে নেন, যা হাদীসের বিপরীত চর্চা। মনে রাখবেন, আল্লাহ তা'আলা অন্ধ নন। তিনি সব সময় সব কিছুই দেখতেছেন। বর্তমান সমাজের মহিলাদেরকে এমন পোশাক পরিধান করতে দেখা যায় যে, তাদের সালোয়ার কামিজ শরীরের সঙ্গে আট-সাটভাবে লেগে থাকে যা কুরআন ও সহীহ হাদীসের পরিপন্থী।

আল্লাহ আমাদের সকলকে বিদ'আতী কাজ ও বিদ'আতীদের ওয়াসওয়াসা থেকে রক্ষা করুন। আমীন!

ইসলাম ধর্মে মানুষকে পাপমুক্ত করার ক্ষমতা কোন মানুষ, জিন, ফিরিশতা, পীর, অলী ও দরবেশকে দেয়া হয়নি

১। যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা। [সূরা আলে ইমরান-১৩৫]

২। আমি এতদ্ব্যতীত কোনই রাসূল প্রেরণ করিনি যে, আল্লাহর আদেশে তাঁর আ-নুগত্য স্বীকার করবে, এবং যদি তারা স্বীয় জীবনের উপর অত্যাচার করার পর তোমার নিকট আগমন করত, অতঃপর আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করত আর রাসূলও তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা চাইত তাহলে নিশ্চয়ই তারা আল্লাহকে তাওবাহ কবূলকারী, করুণাময় দেখতে পেত। [সূরা নিসা-৬৪]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাসাস-৫৬, আনকাবূত-১২ ।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হে লোকসকল! তোমরা আল্লাহর কাছে তাওবা কর। কেননা আমি আল্লাহর কাছে দৈনিক একশত বার তাওবা করে থাকি। [মুসলিম/৬৬১৩-আবূ বুরদাহ (রাঃ)]

৫। আল্লাহ বলেন ঃ তোমার নিকট আত্মীয়বর্গকে সতর্ক কর [সূরা শু'আরা-২১৪] যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বললেন ঃ হে ফাতিমা বিন্‌ত

মুহাম্মাদ! হে সাফিয়া বিন্‌ত আবদুল মুত্তালিব! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদ থেকে যা খুশি চাইতে পার। [মুসলিম/৩৯৭]

- বুজুর্গ, পীর, দরবেশের পাপমোচন আর হিদায়াত দান করার দাবী একেবারেই অমূলক ও মিথ্যা। কোন কোন বুজুর্গ, পীর, দরবেশ মুরীদের পাপের বোঝা বহন করবে বলেও মুরীদদের আশ্বস্ত করে থাকে।

সুবহানাল্লাহ! যিনি সৃষ্টির সেরা, নাবী ও রাসূলগণের অধিনায়ক/নেতা, আল্লাহর সর্বাপেক্ষা প্রিয়তম, তিনি স্বীয় আদরের কন্যার দোষ-ত্রুটির দায়িত্ব গ্রহণ সম্পর্কে স্বীয় অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন, আর এই বুজুর্গ, পীর, দরবেশ নামধারী এক শ্রেণীর মানুষ তাদের মুরিদদের পাপের বোঝা বহন করবে বলে প্রচার করে। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে, আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব, মূলতঃ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবেনা, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। [সূরা আনকাবূত-১২]

আখিরী নাবীর উম্মাতের কিছু লোকও প্রতিমা/মূর্তি পূজা করে

১। তুমি কি তাদের প্রতি লক্ষ্য করনি যাদেরকে গ্রন্থের একাংশ প্রদত্ত হয়েছে? তারা মূর্তি ও শাইতানের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে এবং কাফিরদেরকে বলে, বিশ্বাস স্থাপনকারীগণ অপেক্ষা তারাই অধিকতর সুপথগামী। [সূরা নিসা-৫১]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হাজ্জ-৭৩, ৭৪, ফাতির-৪০, কাহফ-২১, মায়িদা-৬০।

৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি যে, কিয়ামাত কায়েম হবেনা যতক্ষণ যুলখালাসার পাশে দাওস গোত্রীয় রমণীদের নিতম্ব দোলায়িত না হবে। ('যুলখালাসা' হল দাওস গোত্রের একটি মূর্তি, জাহিলি যুগে তারা এর উপাসনা করত)। [বুখারী/৬৬১৮]

ইহকাল বনাম পরকাল

ক) যারা পার্থিব জীবন চায় আখিরাতে তাদের জীবন দুঃখময়

১। যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা-সৌন্দর্য কামনা করে তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দিই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয়না। [সূরা হুদ-১৫, ১৬]

২। তারাই পরকালের বিনিময়ে পার্থিব জীবন ক্রয় করে। কাজেই তাদের শাস্তি কম করা হবেনা এবং তারা সাহায্য প্রাপ্তও হবেনা। [সূরা বাকারা-৮৬]

- যারা আখিরাতকে ভুলে কেবল দুনিয়ার পিছনে লেগে থাকে আল্লাহ তাদের দুনিয়ায় প্রার্থিত কামনা পূর্ণ করেন। আখিরাত তাদের জন্য দুঃখময়। যদি বলা হয় বয়স তো কম হলনা, আয়-রোজগারও কম নয়, এবার সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাতে মনোযোগ দিন। তখনও অনেক অনেক অজুহাত। সময় নেই, ওসব কখন করব? কেবল দুনিয়া চাইলে দুনিয়াই পাবে। আখিরাত শুধু শূন্য

নয়, জ্বলন্ত আগুনই তার আবাস। ৮০/৯০ বছরের সুখের বদলে অনন্ত কালের জন্য জ্বলন্ত আগুনে প্রবেশ করার হুঁশিয়ারী দেয়া সত্ত্বেও মানুষ ছুটে চলছে। আহা কতইনা বেদনাদায়ক পরিণতির দিকে চলছে ইবলীসের বহর!

খ) পরকালের বিনিময়ে যারা পার্থিব জীবন ক্রয় করে

১। মানুষের মধ্যে এমন আছে, পার্থিব জীবন সম্পর্কিত যার কথা-বার্তা তোমাকে চমৎকৃত করে, আর সে ব্যক্তি তার অন্তরে যা আছে সে সম্পর্কে আল্লাহকে সাক্ষী রাখে অথচ সে ব্যক্তি খুবই ঝগড়াটে। [সূরা বাকারা-২০৪]

২। কারুন তার সম্প্রদায়ের সামনে উপস্থিত হয়েছিল জাকজমক সহকারে। যারা পার্থিব জীবন কামনা করত তারা বলল ঃ আহা! কারুনকে যেরূপ দেয়া হয়েছে আমাদেরকে যদি তা দেয়া হত! প্রকৃতই সে মহা ভাগ্যবান! [সূরা কাসাস-৭৯]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ তাওবা-১১১

কেবল শাইতানের অনুসারী ব্যক্তিরাই চমৎকার কথা বলে, মানুষকে দুনিয়া মুখী করার জন্য । দুনিয়ায় অঢ়েল সুখ, নিরাপত্তার জন্য রকমারী ইন্তিজাম করার কাজে সব সময় ব্যস্ত থাকে। তাদের এতটুকু অবসর নেই পরকালীন জীবনের দিকে দৃষ্টি দেয়ার। কাজ আর ব্যস্ততায় জীবনকে এমন ভাবে ঘিরে রাখে যে প্রতিটি মুহুর্তে পার্থিব জীবনের লাভ-ক্ষতির অংকই কষে। নিজেরা এ কাজে লিপ্ত থাকে এবং অন্যকেও এ কাজে আকৃষ্ট করার কৌশল খুজে।

দুনিয়ায় ফায়দা লাভের মানসে সে আল্লাহর নামে কসম খেয়ে মিথ্যা কথা বলতে আদৌও দ্বিধা করেনা। তাদের অন্তরের খবর এবং প্রকৃত বিষয় তো আল্লাহ জানেন। টাকা-পয়সার মুনাফা, পদ মর্যাদার লালসা, প্রতিপত্তির লোভে সে অবলীলায় আখিরাতকে বিক্রি করে দেয়, ব্যবসায়ে মিথ্যা কসম খায়, পদ মর্যাদায় মিথ্যার ফিরিস্তি দেয়, আদালতে মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়, ওয়াদা ভঙ্গ করে, আমানাতের খিয়ানাত করে, অংশীদারকে ফাঁকি দেয় এবং এ প্রকার কাজে সে আখিরাত বিক্রি করে। বনী ইসরাইলের যামানায় কারূন ছিল সেরা কৃপণ, তার ধন-সম্পদ ছিল অঢেল।

কারূনের ঐশ্বর্য আর প্রাচুর্য দেখে, দুনিয়াকামী মানুষের মনে আকাঙ্খা জাগে যদি তাকেও ঐরূপ সম্পদ দেয়া হত। কিন্তু কারূন যে কতবড় হতভাগ্য তা কি তারা ভাবতে পেরেছিল? আল্লাহ তার ইমারাত ও যাবতীয় সম্পদ মাটির নিচে দাবিয়ে দেন, অথচ এ সময় তার কোন সাহায্যকারী ছিলনা। পৃথিবীর বয়স এখন অনেক। বহু জাতি, দেশ, সম্প্রদায় দুনিয়ার মোহে পরকালকে উপেক্ষা করায় নিশ্চিহ্ন হয়ে গেছে। তাদের ধ্বংসলীলা এখনও বিদ্যমান, অথচ এই একবিংশ শতকের মানুষ এর থেকে শিক্ষা গ্রহণ করছে কি?

আমাদের সমাজে কি এমন কেহ নেই যে অন্যের ঐশ্বর্যে বিমুগ্ধ হয়ে নিজেকে তদ্রুপ হতে ইচ্ছা পোষন করেনা? অথচ সেই সম্পদশালী কেবল দুনিয়ায় পাহারাদার রূপে সম্পদের পাহাড় গড়েছে। হালাল-হারামের সীমা ভেঙ্গে চুরমার করেছে, প্রতারণা আর অন্যকে ফাঁকি দিয়ে সে তরতর করে ঐশ্বর্যের সিঁড়ি বেয়ে উঠে গেছে। এরা প্রকৃতপক্ষেই হতভাগা। ⊙ তাই তো মহানাবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অন্যের ঐশ্বর্য দেখে তোমার মনকে বিব্রত না করে তোমার থেকে যারা নীচে অর্থাৎ কম সম্পদের অধিকারী তাদের দিকে তাকিয়ে আল্লাহর কাছে কৃতজ্ঞতা প্রকাশ কর। [মুসলিম/৭১৫৯] তাহলেই দুনিয়া কুড়ানোর জন্য আমাদের হৃদয় চঞ্চল হবেনা। আখিরাতের চিন্তায় পার্থিব জীবন তুচ্ছ মনে হবে। পার্থিব সম্পদ লুণ্ঠনের জন্য যারা একে অন্যের সহযোগী, বন্ধু এবং উৎসাহদাতা হয়, পরকালকে নষ্ট করে তারা জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে।

গ) পার্থিব জীবন যেন মানুষকে প্রতারিত করতে না পারে

১। (আল্লাহ জিজ্ঞেস করবেন) হে জিন ও মানব সমাজ! তোমাদের কাছে তোমাদের মধ্য হতে কি রাসূলগণ আসেনি যারা তোমাদের কাছে আমার আয়াত বর্ণনা করত, আর এ দিনের সাথে যে সাক্ষাৎ ঘটবে সে ব্যাপারে তোমাদেরকে ভয় প্রদর্শন করত? তারা বলবে ঃ আমরা আমাদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিচ্ছি।
মূলতঃ এ দুনিয়ার জীবন তাদেরকে প্রতারিত করেছে, তারা নিজেদের বিরুদ্ধে সাক্ষ্য দিবে যে, তারা কাফির ছিল। [সূরা আন'আম-১৩০]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউনুস-৭, ৮, ফাতির-৫, ৬।

☐ পার্থিব জীবনে ধর্ম প্রচারের নামে এমন ধর্ম বিকৃতিকারী আছে যারা স্পষ্টতঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের হুকুমের তোয়াক্কা করেনা। বরং খেয়াল খুশীকে মাবূদ মনে করে মনের চাহিদা মুতাবেক ইবাদাত পদ্ধতি আবিষ্কার করেছে। তারাই কাবরে ইমারাত করে, কাবরে আর্জি পেশ করার আহ্বান জানায় এবং নজর, নেওয়াজ, মানত, সিন্নি গ্রহণের ব্যবসায় তৎপর। মীলাদ, উরস, কুলখানি, চেহলাম, মউতখানা এবং জন্ম-মৃত্যু বার্ষিকী পালনে তৎপর। পীর পূজা, কাবর পূজা, ব্যক্তি পূজা এবং রসম রেওয়াজ পন্থী এরাই। তারা সুন্দর সাজ-সজ্জা করে মন ভুলানো ও লোক দেখানো ইবাদাত করে আর বলে ঃ আমরা ভালই করছি।

ঘ) পার্থিব জীবন কাম্য নয়, পারলৌকিক জীবনই কাম্য

১। দুনিয়ায় আছে তাদের জন্য সামান্য ভোগ্যবস্তু, অতঃপর আমার কাছেই হবে তাদের প্রত্যাবর্তন, তখন তাদের কুফরীর কারণে তাদেরকে আমি কঠিন 'আযাব আস্বাদন করাব। [সূরা ইউনুস-৭০]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আনফাল-৬৭, কাসাস-৬১।

☐ আল্লাহর কথা মত চললে এ পৃথিবীর সমস্ত শাইতানী প্রচারণা, প্রবঞ্চনা, ক্রীড়া কৌতুক, ছলনা নস্যাৎ করে আখিরাত অভিমুখী জান্নাতী জীবন তৈরী করা সম্ভব। আর শাইতানকে অনুসরণ করলে মিথ্যা, শঠতা, ভেজাল, ফাঁকি, সুদ, ঘুষ, ব্যভিচার, গান-বাজনা, নাটক, থিয়েটার, টিভি, সিনেমা, নগ্নতা, অশ্লীলতা, শিরক, বিদ'আত, কুফরী, হত্যা, সন্ত্রাস ইত্যাদি করতে হবে। এটাতো কাম্য হতে পারেনা।
অতএব মু'মিন, মুত্তাকী ও আল্লাহর পথের পথিকদের উচিত বে-দীন, মুশরিক, মুনাফিক, গাফিল, আল্লাহদ্রোহীদের সুখ সম্ভারে আক্ষেপ না করা এবং বিচলিত

না হওয়া। বরং এ জন্য শোকর করা উচিত যে, আল্লাহ এসব পার্থিব ফিত্না ও সম্পদের মোহ থেকে সকলকে বিমুক্ত রাখুন।

ঙ) পার্থিব জীবনে যারা শাস্তি পাবে

১। যে আল্লাহর মাসজিদসমূহের মধ্যে তাঁর নাম উচ্চারণ করতে নিষেধ করছে এবং তা উজাড় করতে চেষ্টা করছে সে অপেক্ষা কে অধিক অত্যাচারী? তাদের পক্ষে উপযুক্ত নয় যে, তারা শংকিত হওয়া ব্যতীত তন্মধ্যে প্রবেশ করে; তাদের জন্য ইহলোকে দুর্গতি এবং পরলোকে কঠোর শাস্তি রয়েছে। [সূরা বাকারা-১১৪]

২। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর নিদর্শনসমূহ অবিশ্বাস করে ও অন্যায়ভাবে নাবীদেরকে হত্যা করে এবং হত্যা করে তাদের যারা মানবমন্ডলীর মধ্যে ন্যায়ের আদেশকারী, তাদেরকে যন্ত্রণাদায়ক শাস্তির সুসংবাদ দাও। এদের কৃতকর্মসমূহ ইহকাল ও আখিরাতে ব্যর্থ হবে এবং তাদের জন্য কেহ সাহায্যকারী নেই। [সূরা আলে ইমরান-২১-২২]

৩। যারা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে কষ্ট দেয়, আল্লাহ তাদেরকে দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত করেছেন, আর তাদের জন্য প্রস্তত রেখেছেন অপমানজনক শাস্তি। [সূরা আহ্যাব-৫৭]

৪। যারা পছন্দ করে যে, মু'মিনদের মধ্যে অশ্লীলতার বিস্তৃতি ঘটুক তাদের জন্য আছে ভয়াবহ শাস্তি দুনিয়া ও আখিরাতে। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জাননা। [সূরা নূর-১৯]

৫। যারা সতী-সাধ্বী, সহজ-সরল ঈমানদার নারীর প্রতি অপবাদ আরোপ করে তারা দুনিয়া ও আখিরাতে অভিশপ্ত, আর তাদের জন্য আছে গুরুতর শাস্তি। [সূরা নূর-২৩]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নূর-১৪, ফুসসিলাত-১৬, হাজ্জ-৯-১০, রাদ-৩৪, আরাফ-১৫২, মায়িদা-৩৩।

◻ মূলতঃ যারা আল্লাহর বিধানের ও রাসূলের হুকুমের বিরুদ্ধাচরণ করে কিংবা উপেক্ষা করে বা বাতিল করে তার পরিবর্তে নতুন কিছু সংযোজন করে অথবা প্রত্যাখ্যান করে অথবা বিদ্রুপ করে তারাই আল্লাহর শত্রু। এদের মধ্যে পৌত্তলিক, খৃষ্টান, ইয়াহুদী, কমিউনিষ্ট, ভোগবাদী, বস্তুবাদী, প্রকৃতিবাদী, নৈরাশ্যবাদী, মুনাফিক, কাফির এবং ছদ্মবেশী ফাসিক ও যালিমরাই দুনিয়ার জীবন পিপাসু এবং আখিরাত উপেক্ষাকারী।

চ) পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী ও পারলৌকিক জীবন চিরস্থায়ী

১। হে আমার সম্প্রদায়! পার্থিব এ জীবন (অস্থায়ী) ভোগ্য বস্তু মাত্র, আর আখিরাতই হল চিরকালীন আবাসস্থল। [সূরা মু'মিন-৩৯]

◻ আমরা প্রতিনিয়ত দেখতে পাচ্ছি আমাদের চার পাশের মানুষের মধ্যে অনেকেই মৃত্যুর কোলে ঢলে পড়ছে। তারা কেহ শিশু, বালক, যুবক, বৃদ্ধ, অশিক্ষিত, শিক্ষিত, ধনী, গরীব। আবার কেহ বিশ্বাসী-অবিশ্বাসী । এটা তো অবিশ্বাস করার কথা নয়। আবার পৃথিবীটাও এখন প্রায় হাতের মুঠিতে। যোগাযোগ এবং তথ্য প্রযুক্তি ব্যবস্থা এমন তাৎক্ষণিক হয়েছে যে, সুদূর আমেরিকা বা

অস্ট্রেলিয়া অথবা স্কটল্যান্ডের কোন প্রত্যন্ত অঞ্চলের একটা অঘটনের খবর বাংলাদেশের পল্লীতে বসে সেই দিনই জানা যায়। পৃথিবীর যে কোন দেশ এখন সকল দেশের প্রতিবেশী। ফলে প্রতি সেকেন্ডে কতজন মৃতবরণ করছে, আর কতজন জন্মগ্রহণ করছে তার পরিসংখ্যান অজানা নয়। আজ থেকে পাঁচ হাজার বছর আগে যিনি মারা গেছেন তার পার্থিব জীবন কত বছর ছিল? হয়তো ১০০ কিংবা ধরুন ১৫০ বছর। তাহলে ১৫০ বছর বেশী নাকি ৫০০০ বছর বেশী? আমাদের পিতা, পিতামহ, প্রপিতা, প্রপিতামহ কতদিন পূর্বে পৃথিবী ছেড়ে চলে গেছেন? তারা কত দিন পৃথিবীতে ছিলেন? এটা থেকে তো বুঝা যায়, যে, পার্থিব জীবন ক্ষণস্থায়ী, আর পরজীবন কত অনন্ত।

<u>ছ) পার্থিব জীবনে অবিচার, অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব করলে পরকালে কে উকিল হবে?</u>

১। সাবধান! তোমরাই ঐ লোক যারা ওদের পক্ষ হতে পার্থিব জীবন সম্বন্ধে বিতর্ক করছ; কিন্তু কিয়ামাত দিবসে তাদের পক্ষ হতে কে আল্লাহর সাথে বিতর্ক করবে এবং কে তাদের কার্য সম্পাদনকারী হবে? [সূরা নিসা-১০৯]

মানুষ অর্থ ও স্বার্থের বিনিময়ে অথবা কিছু কালের সুখ-শান্তির জন্য অন্যের প্রতি অবিচার, অন্যায় ও পক্ষপাতিত্ব করতে দ্বিধা করেনা। কিন্তু এসব কাজও গর্হিত, অন্যায়। আমরা দুনিয়ার জীবনে কি দেখছি? কেহ কেহকে ফাঁকি দিয়ে জমি, বাড়ী, গাড়ী দখল করে নিল অথবা কেহ কেহকে হত্যা করল, অথবা ব্যভিচার করল, ধর্ষণ করল, হত্যার চক্রান্ত করল, ইজ্জতহানী করল, ছিনতাই করল, মিথ্যা মামলা করল; চুরি, ডাকাতি, রাহাজানি করল; ভেজাল, চোরাকারবারী করল, মিথ্যা অপবাদ দিল। মযলুম ব্যক্তি আদালতে বিচার প্রার্থনা করল । কিন্তু দেখা গেল যালিম অপরাধী হওয়া সত্ত্বেও হাজার মিথ্যার আশ্রয় নিয়ে আইনজীবি, উকিল, মোক্তার, পেশকারসহ সকল আইন ব্যবসায়ী মোটা অংকের লালসার বশবর্তী হয়ে তার পক্ষে উকালতী করল। হয়তো বিচারকও আসামীর পক্ষে সমর্থন দিয়ে বেকসুর খালাস দিয়ে দিল অপরাধীকে। এমনটি কি হচ্ছেনা আমাদের আদালত পাড়ায়? মযলুম কয়জন ইনসাফ/ন্যায় বিচার পাচ্ছে? বরং আদালতে গেলে আরও বিপদ। হুমকী, নির্যাতন চলে। এই তো দুনিয়ার বিচারালয় ও উকিলদের পেশার তেজারতী। এ জন্যই আল্লাহ বলেন, কাল কিয়ামাতে কে উকিল হবে অপরাধীকে ছাড়িয়ে নেবার জন্য? আজ যদি কেহ অপরাধীর পক্ষ না নিত তাহলে সুবিচার হত এবং হানাহানি ও যালিমের যুল্‌ম থেকে পৃথিবীর মানুষ রেহাই পেত। আমরা ভুলে বসে আছি যে, যালিম, মাযলুম, বিচারক-উকিল সবাইকে মৃত্যুর পরে হাজির হতে হবে মহান বিচারক আল্লাহ আহকামূল হাকিমীনের সামনে।

<u>জ) পার্থিব কল্যাণ কিভাবে কতটুকু চাইতে হবে</u>

১। লোকদের মধ্যে কিছু লোক এমন আছে যারা বলে থাকে ঃ হে আমাদের রাব্ব! আমাদেরকে দুনিয়াতেও কল্যাণ দাও এবং আখিরাতেও কল্যাণ দাও এবং আমাদেরকে জাহান্নামের আযাব হতে রক্ষা কর। [সূরা বাকারা-২০১]

২। যে ব্যক্তি পার্থিব পুরস্কার কামনা করে সে জেনে রাখুক যে, আল্লাহর নিকট ইহলৌকিক ও পারলৌকিক পুরস্কার রয়েছে। আল্লাহ সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা নিসা-১৩৪]

৩। বল ঃ হে ঈমানদারগণ! তোমরা তোমাদের রাব্বকে ভয় কর। এ দুনিয়ায় যারা ভাল কাজ করবে তাদের জন্য আছে কল্যাণ। আল্লাহর যমীন প্রশস্ত। আমি ধৈর্যশীলদেরকে অপরিমিতভাবে পুরস্কার দিয়ে থাকি। [সূরা যুমার-১০]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাসাস-৭৭, নাহল-৪১, ইবরাহীম-২৭, আ'রাফ-১৫৬।

⧉ অতএব মুসলিমদের মনে রাখা উচিত ঃ

ক) প্রত্যেকের চাহিদার জন্য এ পৃথিবীতে রয়েছে ভোগ্যবস্তু, একে অন্যের আহার কেড়ে খাবার জন্য নয়।

খ) পৃথিবীর সম্পদের ন্যায়সঙ্গত বন্টন করতে হবে সুশাসনের জন্য আল্লাহর কাছে গ্রহণযোগ্য সংবিধান রচনা করার মাধ্যমে।

গ) দুনিয়া কেবল অসৎ, কুকর্মকারী ও কাফিরদের জন্য ছেড়ে দিয়ে মু'মিনদেরকে হাত গুটিয়ে বসে থাকার কথা বলা হয়নি। পৃথিবী মু'মিনদের জন্য প্রশস্ত। সৎ আমলকারী ও ধৈর্যশীলদের জন্য এর নি'আমাত অবারিত। ফলে সুকর্ম ও সুন্দর কাজের দ্বারা সুন্দর সমাজ গঠন করতে পারে মু'মিনরাই।

ঘ) দুনিয়ায় ততটুকু চাইতে হবে যতটুক চাইলে আখিরাতের অঢেল কল্যাণ আসবে। দুনিয়ায় ততটুকু সম্পদ সংগ্রহ করতে হবে যা দিয়ে আখিরাতের গৃহ সুন্দরভাবে নির্মিত হবে, তাতে অন্তর্ভুক্ত থাকবে দুঃস্থের-অভাবীর এবং নিঃস্বের প্রতি নিঃস্বার্থ সাহায্যের দ্বারা। এটাই দুনিয়ার সম্পদ যা ভোগের নয়, বরং ত্যাগের।

ঝ) পার্থিব ও পারলৌকিক জীবনের বন্ধু ও অভিভাবক আল্লাহ

১। আমি আমার রাসূলদেরকে আর মু'মিনদেরকে অবশ্যই সাহায্য করব দুনিয়ার জীবনে আর (কিয়ামাতে) যে দিন সাক্ষীগণ দন্ডায়মান হবে। [সূরা মু'মিন-৫১]

২। যখন ঐ বিকট ধ্বনি এসে পড়বে; সেদিন মানুষ পালিয়ে যাবে তার ভাই থেকে, তার মা, তার বাবা, তার স্ত্রী ও তার সন্তান থেকে। সেদিন প্রত্যেকেই নিজেকে নিয়ে ব্যতিব্যস্ত থাকবে। [সূরা আবাসা-৩৩-৩৭]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কিয়ামা-২০-২১, তাওবা-৩৮-৩৯।

⧉ মহান স্রষ্টা এমন বন্ধু ও অভিভাবক যিনি পৃথিবীতে এবং পরকালের একমাত্র সাহায্যকারী। একজন মানুষ অন্যকে কতটুকু সাহায্য করতে পারে তাঁর প্রয়োজন মিটানোর ব্যাপারে? কিন্তু আল্লাহ? তার ভান্ডার অফুরন্ত। তিনিই সমস্ত বস্তুর মালিক। তিনি অভাবমুক্ত, তাঁর সাহায্যের ফলে সকলেই উপকৃত হয়। সমাজে দেখা যায়, সাহায্য পাওয়ার জন্য অন্য ধর্মের লোকদেরকেই মুসলিমরা বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করছে। কুরআন ও হাদীস মোতাবেক তারা বন্ধু নয়।

পর্দা

❖ ইসলামী হিজাব বা পর্দা অর্থ অবরোধ নয়। মুসলিম মহিলারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) ও খুলাফায়ে রাশেদীনের যুগ থেকেই ইসলামী পোশাক ও শালীনতাসহ ধর্মীয়, পারিবারিক, অর্থনৈতিক ও সামাজিক কর্মকান্ডে অংশগ্রহণ করেছেন। ইসলামী পর্দা একটি ব্যাপক ব্যবস্থা। পবিত্র সামাজিক পরিবেশে সুন্দর আন্তরিক স্নেহ-মমতা ভালবাসাপূর্ণ পরিবার গঠনে ইসলামের বিভিন্ন বিধানাবলী সমষ্টিকেই মূলত এক কথায় হিজাব বা ‘‘পর্দা ব্যবস্থা’’ বলা হয়।

১। মুমিনদেরকে বল ঃ তারা যেন তাদের দৃষ্টিকে সংযত করে এবং তাদের লজ্জাস্থানের হিফাযাত করে; এটা তাদের জন্যে পবিত্রতম; তারা যা করে সে বিষয়ে আল্লাহ অবহিত। আর ঈমানদার নারীদেরকে বলে দাও তাদের দৃষ্টি অবনমিত করতে আর তাদের লজ্জাস্থান সংরক্ষণ করতে, আর তাদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করতে, যা এমনিতেই প্রকাশিত হয় তা ব্যতীত। তাদের ঘাড় ও বুক যেন মাথার কাপড় দিয়ে ঢেকে দেয়। তারা যেন তাদের স্বামী, পিতা, শ্বশুর, পুত্র, স্বামীর পুত্র, ভাই, ভাইয়ের ছেলে, বোনের ছেলে, নিজেদের মহিলাগণ, স্বীয় মালিকানাধীন দাসী, পুরুষদের মধ্যে যৌন কামনামুক্ত পুরুষ আর নারীদের গোপন অঙ্গ সম্পর্কে অজ্ঞ বালক ছাড়া অন্যের কাছে নিজেদের শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ না করে। আর তারা যেন নিজেদের গোপন শোভা সৌন্দর্য প্রকাশ করার জন্য সজোরে পদচারণা না করে। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর নিকট তাওবাহ কর, যাতে তোমরা সফলকাম হতে পার। [সূরা নূর-৩০, ৩১]

২। আর তোমরা (নারীরা) নিজেদের গৃহে অবস্থান কর, প্রাচীন অজ্ঞতার যুগের মত নিজেদেরকে প্রদর্শনী করে বেড়িও না। [সূরা আহযাব-৩৩]

৩। হে নাবী-পত্নিগণ। তোমরা অন্য নারীদের মত নও, যদি তোমরা আল্লাহকে ভয় কর তাহলে পর-পুরুষের সাথে কোমল কণ্ঠে এমনভাবে কথা বলনা যাতে অন্তরে যার ব্যাধি আছে, সে প্রলুব্ধ হয় এবং তোমরা ন্যায়সংগত কথা বলবে। [সূরা আহযাব-৩২]

৪। হে নাবী! তুমি তোমার স্ত্রীগণকে, কন্যাগণকে ও মু'মিন নারীগণকে বল, তারা যেন তাদের চাদরের কিয়দংশ নিজেদের উপর টেনে দেয়। এতে তাদেরকে চেনা সহজ হবে। ফলে তাদেরকে উত্যক্ত করা হবেনা। আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আহযাব-৫৯]

৫। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফিরিশতা। আল্লাহ যা আদেশ করেন তা তারা অমান্য করেনা, আর তারা তাই করে যা তাদেরকে করার জন্য আদেশ দেয়া হয়। [সূরা তাহরীম-৬]

৬। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ নূর-৫৮, ৬০।

৭। কোন মুসলিম মহিলার সাথে তার কোন মাহরিম (যাদের সাথে বিয়ে নিষেধ) পুরুষ ব্যতীত এক রাতের পথও সফর করা বৈধ নয়। [মুসলিম/৩১৩২-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/১১৭১]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জাহান্নামবাসী দু'ধরণের লোক যাদের আমি (এখনও) দেখতে পাইনি। একদল লোক, যাদের সাথে গরুর লেজের ন্যায় চাবুক থাকবে, তা দিয়ে তারা লোকজনকে পিটাবে। আর একদল স্ত্রীলোক, বস্ত্র পরিহিতা হয়েও বিবস্ত্রা, যারা অন্যদের আকর্ষণকারিণী ও আকৃষ্টা, তাদের মাথার চুলের অবস্থা উটের হেলে পড়া কুঁজের ন্যায়। ওরা জান্নাতে প্রবেশ করবেনা, এমনকি তার খুশবুও পাবেনা। অথচ এত এত দূর থেকে তার খুশবু পাওয়া যাবে। [মুসলিম/৫৩৯৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শরীরের একপাশ খোলা রেখে অন্য পাশ ঢেকে কাপড় পরতে নিষেধ করেছেন। আর এক কাপড়ে পুরুষকে এমনভাবে ঢেকে বসতে নিষেধ করেছেন যাতে তার লজ্জাস্হানের উপর ঐ কাপড়ের কোন অংশ থাকেনা । [বুখারী/৫৩৯২-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)]

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্ত্রীলোকদের পোষাক পরিধানকারী পুরুষদের এবং পুরুষদের পোষাক পরিধানকারিণী স্ত্রীলোকদের উপর লা'নত করেছেন। [আবূ দাউদ/৪০৫৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৫৪৫২]

১১। আয়িশা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দু'ধরণের পোষাক পরতে নিষেধ করেছেন। প্রথমতঃ শরীরের সাথে কাপড় এমনভাবে লেপ্টে যায় যাতে শরীরের ভাঁজ দেখা যায়। দ্বিতীয়তঃ এমনভাবে কাপড় পরা যাতে সতর খোলা থাকে (অর্থাৎ লজ্জাস্থান প্রকাশ পায়)। [ইব্‌ন মাজাহ/৩৫৬১]

১২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি আমার পরে লোকদের মাঝে পুরুষদের জন্য মেয়েদের চেয়ে ক্ষতিকর আর কোন ফিত্‌না ছেড়ে যাচ্ছিনা। [তিরমিযী/২৭৮০]

উপরিউক্ত সকল আয়াত এবং এ বিষয়ক অসংখ্য হাদীসের ভিত্তিতে মুসলিম উম্মাহ একমত যে, মাহরিম (যাদের সাথে বিবাহ হারাম) ছাড়া সকল আত্মীয় ও অনাত্মীয় পুরুষের সামনে মুমিনা নারীর পুরো দেহ আবৃত করে রাখা ফার্‌য। শুধু মুখমন্ডল ও দু' হাতের কবজি পর্যন্ত খোলা রাখার বিষয়ে বিদ্বানগনের মধ্যে মতভেদ রয়েছে। কোনো কোনো বিদ্বানগন বলেছেন মুখমন্ডল আবৃত রাখা উত্তম, তবে আনাবৃত রাখা বৈধ। অন্যান্য বিদ্বানগন বলেছেন, চক্ষু উন্মুক্ত রেখে মুখমন্ডল আবৃত রাখা ফার্‌য। এই মতবিরোধ শুধুমাত্র মুখ ও হাতের বিষয়। তবে মাথার চুল থেকে পা পর্যন্ত শরীরের বাকী অংশ আবৃত করা অর্থাৎ মাথা, মাথার চুল, গলা, কান, ঘাড়, কনুই কোমর ইত্যাদিসহ দেহ পুরোপুরি ঢেকে রাখা প্রতিটি মুসলিম মেয়েদের জন্য ফার্‌য, সে বিষয়ে মুসলিম উম্মাহ একমত। কুরআন ও হাদীসের এ সকল সুস্পষ্ট নির্দেশ সম্পর্কে মুসলমানদের অজ্ঞতা এত কঠিন পর্যায়ে গেছে যে, অনেকে মনে করেন পর্দা নিজের কাছে বা নিজের মনে, পর্দার জন্য বিশেষ কোন বিধান বা বিশেষ কোন পোষাক নেই। এ বিষয়ে

আলেম বা প্রচারকদের মতামতকে তাঁরা ধর্মান্ধতা বা বাড়াবাড়ি বলে মনে করেন। কেহ বা মনে করেন যে, পর্দা করা ভাল, তবে বেপর্দায় চলাফেরা কঠিন কোন অপরাধ নয়। এ সকল ধারণা আল্লাহর কুরআনকে অস্বীকার ও অবিশ্বাস করা ছাড়া কিছুই নয়। পাশ্চাত্যের অন্ধ অনুকরণ আমাদেরকে ধ্বংসের পথে টেনে নিয়ে যাচ্ছে। বেহায়াপনা ও অশ্লীলতার কারণে পাশ্চাত্যের মানুষেরা ব্যক্তিগত ও পারিবারিক জীবনের প্রশান্তি হারিয়েছে। সর্বোপরি একারণে পাশ্চাত্যে পারিবারীক কাঠামো ভেঙ্গে গেছে। লক্ষ লক্ষ নারী-পুরুষ বিবাহ না করে পশুর মত জীবন যাপন করছে। নতুন প্রজন্মের জন্ম প্রায় বন্ধ হয়ে গেছে। আর এর একমাত্র কারণ নারী স্বাধীনতার নামে বেহায়াপনার প্রসার। নারী স্বাধীনতার নামে মুসলিম মহিলাদেরকে সেই পথে ডাকা হচ্ছে। সর্বত্র একটি দৃশ্য আমাদের নযরে পড়ে। পুরুষ মাথা থেকে পা পর্যন্ত আবৃত করে পোশাক পরছেন। তার পাশে মহিলা দাড়িয়ে আছেন শরীরের অধিকাংশ স্থান অনাবৃত করে। শালীন পোশাক যদি স্বাধীনতার পরিপন্থী হয় তাহলে এই পুরুষটি কি স্বাধীনতা বিহীন? তিনি কি তার পাশের মহিলার অধীন? একজন পুরুষ যদি তার পুরো শরীর আবৃত করে স্বাধীনতা ও ভদ্রতা রক্ষা করতে পারেন তাহলে মহিলা কেন পারবেনা? একজন মহিলার দেহ অনাবৃত করলে তার কি কোন দৈহিক, মানসিক বা সামাজিক কোন লাভ আছে? একমাত্র বেহায়া পুরুষের কুদৃষ্টির পরিতৃপ্তি দান ছাড়া এর আর কোনো উদ্দেশ্য আছে কি? এ সকল বেহায়া পশু চরিত্রের পুরুষেরাই বিভিন্ন অজুহাতে মেয়েদেরকে নগ্ন করে তাদের নারীত্ব ও শালীনতা নষ্ট করতে চায়। কুরআন ও হাদীসের আলোকে আমরা বুঝি যে, একজন মুসলিম নারীর জন্য মাথার চুল, কান, গলা, হাত বা দেহের যে কোন অঙ্গ অনাবৃত রেখে বাইরে যাওয়া বা ঘরের মধ্যে গাইর মাহরিম আত্মীয়দের সামনে এভাবে যাওয়া ব্যভিচার, মদ্যপান ও অন্যান্য কঠিন হারাম কাজগুলির মতই কঠিন হারাম কাজ। মুসলিম মহিলার জন্য এগুলি আবৃত করা যেমন ফার্‌য, তাকে শারীয়াতের মধ্যে পরিচালিত করা তার স্বামী বা পিতার জন্যও অনুরূপ ফার্‌য আইন। আমরা সমাজে এমন অনেক দীনদার মানুষ দেখতে পাই, যিনি নিজে দাড়ি রেখেছেন এবং টুপি পরিধান করেন, অথচ তার স্ত্রী বা কন্যা মাথা, চুল বা দেহের অন্যান্য অংশ অনাবৃত করে চলেন। এ ক্ষেত্রে স্ত্রী ও কন্যার মাথায় কাপড় পরানো ও তাদের কে পর্দা মানানো ফার্‌য। আমরা অনেকেই এরূপ উদ্ভট ধার্মিকতায় লিপ্ত। বর্তমানে আমাদের মুসলিম সমাজে পর্দা নামক শব্দটি মনে হয় হারিয়ে যাচ্ছে। সবচেয়ে বড় প্রশ্ন হলো, কেন আ-মরা আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের নির্দেশ অমান্য করব? শালীন পোষাক শরীর আবৃত করার কারণে কোনো মুসলিম মহিলার জাগতিক কোন স্বার্থের ক্ষতি হয়না, তার কোন কর্ম বা প্রয়োজন ব্যাহত হয়না বা তার সামাজিক বা পারিবা-রিক কোন মর্যাদার ক্ষতি হয়না। বরং তিনি অতিরিক্ত সম্মান ভোগ করার সাথে সাথে আল্লাহর অফুরন্ত দয়া, কল্যাণ ও বারকাত লাভে সক্ষম হন।

পানির অপর নাম জীবন

১। তিনিই সমুদ্রকে দু' ধারায় প্রবাহিত করেছেন। একটি সুপেয় সুস্বাদু, আরেকটি লবণাক্ত কটু। উভয়ের মাঝে টেনে দিয়েছেন এক আবরণ, এক অনতিক্রম্য প্রাচীর। [সূরা ফুরকান-৫৩]
২। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ ওয়াকি'আহ-৬৮- ৭০।
৩। দাঁড়িয়ে পান করা নিষেধ। [তিরমিযী/১৮৮৫-আনাস (রাঃ), মুসলিম/৫১০৩]
৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন নিঃশ্বাসে পানি পান করতেন। [বুখারী/৫২১৬-সু, ই, আবদুল্লাহ (রাঃ), তিরমিযী/১৮৯০, আবূ দাউদ/৩৬৮৫, মুসলিম/৫১১৪]
৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন ঐ সকল লোকের প্রতি আল্লাহ তা'আলা দৃষ্টিপাত করবেননা যার নিকট প্রয়োজনের অতিরিক্ত পানি আছে অথচ সে পথিককে তা দেয়না। [বুখারী/২১৯৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]
৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ডান হাত দ্বারা পানি পান কর। কেননা শাইতান বাম হাত দিয়ে পান করে। [আবূ দাউদ-৩৭৩৪-ইব্ন উমার (রাঃ), মুসলিম/৫০৯৩]

☐ পানির অপর নাম জীবন। প্রাণী ও বস্তুর সৃষ্টিতে পানির উপাদান সর্বাগ্রে। এ পানি দু'ভাবে আমরা পেয়ে থাকি। যমীন থেকে আর আকাশ থেকে। আকাশের পানি নির্মল, পবিত্র এবং মুবারাকময়। যমীনের পানি দু'রকম। একটি মিষ্টি যা সুপেয় ভূগর্ভ হতে অথবা নদী হতে পেয়ে থাকি, আর একটি লোনা সেটা নদী বা সাগর মহাসাগরের। আর এক প্রকারের পানি সেটা হল বরফ গলা। পাহাড়-পর্বতের শিখরে জমা বরফ গলে ঝরণা বা নদী রূপে প্রবাহমান। এখন প্রশ্ন হল, কে এই বিভিন্ন উৎস হতে পানি সরবরাহ করে জীব বা প্রাণীর জন্য? আজ মুসলিমেরা না বুঝার কারণে আল্লাহর প্রায় সব নি'আমাতকেই অস্বীকার করে। তাঁর বেঁধে দেয়া সালাত, সিয়াম, দান-খাইরাত ইত্যাদি ইবাদাতগুলি লোকেরা তোয়াক্কা করেনা। মুসলিমরা কুরআন/হাদীসের তোয়াক্কা না করে দাঁড়িয়ে এবং বাম হাতে পান করতে দ্বিধাবোধ করেনা।

পিতা-মাতার প্রতি সন্তানের কর্তব্য

১। তোমরা আল্লাহর 'ইবাদাত কর, কোন কিছুকেই তাঁর শরীক করনা এবং মাতা-পিতা, আত্মীয়-স্বজন, ইয়াতীম, অভাবগ্রস্ত, নিকট প্রতিবেশী, দূর প্রতিবেশী, সাথী, মুসাফির এবং তোমাদের আয়ত্তাধীন দাস-দাসীদের সঙ্গে সদ্ব্যবহার কর। নিশ্চয়ই আল্লাহ ঐ লোককে ভালবাসেননা যে অহংকারী, দাম্ভিক। [সূরা নিসা-৩৬]
২। আমি মানুষকে তার মাতা-পিতার প্রতি সদয় ব্যবহারের নির্দেশ দিয়েছি। তার জননী তাকে গর্ভে ধারণ করে কষ্টের সাথে এবং প্রসব করে কষ্টের সাথে, তাকে গর্ভে ধারণ করতে এবং ওর স্তন্য ছাড়াতে লাগে ত্রিশ মাস, ক্রমে সে পূর্ণ শক্তি প্রাপ্ত হয় এবং চল্লিশ বছরে উপনীত হওয়ার পর বলে ঃ হে আমার রাব্ব!

আপনি আমাকে সামর্থ্য দিন যাতে আমি আপনার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করতে পারি, আমার প্রতি ও আমার মাতা-পিতার প্রতি আপনি যে অনুগ্রহ করেছেন তার জন্য এবং যাতে আমি সৎকার্য করতে পারি যা আপনি পছন্দ করেন; আমার জন্য আমার সন্তান সন্ততিদেরকে সৎ কর্মপরায়ণ করুন, আমি আপনারই অভিমুখী হলাম এবং আত্মসমপর্ণ করলাম। [সূরা আহকাফ-১৫]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-১৫১, ইসরা-২৩, ২৪।

৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করলেন ঃ কোন্ আমল জান্নাতের অধিক নিকটবর্তী করে? তিনি বললেন ঃ সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা, মাতা-পিতার সঙ্গে সদ্ব্যবহার করা, আল্লাহর পথে জিহাদ করা। [মুসলিম/১৫৫, তিরমিযী/১৯০৭]

৫। জনৈক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রশ্ন করলেন ঃ মানুষের মধ্যে সদ্ব্যবহার পাওয়ার সর্বাপেক্ষা যোগ্য কে? তিনি বললেন ঃ তোমার মা, এরপর তোমার মা, এরপর তোমার মা, এরপর তোমার পিতা। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন। এরপর তোমার নিকটবর্তী জন। [মুসলিম/৬২৭০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৩৬৬১, আবূ দাউদ/৫০৪৯, বুখারী/৫৫৩৩]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তার নাক ধূলিমলিন হোক, তার নাক ধূলিমলিন হোক, তার নাক ধূলিমলিন হোক। জিজ্ঞেস করা হল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! কার? তিনি বললেন ঃ যে ব্যক্তি তার পিতা-মাতা উভয়কে অথবা তাদের একজনকে বৃদ্ধাবস্থায় পেল, এর পরও সে জান্নাতে প্রবেশ করতে পারলনা। [মুসলিম/৬২৮০-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

⧉ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পিতা-মাতার মধ্যে কার হক বেশী প্রশ্ন করলে তিনি তিনবার বলেন, তোমার মায়ের, তারপর পিতার। অথচ আজকের সমাজের চিত্র বড়ই বেদনাদায়ক। অধিকাংশ ক্ষেত্রে পিতা-মাতার প্রতি সদ্ব্যবহার করা হয়না। দুর্ব্যবহার করা হয়। আর্থিক অনটনে ফেলা হয়। তাদেরকে বলা হয়, আমার ছেলে-মেয়েকে খেতে দিতে পারিনা, সেখানে তোমাদেরকে কি করে খাওয়াবো? এহেন উক্তি দুঃখজনক। পিতার-মাতার নিকট হতে অর্থ-কড়ি, সম্পদ দখলের জন্য নানা প্রকার কষ্ট দেয়া হয় ও অত্যাচার করা হয়। স্ত্রীকে বেশী প্রাধান্য দিয়ে মাকে অবহেলা করা হয়, যে কারণে আজ সমাজে বৃদ্ধ আশ্রম গড়ে তুলতে হচ্ছে। পিতা-মাতার বোঝা সন্তান বইতে নারাজ। অথচ আল্লাহর ইবাদাতের পরই পিতা-মাতার খিদমাতের কথা আল্লাহ আদেশ করেছেন। এমতাবস্থায় উভয়ের প্রতি আপনি কথা, কাজ, অর্থ ও দৈহিকভাবে সদ্ব্যবহার করুন। আল্লাহর অবাধ্যতা এবং যাতে ক্ষতি সাধিত হবে তা ব্যতীত আপনি তাদের আদেশ পালন করুন। তাদের সাথে মিষ্টি ভাষায় হাসি মুখে কথা বলুন, সাধ্যমত সেবা যত্ন করুন, তাদের বার্ধক্য, অসুস্থ ও দুর্বল অবস্থায় বিরক্তিবোধ করবেননা। এ অবস্থায় তাদেরকে বোঝা মনে করবেননা, অচিরে আপনিও তাদের অবস্থায় পরিণত হবেন, আপনিও পিতা হতে যাচ্ছেন, যেমন তারা আপনার পিতা-মাতা । যদি বেঁচে থাকেন আপনিও

আপনার সন্তানদের নিকট বার্ধক্য অবস্থায় উপনীত হবেন, যেমন আপনার নিকট আপনার পিতা-মাতা উপনীত হয়েছে। সুতরাং আপনারও সন্তানদের নিকট থেকে অনুগ্রহ, সহানুভূতি ও সদ্ব্যবহারের প্রয়োজন হবে, যেমন আপনার পিতা-মাতা আপনার সদ্ব্যবহারের মুখাপেক্ষী। অতএব আপনি যদি মাতা-পিতার সাথে সদ্ব্যবহার করেন তাহলে আপনি এর মহাপ্রতিদানের ও অনুরূপ ব্যবহারের শুভ সংবাদ গ্রহণ করুন। প্রতিদিন পিতা-মাতার দু'আ নিয়ে যেন জীবন ও জীবিকা নির্বাহ করা যায় সেই দু'আই সকলের জন্য কাম্য।

সন্তানের প্রতি পিতা-মাতার কর্তব্য

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা তোমাদের নিজেদেরকে আর তোমাদের পরিবার-পরিজনকে জাহান্নামের আগুন থেকে রক্ষা কর যার ইন্ধন হবে মানুষ ও পাথর, যাতে মোতায়েন আছে পাষাণ হৃদয় কঠোর স্বভাব ফিরিশতা। আল্লাহ্ যা আদেশ করেন, তা তারা অমান্য করেনা, আর তারা তাই করে, তাদেরকে যা করার জন্য আদেশ দেয়া হয়। [সূরা তাহরীম-৬]

২। শিশু জন্ম গ্রহণের পর তাকে আযান শোনাতে হবে। [তিরমিযী/১৫২০]

৩। সন্তানের নাম রাখতে হবে। [বুখারী/৩২৭৭]

৪। আকীকা দিতে হবে। [বুখারী/৫০৬৩, তিরমিযী/১৫২২, নাসাঈ/৪২১৬]

৫। সন্তানের লালন পালন করতে হবে। [বুখারী/৪৯৫২]

৬। পুত্র সন্তানের জন্য খাতনা করতে হবে। [বুখারী/৫৮৪৭]

৭। ইল্ম (কুরআন-হাদীস) শিক্ষা দেয়া, যথা ঃ সালাতের শিক্ষা দেয়া। [আবূ দাউদ/৪৯৫, তিরমিযী/৪০৭]

৮। বয়স হলে বিয়ে দেয়া। [ইব্ন মাজহা/১৮৪৬]

পীরের মুরীদ হওয়া

১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

২। তুমি যাকে ভালবাস তাকে সৎপথ দেখাতে পারবেনা, বরং আল্লাহই যাকে চান সৎ পথে পরিচালিত করেন, সৎপথ প্রাপ্তদের তিনি ভাল করেই জানেন। [সূরা কাসাস-৫৬]

৩। কাফিরেরা মু'মিনদেরকে বলে ঃ আমাদের পথ অনুসরণ কর, আমরা তোমাদের পাপের বোঝা বহন করব। মূলতঃ তারা তাদের পাপের কিছুই বহন করবেনা, অবশ্যই তারা মিথ্যাবাদী। [সূরা আনকাবূত-১২]

৪। তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা, তোমরা খুব সামান্যই উপদেশ গ্রহণ কর। [সূরা আ'রাফ-৩]

৫। তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কারও উপকারে আসবেনা এবং কারও সুপারিশ গৃহীত হবেনা এবং কারও নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবেনা, আর তারা কোন রকম সাহায্যও পাবেনা। [সূরা বাকারা-৪৮]

৬। **আমি** কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য রাব্ব তালাশ করব? (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তিনিই **সব** কিছুর রাব্ব। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী **হবে**। কোন ভার বহনকারীই অন্যের ভার বহন করবেনা। অবশেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল তোমাদের রবের নিকটেই, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন, যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদে লিপ্ত ছিলে। [সূরা আন'আম-১৬৪]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-৯৪, ইনফিতার-১৯, আলে ইমরান-১৫৪, আনকাবূত-৬৫, হা মীম আস সাজদা-৪৬।

◫ বর্তমান মুসলিম সমাজের অনেক মানুষ কোন না কোন পীরের মুরীদ। তাদের বিশ্বাস, পীর না ধরলে পরিত্রাণ নেই। সেই জন্য মানুষ দলে দলে পীরের মুরীদ হয়। মুরীদরা পীরের সব কিছু পূতঃ পবিত্র মনে করে। পীরের অবশিষ্ট (উচ্ছিষ্ট) পানীয় বা খাবার বারাকাতময় জ্ঞান করে, ফলতঃ তা গ্রহণ করার জন্য ধাক্কা-ধাক্কি শুরু হয়। পা ও শরীর ধৌত করা ব্যবহৃত পানি তাবারুক হিসাবে বিতরণ করা হয়। কেহ হাতে নিয়ে সঙ্গে সঙ্গে শরীরে মেখে নেয়, আবার কেহ ভবিষ্যতে বারাকাত হাসিল করার আশায় বোতলে ভরে নেয়। শয়নে-স্বপনে, নিদ্রায়-জাগরণে, আপদে-বিপদে সর্বক্ষেত্রে পীর বাবাকেই ডাকে এবং স্মরণ করে। আবার কেহ পীর বাবার ছবি গলায় ঝুলিয়ে রাখে। পীরকে এমন ভয় করে যে, তার অসম্মানকে ধ্বংসের কারণ মনে করে। এই বিশ্বাস করা বড় শির্ক। এ প্রকার মানুষেরা তৎকালীন মুশরিকদের চেয়েও নিকৃষ্ট বা অধম। কারণ তারা অন্য সময় আল্লাহকে ভুলে গেলেও বিপদের সময় আল্লাহকে ডাকত। পীর ভক্তরা ধারণা করে যে, তারা সাধারণ মানুষ, তাই তাদের ইবাদাত, দু'আ ইত্যাদি পীরের মাধ্যমে আল্লাহর দরবারে পৌঁছবে। কারণ তারা পাপী মানুষ। তাদের আমল আল্লাহর কাছে সরাসরি পৌঁছবেনা, তাই পীরেরা কিয়ামাতের দিন সুপারিশ করে পুলশিরাত পার করে দিবে। সেই জন্য তারা পীরের উপর সমস্ত দায়িত্ব অর্পন করে দায়মুক্ত হয়েছে। আর পীরেরাও তাদের দায়িত্ব গ্রহণ করেছে। এমন কি সালাত, সিয়াম পালন করা থেকেও তাদের মুরীদদেরকে অব্যাহতি দেয়া হয়েছে। কারও মাধ্যমে আল্লাহর কাছে চাওয়া বা ইবাদাত করা সবচেয়ে বড় শির্ক।

বর্তমান যুগে যারা পৌত্তলিকতায় বিশ্বাসী তারাও ঐ কথা বলে যে, আমরা প্রতিমা পূজার মাধ্যমে ভগবানের নৈকট্য লাভ করতে চাই। তাহলে পীর-মুরীদ এবং মুশরিকদের মধ্যে পার্থক্য রইলো কোথায়? মূল কথা হল এই রূপ আকীদাহ হিন্দু বা মূর্তি পূজকদের।

পীর বাবারা সাধারণ মানুষকে ধোঁকা দিয়ে এই বলে বোকা বানিয়ে রেখেছে যে, কিয়ামাতের দিন তারা তাদের সুপারিশকারী হবে! তাদের এই কথা কতখানি সত্য আল্লাহর বাণী পাঠ করলে পাঠকগণ উপলব্ধি করতে পারবেন।

⊙ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আল্লাহ অন্তরের খবর জানেন। [সূরা আলে ইমরান-১৫৪]

সুতরাং পীরের উকালতির প্রয়োজন নেই। তাদের এও জেনে রাখা দরকার যে, স্রষ্টার সাথে কোন সৃষ্টির সদৃশ স্থাপন শির্ক, যা তাওহীদ বিরোধী বা আমল কবূলের শর্তের পরিপন্থী।

তাছাড়াও আধ্যাত্মিক বিদ্যায় পারদর্শী অথচ কুরআন ও সুন্নাহর অমান্যকারী বিদ্বানরা মহাপন্ডিত, বিদ্যাসাগর, সুফী সম্রাট, দরবেশ, পীর, মুরশিদ, সাধক, মোকাম্মেল, হাদিয়ে জামানা, কুতুবে রাব্বানী, মাওলানা, শাহ সূফী সব কিছুই হতে পারেন, কিন্তু"আহলে যিক্র" কুরআন ও সুন্নাহয় পারদর্শী হওয়ার আলামত তাদের মধ্যে তেমন দেখা যায়না।

মোট কথা, পাপ মোচন ও হিদায়াত দান করে পাপীকে কামেল করা, ফায়েজের দ্বারা পরিশুদ্ধ করার দাবী পীরদের একেবারেই অমূলক, মিথ্যা বিভ্রান্ত মূলক দাবী। কোন কোন পীর তার মুরীদদের পাপের বোঝা বহন করবে বলেও মুরিদদের আশ্বস্ত করে । কুরআন তাদের এরূপ দাবী প্রত্যাখ্যান করে।

ফাতওয়া বনাম ফাতওয়াবাজী

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

الَّذِينَ صَبَرُواْ وَعَلَى رَبِّهِمْ يَتَوَكَّلُونَ

(আখিরাতের মহা পুরস্কার তাদের জন্য) যারা ধৈর্যধারণ করে আর তাদের রবের উপর নির্ভর করে। [সূরা নাহল-৪২]

২। হে মানুষ! তোমাদের রবের নিকট থেকে তোমাদের কাছে এসেছে নাসীহাত আর তোমাদের অন্তরে যা আছে তার নিরাময়, আর মু'মিনদের জন্য সঠিক পথের দিশা ও রাহমাত। [সূরা ইউনুস-৫৭]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ যুমার-৯।

৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ যে ব্যক্তি কোন দীনের কথা জানার পরে তা গোপন করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উঠানো হবে। [ইব্ন মাজাহ/২৬১]

ফাতওয়া হল মুসলিমদের দীনের ব্যাপারে সমস্যা সমাধানের একটি বিশেষ দিক যা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে উৎসারিত।

সকল মানুষ সব জান্তা নয় এবং তা আশা করাও ঠিক নয়। তাই জানার জন্য প্রশ্ন বা শিখার জন্য জিজ্ঞাসা। এটা জাগতিক বা পারলৌকিক যে কোন বিষয়ে হতে পারে। এই জিজ্ঞাসার দরজা একমাত্র আহাম্মক আর উম্মাদ ব্যতীত কেহ বন্ধ করতে চাবেনা।

মুসলিমের জীবন চলার পথে হাজারও রকমের সমস্যা আসতে পারে এবং তার সুষ্ঠ সমাধান পাওয়া একান্ত প্রয়োজন। সে প্রয়োজন মিটাতে গেলে অহী ভিত্তিক আইনের উৎসের সাহায্য নিতে হবে। ⊙ সেই অহী ভিত্তিক উৎস হল মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দ্ব্যর্থহীন উচ্চারণ ঃ আমি তোমাদের নিকট দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি, একটি আল্লাহর কিতাব অন্যটি আমার সুন্নাহ। এ দু'টি

যে দৃঢ় মুষ্টিতে ধরে থাকবে কেহ তাকে পথভ্রষ্ট করতে পারবেনা। [আবূ দাউদ/৪৫৩৩]

ফাতওয়া ও ফাতওয়াবাজী এক কথা নয়। কথায় কথায় দলীল প্রমাণ ছাড়াই ধর্মের নামে অজ্ঞ ও জাহিলরা যে ফাতওয়া দেয় সেটাই ফাতওয়াবাজী। এটা যেমন কাম্য নয়, তেমনি এটা মানুষের জন্য কল্যাণ বয়ে আনেনা। তাই মুসলিমদের উচিত কুরআন ও সহীহ হাদীসের উপর ভিত্তি করে সকল প্রকার প্রশ্নের সমাধান দেয়া। আর তাতে কারো কিছু বলার থাকেনা, সেটা সর্বান্তকরনে সবাই মানতে পারে। ফলে কোন দ্বিধা-দ্বন্দ হয়না।

বিনা ইল্‌মে ফাতওয়া দান

১। তুমি বল ঃ আমার রাব্ব প্রকাশ্য, অপ্রকাশ্য অশ্লীলতা, পাপ কাজ, অন্যায় ও অসংগত বিদ্রোহ ও বিরোধিতা এবং আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করা যার পক্ষে আল্লাহ কোন দলীল প্রমাণ অবতীর্ণ করেননি, আর আল্লাহ সম্বন্ধে এমন কিছু বলা যে সম্বন্ধে তোমাদের কোন জ্ঞান নেই, (ইত্যাদি কাজ ও বিষয়সমূহ নিষিদ্ধ করেছেন)। [সূরা আ'রাফ-৩৩]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আনকাবূত-১২, ১৩, নাহল-২৫।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কেহকে ফাতওয়া দেয়া হলে, তার পাপের ভার ফাতওয়া দাতার উপর বর্তাবে। [ইব্‌ন মাজাহ/৫৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমানও হয়। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল। [বুখারী/৩২০৭]

বর্তমান সমাজে মুফতির অভাব নেই। খ্যাতি ও প্রসিদ্ধির লোভে, মানুষের নিকট ধন্য হবার উদ্দেশে এবং আড়ম্বরের সহিত জ্ঞানের প্রচারের উদ্দেশে মৌলভীরাও ফাতওয়া দিতে দ্বিধা করেননা। ফলে এই জিহ্বার দ্বারা উৎপন্ন কথা-বার্তা সমাজে কত বিপর্যয় ও বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হচ্ছে তা সকলের কাছে দৃশ্যমান। এ কারণে আলেম সমাজ জনসাধারণের নিকট হেয় হচ্ছে। শুনতে হচ্ছে জনসাধারণের নানা রকম কথা, যত আলেম তত ফাতওয়া ! ইত্যাদি। অথচ এমনটা বলাও ঐ বক্তাদের জন্য তাদের জিহ্বার এক সর্বনাশ। অনেকে না জেনে ফাতওয়া দিয়ে আবার চ্যালেঞ্জও করে। আবার কখনও বলে, 'এতে পাপ হলে তোমার হয়ে আমি বহন করবো, আমার কথা মানো ইত্যাদি ইত্যাদি।

ফিরিশতাদের উপর বিশ্বাস স্থাপন করা

১। তোমরা তোমাদের মুখমন্ডল পূর্ব বা পশ্চিম দিকে প্রত্যাবর্তিত করলেই তাতে পুণ্য নেই, বরং পুণ্য তার যে ব্যক্তি আল্লাহ, আখিরাত, মালাইকা/ফিরিশতা, কিতাব ও নাবীগণের প্রতি বিশ্বাস স্থাপন করে । [সূরা বাকারা-১৭৭]

২। আর তিনি আদেশ করেননা যে, তোমরা মালাক/ফিরিশতা ও নাবীগণকে রাব্ব রূপে গ্রহণ কর; তোমরা আত্মসমর্পণকারী হবার পর তিনি কি তোমাদেরকে পুনরায় কুফরীতে ফিরে যাবার আদেশ করবেন? [সূরা আলে ইমরান-৮০, সাবা-৪০, ৪১]
৩। ফিরিশতাগণও আল্লাহর ভয়ে ভীত হয়ে তাঁর মহিমা ও পবিত্রতা ঘোষণা করেন। [সূরা রা'দ-১৩]
৪। রাসূলগণ ফিরিশতা ছিলেননা। [সূরা আন'আম-৮, ৯, ইসরা-৯৫, মু'মিনূন-২৪, ফুরকান-৭, ২১]
৫। ফিরিশতা দ্বারা অহী প্রেরিত হয়। [সূরা নাহল-২, হাজ্জ-৭৫]
৬। বানী ইসরাইলের সেই পবিত্র সিন্ধুক বাদশাহ তালুতের নিকট ফিরিশতারা বহন করে পৌছায়। [সূরা বাকারা-২৪৮]
৭। নাবী যাকারিয়া (আঃ), ইবরাহীম (আঃ), মারইয়াম (আঃ) প্রমুখের নিকট সুসংবাদবাহী ফিরিশতা প্রেরিত হন। [সূরা আলে ইমরান-৩৯, ৪২-৪৬, হূদ-৬৯-৭৩, ৭৭-৮১]
৮। ফিরিশতাগণ আম্বিয়ায়ে কিরামের সাহায্যকারী। [সূরা তাহরীম-৪]
৯। ফিরিশতাগণ মানুষ বেশে নাবীদের প্রতি প্রেরিত হন। [সূরা হূদ-৬৯-৭৩, ৭৭-৮১]
১০। ফিরিশতাগণ পাখা বা ডানা বিশিষ্ট। [সূরা ফাতির-১]
১১। ফিরিশতাগণ নারীরূপে সৃষ্ট নয় যা কাফিরেরা অপবাদ দেয়। [সূরা সাফ্‌ফাত-১০৫, যুখরূফ-১৯]
১২। যুদ্ধক্ষেত্রে মু'মিনদের সাহায্যে ফিরিশতাগণ প্রেরিত হন। [সূরা আলে ইমরান-১২৪, ১২৫, আনফাল-৯]
১৩। যারা আল্লাহর প্রতি অবিচল থাকে তাদের উপর রাহমাতের ফিরিশতা নাযিল হবে, আর তাদের জন্য দু'আ করবে। [সূরা হা মীম আস সাজদা-৩০]
১৪। আল্লাহর অনুমতি ভিন্ন আসমানের ফিরিশতাদের সুপারিশ করার ক্ষমতা নেই। [সূরা নাজম-২৬]
১৫। ফিরিশতারাও মানুষকে লা'নত করে। [সূরা বাকারা-১৬১, আলে ইমরান-৮৭, নিসা-১৩৬]
১৬। আল্লাহর আদেশে ফিরিশতারা মৃত্যু ঘটায়। [সূরা নাহল-২৮, ৩২]
১৭। মুনাফিক, মুশরিক, যালিম, কাফির ও আল্লাহদ্রোহীদের প্রাণ নির্মম যন্ত্রণা দ্বারা ফিরিশতারা হরণ করেন। [সূরা আন'আম-৯৩, আনফাল-৫০, মুহাম্মাদ-২৭]
১৮। ফিরিশতাগণ জাহান্নামের প্রহরী। [সূরা মুদ্দাসসির-৩১]
১৯। জান্নাতে জান্নাতবাসীদেরকে ফিরিশতাগণ সালাম সালাম বলে অভ্যর্থনা করবে। [সূরা রা'দ-২৩, নাহল-৩২, আম্বিয়া-১০৩]
২০। কিয়ামাতের দিন আসমান হতে ফিরিশতা নামানো হবে। [সূরা ফুরকান-২৫]
২১। কিয়ামাতের দিন ফিরিশতাগণ সারিবদ্ধ হয়ে দাঁড়াবে। [সূরা নাবা-৩৮, ফজর-২২]
২২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইনফিতার-১০, ১১, ১২, কাফ-২৩, ১৭-১৮, নাজম-৩-৭, ১১-১৪, আহযাব-৪৩, ৫৬, শূরা-৫, যুমার-৭৫, মা'আরিজ-৪, তাহরীম-৬, বাকারা-১০২, ১২৫, ১৭৭।

২৩। **রাসূলুল্লাহ** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের মধ্যে রাত ও দিনে ফিরিশতাগণ পালাক্রমে আগমন করেন। আর তাঁরা একত্রিত হন আসর ও ফাজরের সালাতে। তারপর যাঁরা তোমাদের মাঝে রাত্রি যাপন করেছেন তাঁরা উঠে যান। তখন তাদের রাব্ব তাদেরকে জিজ্ঞেস করেন, অথচ তিনি তোমাদের ব্যাপারে সবচেয়ে অধিক জ্ঞাত ঃ কেমন অবস্থায় আমার বান্দাদেরকে তোমরা ছেড়ে এসেছ? তাঁরা তখন উত্তর দেয় ঃ আমরা তাদেরকে সালাত রত অবস্থায় রেখে এসেছি, প্রথমে গিয়েও আমরা তাদেরকে সালাতে পেয়েছিলাম। [বুখারী/৬৯১১-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

অনুরূপভাবে মিকাঈল (আঃ) রুটি-রুযী ও পানীয়ের দায়িত্বে নিয়োজিত। ইসরাফীল (আঃ) কিয়ামাত সংঘটিত করার জন্য শিংগায় প্রচন্ড ফুৎকারের দায়িত্বে। আর মালাকুল মাউত (আযরাঈল) (আঃ) মানুষের জান কবজ বা মৃত্যু ঘটানোর দায়িত্বে নিয়োজিত। সকল ফিরিশতাই স্রষ্টা কর্তৃক অর্পিত দায়িত্ব পালনে বিন্দুমাত্র ত্রুটি করেনা। যে কাজের দায়িত্বে যিনি ঐ কাজের জন্য তার নিজস্ব কোন ইখতিয়ার নেই হ্রাস বৃদ্ধি বা বিয়োজন বা স্থগিতকরণের। এর সকল ইখতিয়ার মহাপ্রভুর। ফিরিশতাগণের সংখ্যা নির্ণয় করা যায়না। কেননা রাহমাতের ফিরিশতা যে কত তা আল্লাহ ছাড়া কেহ বলতে পারেনা। কিরামান কাতিবীন দু'জন। দিবা-রাতে আমল সংগ্রাহক দু'জন করে চার জন। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ বজ্রনাদ তাঁরই ভয়ে তাঁর প্রশংসা বর্ণনা করে আর ফিরিশতারাও। তিনি গর্জনকারী বজ্র প্রেরণ করেন আর তা দিয়ে যাকে ইচ্ছা আঘাত করেন, আর তারা আল্লাহ সম্পর্কে বিতন্ডায় লিপ্ত হয়। অথচ তিনি বড়ই শক্তিশালী। [সূরা রাদ-১৩]

বাইআত

❖ বাইআত অর্থ আনুষ্ঠানিকভাবে আনুগত্যের অঙ্গীকার করা

১। যারা তোমার কাছে বাইআত (অর্থাৎ আনুগত্য করার শপথ) করে আসলে তারা তো আল্লাহর কাছে বাইআত করে। তাদের হাতের উপর আছে আল্লাহর হাত। এক্ষণে যে এ ওয়াদা ভঙ্গ করে, এ ওয়াদা ভঙ্গের কুফল তার নিজেরই উপর পড়বে। আর যে ওয়াদা পূর্ণ করবে, যা সে আল্লাহর সঙ্গে করেছে, তিনি অচিরেই তাকে মহাপুরস্কার দান করবেন। [সূরা ফাতহ- ১০]

২। হে নাবী! যখন মু'মিনা নারীরা তোমার কাছে এসে বাইআত/ অঙ্গীকার করে যে, তারা আল্লাহর সঙ্গে কোন কিছুকে শরীক করবেনা, চুরি করবেনা, যিনা করবেনা, নিজেদের সন্তান হত্যা করবেনা, জেনে শুনে কোন অপবাদ রটাবেনা এবং কোন ভাল কাজে তোমার অবাধ্যতা করবেনা– তাহলে তুমি তাদের বাইআত গ্রহণ কর এবং তাদের জন্য আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা কর। আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [সূরা মুমতাহানা-১২]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ ফাতহ-১৮।

৪। জারীর (রাঃ) বলেন ঃ আমি সালাত কায়েমের , যাকাত দেয়ার এবং প্রত্যেক মুসলিমের কল্যাণ কামনার জন্য রাসূল (সাঃ) এর নিকট বাইআত (অঙ্গীকার) করেছি। [মুসলিম/১০৫]

৫। উবাদা ইব্‌ন সামিত (রাঃ) বলেন ঃ আমি ঐ প্রতিনিধি দলের অন্তর্ভুক্ত ছিলাম, যারা রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর কাছে বাইআত করেছিল যে, আমরা আল্লাহর সঙ্গে অন্য কিছুকে শরীক করবনা, আমরা চুরি করবনা, ব্যভিচারে লিপ্ত হবনা, আল্লাহ যাকে হত্যা করা হারাম করেছেন আমরা তাকে হত্যা করবনা, আমরা লুটতরাজ করবনা এবং নাফরমানী করবনা। আমরা যদি এসব আদেশ পালন করি তাহলে জান্নাত লাভ করব। আর যদি আমরা এর মধ্যে কোনটিতে লিপ্ত হই তাহলে এর ফাইসালা আল্লাহ তা'আলার উপর ন্যস্ত। [বুখারী/৩৬০২]

◻ বাইআত আরবী শব্দ। রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণের বাইআত করার কথা অনেক জায়গায় উল্লেখ আছে। প্রথমতঃ যে সব লোক ঈমান এনে ইসলাম কবূল করত তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাইআত কবূল করত, আর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের নিকট থেকে বাইআত করতেন। কাজেই সুন্নাত অনুযায়ী বাইআত তা যা ইসলামের হুকুম আহকাম পুরাপুরি পালন করবে এবং শারীয়াতের খেলাফ কোন কাজ করবেনা। দীনী ওয়াদা দিয়ে ও নিয়ে যে বা-ইআত করা বা গ্রহণ করা হয়, তাই হল সুন্নাত মুতাবিক বাইআত ।

কিন্তু বর্তমানে প্রচলিত পীর-মুরীদের ক্ষেত্রে বাইআত হওয়ার সাথে নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবা আজমাঈনদের বাইআতের কি কোন মিল আছে? আসলে এ হচ্ছে ইসলামের একটি ভাল কাজকে খারাপ ক্ষেত্রে ও খারাপ উদ্দেশে ব্যবহার করা । আর এ কারণেই পীর-মুরীদের ক্ষেত্রে হাতে হাতে কিংবা পাগড়ী ধরে বা পাগড়ী ধরা লোকের গায়ে গা মিলিয়ে বাইআত করা এবং বাইআত করান হয় নানা তরীকার মুরাকাবার জন্য, যা শারীয়াতে সম্পূর্ণ বিদ'আত। আরও বড় বিদ'আত হল কুরআন তিলাওয়াত বাদ দিয়ে পীরের বানানো দুরূদ তিলাওয়াত করা। কিন্তু শারীয়াতে কুরআন ছাড়া আর কিছু তিলাওয়াত করাকে বড় সাওয়াবের কাজ মনে করা, কুরআন অপেক্ষা অন্য কোন কিতাবকে অধিক গুরুত্বপূর্ণ মনে করা সুস্পষ্ট এক বড় বিদ'আত। যে লোকই লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ পড়েছে ও বিশ্বাস করেছে, সেতো নিজেকে আল্লাহর নিকট অর্পন করেই দিয়েছে, সে কি করে আবার পীরের হাতে নিজেকে অর্পন করতে পারে?

⊙ সূরা তাওবার ১১১ নং আয়াতে আল্লাহ ইরশাদ করেছেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহ তা'আলা মু'মিনদের নিকট হতে তাদের জান ও মালকে ক্রয় করে নিয়েছেন এ শর্তে যে, তিনি এর বিনিময়ে জান্নাত দান করবেন।" কাজেই আল্লাহর নিকট জান-মাল বিক্রয় করার পর তা যদি কোন পীর-আওলিয়া-দরবেশের হাতে পুনরায় বিক্রয় (বাইআত) করে তাহলে তা হবে কুরআন ও সহীহ সুন্নাহ বিরোধী।

বিবাহ

১। মুশরিক নারীকে ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা বিয়ে করনা এবং নিশ্চয়ই মু'মিন কৃতদাসী মুশরিক মহিলা অপেক্ষা উত্তম যদিও সে তোমাদেরকে মোহিত করে;

এবং অংশীবাদীরা বিশ্বাস স্থাপন না করা পর্যন্ত তাদের সাথে (মুসলিম নারীদের) **বিয়ে** দিওনা এবং নিশ্চয়ই অংশীবাদী তোমাদের মনঃপুত হলেও বিশ্বাসী দাস **তদপেক্ষা** শ্রেয়তর; এরাই জাহান্নামের দিকে আহ্বান করে এবং আল্লাহ স্বীয় **ইচ্ছায়** জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন ও মানবমন্ডলীর জন্য স্বীয় নিদর্শনাবলী বিবৃত করেন যেন তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। [সূরা বাকারা-২২১]

২। তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ করা হয়েছে তোমাদের মাতা, কন্যা, বোন, ফুফু, খালা, ভাইয়ের কন্যা, ভগ্নিকন্যা, দুগ্ধমাতা, দুগ্ধ ভগ্নি, শাশুড়ী ও তোমাদের স্ত্রীদের মধ্যে যার সাথে সংগত হয়েছ তার পূর্ব স্বামীর ঔরসে তার গর্ভজাত কন্যা, যারা তোমাদের অভিভাবকত্বে আছে, তবে যদি তাদের সাথে সংগত না হয়ে থাক তাতে তোমাদের কোন অপরাধ নেই এবং তোমাদের জন্য নিষিদ্ধ তোমাদের ঔরসজাত পুত্রের স্ত্রী ও দুই সহোদরা বোনকে একত্রে বিবাহ করা। পূর্বে যা হয়েছে, আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নিসা-২৩]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ চারটি বিষয়ের প্রতি লক্ষ্য রেখে সাধারণতঃ মেয়েদের বিয়ে করা হয়। যথা ঃ কন্যার ধন-সম্পদের কারণে, তার বংশীয় আভিজাত্যের কারণে, তার রূপ-গুণের কারণে এবং তার দীনী আমলের কারণে। তুমি ধার্মিকাকে পেয়ে ভাগ্যবান হও! [মুসলিম/৩৫০০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/৩২৩৩, বুখারী/৪৭১০]

৪। এক ব্যক্তি এক আনসারী মহিলাকে বিয়ের প্রস্তাব দিল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকে বললেন ঃ তুমি কি তাকে দেখেছ? সে বলল ঃ না। এরপর তিনি তাকে দেখার আদেশ করলেন। [নাসাঈ/৩২৩৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কোন স্ত্রীকে বা তার কন্যাদের কারও 'বার' আওকিয়ার অধিক মহোরানা দেননি। কোন ব্যক্তি তার স্ত্রীকে অধিক মহোরানা দান করে, শেষ পর্যন্ত ঐ স্ত্রীর প্রতি ঐ ব্যক্তির অন্তরে শত্রুতার সৃষ্টি হয়। [নাসাঈ/৩৩৫২-আবুল আজফা (রঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিয়ে করা আমার সুন্নাত। যে আমার সুন্নাত অনুসরণ করলনা সে আমার দলভুক্ত নয়। তোমরা বিয়ে কর, কেননা আমি তোমাদের নিয়ে অন্যান্য উম্মাতের উপর গর্ব করব। আর যার সামর্থ্য আছে সে যেন বিয়ে করে। [ইব্‌ন মাজাহ/১৮৪৬-আয়িশা (রাঃ)]

◫ একজন মুসলিমের দাম্পত্য জীবনের সূচনা হয় বৈবাহিক বন্ধনে। বিবাহের পূর্বে পাত্র-পাত্রী নির্বাচন জীবনের জন্য একটা গুরুত্বপূর্ণ বিষয় যা ভুল হলে সংসার জীবন হয়ে উঠে বিষাদময়। বিবাহের পূর্বে ইয়াহুদীদের প্রধান বিবেচ্য "অর্থ", খৃষ্টানদের প্রধান বিবেচ্য "সৌন্দর্য", হিন্দুদের প্রধান বিবেচ্য "বংশ", আর মুসলিমদের প্রধান বিবেচ্য হচ্ছে তাকওয়া বা আল্লাহ ভীতি। বিবাহের ক্ষেত্রে সমতা রক্ষা করা উচিত– যাকে বলা হয় কুফু। পাত্র/পাত্রী নির্বাচনের পর দ্বিতীয় যে বিষয়টি প্রাধান্য পাবে তা হল মহোরানা । সামর্থ্য অনুযায়ী পাত্র পাত্রীকে মহোরানা নগদে প্রদান করবে। বাকীতে নয়। দায়েন বা দেন মহোরানা নয়। বিশাল একটা অংক মহোরানা ধার্য হল, অথচ নগদ প্রদান করা হল সামান্য,

আর বাকী রইল বেশীটাই, এটা বৈধ নয়। আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ও সাহাবায়েকেরাম নগদ মহোরানা প্রদান করতেন সমর্থ অনুযায়ী। কাবিনও নয়, দেন মহোরানাও নয়। অথচ আজকের সমাজে এটা একটা অনৈতিক ব্যাধিরূপে প্রচলিত। মহোরানা হল স্ত্রীর ইজ্জত অধিকারের পবিত্র সনদ এবং স্ত্রীর হক। হককে না হক (বঞ্চিত) করলে তার সাথে সহবাস বৈধ নয় এবং এর পরিনতিও সুখকর নয়। সমাজে এই গুরুত্বপূর্ণ অবহেলিত বিষয়-টিকে বিবেচনায় আনতে হবে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ মনে করে। কেননা অধিকাংশই বাকী মহোরানার দলে। নগদ আদায়ের সংখ্যা নগণ্য। বিবাহ অনুষ্ঠানে খুতবা হবে, কিন্তু মিলাদ হবেনা। আর নব বধুকে সাজিয়ে প্রদর্শনীর জন্য বসিয়ে বা ফটো বা ভিডিও বা অন্যকে দেখানোর জন্য পত্র পত্রিকায়ও প্রকাশ করা যাবেনা। এ সকল কাজ মুসলিম হিসাবে জায়েয নয়।

বিবাহের দিন বা পরের দিন পাত্রের বাড়ীতে অলিমা খানার ব্যবস্থা করতে হবে সামর্থ্য অনুযায়ী যা সুন্নাত ও বারাকাতময়। কিন্তু তৃতীয় বা অন্য কোন দিবসে নয়। তাহলে সেটা বৌভাত হবে, অলিমা হবেনা। সুন্নাত ও বারাকাত হবেনা। আজকাল ঘটা করে বৌভাত করা হয় যা অন্য ধর্মের অনুকরণ মাত্র। ইসলামী শারীয়াত মতে বিয়ের অনুষ্ঠান, খাওয়া-দাওয়া ইত্যাদি ব্যাপারে যাবতীয় ব্যয়ভার বহন করবে বর অথবা বরের অভিভাবক। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক পথে চলার তাওফীক দান করুন।

বিয়ের অলিমা কখন করতে হবে?

❖ অলিমা অর্থ মুসলিমদের বৈবাহিক ভোজ, বিবাহ উৎসবে প্রদত্ত ভোজ।

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যাইনাব বিনতে জাহাশকে যখন বিয়ে করলেন তখনই অর্থাৎ দ্বিপ্রহরে লোকজনকে অলিমার দাওয়াত খেতে দেন এবং তা ছিল রুটি ও গোশত। এমন খানা আর কোন সহধর্মিণীর বিয়েতে তিনি দেননি এবং যেদিন বিয়ে সেই দিনই অলিমা ছিল। [মুসলিম/৩৩৬৭]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সহধর্মিণী সাওদাহ বিন্‌তে হুয়াই বিন আখতাব এর বেলায় বিয়ের পরের দিন অলিমার খানা খেতে দাওয়াত দিয়েছেন । [বুখারী/৩৮৮৩]

৩। সবচেয়ে মন্দ খাবার হল ঐ অলিমার খাবার যেখানে শুধু ধনীদের দাওয়াত করা হয় এবং গরীবদের উপেক্ষা করা হয়। আর যে ব্যক্তি দাওয়াত গ্রহণ করেনা সে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করে। [ইব্‌ন মাজাহ/১৯১৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

⊞ আমাদের দেশে এক ভিন্ন রেওয়াজ প্রচলিত। বিয়ে হয়ে গেলে তারপর সুযোগ সুবিধামত খানাপিনার ব্যবস্থা হয়। কিন্তু এ ধরণের লোক দেখানো খানা খেতে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন। [তিরমিযী/১০৯৭] বস্তুতঃ মুসলিমের কোন ইবাদাত (যথা ঃ সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, দান-খাইরাত কিংবা জিহাদ যা কিছুই হোক না কেন) লোক দেখানো কিংবা প্রদর্শনী

ও নাম কেনার জন্য হলে তাতে কোন সাওয়াব নেই, বরং পাপ ও আযাব রয়েছে। অথচ যদি অলিমা খানা ধনী-দরিদ্র সকলকে নিয়ে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসৃত নিয়মে করা যায় তাহলে প্রভূত কল্যাণ ও সাওয়াব পাওয়া যাবে।

বিয়ের যৌতুক

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

وَآتُواْ النَّسَاء صَدُقَاتِهِنَّ نِحْلَةً فَإِن طِبْنَ لَكُمْ عَن شَيْءٍ مِّنْهُ نَفْساً فَكُلُوهُ هَنِيئاً مَّرِيئاً

আর তোমরা সন্তুষ্ট চিত্তে নারীদের দিবে তাদের মহোরানা, তবে তারা খুশী হয়ে মহোরানার কিছু ছেড়ে দিলে তা তোমরা ভোগ করবে স্বচ্ছন্দে। সূরা নিসা- ৪]

২। আবদুর রহমান ইব্‌ন আউফ (রাঃ) কোন এক মহিলাকে বিয়ে করলেন এবং তাকে মহোরানা হিসাবে খেজুর দানার পরিমাণ স্বর্ণ দিলেন। [বুখারী/৪৭৬২]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে বললেন ঃ তুমি বিয়ে কর একটি লোহার আংটির বিনিময় হলেও। [বুখারী/৪৭৬৪]

◻ আমাদের দেশে বিয়ের প্রাক্কালে কনে পক্ষের তরফ থেকে বর পক্ষ যে ধন সম্পদের দাবী করে তা হল যৌতুক। এটা আইয়্যামে জাহিলিয়া নয়, বরং হিন্দু সমাজ থেকে পাওয়া। ওদের জাতিভেদ প্রথা ও বর্ণে বর্ণে বিবাহ রীতির ফলে কন্যাদায়গ্রস্থ পিতা এক মহাসংকটে পড়ে। কেননা জাতিভেদ রীতির জন্য বিবাহের ক্ষেত্র সংকুচিত ও সীমাবদ্ধ। ব্রাহ্মণ, ক্ষত্রিয়, বৈশ্য ও শুদ্র- কেহ কারো ছেলে-মেয়ের বিবাহ নিজ নিজ বর্ণ ছাড়া দিতে পারেনা। জাতপাট কঠিনভাবে মেনে চলার কারণে দরিদ্র কন্যার পিতার অবস্থা খুবই নাজুক হয়ে পড়ে। আর ছেলে বা বরের মূল্য তার অভিভাবক বেশ যাচাই বাছাই করে মেপে মেপে যতটা সম্ভব বৃদ্ধি করে। অর্থাৎ ছেলের মূল্য বিবাহের সময়ে কন্যার পিতার নিকট হতে কড়ায় গন্ডায় হিসাব করে নেয়া হয়। সমাজের এই দুরারোগ্য নৃশংস রেওয়াজের প্রতি অঙ্গুলি নির্দেশ করে উপন্যাসিক শরৎচন্দ্র চট্টোপাধ্যায় তার শ্রেষ্ঠ উপন্যাস শ্রীকান্তে বলেছেন ঃ "ওগো ! তোমাদের পুটির বরের মূল্য কি আট হাজার টাকার একটি কড়িও কমে হবেনা?"

ঠিক হিন্দুদের ঐ সামাজিক ব্যাধিটা তথাকথিত মুসলিম পরিবারের মধ্যে প্রবেশ করেছে। আজ কোন কোন মুসলিমকে দেখে ইসলাম যেমন চিনা বা জানা যায়না, তেমনি ইসলামকে জানতে হলে তাদের রীতি-নীতির দিকেও তাকান যায়না। ইসলাম কেবল কুরআনে ও হাদীসের কিতাবেই তা বন্দী। তা না হলে কন্যাকে মহোরানা প্রদান করে তার সম্মান যেখানে হালাল করার বিধান, সেখানে কাফির মুশরিকদের রীতির চর্চায় কন্যার পিতাকে ক্রমবর্ধমান চাহিদা মোতাবেক অর্থ যোগান দিতেই কন্যার পিতার দশা বারটা বেজে ভিটে ছাড়া হয় কেন? এই হারাম যৌতুকের জন্য কত নারীর জীবন যে নির্যাতিত, এসিড দগ্ধ এবং প্রাণ সংহারে অকালে ঝরে পড়ছে তার জন্য শাসক তথা সমাজপতিদের কি চিন্তা শক্তি উদয় হবেনা? এ ব্যাধি, এ হারাম শাইতানী চাহিদা গ্রাম-

বাংলায়ই নয়- শহরে শিক্ষিত, অশিক্ষিত, অভিজাত মহলেও ঠাঁই নিয়েছে। অথচ কাবিননামায় মহোরানা নগদ অর্থে পরিশোধে ধর্মীয় বিধান নাকচ করে সেখানে অবলীলাক্রমে ঠাঁই পেয়েছে যৌতুক। এ ক্ষেত্রে খাতীব সাহেবদেরকে জুম'আর খুতবায় 'মহোরানা বনাম যৌতুক' ও গ্রাম মহল্লার প্রধান এবং আইনের মাধ্যমে এ বিষয়ে জনসাধারণকে অবহিত করতে হবে। ছেলেদেরকে বুঝাতে হবে এটা কত নীচু, হীন এবং অমানবিক পুরুষের জন্য অবমাননাকর রীতি যে, মেয়ের পিতার নিকট হতে জোর করে যৌতুক নামক অর্থ কেড়ে নেয়া হচ্ছে। এটা এক ধরণের সন্ত্রাসী, ডাকাতি ও ছিনতাই যার জন্য নেমে আসে একটা অসহায় নিরপরাধ নারীর জীবনে যুল্ম, নির্যাতন এবং আত্মহনন।

বার চাঁদের ফাযীলাত

১। নিশ্চয়ই আকাশমন্ডলী ও পৃথিবী সৃষ্টির দিন থেকে আল্লাহর বিধানে মাস গণনায় বারটি। এর মধ্যে বিশেষ রূপে চারটি মাস হচ্ছে সম্মানিত। এটাই হচ্ছে সুপ্রতিষ্ঠিত ধর্ম। অতএব তোমরা এ মাসগুলিতে (ধর্মের বিরুদ্ধাচরণ করে) নিজেদের ক্ষতি সাধন করনা, আর মুশরিকদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ কর, যেমন তারা তোমাদের বিরুদ্ধে সকলে একযোগে যুদ্ধ করে। আর জেনে রেখ যে, আল্লাহ মুত্তাকীদের সাথে রয়েছেন। [সূরা তাওবা-৩৬]

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, রাসূলের আনুগত্য কর এবং তোমাদের কর্মফল বিনষ্ট করনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমাণও হয়। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করে সে যেন জাহান্নামকেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নেয়। [বুখারী/৩২০৭]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের এ দীনের মাঝে যদি কেহ এমন কিছু উদ্ভাবন করে যা দীনের নয়, তা পরিত্যাজ্য। [মুসলিম/৪৩৪৪, ইব্ন মাজাহ/১৪]

৫। কুরআনই সর্বশ্রেষ্ঠ এবং সব হিদায়াতের চেয়ে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াতই উৎকৃষ্ট। দীনের মাঝে নতুন কিছু উদ্ভাবন করা সর্বাপেক্ষা মন্দ কাজ এবং প্রত্যেক বিদ'আতই গুমরাহী। [মুসলিম/১৮৭৫, ইব্ন মাজাহ/৪৫]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে তার দীন পরিবর্তন করে, তাকে কতল কর। [ইব্ন মাজাহ/২৫৩৫]

⧉ আরাবী বার মাসের নাম হল ঃ মুহাররাম, সফর, রবিউল আওয়াল, রবিউস সানী, জমাদিউল আওয়াল, জমাদিউস সানী, শাবান, রামাযান, শাওয়াল, যিলকাদ, যিলহাজ্জ। কুরআন মোতাবেক যিলকাদ, যিলহাজ্জ, মুহাররাম ও রজব পবিত্র মাস হওয়ায় এ মাসসমূহে যুদ্ধ-বিগ্রহ করা নিষেদ। এ কথার অর্থ এই নয় যে, অন্যান্য মাসে তা বৈধ; বরং শারীয়াত বিরোধী কাজ সব সময় অবৈধ। তবে স্থান-কাল-পাত্র ভেদে এ অবৈধতার মাত্রা কঠিন থেকে

কঠিনতর হয়। বার চাঁদের মাসে কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক কি কি করণীয় আমল রয়েছে এবং বর্তমান সমাজে কোন আমলগুলি প্রচলিত আছে তা সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল।

মুহাররাম

১। কুরাইশরা জাহিলি যুগে আশুরার দিন (১০ই মুহাররাম) সিয়াম পালন করত। রামাযান মাসের সিয়াম (রোযা) ফারয হওয়ার পূর্বে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এ দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিতেন। রামাযান মাসের সিয়াম (রোযা) ফারয হওয়ার পর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যার ইচ্ছা, সে এদিন সিয়াম পালন করবে, আর যার ইচ্ছা সে তা ছেড়ে দিবে। [বুখারী/১৭৬৭, মুসলিম/২৫০৮, তিরমিযী/৭৫১]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ রামাযান মাসের সিয়ামের পর সর্বোত্তম সিয়াম হচ্ছে আল্লাহর মাস মুহাররামের সিয়াম। [মুসলিম/২৬২২]

৩। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুহাররাম মাসের নবম ও দশম তারিখে (এই দুই দিন) তারিখ আশুরার সিয়াম পালন করতে নির্দেশ দিয়েছেন। কারন ইয়াহুদীরা কেবল দশ তারিখ সিয়াম পালন করত। [তিরমিযী/৭৫৩]

(১) মূসা (আঃ) ও স্বীয় কওম মহা-বিপদ হতে নাজাত পাওয়ায় মহান আল্লাহর শুকরিয়া জ্ঞাপনার্থে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে ও স্বীয় উম্মাতকে মুহাররাম মাসে আশুরার দুই দিন সিয়াম পালনে উৎসাহিত করেছেন।

(২) বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখকের বইয়ে সংশ্লিষ্ট মাসের ফাযীলাতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, যদি কোন ব্যক্তি আশুরার রাতে ৪ রাক'আত সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহা একবার ও সূরা ইখলাস ৫০০ বার পাঠ করে, তাহলে তার প্রতি আল্লাহ তা'আলার খাস রাহমাত নাযিল হয়ে থাকে যা অন্য কোন লোকের ভাগ্যে জোটেনা। ** কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীসে এরূপ আমল ও সালাত আদায়ের কোন নিয়ম-কানূন পাওয়া যায়না।

(৩) সম্মানিত পাঠক/পাঠিকাদের নিকট অনুরোধ মুহাররাম মাস কিংবা অন্য যে কোন মাসের ফাযীলাত কেহ বর্ণনা করলে দয়া করে তাকে অবশ্যই জিজ্ঞেস করবেন যে, আপনি বিভিন্ন ফাযীলাতের যে সকল বর্ণনা দিচ্ছেন এগুলি কি কুরআন ও সহীহ হাদীসে আছে? যদি সেই ব্যক্তি কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে দেখাতে পারে তাহলেই ঐগুলি আমল করবেন। কুরআন ও সহীহ হাদীসের দলীল ও প্রমাণ ব্যতীত কারও কথায় বিশ্বাস করে আমল করা উচিত নয়।

সফর

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রতি মাসে তিন দিন করে সিয়াম পালন কর। কারণ সাওয়াবের কাজের ফল দশগুণ, এভাবেই সারা বছরের সিয়াম পালন করা হয়ে যাবে। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/ ২৪১৩]

২। আবূ যার (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [নাসাঈ/২৪২৫]

(১) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম সফর মাসে 'আখেরী চাহার শোম্বা' দিবস পালন করেন। 'আখেরী' শব্দের আরাবী ভাষায় অর্থ হল শেষ এবং 'চাহার শোম্বা' শব্দের ফার্সী ভাষায় অর্থ হল বুধবার। অর্থাৎ সফর মাসের শেষ বুধবার। এ বাক্যটি আরাবী এবং ফার্সী শব্দ সমন্বয়ে গঠিত হয়েছে। এ দিনটি পৃথিবীর মুসলিমদের কাছে খুশির দিন হিসাবে বিবেচিত হয়ে আসছে। কারণ নাবী (সাঃ) সফর মাসে রোগাক্রান্ত অবস্থায় ছিলেন এবং ঐ দিন কিছুটা সুস্থতা বোধ করেছিলেন।

এ ছাড়াও বলা হয় যে, আমাদের প্রিয় নাবী মুহাম্মাদ (সাঃ) এর সেই দিনের গোসলই ছিল জীবনের শেষ গোসল। তারপর তিনি যতদিন বেঁচে ছিলেন, পুনরায় আর গোসল করার সুযোগ পাননি। কেননা এর পরই তাঁর রোগ বাড়তির দিকে যেতে থাকে। সেই সময় থেকে 'আখেরী চাহার শোম্বা' দিনটিতে ইবাদাত-বন্দেগী ও দান খাইরাতের মাধ্যমে পালন করে আসছেন।

(২) কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক কোথাও 'আখেরী চাহার শোম্বা' দিবস পালন করা অথবা সেই দিন উপলক্ষ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করা কিংবা এই মাসের কোন ফাযীলাতের বর্ণনা পাওয়া যায়না।

রবিউল আওয়াল

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/২৪২৫]

(১) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম রবিউল আওয়াল মাসে 'ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম' দিবস পালন করেন। রবিউল আওয়াল চাঁদের ১২ তারিখ 'ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম' নামে খ্যাত। 'ফাতেহা' শব্দটি একটি আরাবী শব্দ। এর আধ্যাত্মিক অর্থ হল মৃতের মাগফিরাত কামনা করে দু'আ করা, সাওয়াব রেসানী করা এবং 'ইয়াজদাহম' ফার্সী শব্দ এর অর্থ হল ১২। অতএব শব্দগুলির সম্মিলিত অর্থ হল রবিউল আওয়াল মাসের ১২ তারিখ দু'আ, দুরূদ, নাফল সালাত, কুরআন তিলাওয়াত ও দান খাইরাত করে মৃতের জন্য বিশেষ করে নাবী কারীম (সাঃ) এর রূহ মোবারকে সওয়াব রেসানী করা।

আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও পূর্ববর্তী কোন নাবীর জন্ম বা মৃত্যু দিবস পালন করেননি। নাবী (সাঃ) নিজের জীবদ্দশায় কখনও

জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেননি। সাহাবাগণও (রাঃ) তা পালন করেননি। আরাব জাহানের লোকেরাও জন্ম/মৃত্যুবার্ষিকী পালন করেননা।
রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) পরবর্তী সম্মানিত খুলাফায়ে রাশিদীন ও অন্যান্য সাহাবীগণ ভাল করেই জানতেন কবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্ম গ্রহণ করেছেন। তারা সঠিকভাবে জানতেন, তিনি কোন দিন/তারিখ মাক্কা থেকে মাদীনায় হিজরাত করেছেন। তারা নির্দিষ্ট করে জানতেন, তাঁর বিজয়ের দিনগুলিও। তারা সঠিকভাবে জানতেন যে, কোন তারিখে তাঁর মৃত্যু হয়েছে। এতদসত্ত্বেও তাঁরা ঐ সব দিনগুলিতে এ জাতীয় কাজ/অনুষ্ঠান করেছেন বলে হাদীসে বা ইতিহাসে কোন বর্ণনা পাওয়া যায়না। রাসূল (সাঃ) সাহাবীগণের কাছে সর্বাধিক প্রিয়জন ছিলেন এবং তারা তাঁকে সত্যিকার অর্থে পূর্ণ মাত্রায় ভালবাসতেন। এত কিছুর পরও রাসূলের (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) ব্যাপারে তারা কোন নতুন বিষয় উদ্ভাবন করেননি কিংবা কোন বিদ'আতের প্রবর্তন করেছেন বলে জানা যায়না। তারাই তো ছিলেন তাঁর জীবন পদ্ধতির সঠিক অনুসরণকারী, তাঁর অনুগত এবং তাঁরই আদর্শে আদর্শবান সর্বোত্তম জনগোষ্ঠী। তাই পরবর্তী মুসলিমদের আচরণও এমনটিই হওয়া উচিত।
(২) কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক কোথাও 'ফাতেহা-ই-ইয়াজদাহম' দিবস পালন করা কিংবা ঐ দিবস উপলক্ষ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করা অথবা এই মাসের কোন ফাযীলাতের বর্ণনা পাওয়া যায়না।

রবিউস সানী

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/২৪২৫]

বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম রবিউস সানী মাসকে 'চেহলাম' অনুষ্ঠিত হওয়ার মাস হিসাবে পালন করেন। এই মাসটি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেহলাম অনুষ্ঠিত হওয়ার মাস। এই মাসের ১১ তারিখ অতিক্রান্ত হওয়ার পর ১২ রবিউস সানী রাত্র অর্থাৎ ১২ রবিউল আওয়াল থেকে গণনা করে ৩৯ দিনের দিবাগত রাত্রে চল্লিশা রাতে কুরআনখানী, দু'আ-দুরূদ, তাসবীহ-তাহ্লীল, মিলাদ-মাহফিল করে নাবী (সাঃ) এর জীবনী আলোচনা করা খুবই সাওয়াবের কাজ। সে লক্ষ্যে গরীব-মিসকীনদেরকে দান-খাইরাত ও ভোজের আয়োজন করাও বিরাট সাওয়াবের কাজ হিসাবে বিবেচিত করা হয়। চল্লিশা পালন করার প্রথা কুরআন ও হাদীসের কোথাও নেই। এটা নব আবিস্কৃত কু-সংস্কার। কাজেই এটা বর্জনীয় ও পাপের কাজ। এতে মৃত ব্যক্তির উপকার হওয়ার কোন দলীল দ্বারা প্রমাণিত নয়। চেহলাম অর্থ চল্লিশতম দিন। মৃত ব্যক্তির মৃত্যুর চল্লিশতম (৪০) দিবসে তার রুহের মাগফিরাতের জন্য তার আত্মীয়-স্বজন, গ্রামের

মোল্লা-মুন্সী ও গরীবদেরকে ডেকে সূরা ইখলাস, নির্দিষ্ট সংখ্যায় দুরূদ পাঠ ও ছোলার দানা বা তেঁতুল বিচি সংগ্রহ করে মৃতের নামে সোয়া লক্ষবার কালেমা পাঠ করা এবং কুরআনের কিয়দংশ পাঠ করে তা মৃতের নামে 'বখশে' দিয়ে সকলে একত্র হয়ে হাত উত্তোলন করে লম্বা একখানা মুনাজাত করা এবং ভাল মানের খানা-পিনা পরিবেশন করা হয়। এটাই চেহলাম নামে পরিচিত।

এ রীতিটি একেবারেই বানোয়াট ও জালিয়াতী। এ সকল দিবসে মৃতের জন্য কোন অনুষ্ঠান করার বিষয়ে কোন প্রকার নির্দেশ কুরআন ও সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি। তবে মৃতের জন্য সদা-সর্বদা বা সুযোগমত দু'আ করা যাবে। বিশেষ করে সন্তানগণ দু'আ ও দান-খাইরাত করবেন এবং এ সবই হতে হবে অনানুষ্ঠানিক অর্থাৎ রেওয়াজ সৃষ্টি হবে এমন ভাবে নয়।

(২) কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক কোথাও 'চেহলাম' অনুষ্ঠিত হওয়ার দিবস পালন করা অথবা ঐ দিবসে উপলক্ষ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করা কিংবা এই মাসের কোন ফাযীলাতের বর্ণনা পাওয়া যায়না।.

জমাদিউল আওয়াল

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/২৪২৫]

⊞ বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখকের বইয়ে সংশ্লিষ্ট মাসের ফাযীলাতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, যে দিন প্রথম জমাদিউল আওয়াল মাসের চাঁদ দৃষ্টিগোচর হবে সে রাত্রে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে ৪ রাক'আত নাফল সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস ৩ বার করে পড়ে দু'আ ও মুনাজাত করলে বিশেষ সাওয়াবের অধিকারী হওয়া যায়। ** কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীসে এরূপ আমল ও সালাত আদায়ের কোন নিয়ম-কানূন পাওয়া যায়না।

জমাদিউস সানী

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/২৪২৫]

⊞ বাংলাদেশের বিভিন্ন লেখকের বইয়ে সংশ্লিষ্ট মাসের ফাযীলাতের বর্ণনায় দেখা যায় যে, কেহ যদি এই মাসের চাঁদ দেখার রাত্রে মাগরিব ও ইশার মধ্যবর্তী সময়ে দু' দু' রাক'আত করে তিন সালামে ৬ রাক'আত সালাতের প্রত্যেক রাক'আতে সূরা ফাতিহার পর সূরা ইখলাস তিন তিন বার পাঠ করার নিয়ম আছে। বলা হয়েছে যে, এতে বিরাট সাওয়াব ও আল্লাহ তা'আলার নৈকট্য লাভ হয়। ** কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীসে এরূপ আমল ও সালাত আদায়ের কোন নিয়ম-কানূন পাওয়া যায়না।

রজব

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/২৪২৫]

(১) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম ২৭শে রজবের রাত 'শবে মিরাজ' হিসাবে পালন করেন । নিঃসন্দেহে মিরাজের ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য নাবী হওয়ার অন্যতম একটি দলীল। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মিরাজের ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু ২৭শে রজবের রাত 'শবে মিরাজ' বলে যে বক্তব্য আমাদের দেশে প্রচলিত আছে তা সম্পূর্ণ ভিত্তিহীন। কুরআন বা সহীহ হাদীসে মিরাজের ঘটনার কোন নির্দ্দিষ্ট তারিখ ও মাসের নাম উল্লেখ নেই। যদি নির্দিষ্ট তারিখ প্রমাণিত হয় তবুও এ রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন ইবাদাত করা বা অনুষ্ঠান করা জায়েয হবেনা। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান উৎযাপন করেননি বা সেই ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনাও দেননি। অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাত পৌঁছিয়েছেন এবং স্বীয় আমানাতও যথাযথভাবে আদায় করেছেন। যদি এ রাতকে সম্মান করা এবং তা নিয়ে অনুষ্ঠান করা দীনের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তিনি অবশ্যই তা আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন।

(২) কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক কোথাও 'শবে মিরাজ' দিবস পালন করা অথবা ঐ দিন উপলক্ষ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করা কিংবা এই মাসের কোন ফাযীলাতের বর্ণনা পাওয়া যায়না।

শাবান

১। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে রামাযান ব্যতীত কোন পুরা মাসের সিয়াম পালন করতে দেখিনি এবং শাবান মাসের চেয়ে কোন মাসে বেশি (নাফল) সিয়াম পালন করতে দেখিনি। [বুখারী/১৮৪০, মুসলিম/২৫৮৮]

(১) বাংলাদেশের অধিকাংশ মুসলিম আরাবী শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবে বরাত' হিসাবে পালন করেন। 'শব' একটি ফার্সী শব্দ এর অর্থ রাত এবং 'বরাত' একটি ফার্সী শব্দ এর অর্থ ভাগ্য। দু'টি শব্দ ফার্সী হওয়ায় কুরআন ও সহীহ হাদীসে 'শবে বরাত' বা 'লায়লাতুল বরাত' নামে কোনই শব্দ নেই। আরাবী শাবান মাসের ১৪ তারিখ দিবাগত রাতকে সাধারণভাবে 'শবে বরাত' বলা হয়। আমাদের দেশে 'শবে বরাতকে' ভাগ্য রজনী হিসাবেই পালিত হয়। এজন্য সরকারী ছুটি ঘোষিত হয়। লোকেরা ধারণা করে যে, এ রাতে বান্দাহ্‌র পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয় এবং সৃষ্টিকুলের হায়াত, মউত, রিযিক, দৌলত, উন্নতি-

অবনতি, সুখ-দুঃখ, উত্থান-পতন, ভাল-মন্দ, রোগ-ব্যাধি ইত্যাদি আগামী এক বছরের জন্য লিপিবদ্ধ করা হয়। এই রাতে রূহগুলো সব আত্মীয়-স্বজনের সাথে মুলাকাতের জন্য পৃথিবীতে নেমে আসে। বিশেষ করে বিধবারা মনে করেন যে, তাদের স্বামীদের রূহ ঐ রাতে ঘরে ফিরে। এজন্য ঘরের মধ্যে আলো জ্বেলে তারা সারারাত মৃত স্বামীর রূহের আগমনের আশায় বুক বেঁধে বসে থাকেন। অফিসে, বাসগৃহে ধুপ-ধুনা, আগরবাতী, মোমবাতী ও অগণিত বাল্ব জ্বালিয়ে আলোকসজ্জা করা হয়। আত্মীয়রা সব দলে দলে কাবরস্থানে ছুটে যায়। হালুয়া-রুটির হিড়িক পড়ে যায়। ছেলেরা পটকা ফাটিয়ে, আতশবাজি করে হৈ-হুল্লোড়ে রাত কাটিয়ে দেয়। যারা কখনো সালাতে অভ্যস্ত নয়, তারাও ঐ রাতে মাসজিদে গিয়ে ১০০ রাক'আত সালাত আদায়ে রত হয় এবং প্রতি রাকা'আতে ১০ বার করে সূরা ইখলাস পাঠ করা হয়। তারপর রাতের শেষ দিকে ক্লান্ত হয়ে সবাই বাড়ী ফিরে ঘুমিয়ে পড়েন। এক সময় ফাজরের আযান হয়, কিন্তু মাসজিদগুলোতে আশানুরূপ মুসল্লী থাকেনা। ১৩ কোটি মুসলিমের এই দরিদ্র দেশে এই রাতকে উপলক্ষ্য করে কত লক্ষ কোটি টাকা যে শুধু আলোকসজ্জার নামে আগরবাতি, মোমবাতি ও বিদ্যুৎ বাল্ব জ্বালান হয় তার হিসাব কে রাখে? অন্যান্য খরচের হিসাব না হয় বাদই দিলাম। সংক্ষেপে এই হল এদেশে 'শবে বরাতের' নামে প্রচলিত ইসলামী পর্বের বাস্তব চিত্র। (বিস্তারিত দেখুন এই বইয়ে 'শবে বরাত' বিষয়ের সংকলন)

(২) কুরআন ও সহীহ্ হাদীস মোতাবেক কোথাও 'শবে বরাত' দিবস পালন করা অথবা ঐ দিন উপলক্ষ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করা কিংবা এই মাসের কোন ফাযীলাতের বর্ণনা পাওয়া যায়না।

রামাযান

১। হে মু'মিনগণ! তোমাদের জন্য সিয়ামের বিধান দেয়া হল, যেমন বিধান তোমাদের পূর্ববর্তীগণকে দেয়া হয়েছিল, যাতে তোমরা মুত্তাকী হতে পার। [সূরা বাকারা-১৮৩]

২। যে ব্যক্তি ঈমানসহ সাওয়াবের আশায় রামাযান মাসের সিয়াম (রোযা) পালন করে তার অতীতের সমস্ত পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [বুখারী/১৭৭৫]

৩। জান্নাতের মাঝে রাইয়ান নামক এক দরজা আছে। এ দরজা দিয়ে কিয়ামাতের দিন সিয়াম পালনকারীরাই (রোযাদার ব্যক্তি) প্রবেশ করবে। [বুখারী/১৭৭০, মুসলিম/২৫৭৭]

৪। যে ব্যক্তি রামাযান মাসের রাতে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [বুখারী/১৮৭৭]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসের শেষ দশ দিন ই'তিকাফ করতেন এবং বলতেন ঃ তোমরা রামাযান মাসের শেষ দশ দিন লাইলাতুল কাদ্‌র তালাশ কর। [বুখারী/১৮৮৮]

শাওয়াল

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিতরের দিন (শাওয়াল মাসের প্রথম তারিখ) কিছু খেজুর না খেয়ে বের হতেননা। [বুখারী/৯০০]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালিকা, তরুণী, গৃহিণী, যুবতী সকল মহিলাকেই সালাতুল ঈদে বের হওয়ার জন্য বলতেন। তবে রজঃবতী মহিলারা সালাত স্থল থেকে দূরে থাকতেন। তারা কেবল মুসলিমদের সঙ্গে দু'আয় শরীক হতেন। জনৈক মহিলা একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ যদি কারও চাদর না থাকে তাহলে সে কিভাবে বের হবে? তিনি বললেন ঃ তার কোন বোন তাকে একটি চাদর ধার দিবে। [বুখারী/৯২৩, তিরমিযী/৫৩৯]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতের উদ্দেশে যাত্রা করার পূর্বেই সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করার নির্দেশ দেন। [বুখারী/১৪১৬, তিরমিযী/৬৭৪]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদুল ফিত্‌র ও ঈদুল আযহার দিনসমূহে সিয়াম পালন করতে নিষেধ করেছেন। [বুখারী/১৮৬২, মুসলিম/২৫৩৯, তিরমিযী/৭৭০]

৫। রামাযান মাসের সিয়াম পালন করার পরে শাওয়াল মাসে ছয় দিন সিয়াম পালন করা সারা বছর সিয়াম (রোযা) পালন করার মত। [মুসলিম/২৬২৫, তিরমিযী/৭৫৭, ইব্‌ন মাজাহ/১৭১৬]

অন্যান্য মাসের মত এটিও একটি আরাবী চান্দ্র মাস সংখ্যার হিসাবে দশম মাস। রামাযান মাসের ২৯ বা ৩০ দিনের সূর্যাস্তের সঙ্গে সঙ্গে এ মাসের আরম্ভ। পরের দিন 'ঈদুল ফিতর'-এর দিন, বিশ্ব মুসলিমের খুশীর দিন। গরীবকে ধনীর সহানুভূতি ও সাহায্য তথা 'ফিৎরা' দানের দিন। এটা ভোজের দিবসও বটে। বছরে যে কয়দিন রোযা রাখা নিষেধ, তন্মধ্যে এটি একটি। মুসলিম বিশ্বে আদর্শের দিক হতে এই দিনটি অতি সম্মানিত ও আনন্দের।

যিলকাদ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে প্রত্যেক মাসে আইয়ামে বীযের তিন দিন সিয়াম পালন করার নির্দেশ দিয়েছেন অর্থাৎ চাঁদের মাসের তের, চৌদ্দ এবং পনের তারিখ। [বুখারী/১৮৪৭, মুসলিম/২৬০৩, নাসাঈ/২৪২৫]

কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক এই চন্দ্র মাসটি সম্মানীত। তবে এই মাস উপলক্ষ্যে ইবাদাত-বন্দেগী করা অথবা এই মাসের অন্য কোন ফাযীলাতের বর্ণনা পাওয়া যায়না।

যিলহাজ্জ

১। তোমরা আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ ও উমরা পূর্ণ কর--। [সূরা বাকারা-১৯৬]

২। নিশ্চয়ই সাফা ও মারওয়া আল্লাহর নিদর্শনসমূহের অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং যে কেহ কা'বা গৃহের হাজ্জ কিংবা উমরা সম্পন্ন করে এই দু'টির মধ্যে সা'ঈ করলে তার কোন পাপ নেই, আর কেহ স্বতঃস্ফূর্তভাবে সৎকাজ করলে আল্লাহ তো পুরস্কারদাতা, সর্বজ্ঞ। [সূরা বাকারা-১৫৮]

৩। আল্লাহর কাছে পৌঁছেনা ওগুলির গোশত এবং রক্ত, বরং পৌঁছে তোমাদের তাকওয়া; এভাবে তিনি ওগুলিকে তোমাদের অধীন করে দিয়েছেন যাতে তোমরা আল্লাহর শ্রেষ্ঠত্ব ঘোষণা কর এ জন্য যে, তিনি তোমাদেরকে পথ প্রদর্শন করেছেন; সুতরাং তুমি সুসংবাদ দাও সৎ কর্মশীলদেরকে। [সূরা হাজ্জ-৩৭]

৪। আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাস'উদ (রাঃ) তাকবীর দিতেন 'আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ, আল্লাহু আকবার, আল্লাহু আকবার, ওয়া লিল্লাহিল হাম্‌দ। (মুসান্নাফ ইব্‌ন আবী শাইবাহ, ইরওয়া ৩/১২৫ পৃঃ)।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন (যিলহাজ্জের চাঁদের) প্রথম দশ দিন উপস্থিত হয় আর কারও নিকট কুরবানীর পশু থাকে, যা সে যবাহ করার নিয়াত রাখে, তাহলে সে যেন কুরবানী করার আগ পর্যন্ত তার চুল না ছাটে এবং নখ না কাটে। [মুসলিম/৪৯৫৬, আবূ দাউদ/২৭৮২, ইব্‌ন মাজাহ/৩১৪৯, নাসাঈ/৪৩৬৩]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের এ দিনে (১০ যিলহাজ্জ) আমরা সর্বপ্রথম যে কাজটি করব তা হল সালাত আদায় করা। এরপর ফিরে এসে আমরা কুরবানী করব। [বুখারী/৫১৩৪]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কুরবানীর গোশত তোমরা নিজেরা খাও, অন্যকে খাওয়াও এবং সঞ্চয় করে রাখ। [বুখারী/৫১৫৮, মুসলিম/৪৯৪৭]

৮। বুরায়দা (রাঃ) বলেছেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরবানীর দিন ঈদগাহ থেকে প্রত্যাবর্তন না করে আহার করতেননা। [ইব্‌ন মাজাহ/১৭৫৬, তিরমিযী/৫৪২]

৯। যে ব্যক্তি আরাফা দিবসে সিয়াম পালন করে তার এক বছর আগের ও পরের বছরের পাপরাশি ক্ষমা করে দেয়া হয়। [ইব্‌ন মাজাহ/১৭৩১]

১০। আরাফার দিন আরাফাতের মায়দানে হাজীদের জন্য সিয়াম পালন না করা মুস্তাহাব। [মুসলিম/২৫০৩]

১১। যে সকল হাজ্জ পালনকারী কুরবানী দিতে পারেনি তারা ব্যতীত অন্যান্যদের আইয়্যামে তাশরীকের (যিলহাজ্জ মাসের ১০, ১১, ১২ ও ১৩ তারিখকে আইয়্যামে তাশরীক বলা হয়) দিনগুলিতে সিয়াম (রোযা) পালন করা নিষেধ। [তিরমিযী/৭৭১]

বিচার ফাইসালা করা

১। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদেরকে নির্দেশ দিচ্ছেন, হকদারদের হক তাদের কাছে পৌঁছে দিতে। তোমরা যখন মানুষের মাঝে বিচার করবে তখন ন্যায়পরায়ণতার সঙ্গে বিচার করবে। আল্লাহ তোমাদেরকে কত উত্তম উপদেশই না দিচ্ছেন । নিশ্চয়ই আল্লাহ সবকিছু শোনেন, সবকিছু দেখেন। [সূরা নিসা-৫৮]

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের অনুগত হও এবং তোমাদের জন্য যারা বিচারক তাদের; অতঃপর যদি তোমাদের মধ্যে কোন বিষয়ে কোন মতবিরোধ হয় তাহলে আল্লাহ ও রাসূলের দিকে প্রত্যাবর্তিত হও, যদি তোমরা আল্লাহ ও পরকালের প্রতি বিশ্বাস করে থাক; এটাই কল্যাণকর ও শ্রেষ্ঠতর পরিসমাপ্তি। [সূরা নিসা-৫৯]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা- ৮৫, ২০৮, নিসা- ৬০, ৬৫।

৪। যদি কোন বিচারক যথাযথ চিন্তা-গবেষণার পর রায় দেন, অতঃপর তিনি সঠিক সিদ্ধান্তে উপনীত হন, তার জন্য রয়েছে দু'টি পুরস্কার। আর তিনি যদি চিন্তা-গবেষণা (ইজতিহাদ) করে রায় প্রদানের সময় ভুল করেন তবুও তার জন্য রয়েছে একটি পুরস্কার। [মুসলিম/৪৩৩৮-আমর ইব্ন আস (রাঃ)]

৫। বিচারের ক্ষেত্রে ঘুষখোর ও ঘুষদাতাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। [তিরমিযী/১৩৪১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), আবূ দাউদ/৩৫৪২]

আল্লাহ তা'আলার প্রতি ঈমান আনা ও তাঁর সকল প্রকার ইবাদাত করা, তাঁর হুকুমের অনুগত্য করা, তাঁর শারীয়াতের প্রতি সন্তুষ্ট থাকা এবং শারীয়াতের ক্ষেত্রে মতের বিরুদ্ধে ও শারীয়াতের মৌল নীতিসমূহের বিষয়ে ও মামলা-মুকাদ্দামায়, খুনের ব্যাপারে, অর্থ বন্টন নীতিতে ও সমস্ত অধিকারের ক্ষেত্রে আল্লাহ তা'আলা এবং তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের অনুগত্য করা অপরিহার্য। কেননা আল্লাহ তা'আলাই একমাত্র সর্ব বিষয়ের বিধানদাতা ও তাঁর কাছেই রয়েছে বিচার ফাইসালার চাবিকাঠি। সুতরাং শাসক ও বিচারকদের উপর কর্তব্য হল আল্লাহ প্রদত্ত বিধান অনুযায়ী দেশ পরিচালনা করা ও ফাইসালা দেয়া। আর জনগণের উপর কর্তব্য কুরআন ও সুন্নাহর আলোকে বিচার চাওয়া ও মান্য করা।

আল্লাহ ও বান্দাদের মধ্যে বুজুর্গ, পীর, দরবেশের মধ্যস্থতাকারী হওয়ার দাবী একেবারেই ভিত্তিহীন

১। আর তারা আল্লাহকে ছেড়ে 'ইবাদাত করে এমন কিছুর যা না পারে তাদের কোন ক্ষতি করতে, আর না পারে কোন উপকার করতে। আর তারা বলে, "ওগুলো আমাদের জন্য আল্লাহর কাছে সুপারিশকারী"। বল ঃ "তোমরা কি আল্লাহকে এমন কিছুর সংবাদ দিতে চাও আকাশমন্ডলীতে যার অস্তিত্ব সম্পর্কে না কিছু তিনি জানেন, আর না জানেন যমীনে থাকা সম্পর্কে। মহান পবিত্র তিনি, তোমরা যা কিছুকে তাঁর শরীক গণ্য কর তা থেকে তিনি বহু উর্ধ্বে। [সূরা ইউনুস-১৮]

২। জেনে রেখ, খালেস দীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে ঃ আমরা তাদের ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দিবে। তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফাইসালা করে দিবেন। মিথ্যাবাদী ও কাফিরকে আল্লাহ সঠিক পথ দেখাননা। [সূরা যুমার-৩]

৩। এ বিষয়ে অন্য আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাবা-২২, ২৩।

৪। শাইতানের নিকট মর্যাদায় বড় সে, যে সর্বাধিক ফিত্না সৃষ্টিকারী। [মুসলিম/৬৮৪৫-জারীর (রাঃ)]

⧉ আধ্যাত্মিক গুরু বা পুরোহিতরূপী বুজুর্গ, পীর, দরবেশের কোন অস্তিত্ব ইসলামে নেই, ইসলামী সমাজ ব্যবস্থায় প্রত্যেক মুসলিম সৎ কর্মপরায়ণশীল। প্রত্যেক মুসলিমকে তার সৃষ্টিকর্তার সহিত আমলের মাধ্যমে যোগ সূত্র স্থাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে জানা লোকেরা অজানা লোকদেরকে শিক্ষা দিবে।

বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা কী আল্লাহ তা'আলার তরফ হতে "ইলহাম" প্রাপ্ত হয়ে কাজ করে?

❖ ইলহাম অর্থ ঐশী, প্রেরণা, প্রত্যাদেশ ইত্যাদি।

১। আর ঐ ব্যক্তি অপেক্ষা অধিক অত্যাচারী কে হতে পারে যে আল্লাহর প্রতি মিথ্যা আরোপ করেছে? অথবা এরূপ বলে ঃ আমার উপর অহী নাযিল করা হয়েছে, অথচ তার উপর প্রকৃত পক্ষে কোন অহী নাযিল করা হয়নি এবং যে ব্যক্তি এও বলে ঃ যেরূপ কালাম আল্লাহ নাযিল করেছেন, তদ্রুপ আমিও আনয়ন করছি। আর তুমি যদি দেখতে পেতে (ঐ সময়ের অবস্থা) যে সময় যালিমরা হবে মৃত্যু সংকটে (পরিবেষ্টিত); আর মালাইকা/ফিরিশতারা হাত বাড়িয়ে বলবে ঃ নিজেদের প্রাণগুলি বের কর, আজ তোমাদেরকে সেই সব অপরাধের শাস্তি হিসাবে লাঞ্ছনাদায়ক শাস্তি দেয়া হবে যা তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা দোষারোপ করে অকারণ প্রলাপ বকেছিলে এবং তাঁর আয়াতসমূহ কবূল করা হতে অহংকার করেছিলে। [সূরা আন'আম-৯৩]

২। তাঁর কোন শরীক নেই, আমাকে এরই নির্দেশ দেয়া হয়েছে। আর আমিই সর্বপ্রথম আত্মসমর্পণকারী। [সূরা আন'আম-১৬৩]

৩। আল্লাহ ফিরিশতাগণের মধ্য হতে বাণীবাহক মনোনীত করেন, আর মানুষদের মধ্য হতেও। আল্লাহ সব কিছু শোনেন, সব কিছু দেখেন। [সূরা হাজ্জ-৭৫]

⧉ বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা দাবী করে যে, আল্লাহর তরফ থেকে তাদের নিকট ইলহাম আসে অর্থাৎ ইশারা আসে, ফায়েজ আসে, নির্দেশ আসে। আল্লাহর নির্দেশ প্রাপ্ত হয়েই পীরেরা সমস্ত কর্ম-কান্ড করে থাকে বলে দাবী করে। নাবী-রাসূল এবং ফিরিশতাগণ ছাড়া আল্লাহর পক্ষ থেকে কারও নিকট কোন কিছুর নির্দেশনা আসেনা। বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা কি নিজকে ফিরিশতা বা নাবী বলে দাবী করে যা বর্তমান মুসলিম সমাজের চিত্র?

বুজুর্গ, পীর, দরবেশদের অনুসরণ করা প্রসঙ্গ

১। স্মরণ কর, যখন তোমার রাব্ব আদমের পৃষ্ট হতে তাদের বংশধরদের বের করলেন আর তাদেরকেই সাক্ষী বানিয়ে জিজ্ঞেস করলেন ঃ 'আমি কি তোমাদের রাব্ব নই?' তারা বলল ঃ হ্যাঁ, এ ব্যাপারে আমরা সাক্ষ্য দিচ্ছি। যাতে তোমরা কিয়ামাতের দিন না বল যে, 'এ সম্পর্কে আমরা একেবারেই বে-খবর ছিলাম। [সূরা আ'রাফ- ১৭২]

২। অথবা তোমরা যেন কিয়ামাত দিবসে এ কথা বলতে না পার - আমাদের পূর্ব-পুরুষরাইতো আমাদের পূর্বে শির্ক করেছিল, আমরা ছিলাম (শুধুমাত্র) তাদের পরবর্তী বংশধর। সুতরাং আপনি কি আমাদেরকে সেই ভ্রান্ত ও বাতিলদের কৃতকর্মের দরুণ ধ্বংস করবেন? [সূরা আ'রাফ-১৭৩]

৩। তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূরা আ'রাফ-৩]

◫ মহান আল্লাহ অহী প্রেরণের মাধ্যমে ১৪০০ বৎসর পূর্বেই দীন ইসলাম পরিপূর্ণ ঘোষণা করেছেন। এর অর্থ হল এই যে কিয়ামাত পর্যন্ত আল্লাহ তা'আলার পক্ষ থেকে আর কোন অহী, ইশারা, ফায়েজ, ইলহাম, নির্দেশ ইত্যাদি কোন কিছুই আসবেনা। এখন যদি কেহ তার নিকট আল্লাহর নির্দেশ আসে বলে দাবী করে তাহলে সে নিজকে 'নাবী' বলে দাবী করে বসল। তাই কেহ যদি দাবী করে যে, আল্লাহর পক্ষ থেকে তার প্রতি কোন কিছু আসে তাহলে সে এক বড় মিথ্যুক। আল্লাহ বলেন, "মিথ্যুকদের উপর আল্লাহর অভিসম্পাত।" আমাদের সমাজের লোকেরা পীর সম্বন্ধে যা চিন্তা করে তা নিম্নে দেয়া হল ঃ এগুলো একেবারেই মিথ্যা ও বানায়োট কথা।

ক) অলী-আল্লাহগণ দর্পণ (আয়না) তুল্য। আয়নার সামনে দাঁড়ালে যেমন নিজের চেহারা ভেসে উঠে, তেমনি অলী-আল্লাহর সান্নিধ্যে গেলে নিজের চরিত্র ফুটে উঠে।

খ) অলী-আল্লাহগণ মানুষ বটে, কিন্তু তারা আল্লাহর প্রতিনিধি। সুতরাং তাদের সাথে সংযতভাবে আদবের সাথে চলবে, নতুবা বিপদে পতিত হবে।

গ) অলী-আল্লাহর নির্দেশ পালন করতে চেষ্টা কর। তাদেরকে উপদেশ দিতে যেওনা। কারণ তাঁরা আল্লাহর নির্দেশ মোতাবেক কাজ করে ইত্যাদি।

বুজুর্গ, পীর, দরবেশদের দাবী ঃ রাসূল (সাঃ) নূরের তৈরী এবং তাঁর ছায়াও ছিলনা

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

لَاهِيَةً قُلُوبُهُمْ وَأَسَرُّواْ النَّجْوَى الَّذِينَ ظَلَمُواْ هَلْ هَذَا إِلَّا بَشَرٌ مِّثْلُكُمْ أَفَتَأْتُونَ السِّحْرَ وَأَنتُمْ تُبْصِرُونَ

তাদের অন্তর থাকে খেলায় মগ্ন। যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে ঃ তিনি তোমাদেরই মত মানুষ ছাড়া কি অন্য কিছু? তোমরা কি দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে? [সূরা আম্বিয়া-৩]

২। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা তখনও বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব। বলঃ পবিত্র আমার মহান রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। [সূরা বানী ইসরাইল-৯৩]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হাজ্জ-৭৫, রাদ-৩৮, হা মীম আস সাজদা-৬, ফুরকান-৭, ২০, মু'মিনূন-৩৩, ৩৪, ইবরাহীম-১০-১১।

- মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদের আদি পিতা আদমকে (আঃ) মাটি দ্বারা সৃষ্টি করেছেন অর্থাৎ মানব জাতি মাটির তৈরী। উপরে উল্লেখিত আয়াতে অকট্যভাবে প্রমাণ হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানুষ ছিলেন। তিনিও মায়ের গর্ভে সৃষ্টি। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী কথাটি ঠিক নয়। তাঁর ছায়া ছিলনা এ কথাও সত্য নয়। কারণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছায়া না থাকলে অবশ্যই আরাববাসীরা বলতেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ৪০ বৎসর বয়স পর্যন্ত আরাববাসীদের নিকট "আল আমীন " (সত্যবাদী) ছিলেন। নাবুওয়াত প্রাপ্তির পর যখন তিনি প্রচার করলেন, لا اله الا الله "এক আল্লাহ ছাড়া আর কোন মা'বূদ নেই," সমস্ত মূর্তির ইবাদাত ছেড়ে একমাত্র আল্লাহর ইবাদাত কর; তখনই আরাববাসীগণ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে 'আল আমীনের' পরিবর্তে পাগল আখ্যা দিতেও ছাড়েনি। আর যদি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ছায়া না থাকত তাহলে আরাববাসীগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানুষ না বলে অন্য কোন নামে ডাকত।

নূরের তৈরী বস্তুর ছায়া থাকেনা এটা ঠিক। একটি বস্তুর ছায়া হয় কিভাবে? যখন আলো ঐ বস্তু ভেদ করে চলে যেতে পারেনা তখনই শুধু আলোর বিপরীতে ঐ বস্তুর আকৃতির ছায়া পরে। আবার যখন আলো কোন বস্তুতে বাঁধা পেয়ে ফিরে এসে আমাদের চোখের পর্দায় পরে তখন আমরা ঐ বস্তুটাকে দেখতে পাই। অতএব যে বস্তুর ছায়া নেই সে বস্তু দেখা যায়না, যেমন বাতাসের ছায়া নেই। কারণ আলো বাতাসকে ভেদ করে চলে যায়, তাই বাতাসকে দেখা যায়না। হয়ত বুজুর্গ, দরবেশ বা পীরেরা ভবিষ্যতে এটাও বলবেন যে, "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে কেহ দেখতে পেতেননা। 'রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাহাবীগণ (রাঃ) অবশ্যই দেখেছেন, যেহেতু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ ভেদ করে আলো চলে যেতনা, বরং আলো ফিরে এসে সাহাবাগণের (রাঃ) চোখে পরতো বলেই তারা দেখতেন। অতএব রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দেহ আমাদের মত রক্ত মাংসের ছিল । গাঁজাখোরী কথা বিশ্বাস করে বিশ্ববিদ্যালয়ের উচ্চ ডিগ্রিধারীগণও এ সমস্ত বুজুর্গ, দরবেশ বা পীরদের পূঁজা, পাইরুবী, সম্মান ও তোষামোদ করে চলেছে আখিরাতে পার পাবার জন্য।

সত্যিই কি মনে এরূপ বিশ্বাস পোষণ করে মহান আল্লাহর ক্রোধ থেকে পার পাওয়া যাবে?

মনকে পবিত্র করার জন্য মারিফাতের বুজুর্গ, পীর, দরবেশের অন্বেষন করা প্রত্যেক নর-নারীর জন্য কি ফার্‌য?

❖ খাঁটি বুজুর্গ, পীর, দরবেশের অন্বেষণ করার জন্য আল্লাহ তাঁর পবিত্র কুরআনে কোথাও বলেননি এবং আমাদের রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বুজুর্গ, পীর, দরবেশ ছিলেননা। বুজুর্গ, পীর, দরবেশ ধরার কথা সহীহ হাদীসেও নেই।

বুজুর্গ, পীর, দরবেশের প্রথা ইসলামে নেই এবং বুজুর্গ, পীর, দরবেশদের পদ্ধতি একটা স্পষ্ট শির্‌কী প্রথা এবং ধোকাবাজী। এটা স্পষ্টতঃই শাইতানের অনুসারীদের দাবী। তবে যারা কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাহর জ্ঞান অর্জন করে আলেম হয়েছেন তাদেরকে অবশ্যই মানতে হবে, যতক্ষণ তারা কুরআন ও সহীহ হাদীস হতে দলীল পেশ করবেন। কেহ যদি তার নিজের বা অন্য কারোর মতামত/রায় শিক্ষা দেন তাহলে তাদের কোন কথা মান্য করা যাবেনা। প্রত্যেক নর নারীর বুজুর্গ, পীর, দরবেশ ধরার কথা মহান আল্লাহ তা'আল কুরআনে কোথাও বলেননি। তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও বুজুর্গ, পীর, দরবেশ ধরার কথা কোথাও বলেননি। "বুজুর্গ পীর, দরবেশ ধরা ফার্‌য" এটা মিথ্যা ও প্রতারণামূলক কথা। মুসলিম আমীরের নেতৃত্বে জামাআতবদ্ধ জীবন যাপন করতে হবে। এ ক্ষেত্রে কোন গোপনীয়তা নেই।

বুজুর্গ, পীর, দরবেশ, মুর্শীদ, অলী-আওলিয়া সম্পর্কে কতিপয় ভুল ধারণা

• অনেকেই মনে করেন যে, পীর-মুর্শীদ, অলী-আওলিয়ারা গায়িবের খবর রাখেন, কাবরে শুয়ে থেকে মানুষের আবেদন-নিবেদন শুনতে পান, মানুষের ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেন, দুনিয়া পরিচালনার ব্যাপারে তাদের অংশ আছে। এই সমস্ত ধারণা সবই ভিত্তিহীন/কাল্পনিক। ঐ সমস্ত পীর-মুর্শীদ তো দূরের কথা এমনকি আল্লাহর প্রেরিত নাবী-রাসূলগণও এই সমস্ত বিষয়ে কোন ক্ষমতা রাখেননা • পীর-মুর্শীদ, গাউস-কুতুব, যামানার মুজাদ্দিদ, অলীয়ে কামেল, পীরে কামেল ইত্যাদি শব্দ প্রয়োগ করে কেহকে উপাধি দেয়া বা নিজে উপাধি গ্রহণ করা জায়েয নয় • অনেকে মনে করেন যে, ঐ সমস্ত লেংটা ফকীর, মাথায় জট ওয়ালা ফকীর, ৫-১০ কেজি ওজনের লোহার শিকল গলায় ঝুলানো ফকীর ওদের কাছে অনেক কিছু আছে। এ সমস্ত ধারণা করা কোন্ ধরনের বোকামী তা শিক্ষিত ভাইয়েরা একটু ভেবে দেখবেন কি? হ্যাঁ, ঐ সমস্ত ফকীরদের কাছে যা কিছু আছে তা হল চরম বেহায়াপনা ও শাইতানী, আল্লাহ ও রাসূলের নাফরমানী, বৈরাগ্যপনা এ সবগুলিই কুরআন-সুন্নাহ বিরোধী নিষিদ্ধ কাজ • যে কোন কাবরে, মাজারে, পীর, মুর্শীদ ও ফকীরদের দরবারে এবং

দয়াল বাবা ও খাজা বাবাদের আস্তানায় তাদের নামে ডেক চড়িয়ে ঐ সমস্ত জায়গায় আগরবাতি, মোমবাতি ও ধুপ জ্বালানো, আতর ও গোলাপ পানি ছিটানো, ফুল দেয়া, হাঁস-মুরগী, গরু-ছাগল, টাকা-পয়সা ইত্যাদি হাদিয়া ও মানত দেয়া বৈধ নয়। এমনিভাবে তাদের নিকট কোন কিছু চাওয়া, প্রার্থনা করা, যে কোন বিপদ থেকে মুক্তির জন্য আবেদন-নিবেদন করা, ঐ সমস্ত কাবরে/মাজারে সাজদা করা এগুলি পরিষ্কার শির্‌ক ও নিষিদ্ধ • এছাড়া ঐ সমস্ত কাবরে/মাজারে ও দরবারে এবং অন্য যে কোন স্থানে তবলা, হারমোনিয়াম, দু'তারা ইত্যাদি বাদ্যযন্ত্র বাজানো এবং বিভিন্ন গান বাজনা করা নিষিদ্ধ এতে কোনই সন্দেহ নেই • অনেকেই মনে করেন যে, বিনা উযূতে তথা কথিত বড়পীর আবদুল কাদের জিলানীর (রহঃ) নাম উচ্চারণ করলে মাথা কাটা যায়। আবার কেহ কেহ বলেন যে, আড়াইটা পশম উঠে যায়। অনেকেই ধারণা করেন যে, আবদুল কাদের জিলানীর (রহঃ) অসীলায় বাগদাদের কাবরের আযাব মাফ, সেখানে কাবরের আযাব হয়না। তারা আরও মনে করেন, আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) গায়িবের খবর রাখেন, মানুষদেরকে কঠিন বিপদ থেকে উদ্ধার করতে পারেন ইত্যাদি। এ সমস্ত কথা ও ধারণা সবই ভিত্তিহীন ও মিথ্যা। শুধু তাই নয় এ সমস্ত কথা যে বিশ্বাস করবে সে মুশরিক হিসাবে গণ্য হবে • অনেকেই কোন কোন পীরকে হাক্কানী পীর বলে সনদ দিয়ে থাকে। এটা সম্পূর্ণ মিথ্যা বানোয়াট কথা। কারণ কোন হাক্কানী আলেম নিজেকে কোন দিনই পীর বলে দাবী করেননি • আল্লাহ আমাদেরকে সকল প্রকার শির্‌কী ও বিদ'আতী কার্যক্রম এবং ভ্রান্ত অসীলা হতে মুক্ত হয়ে খাঁটি তাওহীদ ও সুন্নাতের উপর প্রতিষ্ঠিত হওয়ার পূর্ণ তাওফীক দান করুন । আমীন।

যারা সাধনার মাধ্যমে নিজেদের কাল্‌বে আল্লাহর সন্ধান লাভ করেছে তারাই কি প্রকৃত মুসলিম?

১। তুমি কি লক্ষ্য করেছ তার প্রতি যে তার খেয়াল-খুশিকে ইলাহ বানিয়ে নিয়েছে? আল্লাহ জেনে শুনেই তাকে গুমরাহ করেছেন, আর তার কানে ও মনে মোহর মেরে দিয়েছেন। আর তার চোখের উপর টেনে দিয়েছেন পর্দা। অতঃপর আল্লাহর পর আর কে তাকে সঠিক পথ দেখাবে ? এরপরও কি তোমরা শিক্ষা গ্রহণ করবেনা? [সূরা জাসিয়া-২৩]

২। যে কুমন্ত্রণা দেয় মানুষের অন্তরে, (এই কুমন্ত্রণাদাতা হচ্ছে) জিনের মধ্য হতে এবং মানুষের মধ্য হতে। [সূরা নাস-৫, ৬]

৩। 'হে আদম সন্তান! আমি কি তোমাদেরকে নির্দেশ দেইনি যে, তোমরা শাইতানের 'ইবাদাত করনা, কারণ সে তোমাদের প্রকাশ্য দুশমন? [সূরা ইয়াসীন-৬০]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মুল্‌ক-১৬, ১৭, আ'রাফ-৫৪, তাহা-৫, বুরুজ-১৪, ১৫, ইয়াসীন-৬১, আলে ইমরান-৫১।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! তোমাদের কেহ যেন এ কথা না বলে ঃ আমার আত্মা কলুষিত হয়ে গেছে। [বুখারী/৫৭৩৪-সাহল (রাঃ)]

☐ আল্লাহর সন্ধান লাভ করতে অযৌক্তিক সাধনার প্রয়োজন নেই; এই পৃথিবীতে অগণিত নিদর্শনই আল্লাহর অস্তিত্বের সাক্ষ্য বহন করে। কুরআনের এতগুলি আয়াতকে অমান্য ও বিরোধীতা করেও বুজুর্গ, দরবেশ, পীর সাহেবরা কিভাবে মুসলিম হওয়ার দাবী করতে পারেন?

বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা যদি সাধনার মাধ্যমে নিজ নিজ কাল্‌বে একটা করে আল্লাহর সন্ধান লাভ করেন তাহলে আল্লাহ কতজন? মহান আল্লাহ আমাদেরকে শিখালেন "কুল হুয়াল্লাহু আহাদ।" অর্থ ঃ হে রাসূল! 'আপনি বলুন, আল্লাহ এক'। এ কথা যারা অবিশ্বাস করবে তারা কাফির নয় কি? সাধনার মাধ্যমে বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা নিজেদের কাল্‌বে আল্লাহ ছাড়া হয়ত কোন শাইতানের সন্ধান লাভ করতে পারেন, যার নির্দেশে নিজেকে ও অন্যান্যদেরকে পরিচালিত করে চলেছেন। সাধনা বলতে যথার্থ ইলম অর্জন ও রাসূল (সাঃ) এর পদ্ধতিতে আমল করা বুঝায়।

বুজুর্গ, পীর, দরবেশের সঙ্গে উঠা-বসা করলে কি আল্লাহ তা'আলার প্রেমের জ্যোতি ও সৌরভ দ্বারা হৃদয় পরিশুদ্ধ হয়ে যায়?

১। বলে দাও ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহকে ভালবাস, তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন, বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। [সূরা আলে ইমরান-৩১]

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৩। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ ইয়াসীন-২১।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হয়েছিল, সর্বোত্তম লোক কে? তিনি বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর পথে জিহাদ করে। তারা জিজ্ঞেস করলেন, এরপর কে ? তিনি বললেন ঃ যে মু'মিন ব্যক্তি পাহাড়ে কোন এক উপত্যকায় বাস করে সে তার রাব্বকে ভয় করে, আর সে লোকদের বাঁচিয়ে রাখে তার অনিষ্টতা থেকে। [তিরমিযী/১৬৬৬-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ)]

☐ মহান আল্লাহর ভালবাসা পেতে হলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য করতে হবে। তাহলে আল্লাহও আমাদেরকে ভালবাসবেন এবং আমাদের পাপ ক্ষমা করবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য/অনুসরণ করলেই আল্লাহর ভালবাসা আমরা পাব বলে মহান আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিয়েছেন। ভালবাসতে হবে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কর্ম পদ্ধতিকে, তাঁর দেয়া জীবন বিধানকে, তাহলেই আমরা আল্লাহর ভালবাসা পাবার আশা করতে পারি।

আবার আল্লাহ বলেন যে, আল্লাহর আনুগত্য ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আনুগত্য না করে অন্যের আনুগত্য, তাবেদারী ও নির্দেশ মানলে

আমাদের যা আমল আছে তাও নিষ্ফল বা ধ্বংস হয়ে যাবে। আল্লাহ ও রাসূল (সাঃ) ছাড়া অন্যদের আনুগত্য বা নির্দেশ মানলেতো আল্লাহর অনুগ্রহ বা রাহমাত পাওয়া যাবেনা।

বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা বলেন, রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ আমি আমার প্রভুকে একটি সুন্দর যুবকের আকৃতিতে দেখেছি

১। কোন কিছুই তাঁর সদৃশ নয়, তিনি সব শোনেন, সব দেখেন। [সূরা শূরা-১১]

২। অতএব কারো সাথে আল্লাহর তুলনা করনা। আল্লাহ জানেন, আর তোমরা জাননা। [সূরা নাহল-৭৪]

৩। এভাবে আমি প্রত্যেক নাবীর জন্য মানুষ আর জিন শাইতানদের মধ্য হতে শত্রু বানিয়ে দিয়েছি। প্রতারণা করার উদ্দেশে তারা একে অপরের কাছে চিত্তাকর্ষক কথাবার্তা বলে। তোমার রাব্ব ইচ্ছা করলে তারা তা করতনা। অতএব তাদেরকে, আর তাদের মিথ্যা চর্চাকে উপেক্ষা করে চল। [সূরা আন'আম-১১২]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-৯৩, ১১৪, আ'রাফ-৩, ৩০, তাওবা-২৪, শু'আরা-২২১-২২৩, জাসিয়া-১৯, বাকারা-৭৯, নিসা-১৪।

৫। যদি কেহ বলে যে (ক) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাব্বকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। (খ) যে ব্যক্তি বলবে যে, আগামীকাল কি হবে সে তা জানে তাহলে সে মিথ্যাবাদী (গ) যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথা গোপন রেখেছেন তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। [বুখারী/৪৪৮২-আয়িশা (রাঃ)]

⧉ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের এ কথা বুজুর্গ, পীর, দরবেশরা কোথায় পেলেন? এ বিষয়ে তার কোন সহীহ দলীল পাওয়া যায়না। এতে এটাই বুঝা যায় যে, ইহা একটা নির্ভেজাল মিথ্যা কথা যা ইসলামকে ধ্বংস করার জন্য তৈরী করা হয়েছে। অনুগ্রহ করে উপরোক্ত কুরআনের আয়াতগুলি পড়ুন ও জানুন এবং সঠিক বিশ্বাস অর্জন করুন।

বিসমিল্লাহ বনাম ৭৮৬

❖ বিসমিল্লাহ এর পরিবর্তে ৭৮৬ লিখা একটা কু-সংস্কার।

⧉ আমাদের দেশের মুসলিমগণ কাগজ, ব্যানার, লিফলেট, যানবাহনের সম্মুখভাগে ও দরজায় "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এর পরিবর্তে ৭৮৬ সংখ্যা লিখে রাখে। ইহা এক বানোয়াটী-কুসংস্কার।

বলা হয়ে থাকে যে আরাবী বর্ণমালার মান অনুযায়ী "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" বাক্যের মধ্যকার ১৯টি বর্ণের মান সমষ্টি = ৭৮৬ । এই সংখ্যাটি দ্বারা সংক্ষেপে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম"এর দিকে ইশারা করা হয়। কিন্তু এই গানিতিক টেকনিক শারীয়াত সমর্থিত নয়। "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" হল মুসলিম ও অমুসলিমদের মধ্যে পার্থক্যকারী রীতি। কেননা অমুসলিমরা প্রত্যেক কাজ তাদের কোন না কোন দেব-দেবীর নামে শুরু করে থাকে। যেমন হিন্দুরা হিসাব-নিকাশের খাতায় ওঁ শব্দ লিখে, ইহার অর্থ- এরা

হরি, কৃষ্ণ, নারায়ণ, ব্রহ্ম, বিষ্ণু সবকিছু বুঝিয়ে থাকে। এটাই এদের সকলের মন্ত্রের আদি বীজ। এরা বলে থাকে হৃদয়াকাশে আত্মার নিকট হতে ইহার উৎপত্তি, ইহা নিজের আশ্রয় ও সাক্ষাৎ ব্রহ্মবাচক। ইহাই সনাতন বীজ। মুসলিমদের প্রত্যেক ভাল কাজের পূর্বে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পাঠ করা ইবাদাত ও সাওয়াবের কাজ এবং আল্লাহর নিকট কর্মের মধ্যে সফলতার জন্য দরখাস্ত করা। তাই "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" এর পরিবর্তে কাগজ, ব্যানার, লিফলেট, যানবাহনের সম্মুখভাগে ও দরজায় ৭৮৬ সংখ্যা লিখা উচিত নয়। আল্লাহ আমাদেরকে বুঝার তাওফীক দান করুন।

বিপদ-আপদ ও বালা-মুসিবাত কেন আসে?

১। মানুষের কৃতকর্মের কারণে সমুদ্রে ও স্থলে বিপর্যয় ছড়িয়ে পড়ে, যার ফলে তাদেরকে কোন কোন কর্মের শাস্তি তিনি আস্বাদন করান, যাতে তারা ফিরে আসে। [সূরা রূম-৪১]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নাহল-১১২, আনকাবূত-৬৫, আলে ইমরান-১৬৫, তাওবা-২৫, বানী ইসরাইল-৫৬, শূরা-২৩, আনফাল-৫৩।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ কোন মুসলিম যখন কোন বিপদে পতিত হয় তখন সে যেন আল্লাহর নির্দেশানুযায়ী "ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" বলে। [মুসলিম/১৯৯৫-উম্মে সালমা (রাঃ), মুসলিম/১৯৯৬]

৪। মুসলিম ব্যক্তির উপর যে সকল বিপদ-আপদ আপতিত হয় এর দ্বারা আল্লাহ তার পাপ মোচন করেন। এমনকি যে কাটা তার শরীরে বিদ্ধ হয় তার দ্বারাও। [বুখারী/৫২২৫-আয়িশা (রাঃ)]

৫। যে ব্যক্তি মু'মিনের পার্থিব কোন বিপদ-আপদ দূর করে দিবে, আল্লাহ তা'আলা কিয়ামাতের দিন তার থেকে বিপদ দূর করবেন। [মুসলিম/৬৬০৮]

☐ মুসিবাত বা বিপদ কি? এ প্রশ্নের উত্তরে বলা যেতে পারে যা কিছু অমঙ্গল, অকল্যাণকর, ক্ষতিকর, দুঃখজনক, পীড়াদায়ক, অনাকাংখিত বিষয়, যা শরীর ও মনকে আঘাত করে, সহায় সম্পদ, অর্থ-বিত্ত, পদ সম্মান, ফল, ফসল, গৃহপালিত পশু এবং জীবন নাশ ইত্যাদি দ্বারা ক্ষতি সাধন হতে পারে। পরিবার-পরিজন, আত্মীয়-স্বজন, পাড়া-প্রতিবেশি, দেশ ও জাতির উপর আপতিত জান-মালের ক্ষয়ক্ষতি আর কলহ, অশান্তি, দুর্ঘটনা, দুর্যোগও মুসিবাত রূপে দেখা দেয়। প্রবল বর্ষণ, অতিবৃষ্টি, শিলাবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, ঝড়, জলোচ্ছ্বাস, পঙ্গপালের আক্রমণ, রোগ ব্যাধির মহামারী দ্বারাও যেমন মুসিবাত আসে তেমনি মতবিরোধ, অনৈক্য, বিবাদ, কলহ, অবাধ্যতা, চুরি, ডাকাতি, ছিনতাই ইত্যাদি দ্বারাও মুসিবাত আসে। ঈর্ষা, হিংসা, বিদ্বেষ, পরনিন্দা, অপবাদ এবং মিথ্যার বহুমুখী ক্ষতির দ্বারাও মুসিবাত সৃষ্টি হয় জনে জনে, স্বজন ও স্বজাতির মধ্যে। মুসিবাত কেহ চায়না অথচ নিজের কৃতকর্মের দ্বারাই এটা তৈরী হয় এবং কোন কোন সময় নিজের উপরই আপতিত হয়। নাফসের অসৎ প্রবৃত্তি বা কুপ্রবৃত্তির

লালসা চরিতার্থ করার যে সব নোংরা ক্ষেত্র আছে সেখানে প্রবেশ করলেই মুসিবতের সূত্রপাত হয়। নিজের মান সম্মান, সম্ভ্রম, ইজ্জাত, অর্থবিত্ত, সম্পদ, মর্যাদায় অন্য কেহ এসে হানা দিলে মন মেজাজ প্রতিবাদমুখর হয়ে প্রতিকারে নেমে পড়তে দেরী করেনা। কিন্তু অন্যের আঙ্গিনায় ঢুকে ঐগুলো হাতিয়ে নেবার ফন্দী-ফিকির করার যে অপচেষ্টা এটা থেকেই মুসিবাত জন্ম নেয়।

এ সকল বালা-মুসিবাত হতে রক্ষা পাওয়ার উপায় হল শিক্ষা ব্যবস্থায় প্রাথমিক ও মাধ্যমিক স্তর, শিশু-কিশোর ও কৈশর বয়সে যথাযথ শিক্ষাদান, কোনটি বর্জনীয় এবং কোনটি অর্জন আবশ্যিক তা বলে দেয়া ও হৃদয়ে গেঁথে দেয়া। পঠন, পাঠন ও নিরীক্ষণ দ্বারা শিক্ষার ফল শতকরা একশ ভাগ অর্জনের টার্গেট নেয়া। আর এটাকে সামাজিক ও পারিবারিক আন্দোলন হিসাবে গ্রহণ করা। আরাবের সেই নোংরা পচাঁ সমাজ যদি কুরআন আর সুন্নাহর সুশাসন দ্বারা একটি মার্জিত রুচিসম্মত নিরাপদ সুখী সমৃদ্ধ সমাজ খুব স্বল্প সময়ে পৃথিবীকে তাক লাগিয়ে দিতে পারে, তবে এখন কেন পারবেনা? কারণ কি? হয়ত আমরা চাইনা, নতুবা আমরা চাইতে পারিনা বা চাইতে জানিনা এবং জানার চেষ্টাও করিনা। অথচ মুসিবাতে আমরা কতই না হাবু-ডুবু খাচ্ছি। সঠিক ও যথাযথ কাজটি করছিনা। পেটের পীড়ায় যদি চোখের ঔষধ লাগান হয় তাহলে রোগীর কি দশা হবে তা বুঝতে কারো বাকী থাকেনা। মুশকিল হল, আমরা মুসলিম থাকব কিন্তু কুরআন-হাদীস মানবনা। এই যে মুনাফিকী তা তো জমজমাট গ্রাম, শহর ও দেশে । এই যদি অবস্থা হয় তাহলে মুসিবাত তো লাফিয়ে লাফিয়ে শতগুণে বৃদ্ধি পাবে। ফলে ভোগান্তি ও অসম্মান/অপমান কখনও শেষ হবেনা।

কেহকে বন্ধু বা শত্রু হিসাবে গ্রহণ করা প্রসঙ্গ

১। হে মুমিনগণ! আমার শত্রু ও তোমাদের শত্রুকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করনা; তোমরা কি তাদের সাথে বন্ধুত্ব করছ? অথচ তারা তোমাদের নিকট যে সত্য এসেছে তা প্রত্যাখ্যান করেছে; রাসূলকে এবং তোমাদেরকে বহিস্কার করেছে এ কারণে যে, তোমরা তোমাদের রাব্ব আল্লাহর উপর ঈমান এনেছ। যদি তোমরা আমার সন্তুষ্টি লাভের জন্য আমার পথে জিহাদের উদ্দেশে বহির্গত হয়ে থাক তাহলে কেন তোমরা তাদের সাথে গোপনে বন্ধুত্ব করছ? তোমরা যা গোপন কর এবং তোমরা যা প্রকাশ কর তা আমি সম্যক অবগত। তোমাদের যে কেহ এটা করে সে তো বিচ্যুত হয় সরল পথ হতে। [সূরা মুমতাহানাহ-১]

২। যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল এবং ঈমানদারগণকে বন্ধু রূপে গ্রহণ করবে সে দেখতে পাবে যে, আল্লাহর দলই বিজয়ী হবে। [সূরা মায়িদা-৫৬]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হুজুরাত-৭, বাকারা-১২০, তাওবা-৩, মুমতাহানাহ-৪ ।

৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেনঃ ব্যক্তি তাঁর বন্ধুর দীনের অনুসারী হয়। অতএব তোমাদের দেখা উচিত, কার সাথে বন্ধুত্ব করছ। [আবূ দাউদ/৪৭৫৮]

৫। **আবূ** হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **বলেছেন** ঃ মানুষের আমলনামা সপ্তাহে দু'বার-সোমবার ও বৃহস্পতিবার পেশ **করা** হয়। এরপর প্রত্যেক মু'মিন বান্দাকে ক্ষমা করা হয়। তবে সেই ব্যক্তিকে নয়, যার ভাইয়ের সাথে তার শক্রতা আছে। তখন বলা হবে ঃ এই দু'জনকে বর্জন কর অথবা অবকাশ দাও যতক্ষণ না তারা আপোষের দিকে প্রত্যাবর্তন করে। [মুসলিম/৬৩১৪]

◻ বর্তমান সমাজে বিশেষ করে বাংলাদেশের মুসলিমদেরকে প্রায়ই দেখা যায় যে, তারা অন্য ধর্মের লোককে সবচেয়ে নিকটতম বন্ধু হিসাবে গ্রহণ করে এবং তাদের বিভিন্ন ধর্মীয় অনুষ্ঠানে যোগদান করে। এ হল বর্তমান সমাজের চিত্র।

বিদ'আত প্রসঙ্গ

❖ বিদ'আত বলতে কি বুঝায় ঃ

(ক) যে সব কাজ বা অনুষ্ঠান বা ইবাদাত সাওয়াবের কাজ বলে দাবী করে যা কুরআন ও সহীহ হাদীস দ্বারা স্বীকৃত নয় এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা করেননি কিংবা করতে বলেননি সেই সব কাজ বা অনুষ্ঠান বা ইবাদাত সাওয়াবের কাজ বিবেচনায় পালন করার নামই বিদ'আত।

(খ) বিদ'আত বলতে আরও বুঝায় দীন পরিপূর্ণ হওয়া সত্ত্বেও দীনের মধ্যে কোন নতুন প্রথা উদ্ভাবন করা। বস্তুতঃ দীন পূর্ণ হয়ে যাওয়ার পর তাতে কোন বিষয়ের বৃদ্ধি করা কিংবা কোন নতুন বিষয়কে দীন মনে করে তদনুযায়ী আমল করলে সাওয়াব হবে বলে মনে করাই হচ্ছে বিদ'আত।

(গ) বিজ্ঞানের উন্নতির সাথে সাথে অনেক কিছুই আবিস্কার হয়েছে। যেমন উড়োজাহাজ, বিদ্যুত, কম্পিউটার, রেডিও, টেলিভিশন ইত্যাদি, যার ব্যবহার মুসলিম, খৃষ্টান, বৌদ্ধ, ইয়াহুদী, হিন্দু সব ধর্মের লোকেরাই করে থাকেন। সবই মানব কল্যাণের জন্য ব্যবহৃত হয়ে থাকে। উহার উপকার যেমন সমস্ত মানব জাতি পেয়ে থাকে তেমনি মুসলিমগণও পেয়ে থাকে। এগুলি ব্যবহারে সাওয়াবের কোন ব্যাপার নেই। এই নব উদ্ভাবিত বিষয়গুলি হল নব উদ্ভাবিত বস্তু, যা বিদ'আত নামে পরিচিত নয়।

(ঘ) আর দীনের ক্ষেত্রে অর্থাৎ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক দীন-ইসলাম পরিপূর্ণ হওয়ার পর কোন নতুন কাজ, অনুষ্ঠান, রসম রেওয়াজ দীনের মধ্যে অন্তর্ভুক্ত করা এবং এগুলি করলে সাওয়াব হবে বলে বিশ্বাস করার নামই হল 'বিদ'আতুন' (অর্থ দীনে নব আবিস্কৃত বিষয়)।

১। বল ঃ আমিতো এমন কোন প্রথম ও নতুন নাবী নই। আমি জানিনা, আমার ও তোমাদের ব্যাপারে কি করা হবে; আমি আমার প্রতি যা অহী করা হয় শুধু তারই অনুসরণ করি। আমি এক স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। [সূরা আহকাফ-৯]

২। দৃষ্টি তাঁর নাগাল পায়না বরং তিনিই সকল দৃষ্টি নাগালে রাখেন, তিনি অতিশয় সূক্ষ্মদর্শী, সব বিষয়ে ওয়াকিফহাল। [সূরা আন'আম-১০৩]

৩। অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রেখ, তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ নির্দেশ ছাড়াই যে নিজের প্রবৃত্তির

অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? আল্লাহ যালিম সম্প্রদায়কে সঠিক পথে পরিচালিত করেননা। [সূরা কাসাস-৫০]

৪। আজ আমি তোমাদের জন্য তোমাদের দীনকে পূর্ণাঙ্গ করে দিলাম, তোমাদের প্রতি আমার নি'আমাত পূর্ণ করে দিলাম এবং ইসলামকে তোমাদের দীন হিসাবে কবূল করে নিলাম। [সূরা মায়িদা-৩]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-৩৮, নাহল-৮৯, শূরা-২১, জাসিয়া-২৩।

৬। উত্তম বাণী হল আল্লাহর কিতাব এবং সর্বোত্তম হিদায়াত হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হিদায়াত। নিকৃষ্ট বিষয় বিদ'আত (নতুন আবিষ্কার বিষয়সমূহ)। সকল বিদ'আতই হল পথভ্রষ্টতা। [মুসলিম/১৮৭৫-জাবির ইবন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৪৫]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের এ দীনের মধ্যে নতুন কিছুর সংযোজন করবে, যা এতে নেই, তা পরিত্যাজ্য। [আবূ দাউদ/৪৫৫১-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৪৩৪৩, ৪৩৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৪]

৮। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করল তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করল তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। [বুখারী/৬৭৭১-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

৯। হুযাইফা (রাঃ) বলেছেন ঃ হে কুরআন পাঠকারী সমাজ! তোমরা (কুরআন ও সুন্নাহর উপর) সুদৃঢ় থাক। নিশ্চয়ই তোমরা অনেক পিছনে পড়ে আছ। আর যদি তোমরা (সিরাতে মুস্তাকীম থেকে সরে গিয়ে) ডান কিংবা বামের পথ অনুসরণ কর তাহলে তোমরা (হিদায়াত থেকে) অনেক দূরে সরে যাবে। [বুখারী/৬৭৭২]

১০। যে আমার (রাসূলের) সুন্নাত (জীবন বিধান) হতে বিমুখ হবে সে আমার তরীকার নয়। [মুসলিম/৩২৬৯]

বিদ'আতীদের পরিনাম ঃ

১। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। [সূরা নিসা-১৪]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৭২, কাসাস-৫০

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ অবশ্যই হাউযে কাউছারের পাশে এমন কিছু লোক আসবে যারা দুনিয়ায় আমার সাহচর্য লাভ করেছিল। এমন কি যখন আমি তাদের দেখতে পাব এবং তাদেরকে আমার সম্মুখে নিয়ে আসা হবে তখন আমার নিকট আসতে তাদের বাধা দেয়া হবে। তারপর আমি বলব ঃ হে আমার রাব্ব! এরা আমার সাথী, এরা আমার সাথী। তখন আমাকে বলা হবে ঃ অবশ্যই তুমি জাননা, তোমার পর এরা কিরূপ বিদ'আত করেছে। [মুসলিম/৫৭৯২-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), বুখারী/৬১২১]

৪। সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম **আদর্শ হল মুহাম্মাদ** সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম **বিষয় হল** কুসংস্কার। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত **হবেই**, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবেনা। [বুখারী/৬৭৬৮-আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ)]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার সকল উম্মাতই জান্নাতে প্রবেশ করবে, কিন্তু যে অস্বীকার করে। তারা বললেন, কে অস্বীকার করবে। তিনি বললেন ঃ যারা আমার অনুসরণ করে তারা জান্নাতে প্রবেশ করবে, আর যে আমার অবাধ্য হবে সেই অস্বীকার করল। [বুখারী/৬৭৭০-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ বিদ'আত করলে আমল কবুল করা হয়না। [বুখারী/১৭৪৪]

বিদ'আত সৃষ্টির কারণসমূহ

১। অজ্ঞতা ঃ [সূরা আরাফ-৩৩, ইসরা-৩৬]
২। প্রবৃত্তি ও খেয়াল খুশীর অনুসরণ ঃ [সূরা কাসাস-৫০, নাজম-২৩, জাসিয়াহ-২৩]
৩। সন্দিহান উক্তির উপর নির্ভরতা ঃ [সূরা আলে ইমরান-৭]
৪। কেবলমাত্র জ্ঞানের উপর ভরসা করা ঃ [সূরা ফুসসিলাত-৫৩, বাকারা-২১৯]
৫। ইমাম ও বুজুর্গদের অন্ধ অনুকরণ ও পক্ষপাতিত্ব ঃ [সূরা আহযাব-৬৬-৬৮]
৬। আলেম-ওলামাদের নীরবতা ও স্বার্থান্বেষিতা ঃ [সূরা আলে ইমরান-১০৪, ১৮৭, বাকারা-১৫৯]
৭। বিজাতির অনুকরণ/অনুসরণ এর মাধ্যমে মুসলিমরা তাদের সমাজে/পরিবেশে বিদ'আত সৃষ্টি করে। [আবূ দাউদ]
৮। যঈফ ও জাল হাদীসের উপর ভিত্তি করে ঃ [সূরা নাজম-২৮]
৯। বিদ'আতীর সংসর্গ ও সাহচর্য বিদ'আত প্রসারে সহায়ক হয়।
১০। স্বপ্নের ভুল ব্যাখ্যার মাধ্যমে ইত্যাদি।

সমাজে প্রচলিত বিদ'আতি কাজসমূহ

• 'মীলাদ মাহফিলের' অনুষ্ঠান করা • 'শবে-বরাত' পালন করা • 'শবে-মিরাজ' পালন করা • মৃত ব্যক্তির কাযা বা ছুটে যাওয়া সালাতসমূহের কাফ্ফারা আদায় করা • মৃত্যুর পর ৭ম, ১০ম, অথবা ৪০তম দিনে খাওয়া-দাওয়া ও দু'আর অনুষ্ঠান করা • ইসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানী বা সাওয়াব বখশে দেয়ার অনুষ্ঠান করা • মৃত ব্যক্তির রুহের মাগফিরাতের জন্য অথবা কোন বিপদ থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য খতমে কুরআন অথবা খতমে জালালীর অনুষ্ঠান করা • উচ্চঃস্বরে যিক্‌র করা • যিক্‌র করার সময় বাদ্য বাজানো, নাচ, হাত তালি দেয়া, যিক্‌রের সময় আল্লাহর নামের পরিবর্তন করে আহ, ইহ, উহ, হুয়া, হিয়া বলা • পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়া • মা-বোন ও স্ত্রীকে পীর সাহেবের কাছে মুরীদ হওয়ার জন্য এবং তাদের খিদমাত করার জন্য পাঠানো। • ফার্‌য, সুন্নাত/নফল তথা বিভিন্ন ধরনের সালাত শুরু করার পূর্বে মুখে উচ্চারণ করে নিয়াত পাঠ করা • প্রস্রাব করার পরে পানি থাকা

সত্ত্বেও অধিকতর পবিত্রতা অর্জনের উদ্দেশে কুলুখ নিয়ে ২০, ৪০, ৭০ অথবা বয়স অনুযায়ী তত কদম হাটাহাটি করা, জোরে জোরে কাশি দেয়া, হেলা-দুলা করা, পায়ে কাঁচি দেয়াকে পবিত্র হওয়ার জন্য নির্দিষ্ট করে লওয়া এসবই বেহায়া কাজ ও পরিস্কার বিদ'আত।

মৃত ব্যক্তি ও কাবর সংক্রান্ত

• কাবর উচু করা, কাবর পাকা ও চুনকাম করা, কাবরের উপর সমাধি নির্মাণ করা, কাবরের গায়ে নাম লিখা, কাবরের উপরে বসা, কাবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা এসবই নিষেধ । [তিরমিযী/২১১৯ ও ইব্‌ন মাজাহ/১৫৬৬] • কাবর যিয়ারাতকারিণী মহিলাদের এবং কাবরে মাসজিদ নির্মাণ ও কাবরে বাতি দানকারীর বিরুদ্ধে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন। [বুখারী/১২৪৪, ইব্‌ন মাজাহ/১৫৭৬] • রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কাবরের নিকটে গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী ইত্যাদি যবাহ করতে নিষেধ করেছেন। জাহিলি যুগে দানশীল ও পুন্যবান ব্যক্তিদের কাবরের পাশে এগুলি করা হত • এমনিভাবে কাবরে গিলাফ দেয়া বা কাবর ঢেকে রাখা নিষেধ।

কাবরে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ

• কাবরে সাজদাহ করা • কাবরের দিকে ফিরে সালাত আদায় করা • কাবরকে কেন্দ্র করে মাসজিদ নির্মাণ করা • কাবরবাসীর নিকট কিছু কামনা করা এবং তার অসীলায় মুক্তি প্রার্থনা করা • কাবরবাসীকে খুশী করার জন্য কাবরে নযর-নিয়াজ ও টাকা-পয়সা দেয়া • কাবরবাসীর জন্য মানত করা, ছাগল-গরু, হাঁস-মুরগী হাজত দেয়া এবং সেখানে উরশ ইত্যাদি করা • মাজারে নযর-নিয়াজ না দিলে মৃত পীরের বদ দু'আয় সব ধ্বংস হয়ে যাবে, এই ধারনা পোষণ করা • সেখানে নযর ও মানত করলে পরীক্ষায় বা মামলায় বা কোন বিপদে মুক্তি পাওয়া যাবে বলে বিশ্বাস করা • খুশির কোন কাজে মৃত পীরের মাজারে শুকরিয়া স্বরূপ পয়সা না দিলে পীরের বদ দু'আ লাগবে, এমন ধারনা পোষণ করা • নদী ও সাগরের মালিকানা খিযর (আঃ) এ একথা মনে করে সাগরে বা নদীতে হাদীয়া স্বরূপ টাকা-পয়সা নিক্ষেপ করা • মৃত পীরের পোষা কুমীর, কচ্ছপ, গজার মাছ, কবুতর ইত্যাদিকে বিশেষ মর্যাদাপূর্ণ ও ক্ষমতাশালী মনে করা ইত্যাদি।

মৃত্যুর পরে প্রচলিত বিদ'আতসমূহ ঃ

• মাইয়েতের (মৃত ব্যক্তির) শিয়রে বসে কুরআন তিলাওয়াত করা • মাইয়েতের নখ কাটা ও গুপ্তাঙ্গের লোম সাফ করা • নাক, কান, গুপ্তাঙ্গ প্রভৃতি স্থানে তুলা ভরা • দাফন না করা পর্যন্ত পরিবারের লোকদের না খেয়ে থাকা • চিৎকার দিয়ে কান্নাকাটি করা, বুক চাপড়ানো, কাপড় ছেঁড়া, মাথা ন্যাড়া করা, গোফ না মুন্ডানো ইত্যাদি • তিন দিনের অধিক (সপ্তাহ, মাস, ছয় মাস ব্যাপী) শোক পালন করা (কেবল স্বামীর মৃত্যুতে স্ত্রী ব্যতীত অন্য কেহ ৪ মাস ১০ দিন ইদ্দাত পালন করবেনা) • কাফির, মুশরিক ও মুনাফিকদের জন্য দু'আ করা •

শোক দিবস পালন করা, শোক সভা করা এবং এ জন্য খানা আয়োজন করা ইত্যাদি • জানাযার পিছে পিছে উচ্চৈঃস্বরে যিক্‌র করা বা তিলাওয়াত করতে করতে চলা • জানাযার সালাত (নামায) শুরু করার আগে মাইয়েত কেমন ছিলেন বলে লোকদের জিজ্ঞাসা করা • জানাযার সালাতের আগে বা দাফনের পরে তার শোকগাঁথা বর্ণনা করা • কাবরে মাইয়েতের উপরে গোলাপ পানি ছিটানো • কাবরের উপরে মাথার দিক থেকে পায়ের দিকে এবং পায়ের দিক থেকে মাথার দিকে পানি ছিটানো। অতঃপর অবশিষ্ট পানিটুকু কবরের মাঝখানে ঢেলে দেয়া • সূরা ফাতিহা, কাদর, কাফিরূন, নছর, ইখলাস, ফালাক ও নাস-এ সাতটি সূরা পাঠ করে দাফনের সময় বিশেষ দু'আ পড়া • কাবরের কাছে বসে কুরআন তিলাওয়াত ও কুরআন খতম করা • কাবরের উপরে শামিয়ানা টানানো, এমনিভাবে কাবরের উপরে বাতি জ্বালানো, ফ্যান চালানো এবং ফুল ছিটানো ইত্যাদি • প্রতি জুমু'আর দিন, আশূরা, ১৫ই শাবান, রামাযান ও দুই ঈদে বিশেষভাবে কাবর যিয়ারত করাকে নির্দিষ্ট করে লওয়া • কাবরের সামনে হাত জোড় করে দাঁড়ানো এবং সূরা ফাতিহা ১ বার, সূরা ইখলাছ ১১ বার, অথবা সূরা ইয়াসীন ১ বার পড়া • কুরআন পাঠকারীকে উত্তম খানা ও টাকা-পয়সা দেয়া অথবা এ বিষয়ে অসীয়াত করে যাওয়া • কাবরকে সুন্দর করা, কাবরে চুম্বন করা • কাবরের গায়ে মৃত ব্যক্তির নাম লেখা এবং মৃত্যুর তারিখ লিখা • কাবরের গায়ে বারাকাত মনে করে পেট ও পিঠ ঠেকানো • ত্রিশ পারা কুরআন (বা সূরা ইয়াসীন বা লাখ কালেমা) পড়ে বখশে দেয়া, যা আমাদের দেশে "কুলখানী" বলে • মৃত্যুর পর ১ম, ২য়, ৭ম, বা ১০ম দিনে বা ৪০ দিনে চেহলাম বা চল্লিশার অনুষ্ঠান করা এবং সেখানে খাওয়ার ব্যবস্থা করা • মৃত্যু বার্ষিকী পালন করা • সালাত (নামায), কির'আত এবং অন্যান্য ইবাদাতসমূহের নেকী মৃত্যু ব্যক্তিদের জন্য হাদিয়া দেয়া, যাকে এদেশে ইসালে সাওয়াব বা সাওয়াব রেসানী বা বখশে দেয়া বলা হয় • আমলসমূহের সাওয়াব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বা অন্যান্য নেককার মৃত ব্যক্তিদের নামে বখশে দেয়া • মৃত্যুর সাথে সাথে স্বামী-স্ত্রীর সম্পর্ক ছিন্ন হয়ে গেছে বলে ধারণা করা • জানাযার সময় স্ত্রীর নিকট থেকে মহোরানা মাফ করে নেয়ার চেষ্টা করা • জানাযার সময় মৃত ব্যক্তির কাযা সালাত (নামায) সমূহের বা উমরী কাযার কাফফারা স্বরূপ টাকা আদায় করা • মৃত্যুর পরপরই ফকীর মিসকীনদের মধ্যে চাউল ও টাকা-পয়সা বিতরণ করা • কাবরে মোমবাতি, আগরবাতি জ্বালানো, গোলাপ পানি ও ফুল ছিটানো ইত্যাদি • মৃতের রূহের মাগফিরাতের জন্য বাড়ীতে মীলাদ দেয়া বা ওয়াজ মাহফিল করা • নববর্ষ, ১৫ই শাবান ইত্যাদিতে কোন বুজুর্গ ব্যক্তিকে ডেকে কাবর জিয়ারাত করে নেয়া ও তাকে বিশেষ সম্মানী প্রদান করা • ১৫ই শাবানের রাতে ঘর-বাড়ী পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন করে মৃত স্বামীর রূহের আগমনের অপেক্ষায় তার পরিত্যক্ত কক্ষে বা অন্যত্র সারা রাত জেগে বসে থাকা ও ইবাদাত বন্দেগী করা • কাবর জিয়ারাত করে ফিরে আসার সময় কাবরের দিকে মুখ করে বেরিয়ে আসা • কাবরের

উপরে একটি বা চার কোনে চারটি কাঁচা খেজুরের ডাল বা কোন ফল বা ফুলের গাছ লাগানো এই ধারণায় যে, এর প্রভাবে কাবরের আযাব হালকা হবে।

◻ আমাদের এই দীনে (ইসলামে), যে কেহ সাওয়াবের আশায় নতুন কিছু আমলের পদ্ধতি উদ্ভাবন করবে তা প্রত্যাখ্যাত হবে। সুতরাং যে কেহ, যে কোন কাজ, আমল বা নতুন পন্থা, রীতি-নীতি চালু করবে এবং দীনের আমলের সাথে সম্পৃক্ত করবে, অথচ ওর স্বপক্ষে দীনের কোন দলীলের প্রমাণ নেই সেটা শারীয়াতের কাজ হিসাবে গণ্য করা যাবেনা। তাই ওটা হবে গোমরাহী ও বিভ্রান্তির মূল। আর ইসলাম ধর্ম সম্পূর্ণ বিদ'আত মুক্ত, চাই এটি আকীদার বিষয় হোক, অথবা কোন আমল কিংবা প্রকাশ্য-অপ্রকাশ্য কথাবার্তাই হোক।

ভক্তি যেখানে অন্ধ, দলীল সেখানে অচল

১। তাদেরকে যখন বলা হয় ঃ আল্লাহ যা নাযিল করেছেন তা অনুসরণ কর তখন তারা বলে, বরং আমরা তারই অনুসরণ করব আমাদের পিতৃ-পুরুষদেরকে যে পথ অনুসরণ করতে দেখেছি। শাইতান যদি তাদেরকে জ্বলন্ত আগুনের শাস্তির দিকে ডাকে, তবুও কি? [সূরা লুকমান-২১]

২। যখন তাদেরকে বলা হয়, তোমরা ঐ জিনিসের অনুসরণ কর যা আল্লাহ নাযিল করেছেন, তখন তারা বলে ঃ বরং আমরা তারই উপর চলব যার উপর আমরা আমাদের বাপ-দাদাদের পেয়েছি; যদিও তাদের বাপ-দাদারা কিছুই বুঝতনা এবং সঠিক পথে চলতনা তবুও? [সূরা বাকারা-১৭০]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সূরা হুদ-৯১, হা-মীম আস সাজদাহ-৪-৫, বাকারা-৮৮।

৪। সেই ব্যক্তি ঈমানের স্বাদ পেয়েছে যে রাব্ব হিসাবে আল্লাহকে, দীন হিসাবে ইসলামকে এবং রাসূল হিসাবে মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সন্তুষ্ট চিত্তে মেনে নিয়েছে। [মুসলিম/৫৮]

◻ উপরোক্ত আয়াত থেকে জানা যায় যে, অবিশ্বাসীরা নিজেদের হঠকারিতাকে ঢেকে রাখার জন্য কুরআনের আয়াতগুলি বুঝতে না পারার অজুহাত পেশ করত। আল্লাহ তাদের এই অজুহাত বার বার মিথ্যা প্রতিপন্ন করেছেন। এই না বুঝার অর্থ আসলে না চাওয়া, যাকে অন্ধ ভক্তি বলে। এদেশে অনেক আলেমদের মাধ্যমে বিভিন্ন নামে/বেনামীতে অসংখ্য ভয়ংকর কুসংস্কার বিস্তার লাভ করেছে। যেমন কাবর পূজা, পীর পূজা, মিলাদ, কিয়াম করা, তাবিয-কাবয ব্যবহার করা, চল্লিশা পালন করা, হিন্দুদের মত আল্লাহ নিরাকার বলে বিশ্বাস করা, হিন্দুদের প্রনামের অনুকরনে কদমবুসী করা ইত্যাদি, যা পূর্ব পুরুষদের নিকট থেকে প্রাপ্ত এবং এ সমস্ত কাজ সাওয়াবের আশায় কঠোর বিশ্বাসের সাথে সুসম্পন্ন করা হয়।

ভাগ্যের লিখনের উপর নির্ভর করে আমল ছেড়ে দেয়া

১। তোমাদের মধ্যে এমন কোন লোক নেই যার ঠিকানা জান্নাতে অথবা জাহান্নামে লিখে দেয়া হয়নি। সাহাবীগণ বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমরা কি ভাগ্যের লেখার উপর ভরসা করে বসে থাকব এবং আমল করা বর্জন করব যেহেতু আমাদের মধ্যে সেই ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে যে সৌভাগ্যশীলদের আমল করবে, আর সেই ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশীলদের অর্ন্তভুক্ত হবে যে দুর্ভাগ্যশীলদের আমল করবে? নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ যে ব্যক্তি সৌভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে তার জন্য সৌভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেয়া হবে আর যে ব্যক্তি দুর্ভাগ্যশীলদের অন্তর্ভুক্ত হবে তার জন্য দুর্ভাগ্যশীলদের আমল সহজ করে দেয়া হবে। [মুসলিম/৬৪৯২]

- সন্দেহ নেই যে, নির্ধারিত তাকদীর পরিবর্তনে দু'আর প্রভাব রয়েছে। তবে জেনে রাখা দরকার, পরিবর্তনটাও পূর্বে লেখা আছে যে, দু'আর মাধ্যমে অমুকের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এ ধারণা যেন না হয় যে, আপনি ভাগ্যের কোন অনির্ধারিত বিষয় পরিবর্তনের জন্য দু'আ করেছেন। সুতরাং দু'আ করবেন এটা লিখা আছে। আর দু'আর মাধ্যমে যা অর্জিত হবে, তাও লিখিত আছে। এ জন্যই আমরা দেখতে পাই যে, রোগীর উপর চিকিৎসা করা হলে রোগী সুস্থ হয়ে উঠে।

আল্লাহর অনুগ্রহ সন্ধানে বৈধ কোন শারীয়াত সম্মত উপায় অবলম্বণ করা, আল্লাহর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়

১। আসমান ও যমীনের অদৃশ্যের জ্ঞান কেবল আল্লাহরই রয়েছে। সকল বিষয়ই (চূড়ান্ত সিদ্ধান্তের জন্য) তাঁর কাছে ফিরে যায়। অতএব তুমি তাঁরই 'ইবাদাত কর, আর তাঁর উপরই নির্ভর কর, তোমরা যা কিছু করছ, সে সম্পর্কে তোমার রাব্ব মোটেই বে-খবর নন। [সূরা হুদ-১২৩]

২। যদি আল্লাহ তোমাদের সাহায্য করেন তাহলে তোমাদের উপর কেহই বিজয়ী হতে পারবেনা এবং যদি তিনি তোমাদের সাহায্য না করেন, সেই অবস্থায় এমন কে আছে যে তোমাদেরকে সাহায্য করবে? মু'মিনদের আল্লাহর প্রতি নির্ভর করা উচিত। [সূরা আলে ইমরান-১৬০]

৩। আর তাকে রিয্ক দিবেন (এমন উৎস থেকে) যা সে ধারণাও করতে পারেনা। যে কেহ আল্লাহর উপর ভরসা করে তার জন্য তিনিই যথেষ্ট। আল্লাহ নিজের কাজ সম্পূর্ণ করবেনই। আল্লাহ প্রতিটি জিনিসের জন্য করেছেন একটা সুনির্দিষ্ট মাত্রা। [সূরা তালাক-৩]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার উপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে পারতে তাহলে তোমরাও অবশ্যই রিয্ক পেতে, যেমন পাখিরা রিয্ক পেয়ে থাকে। ওরা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায়, আর বিকালে ফিরে আসে ভরা পেটে। [তিরমিযী/২৩৪৭-উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ)]

- প্রত্যেক মুসলিমের উচিত হল তার মালিক এবং আকাশ-জমিনের মালিকের উপর ভরসা করবে এবং তাঁর প্রতি ভাল ধারণা রাখবে। সাথে সাথে বাহ্যিক

উপায়-উপকরণ গ্রহণ করবে এবং আত্মরক্ষামূলক সতর্কতা অবলম্বন করবে। কেননা কল্যাণ সংগ্রহের উপকরণ গ্রহণ করা, তাঁর উপর ভরসা করার পরিপন্থী নয়। দেখুন সর্বশ্রেষ্ঠ ভরসাকারী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেও বিভিন্ন সময় বিভিন্ন উপায় ও সতর্কতামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন। নিদ্রায় যাওয়ার পূর্বে তিনি সূরা ইখলাস, ফালাক এবং নাস পাঠ করার মাধ্যমে রোগ-ব্যাধি থেকে বাঁচার জন্য শরীরে ফুঁক দিতেন। যুদ্ধক্ষেত্রে শত্রুদের আঘাত থেকে শরীর হিফাযাত করার জন্য লোহার পোশাক পরিধান করতেন। যখন মুশরিক সম্প্রদায় মাদীনা আক্রমণ করার জন্য তার চারপাশে একত্রিত হল, তখন মাদীনাকে রক্ষা করার জন্য তার চতুষ্পার্শ্বে খন্দক খনন করেছেন। যুদ্ধের সময় আত্মরক্ষার জন্য আল্লাহ যে সমস্ত হাতিয়ার সৃষ্টি করেছেন, তার জন্য আল্লাহর শুকরিয়া আদায় করা উচিত।

মুসলিম কারা?

১। আর তুমি অন্ধকেও তাদের গুমরাহী থেকে ফিরিয়ে আনার জন্য সৎপথ দেখাতে পারবেনা। তুমি কেবল তাদেরকেই শোনাতে পারবে যারা আমার নিদর্শনাবলীতে বিশ্বাস করে, অতএব তারা আত্মসমর্পণ করে। [সূরা নামল-৮১]

২। আর এ বিষয়ে ইবরাহীম ও ইয়াকূব স্বীয় পুত্রগণকে অন্তিম উপদেশ দান করে গেছে ঃ 'হে পুত্রগণ! আল্লাহ এ দীনকে তোমাদের জন্য পছন্দ করেছেন; অতএব তোমরা মুসলিম না হয়ে মৃত্যুবরণ করনা'। [সূরা বাকারা-১৩২]

৩। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর যেমনভাবে তাঁকে ভয় করা উচিত। তোমরা মুসলিম না হয়ে মরনা। [সূরা আলে ইমরান-১০২]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১২৮, ১৩২, ১৩৩, ১৩৬, আলে ইমরান-৫২, ৬৪, ৬৭, ৭৯, ৮০, ৮৪, মায়িদা-১১১, আন'আম-১৬২, ১৬৩, ইউনুস-৭২, ৮৪, ৯০, হুদ-১৪, ইউসুফ-১০১, নাহল-৮৯, ১০২, আম্বিয়া-১০৮, হাজ্জ-৭৮, নামল-৩০, ৩১, ৩৮, ৪২, ৮১, ৯১, কাসাস-৫৩, আহযাব-৩৫, যুমার-১১, ১২, যুখরুফ-৬৭, ৭০, আহকাফ-১৫, যারিয়াত-৩৫, ৩৬, কালাম-৩৫, জিন-১৪।

৫। প্রকৃত মুসলিম সে, যার জিহ্বা ও হাত থেকে সকল মুসলিম নিরাপদ থাকে। [বুখারী/৯-আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ), মুসলিম/৬৮, বুখারী/৬০২৭, তিরমিযী/২৫০৬]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের মত সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয়, আর আমাদের যবাহ করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানাত করনা। [বুখারী/৩৮৪-আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ)]

৭। মানুষ যদি শুধু দুনিয়ার উদ্দেশে মুসলিম হয় তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারবেনা যতক্ষণ ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবে। [মুসলিম/৫৮১৪-আনাস (রাঃ)]

- মুসলিমদের দল একটাই, মুক্তির পথ একটাই, আর তা হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দল, আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশিত পথ। যারা একমাত্র আল্লাহর কুরআন এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীসের আনুগত্য করেন তারাই শুধু মুসলিম। তাই আমি/আপনি মুসলিম কিনা তা নিজেকে নিজেই প্রশ্ন করি। আল্লাহর দল ছাড়া অন্য দল, তা যে নামেই ডাকা হোক না কেন, জাহান্নামই তাদের ঠিকানা।

মুসলিম হিসাবে কোন্ কাজটি করা সঠিক-বেঠিক তা অবশ্যই জেনে আমল করতে হবে

১। লোকেরা কি মনে করে যে 'আমরা ঈমান এনেছি' বললেই তাদেরকে অব্যাহতি দেয়া হবে, আর তাদেরকে পরীক্ষা করা হবেনা? [সূরা আনকাবূত-২]

২। আমি প্রত্যেক লোকের ভাগ্য তার কাঁধেই ঝুলিয়ে রেখেছি (অর্থাৎ তার ভাগ্যের ভাল-মন্দের কারণ তার নিজের মধ্যেই নিহিত আছে) আর কিয়ামাতের দিন তার জন্য আমি এক কিতাব বের করব যাকে সে উন্মুক্ত অবস্থায় পাবে। [সূরা বানী ইসরাইল-১৩]

৩। জ্ঞান-বুদ্ধি আর উত্তম নাসীহাতের মাধ্যমে তুমি (মানুষকে) তোমার রবের পথে আহ্বান জানাও, আর লোকদের সাথে বিতর্ক কর অতি উত্তম পন্থায় । তোমার রাব্ব ভালভাবেই জানেন কে তাঁর পথ ছেড়ে গুমরাহ হয়ে গেছে, আর কে সঠিক পথে আছে তাও তিনি বেশি ভাল জানেন। [সূরা নাহল-১২৫]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হুজুরাত-৬, আম্বিয়া-৭।

৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা ঠিকভাবে ও মধ্যম পন্থায় সৎ আমল করতে থাক। আর জেনে রেখ যে, তোমাদের কেহকে কেবল তার সৎ আমল জান্নাতে নিবেনা এবং আল্লাহর নিকট সবচেয়ে বেশী প্রিয় আমল হল যা নিয়মিত করা হয়। সেই আমল অল্প পরিমাণই হোক না কেন। [বুখারী/৬০০৭-আয়িশা (রাঃ), মুসলিম/৬৮৬১]

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন, একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ কোন্ আমলের বদৌলতে অধিকাংশ লোক জান্নাতে প্রবেশ করবে? তিনি বললেন ঃ তাকওয়া ও সচ্চরিত্রের বদৌলতে। আবার জিজ্ঞেস করা হল ঃ কোন্ জিনিস অধিকাংশ লোককে জাহান্নামে প্রবেশ করাবে? তিনি বললেন ঃ দুটি অংশ, মুখ ও লজ্জাস্থান। মুখ থেকে মন্দ কথা বের হয় এবং লজ্জাস্থান দ্বারা হারাম কাজ সম্পন্ন হয়। [ইব্‌ন মাজাহ/৪২৪৬]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কি বলতে পার অভাবগ্রস্ত কে? তারা বললেন, আমাদের মধ্যে যার দিরহাম (টাকা কড়ি) ও ধন-সম্পদ নেই সেই তো অভাবগ্রস্ত। তখন তিনি বললেন ঃ আমার উম্মাতের মধ্যে সেই প্রকৃত অভাবগ্রস্ত যে ব্যক্তি কিয়ামাতের দিন সালাত, সাওম ও যাকাত নিয়ে আসবে; অথচ সে এই অবস্থায় আসবে যে, একে গালি দিয়েছে, একে অপবাদ দিয়েছে, এর সম্পদ ভোগ করেছে, একে হত্যা করেছে এবং একে মেরেছে। এরপর একে একে তার সৎ আমল থেকে দেয়া হবে। এরপরও

পাওনাদারের হক তার সৎ আমল থেকে পূরণ করা না গেলে ঋণের বিনিময়ে তাদের পাপের একাংশ তার প্রতি নিক্ষেপ করা হবে। অতঃপর সে জাহান্নামে নিক্ষিপ্ত হবে। [মুসলিম/৩৪৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইসলামে কোন ভাল রীতির প্রচলন করবে এবং পরবর্তীকালে যদি সেই অনুযায়ী আমল করা হয় তাহলে আমলকারীর সাওয়াবের সমপরিমাণ সাওয়াব তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের পুরস্কারে কোন রূপ ঘাটতি হবেনা। আর যে ব্যক্তি ইসলামে কোন কু-রীতির প্রচলন করবে এবং তারপরে সেই অনুযায়ী যদি আমল করা হয় তাহলে ঐ আমলকারীর মন্দ ফলের সমপরিমাণ পাপ তার জন্য লিপিবদ্ধ করা হবে। এতে তাদের পাপ কিছুমাত্র হ্রাস করা হবেনা। [মুসলিম/৬৫৫৬, তিরমিযী/২৬৭৪]

- মানুষের অন্যতম বৈশিষ্ট্য হল সত্য বা মিথ্যা নির্ণয় করার ক্ষমতা, বুদ্ধি ও উপলব্ধি, চিন্তা ও গবেষণা করে সত্যতা যাচাই বাছাই করা, সত্য, উত্তম, উৎকৃষ্ট, নির্ভেজাল ও বিশুদ্ধ বিষয় গ্রহণ করা। মিথ্যা, ভেজাল এবং সন্দেহযুক্ত বিষয় বর্জন করা। আল কুরআন অবতীর্ণ হয়েছে সত্য-মিথ্যার পার্থক্যকারী রূপে। আল কুরআন স্পষ্ট করে বলে দিচ্ছে জীবনের চলার পথে কোনটি সরল পথ, আর কোনটা বাকা পথ। কোনটি হালাল, জায়েয, বৈধ, আর কোনটি হারাম, নাজায়েয ও অবৈধ।

কুরআন ও হাদীস যেমন তাকে বা আলমারীতে তুলে রাখা যাবেনা তেমনি তার প্রয়োগ সর্বক্ষেত্রে নিশ্চিত না করতে পারলে নির্ভুল, নির্ভেজাল ও নিখুত জিনিস্ সমাজ থেকে বিদায় নিবে । মানুষ যে পেশার বা যে অবস্থারই হোক না কেন কোন জিনিস কিনতে গেলে যাচাই-বাছাই, পরীক্ষা-নিরীক্ষা বা দেখা শুনা না করে গ্রহণ করেনা। উদাহরণ স্বরূপ ২০ টাকার মাটির হাড়ি/পাতিল কিনতে গেলেও দেখে নেয় যে, ফাটা-ফুটা কিংবা ভাঙ্গা আছে কিনা। কাপড় কিনতে গেলে দেখে নেয় হাতে বহরে, রং-এ ও সূতায় সব ঠিক-ঠাক আছে কিনা এবং টেকসই হবে কিনা। মাছ, তরকারী কিনতে গেলে দেখে টাটকা আছে নাকি পঁচে গেছে। আবার ওজনটাও সঠিক কিনা। দুধ, চিনি, গুড়, লবণ, তেল, আটা, ময়দা, চাল, ডাল, সাবান, সোডা, জিরা, মরিচ, মসলা, ফলমূল ইত্যাদি কেনার সময় বার বার পরীক্ষা করে যে ভেজাল নাকি আসল। অর্থাৎ দুনিয়ার জীবন নিরাপদ বিঘ্নমুক্ত করতে সে নকল থেকে সাবধান হয়, আর আসলটাই গ্রহণ করতে চায়। জমি কেনা/বেচায় ভূয়া দলীল কিনা, দাগ খতিয়ান ঠিক আছে কিনা তাও অভিজ্ঞ পারদর্শীদের দ্বারা দেখিয়ে নেয়। সর্বদা সে এক নম্বরটাই কেনার বা পাবার পক্ষপাতি, ২ নম্বর বা ৩ নম্বর থেকে দূরে থাকতে চায়। লোকজনের মধ্যেও তার স্বভাব-চরিত্র এবং আচার-ব্যবহারে সে ২ নম্বর কিনা তাও ধরা পড়ে। ধর্মের ক্ষেত্রেও তার ব্যতিক্রম নয়। এখানে নকল বা ভেজালের প্রবণতা আরো ব্যাপক, আরো বেশী। কারণ শাইতান সব সময় মানুষকে বিপদের দিকে নিচ্ছে। কেননা এটা অত্যন্ত স্পর্শকাতর ব্যাপার, ভক্তি/ শ্রদ্ধার ব্যাপার ও পারলৌকিক মুক্তির বিশ্বাসের ব্যাপার।

দুনিয়ার ব্যাপারে একজন ক্ষেত মজুর, একজন রিক্সাওয়ালা, একজন মিল শ্রমিক, একজন নির্মাণ শ্রমিক সাধারণতঃ এরা নিরক্ষর, লেখাপড়া না জানা। অথচ তারাও কেনা-কাটায় কখনও নকল বা ভেজাল ক্রয় করবেনা। দেখে শুনে পরখ করে তারপর যখন নিশ্চিত হবে যে, তার চাহিদার বস্তুটি আসল, নির্ভেজাল, নিখুঁত, টেকসই এবং খাঁটি আর ওজনেও ঠিক, তখন সেটা খরিদ করবে। তাহলে দেখা যাচ্ছে এ ব্যাপারে শিক্ষা, অক্ষরজ্ঞান বা বিদ্যা/বুদ্ধির পরিপক্কতার প্রয়োজন পড়ছেনা। প্রাথমিক যাচাই বাচাই সবাই বুঝে। কিন্তু পারলৌকিক জীবনের জন্য একজন মৌলভী সাহেব বললেই তা কেন করতে হবে? তখন যাচাই বাছায়ের প্রয়োজন পড়েনা কেন? অথচ ঐ মৌলভী সাহেব যখন ক্রেতারূপে পণ্য কিনতে যান তখন তো চোখ বুজে ক্রয় করেননা। তখনও তো আসল/নকলটা দেখেন, পরিমাপক ওজনটাও দেখেন। বিশ্বাস, আস্থা, ভক্তি এখানে কোন কাজে আসেনা। তবে কথা হল দুনিয়া বা পার্থিব বিষয়ের লাভ ক্ষতি প্রত্যক্ষভাবে দেখা যায়। বাস্তবে ভেজালের প্রতিফল ভোগ করা যায় এবং এর জন্য খিশারাতও দিতে হয় আর্থিক, শারীরিক, মানসিক ও সামাজিকভাবে তাই এত পরীক্ষা নিরীক্ষা। ভেজাল খেলে নানাবিধ রোগ হবে, ডাক্তার, ঔষধ, হাসপাতাল, হয়রানী এমনকি মৃত্যুও হতে পারে তাই এতশত সর্তকতা।

মৃত্যুর আযাব, কাবরের আযাব, পুলসিরাত পারাপারে ভয়ংকর অবস্থা, হাশর দিবসের ভয়াবহ রূপ, মিযান আর বিচার এবং জান্নাত-জাহান্নাম, মৃত্যুর পর অনন্ত জীবন এ সবই অবধারিত মহাসত্য। এ সবই বিশ্বাস করতে হবে একান্তভাবে। কোন প্রকার সন্দেহ বা ইতস্ততঃ ভাসমান মনোভাব থাকবেনা। সেই জীবনের কাজগুলি যা কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিদ্যমান সব কিছুই আন্তরিকতার সাথে যথা নিয়মে যথা সময়ে যথার্থভাবে করতে হবে। সেই যথার্থতা সত্যিই যথার্থ কিনা তা পরীক্ষা করতে হবে সবাইকে। এটি কি ভাই কুরআনের আয়াত নাকি সহীহ হাদীস? দশ জনে একজনের উপর দায়িত্ব দিলে চলবেনা। 'দশ জনে করছে তাই আমিও করছি' এটা বললেও নিস্তার পাওয়া যাবেনা। শতশত লোকে করছে এ দোহাই দেয়াও নিরর্থক। কেননা 'দুনিয়ায় যখন সবাই ভেজাল খাচ্ছে আমিও খাই' এ কথা যখন বলা হয়না তখন দীনের বেলায় কেন হবে? আল্লাহ বলেন ঃ হে নবী! তুমি যদি দুনিয়াবাসীদের অধিকাংশ লোকের কথার অনুসরণ কর, তবে তারা তোমাকে আল্লাহর পথ হতে বিভ্রান্ত করে ফেলবে, তারা তো নিছক ধারণা ও অনুমানেরই অনুসরণ করে, আর তারা ধারণা অনুমান ছাড়া কিছুই করছেনা। [সূরা আন'আম- ১১৬]

কালেমা, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, দান-খাইরাত, সুদ, ঘুষ, যেনা প্রভৃতি বিষয় যেমন আদেশ সূচক, তেমনি নিষেধ বাচক। করণীয়-বর্জনীয় যেভাবে, যে পদ্ধতি, যে সময়ে, যেমনটি আল্লাহ ও তাঁর রাসূল করতে বলেছেন এবং যা সত্য রূপে, নির্ভেজাল রূপে, আল কুরআন, সহীহ হাদীসে আছে সেখান থেকে নিয়ে আমল করতে হবে। কোন মানুষের কথা, বক্তার বক্তৃতা যতই সুরেলা হোক তা গ্রহণ করা যাবেনা, যদি তা দলীল ভিত্তিক সহীহ/সঠিক সূত্রে বর্ণিত না হয়।

শিক্ষিত-অশিক্ষিত সবাইকে ব্যক্তিগতভাবে তার আমল সম্পর্কে কাবরে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তার নিজ নিজ আমলনামায় যা লিপিবদ্ধ হচ্ছে সেই অনুপাতে জিজ্ঞাসাবাদ করা হবে। তখন এ কথা বলার অবকাশ থাকবেনা যে, সবাই করেছে, অধিকাংশরাই করেছে তাই আমি করেছি । ইন্টারভিউ বা সাক্ষাৎকার দিতে হবে ভিন্ন ভিন্নভাবে, প্রত্যেককে নিজ নিজ হিসাবসহ। অন্যের দোহাই বৃথা। জানিনা, লিখাপড়া শিখিনি, পড়তে ও দেখতে সময় পাইনি এ কথা বলে ক্ষমা পাওয়া যাবেনা।

প্রত্যেককেই অনুসন্ধিৎসু মন নিয়ে, জিজ্ঞাসু অন্তর দিয়ে, হক জানার কৌতুহল দ্বারা ঘুমন্ত আত্মাকে জাগিয়ে তুলতে হবে। ইবাদাত যা করছি তা সঠিক কিনা, ইবাদাত যা করছি তা শির্ক কিনা, ইবাদাত যা করছি তা বিদ'আত কিনা, তা আমাকেই যাচাই/বাছাই পরীক্ষা/নিরীক্ষা করে ঠিক করে নিতে হবে। প্রাথমিক যাচাই/বাছাইয়ে এটি কুরআনের আয়াত নাকি সহীহ হাদীস তা কেবল আল্লাহর কুরআন ও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীসের মানদন্ডের নিরীখে সঠিক হলে এবং সে অনুযায়ী আমল করলে আমি/আপনি আল্লাহর প্রতিনিধি হিসাবে জান্নাতের প্রত্যাশী।

মুসলিমদের দলে দলে ভাগ হওয়া পথভ্রষ্টতার সামিল

১। বিশুদ্ধ চিত্তে তাঁর অভিমুখী হয়ে তাঁকে ভয় কর, সালাত কায়েম কর এবং মুশরিকদের অন্তর্ভুক্ত হয়োনা। যারা নিজেদের দীনে মতভেদ সৃষ্টি করেছে এবং বিভিন্ন দলে বিভক্ত হয়েছে, প্রত্যেক দলই নিজ নিজ মতবাদ নিয়ে উৎফুল্ল। [সূরা রূম-৩১-৩২]

২। তার চেয়ে বড় যালিম আর কে আছে যাকে তার রবের আয়াতসমূহ দিয়ে উপদেশ দান করা হলে সে তা থেকে মুখ ফিরিয়ে নেয়? আমি অপরাধীদেরকে শাস্তি দিব। [সূরা সাজদাহ-২২]

৩। তোমাদের মধ্যে যারা আল্লাহ ও আখিরাতকে ভয় করে এবং আল্লাহকে অধিক স্মরণ করে, তাদের জন্য রাসূলুল্লাহর মধ্যে রয়েছে উত্তম আদর্শ। [সূরা আহ্যাব-২১]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নাহল-১০৪, আন'আম-১৫৯, আলে ইমরান-১০৩, আ'রাফ-৩।

৫। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডান দিকে দু'টি রেখা টানলেন এবং বাম দিকেও দু'টি রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে হাত রেখে বললেন ঃ এটা আল্লাহর রাস্তা। এ পথই হল সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবেনা। করলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। [ইব্‌ন মাজাহ/১১]

বাস্তবে আমরা দেখতে পাচ্ছি যে, মুসলিম দাবিদার এক শ্রেণীর আলেম সামান্য স্বার্থের কারণে মহান আল্লাহর হুকুম অমান্য করে পূর্ববর্তী কুরআন বিরোধীদের মতই দীন ইসলামকে ভেঙ্গে টুকরা টুকরা করে বিভিন্ন তরীকা ও দলে দলে ভাগ হয়েছে। সেই সাথে নিজেদের মতামত বা দলের নীতি মেনে চলা জনগণের উপর ফারয/আবশ্যক/জরুরী বলে ঘোষণা করেছে। ফলে অন্ধ ভক্তের পূঁজারীরা তাদের দলভুক্ত হয়ে আল্লাহর হুকুমের বিরুদ্ধে তাদের মনগড়া রায় ও ফাতওয়াকে দীনের বিধান হিসাবে মেনে নিয়ে তাদেরকেই বিধানদাতা বা রাব্ব হিসাবে মেনে নিয়ে আল্লাহর ইবাদাতে শির্ক করছে। আর এভাবে শির্ক করার পরেও প্রত্যেক দলই আবার নিজেদেরকে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের খাঁটি উম্মাত বা অনুসারী বলে দাবী করছে, যা দাবীই মাত্র। আর আল্লাহই ভাল জানেন।

মুসলিমরা নিজ খেয়াল খুশির অনুসরণে চলতে পারেনা

১। নিজকে তুমি রাখবে তাদেরই সংসর্গে যারা সকাল-সন্ধ্যায় আহ্বান করে তাদের রাব্বকে তাঁর সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশে এবং তুমি পার্থিব জীবনের শোভা কামনা করে তাদের দিক হতে তোমার দৃষ্টি ফিরিয়ে নিওনা; যার চিত্তকে আমি আমার স্মরণে অমনোযোগী করে দিয়েছি সে তার খেয়াল খুশীর অনুসরণ করে এবং যার কার্যকলাপ সীমা অতিক্রম করে তুমি তার আনুগত্য করনা। [সূরা কাহফ- ২৮]

২। অতঃপর তারা যদি তোমার কথায় সাড়া না দেয় তাহলে জেনে রেখ, তারা শুধু তাদের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে। আল্লাহর পথ নির্দেশ ছাড়াই যে নিজের প্রবৃত্তির অনুসরণ করে তার চেয়ে অধিক পথভ্রষ্ট আর কে আছে? যালিম সম্প্রদায়কে আল্লাহ সঠিক পথে পরিচালিত করেননা। [সূরা কাসাস-৫০]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাফ-২৬, নিসা-১৩৫, মায়িদা-৪৮, ৪৯, ৭৭, মুহাম্মাদ-১৪-১৬, কামার-৩, বাকারা-১২০, ১৪৫, রূম-২৯, রাদ-৩৭, হাশর-১৬, ফুরকান-৪৩-৪৪, শূরা-১৫।

৪। যে ব্যক্তি কোন সম্প্রদায়ের অনুসরণ-অনুকরণ করবে সে তাদের দলভুক্ত হবে। [আবূ দাউদ/৩৯৮৯]

পারিবারিক, সামাজিক, আর্থিক, ধর্মীয় ও আন্তর্জাতিক জীবনে মুসলিমরা ইবলীসের জালে জড়িয়ে গেছে। সেখান থেকে বের হতে দিচ্ছেনা খায়েশ নামক প্রভু। শুধু এ মর্মান্তিক দৃশ্য সকল বানী আদমের জন্য আজকের নয়, যুগে যুগে এমনটি দেখা গেছে, হয়ত বিভিন্ন আঙ্গিকে। লাগামহীন ইচ্ছাই স্বেচ্ছাচারী হয়ে কলংকিত করছে কলব বা হৃদয় বা অন্তরকে। সেখানে প্রভুর হুকুমকে সরিয়ে মানুষের নানা রং ও ঢংয়ের হুকুমকে স্থান করে দিয়েছে। ফলে আসলের আসনে নকল বসে আছে খায়েশকে প্রভু বানিয়ে।

আল কুরআন অবতীর্ণ হবার পর পূর্ববর্তী সকল আসমানী কিতাবের কার্যকারিতা রহিত হয়ে গেছে। যেমন নাবী মুহাম্মাদুর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নাবুওয়াত লাভের পর সকল নাবীর সুন্নাহও রহিত হয়ে গেছে। তাই

এখন আল কুরআন ও সহীহ হাদীসে যে বিধান রয়েছে তা জীবনের সর্বক্ষেত্রে প্রয়োগ, প্রচলন ও বাস্তবায়ন করতে হবে। অন্য কোন বিধান মুসলিমের মান্য করা উচিত নয়।

মুসলিম কেন পরীক্ষার সম্মুখীন হয়?

১। তিনি সৃষ্টি করেছেন মৃত্যু ও জীবন, তোমাদের পরীক্ষা করার জন্য- কে তোমাদের মধ্যে কর্মে উত্তম? তিনি পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। [সূরা মুল্‌ক-২]

২। তোমাদের ধন-সম্পদ আর সন্তানাদি পরীক্ষা মাত্র। আর আল্লাহ্ এমন যাঁর কাছে আছে মহাপুরস্কার। [সূরা তাগাবুন-১৫]

৩। আমি তোমাদের একে অপরের জন্য করেছি পরীক্ষা স্বরূপ, তোমরা ধৈর্য ধারণ করবে কি? তোমার রাব্ব সব কিছু দেখেন। [সূরা ফুরকান-২০]

৪। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ সূরা তাওবা-২৪

৫। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের ন্যায় সালাত আদায় করে, আমাদের কিবলামুখী হয়, আর আমাদের যবাহ করা প্রাণী খায়, সেই মুসলিম, যার জন্য আল্লাহ ও তাঁর রাসূল যিম্মাদার। সুতরাং তোমরা আল্লাহর যিম্মাদারীতে খিয়ানাত করনা। [বুখারী/৩৮৪-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ)]

☐ মুসলিমের কর্তব্য হচ্ছে ঈমানের বলে বলীয়ান হয়ে ফিতনা প্রতিরোধ করা এবং আল্লাহর রজ্জুকে (কুরআন-সহীহ হাদীস) সংঙ্ঘবদ্ধ হয়ে দৃঢ়ভাবে আঁকড়ে ধরা। আর যারা কুরআন-হাদীসের জ্ঞান রাখে এবং তা দৃঢ়ভাবে আকড়ে ধরে তাদের থেকেই শারীয়াতের হুকুম-আহকাম জেনে নেয়া। মুসলিম হিসাবে যে কোন বিপদ-আপদে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। আল্লাহ আমাদের তাওফীক দান করুন। আমীন।

মানব জীবনে পথভ্রষ্টতা

১। আমি জিন ও মানবকে সৃষ্টি করেছি একমাত্র এ কারণে যে, তারা আমারই 'ইবাদাত করবে। আমি তাদের থেকে রিয্‌ক চাইনা, আর আমি এও চাইনা যে, তারা আমাকে খাওয়াবে। আল্লাহই তো রিয্‌কদাতা, মহাশক্তিধর, প্রবল পরাক্রান্ত। [সূরা যারিয়াত-৫৬-৫৮]

২। কাজেই দীনের প্রতি তোমার চেহারা নিবদ্ধ কর একনিষ্ঠভাবে। এটাই আল্লাহর প্রকৃতি, যে প্রকৃতি তিনি মানুষকে দিয়েছেন। আল্লাহর সৃষ্টির (বিধানের) কোন পরিবর্তন নেই। এটাই সুপ্রতিষ্ঠিত দীন, কিন্তু অধিকাংশ মানুষ জানেনা। [সূরা রূম-৩০]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-২১৩, নিসা-১৬৩, ইউনুস-১৯, ১০৬, যুমার-৩, নামল-১৪।

৪। রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আমাদের বিরুদ্ধে অস্ত্র ধারণ করবে সে আমাদের দলভুক্ত নয়, আর যে ব্যক্তি আমাদের ধোঁকা দিবে সেও আমাদের দলভুক্ত নয়। [মুসলিম/১৮৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

আত্মাকে স্বভাবগতভাবে যখন ছেড়ে দেয়া হয় তখন সে আল্লাহকে ইলাহ বা মা'বূদ হিসাবে স্বীকার করে নেয়, আল্লাহর ভালবাসায় তাঁর ইবাদাত করে তাঁর সাথে কোন জিনিসকে শরীক করেনা। কিন্তু জিন ও ইনসানের মধ্যকার শাইতানরা যারা একে অপরকে বাক-চাতুর্য দ্বারা ধোঁকা দেয়, তারা তাকে পথভ্রষ্ট করে এবং উহা হতে সরিয়ে দেয়। সুতরাং স্বভাবগতভাবে একাত্মবাদ অন্তরে বদ্ধমূল থাকে, আর শির্ক হচ্ছে এমন আমল যা নতুনভাবে ইহার ভিতর অনুপ্রবেশ করে।

মানুষের চাওয়া পাওয়া

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

أَمْ لِلْإِنسَانِ مَا تَمَنَّى

মানুষ কি তাই পায় যা সে চায়? । [সূরা নাজম-২৪]

২। আর এই যে, মানুষ যা পাওয়ার জন্য চেষ্টা করে তাছাড়া কিছুই পায়না। [সূরা নাজম-৩৯]

৩। যে লোক আখিরাতের ফসল কামনা করে তার জন্য আমি তা বৃদ্ধি করে দিই এবং যে দুনিয়ার ফসল কামনা করে আমি তাকে এরই কিছু দিই, আখিরাতে তার জন্য কিছুই থাকবেনা। [সূরা শূরা-২০]

৪। আল্লাহ যদি তাঁর সকল বান্দাদের জন্য রিয্ক পর্যাপ্ত করে দিতেন তাহলে তারা অবশ্যই যমীনে বিদ্রোহ সৃষ্টি করত। কিন্তু তিনি একটা নির্দিষ্ট পরিমাণে যতটুকু ইচ্ছা নাযিল করেন। তিনি তাঁর বান্দাদের সম্পর্কে পূর্ণ ওয়াকিফহাল, তিনি তাদের প্রতি সর্বদা দৃষ্টি রাখেন। [সূরা শূরা-২৭]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-৫৭, ৫৯, ৬১, ওয়াকিআহ-৬৩, ৬৪, কাহফ-৫১, ফাতির-১৫।

৬। নিশ্চয়ই মানুষের নিজের সম্পদ তাই যা সে আগে পাঠিয়েছে। এ ছাড়া যে মাল বাকী থাকবে তা হল ওয়ারিসদের মাল। [বুখারী/৫৯৮৫-আবদুল্লাহ (রাঃ)]

৭। কল্যাণ একমাত্র কল্যাণকেই বয়ে আনে। যে ব্যক্তি দুনিয়ার ধনদৌলত ন্যায় ও সৎভাবে উপার্জন করবে এবং ন্যায় ও সৎকাজে ব্যয় করবে তা সেই ব্যক্তির খুবই সাহায্যকারী হবে। আর যে ব্যক্তি তা অন্যায়ভাবে উপার্জন করবে সেটা তার জন্য এ রকম খাদ্য হবে যে, সে তা খাবে কিন্তু পরিতৃপ্ত হবেনা। [বুখারী/৫৯৭১-আবূ সাঈদ (রাঃ), নাসাঈ/২৫৮৩]

৮। তিনটি জিনিষ মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। (দাফনের পর) দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। ঐ তিনটি হল তার আত্মীয়-স্বজন, তার সম্পদ ও তার আমল । তার আত্মীয়-স্বজন ও তার সম্পদ ফিরে আসে, কিন্তু তার আমল তার সাথেই থেকে যায়। [বুখারী/৬০৫৭-আনাস (রাঃ), মুসলিম/৭১৫৫]

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যদি মাল ও আকৃতির দিক থেকে তার তুলনায় শ্রেষ্ঠ ব্যক্তির প্রতি দৃষ্টিপাত করে তাহলে

সে যেন সঙ্গে সঙ্গে তার তুলনায় নিম্ন স্তরের ব্যক্তিদের প্রতি লক্ষ্য করে, যাদের উপর তাকে প্রাধান্য দেয়া হয়েছে। [মুসলিম/৭১৫৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

১০। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রায়ই বলতেন ঃ যদি আদম সন্তানকে স্বর্ণে পরিপূর্ণ একটা উপত্যকা পরিমাণ মাল দেয়া হয় তথাপিও সে এরকম দ্বিতীয়টার জন্য আকাংখিত হবে। আর এরকম দ্বিতীয়টা যদি দেয়া হয় তাহলে সে তৃতীয় আরও একটার জন্য আকাংখা করতে থাকবে। মানুষের পেটের ক্ষুধা মাটি ছাড়া আর কিছু দ্বারা ভরাতে পারবেনা। [বুখারী/৫৯৮২]

মানুষের চাওয়ার শেষ নেই, আর প্রাপ্তিতেও ক্লান্তি নেই। অর্থাৎ পাওয়ারও শেষ নেই। একটি পেলে অন্যটির জন্য প্রত্যাশা লেগেই থাকে। প্রয়োজনের শেষ নেই, আর চাহিদারও শেষ নেই। এ জন্যই বর্তমান সমাজের লোকেরা চুরি করে, সুদ খায়, ঘুষ খায়, দান-খাইরাত করেনা, যাকাত ঠিকমত দেয়না, ফসলের ওশর দেয়না, অন্যের মাল অন্যায় ভাবে দখল করে ও ভক্ষণ করে ইত্যাদি।

মুসলিম হিসাবে দৃষ্টিভঙ্গি সঠিক থাকলে পুরা জীবনটাই ইবাদাত বলে গণ্য হবে

১। তারা বলে ঃ ইয়াহুদী বা খৃষ্টান ছাড়া আর কেহই জান্নাতে প্রবেশ করবেনা; এটা তাদের মিথ্যা আশা। তুমি বল ঃ যদি তোমরা সত্যবাদী হও তাহলে তোমাদের প্রমাণ উপস্থিত কর। অবশ্য যে ব্যক্তি নিজেকে আল্লাহর নিকট সর্মপন করেছে এবং সৎকাজ করেছে, ফলতঃ তার জন্য তার রবের নিকট প্রতিদান রয়েছে এবং তাদের জন্য কোন আশংকা নেই ও তারা চিন্তিত হবেনা। [সূরা বাকারা-১১১-১১২]

২। আনাস (রাঃ) বলেন, মানুষ যদি শুধু দুনিয়ার উদ্দেশে মুসলিম হয় তাহলে সে ততক্ষণ পর্যন্ত প্রকৃত মুসলিম হতে পারবেনা যতক্ষণ ইসলাম তার কাছে দুনিয়া এবং দুনিয়ার সমস্ত সম্পদের চেয়ে বেশি প্রিয় না হবে। [মুসলিম/৫৮১৪]

কোন মুসলিম যদি মনে করে যে, সে এ দুনিয়ায় আল্লাহর খালিফা (প্রতিনিধি), তার কাজ আল্লাহর নির্দেশ বাস্তবায়ন করা, সে তাঁর সীমারেখা মেনে চলবে, তাঁর কালেমাকে প্রতিষ্ঠিত করবে এবং তাঁর দেয়া বন্দেগী পালন করবে, তাহলে তার সব আমলই তার রবের নির্দেশ মোতাবেক হয়েছে বলে গন্য হবে। তার তরফ থেকে যে কাজ, কথা, নড়াচড়া ও উঠাবসা সম্পাদিত হবে তার সবই বিশ্বজগতের রাব্ব আল্লাহর জন্য ইবাদাত বলে গণ্য হবে। যে ইঞ্জিনিয়ার যন্ত্র তৈরী করে তার এদিকে কোনই ভ্রুক্ষেপ নেই যে, এর মূল্য কত হবে, বরং তার দৃষ্টি থাকে যে, তার যন্ত্রটি যেন সর্বদা কর্মক্ষম থাকে যে জন্য যন্ত্রটি তৈরী করা হচ্ছে। বিমানের যোগ্যতা হল উড়ে যাওয়া, কামানের যোগ্যতা হল উৎক্ষেপন করা, কলমের যোগ্যতা হল লিখা। এই যোগ্যতাই হল কোন জিনিসের মূল্যায়নের মাপকাঠি। যদি আমরা সেটি নিশ্চিত হই তাহলেই তা গ্রহণ করি এবং এর ফল আশা করি। তেমনিভাবেই মানুষের বেলায় প্রযোজ্য। ইসলাম চায় তার মানসিক প্রস্তুতি প্রথমেই সঠিক হোক। যদি তার মাঝে কাংখিত

যোগ্যতা পাওয়া যায়, দৃঢ় বিশ্বাস ও সঠিক দৃষ্টিভঙ্গি থাকে, তাহলে তার জীবন চলার পথে যত কাজই আসবে তা স্বয়ংক্রিয়ভাবেই আল্লাহর আনুগত্যে রূপান্তরিত হবে। টাকা-পয়সা তৈরীর মেশিনে কাঁচা মাল (কাগজ, ধাতব বস্তু ইত্যাদি) দেয়ার পর যেমন তা মূল্যবান অর্থে রূপান্তরিত হয়, তেমনি একজন মুসলিমের জীবনে যে কাজই আসুক না কেন, তার ঈমানের নিক্তি ও সঠিক দৃষ্টি ভঙ্গির কারণে তা মূল্যবান ইবাদাতে পরিণত হবে। এই মানসিক যোগ্যতার জন্যই আল্লাহ তাদের দাবী প্রত্যাখান করেছেন যারা ধোকায় পড়ে। মানুষের জীবন চলার পথে সৎকাজের কোন সীমা নেই। তা গণনা করা যাবেনা বা কোন ছকে বাধাঁ যাবেনা। এ জন্যই দৃষ্টিভঙ্গি আল্লাহর উদ্দেশে নিবেদিত হবে ও আমল হবে যথাযথ এবং এর মাধ্যমে কাংখিত পূর্ণতায় পৌছতে হবে। আল্লাহ আমাদের সকলকে তাওফীক দান করুন।

মু'জিযাহ (অলৌকিক) দেখানোর ক্ষমতা কার হাতে?

১। অথবা তোমার একটি স্বর্ণ নির্মিত গৃহ হবে, অথবা তুমি আকাশে আরোহণ করবে, কিন্তু তোমার আকাশে আরোহণ আমরা তখনও বিশ্বাস করবনা যতক্ষণ না তুমি আমাদের প্রতি এক কিতাব অবতীর্ণ করবে যা আমরা পাঠ করব; বল ঃ পবিত্র আমার মহান রাব্ব! আমিতো শুধু একজন মানুষ, একজন রাসূল। [সূরা বানী ইসরাইল-৯৩]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৩১, বানী ইসরাইল-৯০।

৩। মাক্কাবাসী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে তাঁর নাবুওয়াতের নিদর্শন হিসাবে মু'জিযা দেখানোর দাবী জানাল। তিনি তাদেরকে চাঁদ দ্বিখন্ডিত করে দেখালেন। এমনকি তারা চাঁদের দু'খন্ডের মধ্যখানে হেরা পর্বতকে দেখতে পেল। [বুখারী/৩৫৭৭-আনাস ইবন মালিক (রাঃ), ৩৩৬৭]

⧉ মু'জিযাহ (অলৌকিকতা) দেখানো বা প্রকাশ করার ইখতিয়ার কোন মানুষ বা রাসূলের হাতে নেই। মূসা (আঃ)-এর মু'জিযাহ এটির সুস্পষ্ট দলীল।

মূসা (আঃ)-এর লাঠি সাপে পরিণত হওয়ায় মূসা (আঃ)-এর ভীত হওয়া প্রমাণ করেছে যে, মু'জিযাহ নাবীগণের ইখতিয়ারে নয়। সুতরাং কিরামাতি আওলিয়াদের ইখতিয়ারে কেমন করে থাকতে পারে? কিন্তু আমরা সাধারণ মানুষ না বুঝার কারণেই বলে থাকি অমুক, অমুক আওলিয়ারা কিরামাতি দেখাতে পারে, যা সত্য নয়। মূলত কিরামতি আল্লাহর ইখতিয়ারে।

মানুষ তার কর্ম অনুযায়ী ফলভোগ করবে

১। আমি কি আল্লাহকে ছেড়ে অন্য রাব্ব তালাশ করব? (অথচ প্রকৃতপক্ষে) তিনিই সব কিছুর রাব্ব। প্রত্যেক ব্যক্তি যা অর্জন করে তার জন্য সে নিজেই দায়ী হবে। কোন ভার বহনকারীই অন্যের ভার বহন করবেনা। অবশেষে তোমাদের প্রত্যাবর্তন স্থল তোমাদের রবের নিকটেই, তখন তিনি তোমাদেরকে জানিয়ে দিবেন যে সকল বিষয়ে তোমরা মতভেদে লিপ্ত ছিলে । [সূরা আন'আম-১৬৪]

২। যে সৎ আমল করে সে নিজের কল্যাণের জন্যই তা করে এবং কেহ মন্দ আমল করলে ওর প্রতিফল সেই ভোগ করবে। তোমার রাব্ব তাঁর বান্দাদের প্রতি কোন যুল্ম করেননা। [সূরা হা মীম আস সাজদা-৪৬]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নাজম-৩৬-৪১, যিলযাল-৭, ৮, নিসা-১২৩, ১২৪, হাক্কাহ-২৪, রাদ-২৪, যুমার-৭৩, তাহা-৭৪, কামার-৪৮, রাহমান-৪১, মা'আরিজ-১৫, ১৬, দুখান-৪৩, ৪৯, মুরসালাত-৪৬, 'আলা-১৪, ১৫, সাজদা-১৮, ২০।

৪। কিয়ামাতের দিন এক ব্যক্তিকে উপস্থিত করা হবে। অতঃপর তাকে জাহান্নামে নিক্ষেপ করা হবে। ফলে তার উদরস্থ নাড়ি-ভুড়ি বের হয়ে যাবে। এরপর গাধা যেমন চাক্কী নিয়ে ঘুরে অনুরূপভাবে সেও এগুলো নিয়ে ঘুরতে থাকবে। এ দেখে জাহান্নামীরা তার চতুষ্পার্শ্বে এসে সমবেত হবে এবং তাকে বলবে ঃ হে অমুক! তোমার কি হয়েছে? তুমি কি সৎ কাজের আদেশ দিতেনা এবং অসৎ কাজ হতে বিরত রাখতেনা? উত্তরে সে বলবে ঃ হ্যাঁ, আমি সৎ কাজের আদেশ দিতাম; কিন্তু নিজে তা পালন করতামনা এবং মন্দ কাজে বাধা দিতাম, কিন্তু নিজে মন্দ কাজ করতাম। [মুসলিম/৭২১৩-উসামা ইব্ন যায়িদ (রাঃ)]

৫। যে ব্যক্তি কোন সৎকাজের সংকল্প করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করলনা, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর যে সংকল্প করল ভাল কাজের এবং তা বাস্তবেও পরিণত করল তাহলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য দশগুণ থেকে সাতশ'গুণ পর্যন্ত, এমন কি এর চেয়েও অনেকগুণ বেশী সাওয়াব লিখে দেন। আর যে ব্যক্তি কোন অসৎ কাজের সংকল্প করল, কিন্তু তা বাস্তবে পরিণত করলনা, আল্লাহ তা'আলা তার জন্য সাওয়াব লিপিবদ্ধ করবেন। আর যদি সে ওই অসৎ কাজের ইচ্ছা করার পর বাস্তবেও তা করে ফেলে তাহলে তার জন্য আল্লাহ তা'আলা মাত্র একটা পাপ লিখে দেন। [বুখারী/৬০৩৪-ইব্ন আব্বাস (রাঃ)]

⧉ পুরস্কার ও তিরস্কার সম্পূর্ণ আমলের উপর নির্ভর করে। কোন মুসলিমের আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারো নিকট আশ্রয় প্রার্থনা, তাকে ডাকা এবং তার নিকট প্রার্থনা করা তার জন্য ভীষণ ক্ষতিকর এবং ইহার পরিণাম হবে ভয়াবহ। এরূপ স্বভাবের লোকদের সম্পর্কে কুরআন যা বলছে তা প্রনিধানযোগ্য ঃ "সে এমন গাইরুল্লাহর ইবাদাত করে যা তার না কোন অপকার করতে পারে, না উপকার। ইহা হচ্ছে হাক্ক হতে বহু দূরবর্তী গোমরাহী। সে এমন বস্তুর ইবাদাত করে যার উপকারিতা অপেক্ষা অপকারিতা নিকটতর। কত নিকৃষ্ট এরূপ অভিভাবক এবং কত নিকৃষ্টতর সহচর। আল্লাহ ব্যতীত অন্যকে ডাকলে এটা শির্ক, ফলে যেটুকু সৎ আমল করে তা নিষ্ফল হয়। সে জন্য শির্ক ও বিদ'আতমুক্ত আমল করতে হবে।

মিলাদ

মৌলভীদের মাধ্যমে কোন বিশেষ উপলক্ষে কারো বাসায়, মাসজিদে বা অন্য যে কোন স্থানে কিছু লোকের উপস্থিতিতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া

সাল্লামের জন্ম-কাহিনীসহ কিছু গুণগান বর্ণনা, কিছু নিজেদের **উদ্ভাবন করা কিচ্ছা** ও দুরূদ পাঠ করার মাধ্যমে অনুষ্ঠান শেষ করা হয়। মিলাদের পরে সবার জন্য মিষ্টিমুখ এবং মৌলভীর জন্য কিছু টাকা/হাদীয়ার ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে, এটাই মিলাদ নামে পরিচিতি লাভ করেছে।

আগর বাতি ও গোলাপ পানির সুগন্ধির মধ্য দিয়ে মৌলভী সাহেব যথারীতি আল্লাহর প্রশংসা করে মিলাদ আরম্ভ করেন। কিচ্ছা কাহিনী, জন্ম বৃত্তান্ত শেষ করে মৌলভী সাহেব বলেন ঃ আসুন আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ করি, কারণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর দুরূদ পাঠ না করলে কোন দু'আ আল্লাহর নিকট পৌছেনা। সবাই একসঙ্গে দুরূদ পড়েন "আল্লাহুম্মা সাল্লে আ'লা, সাইয়েদিনা, মাওলানা মুহাম্মাদ, ওয়া আলিহি ওয়া আস্হাবিহী ওয়া সাল্লাম --------------------।"

এই প্রকার দুরূদ কোন সহীহ হাদীসে নেই। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে যে দুরূদ পড়ার আদেশ দিয়েছেন তা হল ঃ আল্লাহুম্মা সাল্লি আলা মুহাম্মাদিও .... কামা বারাকতা আলা ইবরাহীম ওয়া আলা আলি ইবরাহীমা ইন্নাকা হামিদুম মাজীদ। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এই দুরূদটিই প্রত্যেক সালাতে অন্তর্ভুক্ত করেছেন। যে দুরূদটা মিলাদে পড়া হল সেটা পরবর্তীতে প্রচলন করা হয়েছে, সে কারণে উহা বিদ'আতী দুরূদ। দুরূদের মর্মার্থ খুব ভাল সন্দেহ নেই, কিন্তু রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবিতাবস্থায় যে দু'আ, দুরূদ পড়ানো/শিখানো হয়নি ঐরূপ নতুন কোনো দু'আ, দুরূদে আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সমর্থন নেই।

অতঃপর সবাই মিলে পাঠ করা হয় ইরানের অধিবাসী শিয়া সম্প্রদায়ভুক্ত একজন ফারসী কবি শেখ সাদীর রচিত নিম্নোক্ত কবিতা ঃ

বালাগাল্ উলা বিকামালিহী
কাশাফাদ্দোজা বিজামালিহী
হাসানাত্ জামিউ খিসালিহী
ছাল্লো আ'লাইহে ওয়ালিহী

শেখ সাদীর কবিতাকেও মৌলভীগণ আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার সমান মর্যাদা দিয়ে ছাড়লেন! দীনের মধ্যে অতিরিক্ত কোন কিছু সংযোজন করার নামই হল বিদ'আত এবং আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন। আল্লাহর দেয়া সীমা লংঘন করলে কঠিন শাস্তি। উপরোক্ত দুরূদ পাঠের দ্বারা প্রমাণিত হয় যে, দুরূদে ইবরাহীম তাদের কাছে পছন্দনীয় নয়। বরং এটিই তাদের পছন্দ।

⊙ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা বলেন ঃ আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমা লঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। [সূরা নিসা-১৪]

সর্বশেষ মৌলভী সাহেব পড়েন ⊙ অর্থ ঃ আল্লাহ নাবীর প্রতি অনুগ্রহ করেন, তাঁর ফিরিশতারা নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা করে। হে মু'মিনগণ! তোমরাও নাবীর জন্য অনুগ্রহ প্রার্থনা কর এবং যথাযথ শ্রদ্ধাভরে সালাম জানাও। [সূরা আহযাব-৫৬]

পড়ার সাথে সাথে মৌলভী সাহেব দাঁড়িয়ে যান এবং সবাই তার অনুসরণ করে দাঁড়িয়ে এক সঙ্গে আর একটা দুরূদ পাঠ করতে থাকেন ঃ "ইয়া নাবী সালামু আলাইকা, ইয়া রাসূল সালামু আলাইকা, ইয়া হাবিব সালামু আলাইকা, সালাওয়া তুল্লা আলাইকা।" মৌলভীগনের ধারণা যে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আত্মা মিলাদের জলসায় আগমন করেন। তাই কোথাও কোথাও লক্ষ্য করা যায় যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আত্মার বসার জন্য একটা খালি চেয়ার, আগর বাতি ও ফুল দ্বারা সাজিয়ে রাখা হয়। ঐ পবিত্র আত্মার কাল্পনিক আগমনে সবাই দাঁড়িয়ে সম্মান প্রদর্শন করেন।

⊙ সাহাবীগনের নিকট রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের চেয়ে প্রিয় কোন ব্যক্তিত্ব এই পৃথিবীতে ছিলেননা। তা সত্বেও তাঁরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখে দাঁড়াতেননা। কেননা তাঁকে দেখে দাঁড়ানো তিনি পছন্দ করতেননা। [তিরমিযী/৪২৭৬-আনাস (রাঃ)]

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবিত অবস্থায় তাঁকে দাঁড়িয়ে সম্মান দেখাতে নিষেধ করেছেন, মৌলভীগণ তাঁর আত্মার কাল্পনিক আগমন ঘটিয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের বিরোধিতা করলেন। মৌলভীসাহেবদের বিদ'আতী দুরূদ ও শেখ সাদীর কবিতা পাঠ করলে কোন আত্মাই ঐ জায়গায় আসেনা; ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ তাহলে তোমরা তাকে (অর্থাৎ তোমাদের প্রাণকে মৃত্যুর সময়) ফিরিয়ে নাও না কেন যদি তোমরা (তোমাদের দাবীতে) সত্যবাদী হয়েই থাক? [সূরা ওয়াকিয়াহ -৮৭]

আল্লাহর কথায় বুঝা গেল, মৃত্যুর পর কারও আত্মাকে ইহজগতে ফিরিয়ে আনার ক্ষমতা কারো নেই। বিদ'আতী অনুষ্ঠান, বিদ'আতী দুরূদ, শেখ সাদীর কবিতা পাঠের মাধ্যমে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র আত্মাকে যারা আনতে পারে বলে বিশ্বাস করে তারা নিশ্চয়ই আল্লাহর উপরোক্ত আয়াতটিকেই বিশ্বাস করেনা এবং এরূপ আচরণ মুসলিমদের কাম্য নয়। হিন্দু ধর্মে পুনর্জন্মের বিশ্বাস আছে। বৌদ্ধ ধর্ম মতে মানব আত্মা মুক্তি লাভ করা পর্যন্ত বিভিন্ন প্রাণীর আকার ধারণ করে পুনঃ পুনঃ এই জগতে আসতে থাকে।

⊙ আল্লাহ তা'আলা ইরশাদ করেন ঃ প্রতিটি প্রাণী মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে, অতঃপর আমার কাছেই তোমাদেরকে ফিরিয়ে আনা হবে। [সূরা আনকাবূত-৫৭]

⊙ আল্লাহ বলেন ঃ আল্লাহ যে দিন রাসূলগণকে একত্রিত করবেন অতঃপর **বলবেন**, তোমাদেরকে কী জবাব দেয়া হয়েছিল। তারা বলবে, আমরা কিছুই জানিনা, তুমিই সকল গোপন তত্ত্ব জান। [সূরা মায়িদা-১০৯]

⊙ তুমি আমাকে যে ব্যাপারে নির্দেশ করেছ তা ছাড়া আমি তাদেরকে অন্য **কিছুই** বলিনি, (তা এই) যে, তোমরা আল্লাহর ইবাদাত কর যিনি আমার ও

তোমাদের রাব্ব ! আর তাদের কাজ কর্মের ব্যাপারে সাক্ষী ছিলাম যদ্দিন আমি তাদের মাঝে ছিলাম, অতঃপর যখন তুমি আমাকে উঠিয়ে নিলে তখন তুমিই ছিলে তাদের কার্যকলাপের তত্ত্বাবধায়ক, আর তুমি হলে প্রত্যেক ব্যাপারে সাক্ষী। [সূরা মায়িদা-১১৭]

মৃত্যুর পরে নাবী-রাসূলগণ এই জগতে ফিরে এসে কারো খোজ খবর নেননা; কিংবা কারো রাখা আসনে বসেননা। মৃত্যুর পর কারো আত্মা এই জগতে ফিরে এসে ঘুরাফিরা করে বলে যারা বিশ্বাস করে তারা আল্লাহর কথা বিশ্বাস করেনা। আল্লাহর কথা বিশ্বাস না করলে তারা কাফির হয়ে যাবে।

ছেলের পরীক্ষা সামনে, নতুন বাড়ীতে উঠতে হবে, নতুন ব্যবসা আরম্ভ করতে হবে, তখনই মৌলভী ডেকে মিলাদ অনুষ্ঠান করে থাকেন। এমন কি মদের দোকান চালু করতে, ভিডিওর দোকান বসাতে, সিনেমা হল চালু করতে, অবৈধ অর্থ হালাল করতে হলে মৌলভী সাহেবদের স্মরণাপন্ন হন। তাদের পকেটের ভাল যত্ন নেন; উনারা খতম পড়ে, কুরআনখানী করে, মিলাদ পড়ে। আল্লাহর নিকট মিলাদ আয়োজনকারীর পক্ষে রাহমাত ও বারাকাতের ব্যবস্থা ও সমস্ত বালা মুসিবাত হতে রক্ষা করার নিশ্চয়তা বিধান করার জন্য মৌলভীদের এবং আয়োজনকারীর নিজস্ব চিন্তা ভাবনা কোনই কাজে আসবেনা।

কারো কারো মুখে শোনা যায়, অবৈধ পথে অর্থ উপার্জন হলেও সেই অর্থের অংশ আল্লাহর পথে খরচ করলে সাওয়াব পাওয়া যাবে। এটা একটা জঘন্য মিথ্যা কথা। অবৈধ পথে অর্জিত অর্থ হারাম। ঐ অর্থ দ্বারা কোনই সাওয়াব পাওয়া যাবেনা। আল্লাহ তা'আলা হারাম অর্থকে তাঁর পথে খরচ করতে বলেননি। ⊙ রাসূল (সাঃ) বলেছেন ঃ অবৈধভাবে অর্জিত মালের সাদাকা/দান কবূল হয়না। [মুসলিম/৪২৬-মু, ই, সাদ (রাঃ)]। হারাম অর্থ দ্বারা যদি সাওয়াব পাওয়া যেত তাহলে সন্ত্রাসী, ডাকাত, চাঁদাবাজ, ছিনতাইকারী, ঘুষখোর, সুদখোর, চোর, ঠগবাজদের অপরাধের শাস্তি হল কোথায়? এবং সৎ উপার্জন করা ব্যক্তিদের ভাল কাজের মূল্যায়ন হল কোথায়। আল্লাহ কি ন্যায় বিচারক নন? (নাউযুবিল্লাহ)!

অনেকে বলে থাকেন ঃ "পাপের কাজ করুন, আল্লাহর কাজ সালাত, সিয়াম (রোযা) ইত্যাদি করুন; এই দুই-এর মধ্যে যে পাল্লা ভারী হবে ফলাফল হাশরের মায়দানে তাই হবে। অথচ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ ⊙ তোমার প্রতি যা অহী করা হয়েছে কিতাব থেকে তা আবৃত্তি কর আর সালাত প্রতিষ্ঠা কর; সালাত অশ্লীল ও মন্দ কাজ হতে বিরত রাখে। নিশ্চয়ই আল্লাহর স্মরণ সর্বশ্রেষ্ঠ (বিষয়)। তোমরা যা কর আল্লাহ তা জানেন। [সূরা আনকাবূত-৪৫]

আল্লাহর দেয়া সর্বোত্তম ইবাদাত হল সালাত; সালাত আদায়কারী যদি খারাপ কাজ করে অর্থাৎ পাপের কাজও করতে পারে তাহলে তার সালাত তাকে খারাপ কাজ থেকে রক্ষা করতে পারলনা অর্থাৎ তার সালাতই হয়না। আল্লাহর কথা মিথ্যা নয়। সালাতবিহীন লোক কাফির ও মুশরিকদের সমান। আল্লাহ তা'আলা তাদেরকে কি শাস্তি দিবেন তা সবাই অবগত আছেন। হালাল অর্থও যদি খতম

পড়ানো, মিলাদ পড়ানো, শাবীনা পড়ানো, পীরের মাজারে খরচ করা হয় তাতে কোন সাওয়াব হবে তা কুরআন সুন্নায় পাওয়া যায়না । কারণ আল্লাহর রাস্তায় এসব কাজ করে খরচ করার খাত এগুলি নয়।

এখন আমাদের একমাত্র কর্তব্য হল বিদ'আত পরিত্যাগ করা এবং ভাল কাজ করা যে কাজে আল্লাহ সন্তুষ্ট থাকেন। যত অন্যায়ই আমরা করে থাকি, মহান আল্লাহ তা'আলা আশার বাণী শোনাচ্ছেন ঃ

⊙ তবে তারা নয় যারা তাওবাহ্ করবে, ঈমান আনবে, আর সৎ কাজ করবে। আল্লাহ এদের পাপগুলোকে সাওয়াবে পরিবর্তিত করে দিবেন; আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, বড়ই দয়ালু। [সূরা ফুরকান-৭০]।

আর যদি কেহ পূর্বাবস্থায়ই থাকে তাহলে আল্লাহ তা'আলা ঘোষণা দিচ্ছেন ঃ

⊙ আর যদি তুমি কিতাবধারীদের সামনে সমুদয় দলীল হাজির কর, তবুও তারা তোমার কিবলার অনুসরণ করবেনা, আর তুমিও তাদের কিবলার অনুসরণকারী নও, আর তারা একে অপরের কিবলার অনুসরণকারী নয়। যদি তুমি তোমার নিকট জ্ঞান আসার পরেও তাদের মনগড়া মতবাদসমূহের অনুসরণ কর, সে অবস্থায় তুমিও অবাধ্য দলেরই অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা বাকারা-১৪৫]

⊙ হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

⊙ বল, 'তোমরা আল্লাহর ও রাসূলের আজ্ঞাবহ হও'। অতঃপর যদি তারা না মানে তাহলে জেনে রেখ, আল্লাহ কাফিরদেরকে ভালবাসেননা। [সূরা আলে ইমরান-৩২]

⧉ মিলাদ বা মৌলুদ পাঠ একটি নব আবিষ্কৃত বিদ'আত। এ কথা অনেক মৌলভী, ইমাম বা মোল্লা স্বীকার করা সত্ত্বেও কেবল এক প্লেট মুরগী-পোলাও ও কয়টি টাকার লোভে তা করে থাকেন। ঐ মৌলভীদের মধ্যে অনেকেই নাস্তিক ও বে-নামাযীর জানাযা পড়েননা, কিন্তু তারা মিলাদের দাওয়াত গ্রহণ করতে ভুল করেননা। তারা মিলাদের অনুষ্ঠানে উপস্থিত হওয়ার জন্য ব্যস্ত হয়ে যান। আল্লাহ ধৈর্যশীলদের সাথে আছেন। তাঁদেরকে বুঝাতে গেলে বুঝ মানেননা। অনেকে বিদ'আত স্বীকার করেও 'বিদ'আতে হাসানা' বা উত্তম মনে করেই করে থাকেন। অনেকে তা সুন্নাত প্রমাণ করার অপচেষ্টা করে এদিক-সেদিক থেকে অপ্রাসঙ্গিক দলীল উপস্থিত করে থাকেন। উপরন্ত সমাজে প্রচলিত ঐ বিদ'আতের কথা বললে নাকি তাঁদের পেটে ছুরি মারা হয়! অনেকে জামা'আতের দোহাই দিয়ে বলেন, তিনি যদি মিলাদ না পড়েন তাহলে জামা'আত তাকে রাখবেনা। যেন ঐ জামা'আত তাঁর রুযীর ভার নিয়ে রেখেছে এবং অন্য কোন জামা'আত বা মাসজিদে তাঁর চাকরি মিলবেনা।

বলা বাহুল্য যে, মুসলিম সমাজে ঐ শ্রেণীর মৌলভীরা মানুষের নিকট থেকে মিলাদ ইত্যাদি বিদ'আতী ধর্মানুষ্ঠান করে অসৎ উপায়ে অর্থ গ্রহণ করছে এবং নিজ ভক্তদেরকে সঠিক পথে আসতে বাধা দিচ্ছে। সত্য পথকে অন্যান্য নাম দিয়ে তাদের কানে তালা ঝুলিয়ে দিচ্ছেন। অতএব যে সরিষা ভূত ছাড়াবে,

সেই সরিষাতেই যদি ভূত জেঁকে বসে তাহলে সমাজের ভূত আর ছাড়াবে কিভাবে? সমাজের সাধারণ মানুষের উচিত, ধর্মের নামে অর্থ উপার্জনকারী ঐ সকল কাজ সম্বন্ধে সচেতন হওয়া। তাদেরকে মুরগী-পোলাও খাইয়ে অযথা পয়সা খরচ না করা। যাতে আপনার মৃত মাতা-পিতার কোন লাভ হবেনা তা করা অযথা বৈকি? এবার পাঠক সমাজ! আপনাদের নিকট আমার প্রশ্ন ঃ ধর্মের প্রতিটি কাজ যেমন, সালাত, সিয়াম, কুরআন তিলাওয়াত ও হাদীস অধ্যায়ন ইত্যাদি মৌলভীগণ বেশী বেশী করেন। কিন্তু আপনি কোনদিন লক্ষ্য করেছেন কি, যে মৌলভীরা মিলাদ পড়ান তারা কি কখনও তাদের নিজের পিতা-মাতার জন্য লোক ডেকে মিলাদ করান? কখনই দেখা যায়না। মৌলভীরা জানে এটা করে কোন লাভ নেই। সেজন্যই তারা নিজেরা মিলাদ করেনা।

মানত

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মানত করতে নিষেধ করেছেন। তিনি বলেন ঃ মানত কোন জিনিসকে দূর করতে পারেনা (অর্থাৎ কোন কিছু হওয়াকে আটকাতে পারেনা)। এর দ্বারা শুধুমাত্র কৃপণের মাল খরচ হয়। [বুখারী/৬১৪২-আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), ৬২২৩, আবূ দাউদ/৩২৬১, তিরমিযী/১৫৪৪, মুসলিম/৪০৯৬]

২। কেহ যদি হাজ্জ বা অন্য কিছুর মানত করে তাহলে ঐ ব্যক্তি মারা গেলে তার ওয়ারিসদের তা আদায় করা কর্তব্য। [বুখারী/৬২২৯-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)]

৩। সেই বস্তুর মানত কার্যকর নয়, যার মালিক সে নয়। মু'মিনকে অভিশাপ দেয়া তাকে হত্যা করার শামিল। [মুসলিম/২০৪-সাবিত ইব্‌ন যাহহাক (রাঃ)]

ইসলামে মানত মানার রেওয়াজ পছন্দনীয় নয়, বরং তা রাসূলের (সাঃ) সুন্নাতের সম্পূর্ণ বিপরীত হওয়ায় ইহা এক বিশেষ ধরনের বিদ'আত। আরও স্পষ্ট করে বলা যায়, টাকা-পয়সা বা ধন-সম্পদের কিছু মানত করতে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন, তা যে কোন উদ্দেশেই হোক না কেন যেহেতু তাতে অর্থের অপচয় হয়, আর অর্থের অপচয় যে কোন অবস্থায় শারীয়াতে সমর্থনযোগ্য নয়। যদি মানত মানতেই হয় (কোন উদ্দেশ্য হাসিলের জন্য নয়) তাহলে যেন সালাত (নামায), সিয়াম, আল্লাহর ঘরের হাজ্জ ইত্যাদি ধরনের মানত মানা হয়। কেননা তাতে আল্লাহ ছাড়া আর কেহই বান্দার মনের সামনে আসেনা, আসার সুযোগও নেই।

আল্লাহ ছাড়া কারো উদ্দেশে মানত করা যাবেনা, মানতের জিনিস কে ভোগ করবে?

১। সাদাকাহ হল ফকীর, মিসকীন ও তৎসংশ্লিষ্ট কর্মচারী ও যাদের মন জয় করা উদ্দেশ্য তাদের জন্য, দাসমুক্তি ও ঋণগ্রস্তদের জন্য, আল্লাহর পথে (ব্যয়ের জন্য) আর মুসাফিরের জন্য। এটা আল্লাহ কর্তৃক নির্ধারিত ফারয। আর আল্লাহ সর্বজ্ঞ, মহাবিজ্ঞানী। [সূরা তাওবা-৬০]

২। আর যে সমস্ত পশুকে পূজার বেদীর (আস্তানা) উপর বলি দেয়া হয়েছে .... তবে কেহ পাপ করার প্রবণতা ব্যতীত ক্ষুধার জ্বালায় (নিষিদ্ধ বস্তু খেতে) বাধ্য হলে আল্লাহ বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা মায়িদা-৩]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তার জন্য দু'টি সাওয়াব রয়েছে, আপনজনকে দেয়ার সাওয়াব আর সাদাকাহ দেয়ার সাওয়াব। [বুখারী/১৩৭৬-যাইনাব (রাঃ)]

৪। সেই প্রকৃত মিসকীন যার কোন সম্পদ নেই, অথচ সে (চেয়ে নিতে) লজ্জাবোধ করে অথবা কেহকে আঁকড়ে ধরে ভিক্ষা করেনা। [বুখারী/১৩৮৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

প্রচলিত ভাষায় "আস্তানা" বলা যেতে পারে এমন সব স্থান যা কোন বুজুর্গ ব্যক্তি কিংবা দেবতা অথবা কোন বিশেষ মুশরিকী আকিদার সাথে জড়িত। আস্তানা বলতে সেই সব স্থানকেও বুঝায় যে স্থান আল্লাহ ছাড়া অপর কারো জন্যে বলিদান করার উদ্দেশে লোকেরা নির্দিষ্ট করে নিয়েছে, যেখানে শির্ক ও বিদ'আতী অনুষ্ঠান হয়ে থাকে। আমাদের সমাজের লোকেরা পীর, মোর্শেদ, বুজুর্গ এদের নামে বা মাজারে, দরগায় টাকা-পয়সা, জিনিসপত্র, গরু-ছাগল ইত্যাদি মানত করে। আল্লাহ ছাড়া অন্য কারও নামে মানতের জিনিস মুসলিমদের ভোগ করা হারাম। যদি আল্লাহর নামে মানত করাও হয়, আর উহা যদি কোন আস্তানায় যবাহ করা হয় তাও মুসলিমদের ভোগ করা হারাম। কোন পীরের নামে বা উদ্দেশে দেয়া কোন বস্তু, কোন বুজুর্গানের মাজারে দেয়া যে কোন বস্তু ধনী-গরীব নির্বিশেষে কোন মুসলিম ভোগ করতে পারবেনা, যেহেতু আল্লাহ ঐ সমস্ত বস্তু মুসলিমদের জন্য হারাম করেছেন।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আল্লাহর হুকুমের দিকে একটু লক্ষ্য করুন। মাসজিদে দেয়া আল্লাহর নামের মানতের জিনিস ভোগ করবে ফকির, মিসকিন, ইয়াতীম, অসহায়-গরীব, ঋণ-ভারাক্রান্ত ও অসহায় পথিকেরা। আল্লাহ যাদেরকে খেতে অনুমতি দিয়েছেন তারা ব্যতিত উক্ত খাদ্য যারা খায়, আর যারা আগেই পুটুলি ভাগাভাগি করে নিয়ে নিল আল্লাহ তাদের জন্য মানতের দ্রব্য ভোগ করা নিষিদ্ধ (হারাম) করেছেন। মুসল্লীদের মধ্যে কেহ কেহ হয়ত আল্লাহ তা'আলার নির্ধারিত খাতের মধ্যে থাকতে পারেন, তাদের জন্য হারাম নয়। আল্লাহর নির্ধারিত খাত জেনে নিয়ে নিজেই ঠিক করে নিন আপনি এ সাদাকার বস্তু ভোগ করতে পারবেন কিনা। অনেক লোকই আল্লাহর নামে মানত করে মাসজিদে মিষ্টান্ন, মিষ্টি, জিলেপি দিয়ে থাকেন, এ খাদ্য দ্রব্যগুলি আপনার আহার করা ঠিক কিনা জেনে নিবেন। সবাই মানতের খাদ্য আহার করলে কোন ইবাদাতই আল্লাহর নিকট গ্রহণযোগ্য হবেনা। মাসজিদে দান, সাদাকা ও মানত হিসাবে মিষ্টান্ন দেয়া হলে ইমাম-মুসল্লি সবাই খাচ্ছে। কিন্তু প্রকৃত পক্ষে সবাই ওর হকদার নয়। হকদার হল সূরা তাওবা-৬০ নং আয়াতে বর্ণিত ৮ শ্রেণীর লোক। আল্লাহই সব ভাল জানেন।

মৃত্যু কথাটি সত্য

১। প্রতিটি জীবন মৃত্যুর স্বাদ গ্রহণ করবে এবং কিয়ামাতের দিন তোমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় বিনিময় দেয়া হবে। যে ব্যক্তিকে জাহান্নামের আগুন হতে রক্ষা করা হল এবং জান্নাতে দাখিল করা হল, অবশ্যই সে সফলকাম হল কেননা পার্থিব জীবন ছলনার বস্তু ছাড়া আর কিছুই নয়। [সূরা আলে ইমরান-১৮৫]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ কাহফ-১১০, কাফ-১৯, কিয়ামা-২৬-২৮, ওয়াকি'আহ-৮৩-৮৪, বাকারা-২৮, আলে ইমরান-১৪৪।

৩। তিনটি জিনিষ মৃত ব্যক্তির অনুসরণ করে থাকে। (দাফনের পর) দু'টি ফিরে আসে, আর একটি তার সাথেই থেকে যায়। ঐ তিনটি হল তার আত্মীয় স্বজন, তার সম্পদ ও তার আমল । তার আত্মীয় স্বজন ও তার সম্পদ ফিরে আসে, কিন্তু তার আমল তার সাথেই থেকে যায়। [বুখারী/৬০৫৭-আনাস (রাঃ), মুসলিম/৭১৫৫]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কেহ মৃত্যু কামনা করবেনা। কেননা কামনাকারী যদি সৎকর্মশীল হয় তাহলে (বেঁচে থাকলে) হয়ত সে সৎ কাজ বৃদ্ধি করবে। কিংবা সে পাপাচারী হলে হয়ত সে অনুতপ্ত হয়ে তাওবা করবে। [বুখারী/৬৭২৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৬৫৭৫]

☐ কুরআনুল কারীমে কম-বেশী ১৬৪টি আয়াতে মৃত্যুর কথা উল্লেখ আছে। মৃত্যু আর এক জীবনের প্রবেশ পথ, যে পথ পাড়ি দিয়ে যেতে হবে অনন্ত অসীম জীবনে। এটা খুবই কঠিন ব্যাপার। পাপ মৃত্যুর জন্য বড় বিপদ। এ মুসিবাত হতে উদ্ধারের জন্য কেহ সাহায্যে এগিয়ে আসবেনা। মৃত্যু শয্যার চারপাশ ঘিরে পিতা-মাতা, স্ত্রী, পুত্র, কন্যা, আত্মীয়, গুণগ্রাহী, ভক্ত, অনুরক্ত ভীড় করে আছে। অর্থবিত্ত, বাড়ী, সম্পদ সবই মওজুদ, কিন্তু হায়! কিছুই কাজে আসছেনা। কেহ ডাক শুনছেনা। ঐ ভয়ংকর আমলনামার আগ্রাসন থেকে রক্ষা করার জন্য কেহ এগিয়ে আসছেনা। একাকী জীবনের সব সঞ্চয় এখন এমন বিপর্যয় ডেকে এনেছে, যা থেকে পালাবার উপায় নেই। মৃত্যু এক কঠিন সত্য যে সকলের পিছে পিছে ছায়ার মত লেগে আছে।

মৃত ব্যক্তিরা নিজেদের কিংবা অন্য কারো জন্য কিছু করার ক্ষমতা রাখেনা

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন :

إِنَّكَ لَا تُسْمِعُ الْمَوْتَى وَلَا تُسْمِعُ الصُّمَّ الدُّعَاءَ إِذَا وَلَّوْا مُدْبِرِينَ

তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেনা, আর বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেনা যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা নামল-৮০]

২। আর জীবিত ও মৃতও সমান নয়। আল্লাহ যাকে ইচ্ছা করেন শোনান; যারা কাবরে আছে তুমি তাদেরকে শোনাতে পারনা। [সূরা ফাতির-২২]

৩। তার চেয়ে অধিক গুমরাহ কে, যে আল্লাহর পরিবর্তে এমন কিছুকে ডাকে যা কিয়ামাত পর্যন্ত তাকে সাড়া দিবেনা, আর তাদের ডাকাডাকি সম্পর্কেও তারা বেখবর? [সূরা আহকাফ-৫]

৪। তারা আল্লাহ ছাড়া অন্য যাদেরকে ডাকে তারা কিছুই সৃষ্টি করেনা, তারা (নিজেরাই) সৃষ্ট। [সূরা নাহল-২০]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-২৫৯, মায়িদা-১০৯, ১১৭, জিন-২১, আনকাবূত-৫৭, নাহল-২১, রাদ-১৪, রূম-৫২-৫৩।

৬। যখন তোমাদের কোন ব্যক্তির মৃত্যু হয় তখন কাবরেই প্রত্যহ সকাল ও সন্ধ্যায় তার জান্নাত অথবা জাহান্নামের ঠিকানা তার সামনে পেশ করা হয় এবং বলা হয় এ তোমার স্থায়ী ঠিকানা। কিয়ামাতের পুনরুত্থান পর্যন্ত এ অবস্থা চলতে থাকবে। [বুখারী/৬০৫৮-ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/৬৯৪৭]

⧉ মৃত্যুর পরে আত্মা আল্লাহর নিকট ফিরে যায়। ফিরে যাওয়া অর্থ হল, পূর্বে যেখানে ছিল সেখানে যাওয়া। জন্মের পূর্বে আমরা আল্লাহর নিকট ছিলাম, কোনখানে ছিলাম, কেমন ছিলাম, কি করতাম, এসব যেমন আমরা এখন জানিনা, তেমন মৃত্যুর পরে যেখানে যাব সেখান থেকে পৃথিবীর কিছুই জানা যাবেনা।

প্রিয় মুসলিম ভাই ও বোনেরা! কাবর ও মাজার সম্পর্কিত বর্তমান যে কু-প্রথা চলছে সে সম্পর্কে আমাদেরকে কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে চিন্তা করতে হবে। মাজারে শায়িত ব্যক্তি (লাশ) যত বড় কামেল, দরবেশ বা বুজুর্গ ব্যক্তিই হোক না কেন, আল্লাহর বাণী মোতাবেক জীবিত মানুষের কোন কথাই তারা শোনেনা। যদি কোন কথা তাদের শোনানো না যায়, তারা অন্যের জন্য আল্লাহর নিকট সুপারিশ কিভাবে করতে পারে? মৃত্যুর সাথে সাথেই মৃত ব্যক্তির আমলনামা বন্ধ হয়ে যায় এবং রাসূল এবং নাবীগণও আল্লাহর এই বিধানের ব্যতিক্রম নন। তাহলে কামেল বা দরবেশরা কিভাবে মৃত্যুর পর অন্যকে সাহায্য করতে পারেন? যেখানে স্বয়ং আমাদের প্রিয় নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কারো ভাল-মন্দ করার ক্ষমতা রাখেননা, সেখানে কামেল বা দরবেশরা কিভাবে মৃত্যুর পরে অন্যকে সাহায্য করতে পারবে। এ বিষয়ে সকল মুসলিমের অবশ্যই চিন্তা করা উচিত।

মুমূর্ষু ব্যক্তিকে 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ' বলার তালকীন দেয়া প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের মৃত্যু পথযাত্রীকে কালেমার তালকীন দিবে (অর্থাৎ তার কানের কাছে আস্তে আস্তে "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" পাঠ করতে হবে যেন সে তা শুনে আল্লাহকে স্মরণ করে)। [আবূ দাউদ/৩১০৩-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), মুসলিম/১৯৯২, ইব্‌ন মাজাহ/১৪৪৪]

২। সাঈদ ইব্‌ন মুসাইয়্যাব (রাঃ) এর পিতা থেকে বর্ণিত, তিনি বলেন ঃ আবূ তালিবের যখন মৃত্যু উপস্থিত হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার কাছে উপস্থিত হলেন এবং বললেন ঃ আপনি "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমাটি বলুন, আমি আল্লাহ তা'আলার নিকট আপনার ব্যাপারে এর মাধ্যমে সুপারিশ করব। [বুখারী/৬২১১]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কারও উপর বিপদ আসার পর তা স্মরণ করে অথবা মৃত্যু হওয়ার পরে উপস্থিত সকলের পাঠ করতে হয় إِنَّا لِلّٰهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ "ইন্নালিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন" (আমরা তো আল্লাহরই এবং নিশ্চিতভাবে তাঁর দিকেই প্রত্যাবর্তনকারী) [সূরা বাকারা-১৫৬, আবূ দাউদ/৩১০৫]

৪। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে মুমূর্ষু অবস্থায় তালকীন করতে হবে। যে ব্যক্তির রূহ বের হওয়ার উপক্রম হয়েছে তার কাছে বসে তাকে পাঠ করতে হবে, 'লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ', যেমনটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর চাচা আবূ তালিবের মৃত্যুর সময় করেছিলেন। তিনি বলেছিলেন ঃ "চাচা! আপনি লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু বলুন। এ কালেমা দ্বারা আমি আল্লাহর কাছে আপনার মুক্তির জন্য সুপারিশ করব।" কিন্তু চাচা আবূ তালিব তা বলতে অস্বীকৃতি জানিয়েছে এবং শির্কের উপর মৃতুবরণ করেছে। [বুখারী/৬২১১]

⧉ আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, মৃতপথ যাত্রীকে উপরোক্ত নিয়মে তালকীন না করে কেবল কয়েকজন পাশে বসে কুরআন তিলাওয়াত করে। মৃত ব্যক্তির জন্য কান্নাকাটি করা উচিত নয় । কিন্তু মৃত্যুর পরবর্তী দাফনের পর তালকীন দেয়া একটি বিদ'আত। কেননা এ ব্যাপারে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে কোন সহীহ হাদীস প্রমাণিত নেই। তবে দাফনের পর যা করা উচিত সে সম্পর্কে আবূ দাউদে একটি হাদীস বর্ণিত হয়েছে। ⊙ নবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন মৃতকে দাফন শেষ করলে তার কাবরের কাছে দাঁড়াতেন এবং বলতেন, "তোমাদের ভাইয়ের জন্য আল্লাহর কাছে ক্ষমা প্রার্থনা কর এবং তার দৃঢ়তা কামনা কর। কেননা এখনই তাকে প্রশ্ন করা হবে।" [আবূ দাউদ/৩২০৭]

মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে বিলম্ব করা

১। মৃত ব্যক্তির ক্ষেত্রে শারীয়াতের নির্দেশ হচ্ছে দ্রুত দাফন-কাফনের ব্যবস্থা করা। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "তোমরা জানাযা বহন করার সময় দ্রুত গতিতে চলবে। কেননা সে যদি মু'মিন হয় তাহলে তাকে কল্যাণের দিকে এগিয়ে দিলে। আর যদি অন্য কিছু হয় তাহলে খারাপ লোককে তোমাদের কাঁধ থেকে নামিয়ে দিলে।" [বুখারী/১২৩১]

২। একজন কালো বর্ণের পুরুষ অথবা বলেছেন কালো বর্ণের মহিলা মাসজিদ ঝাড়ু দিত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তার সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলেন। সাহাবীগণ বললেন, সে ইনতিকাল করেছে। তিনি বললেন ঃ তোমরা আমাকে খবর দিলেনা কেন? আমাকে তার কাবরটি দেখিয়ে দাও। তারপর তিনি তার কাবরের কাছে গেলেন এবং তার জানাযার সালাত আদায় করলেন। [বুখারী/৪৪৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/১৯১০]

⧉ দূর-দূরান্ত থেকে নিকটাত্মীয়দের উপস্থিত হওয়ার অপেক্ষায় মৃত ব্যক্তিকে দাফন করতে বিলম্ব করা উচিত নয়। (তবে অল্প কিছু সময় দেরী করায় কোন

দোষ নেই)। তারপরও দ্রুত জানাযার ব্যবস্থা করাই উত্তম। নিকটাত্মীয়গণ বিলম্বে পৌঁছলেও কোন অসুবিধা নেই। তারা মৃতের কাবরের উপর জানাযা সালাত আদায় করতে পারবে।

মৃত ব্যক্তির গোসলের বিশুদ্ধ পদ্ধতি

মৃত ব্যক্তিকে গোসল দেয়ার সুন্নাত পদ্ধতি হল ঃ প্রথমে তার লজ্জাস্থান ঢেকে দিবে, তারপর তার সমস্ত কাপড় খুলে নিবে। অতঃপর তার মাথা বসার মত করে উপরের দিকে উঠাবে এবং আস্তে করে পেটে চাপ দিবে যাতে পেটের ময়লা বেরিয়ে যায়। এরপর বেশী করে পানি ঢেলে তা পরিস্কার করে নিবে। তারপর হাতে কাপড় জড়িয়ে বা হাত মোজা পরে তা দিয়ে উভয় লজ্জাস্থানকে (নযর না দিয়ে) ধৌত করবে। তারপর 'বিসমিল্লাহ' বলবে এবং সালাতের ন্যায় উযূ করাবে। তবে মুখে ও নাকে পানি প্রবেশ করাবেনা। বরং ভিজা কাপড় আঙ্গুলে জড়িয়ে তা দিয়ে উভয় ঠোঁটের ভিতরের অংশ ও দাঁত পরিষ্কার করবে। একইভাবে নাকের ভিতরের অংশও পরিস্কার করবে। পানিতে কুল পাতা মিশিয়ে গোসল দেয়া মুস্তাহাব (উত্তম)। প্রথমে ডান দিকের সামনের দিক ও পিছন দিক ধৌত করবে। তারপর বাম দিক ধৌত করবে। এভাবে তিনবার গোসল দিবে। প্রতিবার হালকাভাবে পেটে হাত বুলাবে এবং ময়লা কিছু বের হলে পরিস্কার করে নিবে। গোসলের সময় সাবান ব্যবহার করতে পারবে এবং প্রয়োজন মোতাবেক তিনবারের বেশী সাত বা ততোধিক গোসল দিতে পারবে। শেষবার কর্পূর মিশ্রিত পানি দিয়ে গোসল দেয়া সুন্নাত। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর কন্যা যাইনাব (রাঃ)-এর শেষ গোসল কর্পূর মিশ্রিত পানি ব্যবহার করতে নির্দেশ দিয়েছিলেন এবং তাঁকে প্রয়োজন মনে করলে তিনবার বা পাঁচবার বা তার চেয়ে অধিকবার গোসল দিতে বলেছেন। [বুখারী/১১৭৭, তিরমিযী/৯৯০, নাসাঈ/১৮৮৪, ১৮৯১, মুসলিম/২০৪৩, ইব্‌ন মাজাহ্/১৪৫৮]

মুনাফিক

১। নিশ্চয়ই মুনাফিকরা ধোঁকাবাজী করে আল্লাহর সাথে, বস্তুতঃ তিনিই তাদের ধোঁকার শাস্তি দেন। আর যখন তারা সালাতের জন্য দাঁড়ায় তখন তারা দাঁড়ায় শৈথিল্যের সাথে, কেবল লোক দেখানোর জন্য। আর তারা আল্লাহকে স্মরণ করে খুবই কম। [সূরা নিসা-১৪২]

২। তারা দু'টানায় দোদুল্যমান, না এদের দিকে, না ওদের দিকে! আর আল্লাহ যাকে গুমরাহীতে রেখে দেন, তুমি কখনো তার জন্য কোন পথ পাবেনা। [সূরা নিসা-১৪৩]

৩। হুযাইফা ইব্‌ন ইয়ামান (রাঃ) বলেন ঃ বর্তমান যুগের মুনাফিকরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগের মুনাফিকদের চেয়েও জঘন্য। কেননা সেই যুগে তারা (মুনাফিকী) করত গোপনে, আর বর্তমানে করে প্রকাশ্যে। [বুখারী/৬৬১৫]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'মুখ বিশিষ্ট ব্যক্তি (অর্থাৎ মুনাফিক) নিকৃষ্টতম, যে এক পক্ষের লোকের সাথে এক মুখে এবং

অপর পক্ষের লোকের সাথে অন্য মুখে কথা বলে। [আবূ দাউদ/৪৭৯৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

- বর্তমান সমাজের কতিপয় মুসলিম মুখে ইসলামকে প্রকাশ করে কিন্তু কার্যকলাপে ব্যতিক্রম আচরণ করে । যেমন ঃ

ক) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের সাথে নিজের আমল মিলিয়ে নেয়না।

খ) নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন তাঁর যে কোনটার সাথে বিরোধ হওয়াকে দোষনীয় মনে করেনা।

গ) আল্লাহর কুরআন ও রাসূলের (সাঃ) সহীহ হাদীস মোতাবেক সালাত আদায় না করে বিভিন্ন দলের ইমামের মনোনীত (মাযহাবী) পন্থায় সালাত আদায় করা।

ঘ) ইসলামের বিজয়কে অপছন্দ করা ইত্যাদি।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূল (সাঃ) সম্বন্ধে মিথ্যা বলা

১। তার থেকে বড় যালিম আর কে যে আল্লাহ সম্পর্কে মিথ্যা কথা রচনা করে অথবা বলে, আমার প্রতি অহী নাযিল হয়; যদিও তার কাছে কিছুই অবতীর্ণ হয়না। আর যে বলে ঃ আল্লাহ যা নাযিল করেন আমি শীঘ্রই তার অনুরূপ নাযিল করব। হায়! যদি তুমি ঐ যালিমদেরকে দেখতে পেতে যখন তারা মৃত্যু যন্ত্রণায় ছটফট করতে থাকবে, আর ফিরিশতারা হাত বাড়িয়ে দিয়ে বলবে, তোমাদের জানগুলোকে বের করে দাও, আজ তোমাদেরকে অবমাননাকর আযাব দেয়া হবে যেহেতু তোমরা আল্লাহ সম্পর্কে এমন কথা বলতে যা প্রকৃত সত্য নয়, আর তাঁর নিদর্শনগুলোর ব্যাপারে ঔদ্ধত্য প্রদর্শন করতে। [সূরা আন'আম-৯৩]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ইউনুস-৬৯, যুমার-৬০, নাহল-১১৬, আন'আম-১৪৪।

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কেহকে ফাতওয়া দেয়া হলে তার পাপের ভার ফাতওয়াদাতার উপর বর্তাবে। [ইব্ন মাজাহ/৫৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমানও হয়। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল। [বুখারী/৩২০৭]

- মিথ্যা বলা মহাপাপ। কিন্তু আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর মিথ্যা বলা, যা বলেননি তা নিজের তরফ থেকে বানিয়ে বলা আরও বড় মহাপাপ। "সাধারণ ভাবে মিথ্যা কথা বলা বা মিথ্যা সাক্ষ্য দেয়া কাবীরা গুনাহ কিন্তু আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের উপর মিথ্যারোপ করলে পরিণতি হবে জাহান্নাম"।

মিথ্যা বলা

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فَاجْتَنِبُوا الرِّجْسَ مِنَ الْأَوْثَانِ وَاجْتَنِبُوا قَوْلَ الزُّورِ

সুতরাং তোমরা বর্জন কর মূর্তি পূজার অপবিত্রতা এবং দূরে থাক মিথ্যা কথা থেকে। [সূরা হাজ্জ-৩০]

২। অতএব তুমি অনুসরণ করবেনা মিথ্যারোপকারীদের। [সূরা কালাম-৮]

৩। মিথ্যাচারীরা অভিশপ্ত। [সূরা যারিয়াত-১০]

৪। আক্ষেপ সেদিন মিথ্যারোপকারীদের জন্য। [সূরা মুরসালাত-২৮]

৫। যে ব্যক্তি আল্লাহ সম্বন্ধে মিথ্যা রচনা করে কিংবা তাঁর নিদর্শনকে অস্বীকার করে তার অপেক্ষা বড় যালিম আর কে? [সূরা আ'রাফ-৩৭]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মায়িদা-৮, মা'আরিজ-৩৩-৩৫, ফুরকান-৭২, বাকারা-২৮৩, হাজ্জ-৩০, নিসা-১৩৫।

৭। মিথ্যা কথা বলা সবচেয়ে বড় পাপ। [বুখারী/৫৮২৬-আবূ বাকর (রাঃ)]

বহু মানুষ না জেনে ও ঘটনা দর্শন না করে কারো পক্ষে বা কারো বিরুদ্ধে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে থাকে কারো প্রতি হিংসা ও শত্রুতা থাকার জন্য তার বিপক্ষে অথবা কারো প্রতি আত্মীয়তা ও সম্প্রীতি থাকার জন্য, অথবা অর্থলোভে, অথবা তার কথায় আস্থা রেখে, অথবা তার প্রতি সদয় হয়ে তার স্বপক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে থাকে। তদ্রূপ অনেকে বহু অন্যায়ের পক্ষে মিথ্যা সাক্ষী দিয়ে থাকে। অন্যায়ভাবে কারও জমি-সম্পদ আত্মসাৎ করায়, অন্যায়ভাবে কারও জমি কারও নামে লিখে নিতে বা দিতে সাক্ষী দিয়ে থাকে। অথচ তা বৈধ নয়।

মু'মিনদের সাথে কাফিরদের শত্রুতার ধরন

১। অন্তরের কুফরী ঃ [সূরা আন'আম-৩৪]

২। ঠাট্টা এবং বিদ্রুপ করা ঃ [সূরা মুতাফ্ফিফীন-২৯, ইয়াসীন-৩০]

৩। মু'মিনদেরকে পাগল বলে অপবাদ দেয়া ঃ [সূরা হিজর-৬]

৪। মু'মিনরা কর্তৃত্ব ও ক্ষমতালোভী বলে অপবাদ দেয়া ঃ [সূরা ইউনুস-৭৮]

৫। মু'মিনদের ধর্মত্যাগ ও বিশৃঙ্খলা (ফাসাদ) সৃষ্টির দায়ে অভিযুক্ত করা ঃ [সূরা মু'মিন-২৬]

৬। মু'মিনদের দারিদ্রতা ও অসহায়ত্বের সুযোগে গালমন্দ করা ঃ [সূরা শূরা-১১১]

৭। তারা এটি করত যাতে অন্য লোকেরা মু'মিনদের নিকট না আসে ঃ [সূরা মারইয়াম-৭৩]

৮। মু'মিনরা অভিশপ্ত এবং মু'মিনদের কারণে তাদের উপর গযব আসবে এমন অভিযোগ ঃ [সূরা ইয়াসীন-১৮]

৯। সত্য প্রত্যাখ্যান এবং মানুষকে বিভ্রান্ত করার উদ্দেশে মিথ্যা যুক্তি প্রদর্শন ঃ [সূরা কাহ্ফ-৫৬]

১০। সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের বিরুদ্ধে ক্ষেপিয়ে তোলা ঃ [সূরা আ'রাফ-৯০, মু'মিন-২৬, শু'আরা-৫৩-৫৬]

১১। তারা দাবী করে যে, সত্য দীনের ব্যাপারে তাদের অবস্থান মু'মিনদের চেয়ে উত্তম ঃ [সূরা তাহা-৬৩]

১২। নানাবিধ চক্রান্ত ও পরিকল্পনা করে সাধারণ মানুষকে মু'মিনদের অনুসরণ থেকে বিরত রাখা ঃ [সূরা সাবা-৩৩]

১৩। মু'মিনদেরকে সুবিধাবঞ্চিত করে দীন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা ঃ [সূরা মুনাফিকূন-৭]

১৪। মু'মিনদেরকে নানাবিধ সমস্যায় ফেলে দীন থেকে দূরে রাখার চেষ্টা ঃ [সূরা কালাম-৯, মায়িদা-৪৯, বাকারা-১২০]

১৫। মু'মিনরা যদি তাদের দীন থেকে না সরে অথবা কাফিরদের সাহায্য সহযোগিতা না করে তাহলে তাদেরকে জেল ও মৃত্যুদন্ডের ভয় দেখান ঃ [সূরা ইবরাহীম-১৩, কাহফ-২০]

১৬। মু'মিনদের উপর অত্যাচার, হত্যা এবং সংঘাত চাপিয়ে দেয়া ঃ [সূরা আম্বিয়া-৬৮, আন্‌ফাল-৩০, বাকারা-২১৭]

মাজার

❖ মাজার আরাবি শব্দ। দরগাহ ফার্সী শব্দ। উভয় শব্দের একই অর্থ। অর্থাৎ পরিদর্শনের স্থান, দর্শনীয় স্থান, রাজসভা যেখানে পর্যটকরা দেখতে যায়। এগুলো হলো আভিধানিক অর্থ।

কাবরকে মাজার বলা যায়না। রাসূলুল্লাহ (সা.) কাবরকে মাজার বলেননি, সাহাবীগণও বলেননি। রাসূলের (সাঃ) কাবরকে মাজার বলা হয়না, কোনো সাহাবীর কাবরকেও মাজার বলা হয়না। কাবরকে মাজার বলা ইসলামের নীতি ও আদর্শের খেলাপ। কাবরকে মাজার বলার উদ্দেশ্য তিনটি ঃ

ক) ঐ কাবর পূজা করার জন্যে মানুষকে আহবান জানানো, অথবা

খ) ঐ কাবরে যাকে দাফন করা হয়েছে তার অনুসারী হওয়া, কিংবা

গ) যারা কাবরকে ব্যবসা কেন্দ্র বানিয়েছে, তাদেরকে টাকা-পয়সা দেয়া। এর কোনটিই ইসলামে বৈধ নয়।

তবে নিজের মৃত্যুর কথা স্মরণ করার জন্যে রাসূলুল্লাহ (সাঃ) কাবর জিয়ারত করাকে বৈধ করেছেন।

১। তুমি মৃতদেরকে শোনাতে পারবেনা, আর বধিরকেও আহ্বান শোনাতে পারবেনা (বিশেষতঃ) যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা নামল-৮০]

২। তুমি তো মৃতকে শোনাতে পারনা, বধিরকেও শোনাতে পারবেনা আহ্বান যখন তারা পিছন ফিরে চলে যায়। [সূরা রূম-৫২]

⧉ বর্তমান মুসলিম বিশ্বে পীর, দরবেশ, অলী-আওলিয়া, গাউস-কুতুব, ফকির বিভিন্ন নামের পরিচিত লোকেরা মারা গেলে তার কিসসা-কাহিনী শেষ হয়ে যায়না; বরং তার মৃত্যুর পর কিরামাতি বেড়ে যায়। সে জন্য ভক্তরা তার কাবর পাকা করে ও পাশে বিল্ডিং নির্মাণ করে, কাবরের উপর চাদর দেয়, আগর বাতি জ্বালায়, তাওয়াফ করে, কোন কোন মাজারে সাজদা করে। শত শত মানুষ নিজ

মনোবাসনা পূরণের আশায় দূর দূরান্ত থেকে সমবেত হয়। এ সমস্ত কাজের পিছনে মনের মনি কোঠায় লুকিয়ে থাকা একটি ধারণা/বিশ্বাস কাজ করে, সেটি হচ্ছে পীর-অলী মরে গেলেও তাদের কিরামাতী মরে যায়না। কাবরের ভিতর থেকে অনেক কিছু করার ক্ষমতা রাখে, এই তাদের বিশ্বাস। হায় আফসোস! মানব জাতি, শ্রেষ্ঠ জাতি হয়েও বুঝতে পারেনা যে, জীবনের অবসান ঘটলে তার কোন শক্তি থাকেনা? মানুষ কাবরের গর্ভে, গভীর পানিতে ডুবন্ত ব্যক্তির ন্যায় অসহায়। মৃত্যুর পর যদি কারো কিছু করার শক্তি থাকত তাহলে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের থাকত; কিন্তু না, তাঁরও নেই। তাই সাহাবাগণ নাবীর (সাঃ) মৃত্যুর পর তাঁর চাচা আব্বাস (রাঃ) এর অসীলায় পানির জন্য দু'আ করেছিলেন, নাবীর কাবরের কাছে নয়। বিশ্ব নাবী যাঁর অগ্র/পশ্চাতের পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়েছে, তাঁর যদি মৃত্যুর পর মঙ্গল-অমঙ্গলের জন্য দু'আ করার ক্ষমতা না থাকে তাহলে আর কার থাকতে পারে? চিন্তা করুন হে পাঠক! এ আলোচনা থেকে জানতে পারলাম যে, মাজারগুলো শির্‌কের আখড়া। আমল কবূলের শর্তের বিপরীত।

যিক্‌রের গুরুত্ব

১। আর তোমার রবের যিক্‌র কর বেশি বেশি এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর সন্ধ্যায় ও সকালে। [সূরা আলে ইমরান-৪১]

২। আর যিক্‌র কর তোমার রবের মনে মনে বিনয় ও ভয় সহকারে অনুচ্চঃস্বরে সকাল-সন্ধ্যায়। আর তুমি হয়োনা গাফিল। [সূরা আরাফ-২০৫]

৩। যারা ঈমান এনেছে এবং যাদের অন্তর প্রশান্ত হয় আল্লাহর যিক্‌রে। জেনে রেখ, আল্লাহর যিক্‌রেই অন্তর প্রশান্ত হয়। [সূরা রা'দ-২৮]

৪। আবূ মূসা (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তার রবের যিক্‌র করে, আর যে ব্যক্তি তা করেনা, তাদের দু'জনের দৃষ্টান্ত হল জীবিত ও মৃতের। [বুখারী/৫৯৫২]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সব সময় আল্লাহর যিক্‌র করতেন। [মুসলিম/৭১০, আবূ দাউদ/১৮]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ তিরমিযী/৩৩৭৭, ইব্‌ন মাজাহ/৮০০, আবূ দাউদ/৪৭৮০।

(ক) আমরা কেবল সালাতের (নামাযের) পরেই যিকরের কথা চিন্তা করি।

(খ) যিক্‌র যে কোন সময় এবং উযূ ছাড়াই করা যায়। এ ব্যাপারটি অবশ্যই সবার জানা থাকা উচিত।

(গ) তা ছাড়াও কোন কোন লোক দা'ওয়াত দেন, অমুক অমুক মাসজিদে/স্থানে নির্দিষ্ট দিনে ও সময়ে যিক্‌র হবে। তা কতটুকু যুক্তিসংগত একমাত্র আল্লাহই ভাল জানেন।

যিক্‌রের ফাযীলাত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে সন্তুষ্ট করার জন্য "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ" বলে আল্লাহ তা'আলা তার জন্য জাহান্নামের আগুন হারাম করে দেন। [মুসলিম/১৩৬৯-মাহমূদ ইব্‌নূর রাবী আনসারী (রাঃ)]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু'টি বাক্য এমন যে, মুখে তা উচ্চারণ অতি সহজ, পাল্লায় অনেক ভারী, আর আল্লাহর কাছে অতি প্রিয়। তা হল "সুবহানাল্লাহি ওয়া বিহামদিহি, সুবহানাল্লাহিল আযীম"। [বুখারী/৫৯৫১, ৬২১২-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৬৬০১]

৩। যে একশত'বার তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ্) পাঠ করবে তার জন্য এক হাজার নেকী (পুণ্য) লিপিবদ্ধ করা হবে এবং তার থেকে এক হাজার পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [মুসলিম/৬৬০৭-মুস'আব ইব্‌ন সা'দ (রাঃ)]

৪। যে ব্যক্তি দিনের মধ্যে একশত বার পাঠ করবে ঃ-

لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকা লাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুওয়া আলা কুল্লি সাইয়িন কাদীর।

(অর্থ ঃ আল্লাহ ব্যতীত আর কোন ইলাহ নেই, তিনি এক, তাঁর কোন অংশীদার নেই। রাজত্ব একমাত্র তাঁরই। প্রশংসা শুধু তাঁরই। তিনি সব কিছুর উপর সর্বশক্তিমান)। সে একশত গোলাম আযাদ করার সাওয়াব অর্জন করবে এবং তার জন্য একশতটি নেকী (পুণ্য) লেখা হবে, আর তার একশতটি পাপ মিটিয়ে দেয়া হবে এবং সেদিন এটা তার রক্ষাকবজে পরিণত হবে। আর তার চেয়ে বেশি ফাযীলাত ওয়ালা আমল আর কারও হবেনা। তবে যে ব্যক্তি এ আমল তার চেয়ে বেশি করলো তার কথা ভিন্ন। [বুখারী/৫৯৪৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৬৫৯৮, ইব্‌ন মাজাহ/৩৭৯৮]

৫। যে ব্যক্তি দিনে একশত বার "সুবহানাল্লাহ" (অর্থ ঃ আমি আল্লাহর পবিত্রতা বর্ণনা করছি) পাঠ করবে, তার যাবতীয় পাপ ক্ষমা করে দেয়া হবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার সমতুল্য হয়। [মুসলিম/৬৫৯৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ একদল দরিদ্র লোক রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বলল ঃ সম্পদশালী ও ধনী ব্যক্তিরা তাদের সম্পদের দ্বারা উচ্চ মর্যাদা ও স্থায়ী আবাস লাভ করছে, তারা আমাদের মত সালাত আদায় করছে, আমাদের মত সিয়াম পালন করছে এবং অর্থের দ্বারা হাজ্জ, উমরা, জিহাদ ও সাদাকা করার মর্যাদাও লাভ করছে। এ কথা শুনে তিনি বললেন ঃ আমি কি তোমাদের এমন কিছু কাজের কথা বলব যা তোমরা করলে যারা সৎ (পুণ্য) কাজে তোমাদেও চেয়ে অগ্রগামী হয়ে গেছে তাদের সমপর্যায়ে পৌঁছতে পারবে? তবে যারা পুনরায় এ ধরনের কাজ করবে তাদের কথা স্বতন্ত্র। তোমরা প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার করে তাসবীহ (সুবহানাল্লাহ),

তাহ্মীদ (আলহামদুলিল্লাহ্) এবং তাকবীর (আল্লাহু আকবার) পাঠ করবে। (এ বিষয়টি নিয়ে) আমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি হল। কেহ বলল, আমরা তেত্রিশবার তাসবীহ পাঠ করব। তেত্রিশবার তাহ্মীদ, আর চৌত্রিশবার তাকবীর পাঠ করব। এরপর আমি তাঁর (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) কাছে ফিরে গেলাম। তিনি বললেন ঃ "সুবহানাল্লাহি ওয়াল হাম্দু লিল্লাহি ওয়াল্লাহু আকবার" سُبْحَانَ اللهِ وَالْحَمْدُ للهِ واللهُ اَكْبَرُ বলতে হবে। যাতে সবগুলোই তেত্রিশ করে হয়ে যাবে। [বুখারী/৮০০, ইব্‌ন মাজাহ/৯২৭]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের পর এমন কিছু যিক্‌র আছে যা থেকে পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনও বঞ্চিত হবেনা। তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" ও চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার"। [মুসলিম/১২২৫-কা'ব ইব্‌ন উজরা (রাঃ), নাসাঈ/১৩৫২]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" ও তেত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" বলবে, এই নিরানব্বই-আর

لا إِلَهَ إِلا اللهُ وَحْدَهُ لا شَرِيْكَ لَهُ لَه الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيْرٌ

উচ্চারণ ঃ লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি শাইয়িন কাদীর" বলে একশত পূর্ণ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়। [মুসলিম/১২২৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর নিরানব্বই অর্থাৎ এক কম একশ'টি নাম রয়েছে। যে ব্যক্তি উহা (ঈমানের সাথে) আয়ত্ত করবে (এবং তদনুযায়ী 'আমল করবে) সে জান্নাত প্রাপ্ত হবে। [বুখারী/৫৯৫৫, ইব্‌ন মাজাহ/৩৮৬০]

১০। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/অনুচ্ছেদ-৫৯৫০, মুসলিম/৪২৫, ৬৫৯৯, ৬৬৬৫, ৬৬৭০, তিরমিযী/৩৩৮৩, ইব্‌ন মাজাহ/৩৮০০, ৩৮০৭, ৩৮১০, নাসাঈ/১৩৫৭।

⧉ (ক) আমাদের সমাজে যিকরের নামে বিভিন্ন শব্দ যোগ করে আমরা যিক্‌র করি, যা কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক হয় কিনা তা জানার চেষ্টা করিনা। রাসূলের (সাঃ) দেয়া সহীহ হাদীস অনুযায়ী যিক্‌র করতে হবে।

(খ) তাছাড়াও এ দেশে বিভিন্ন নামের পীর/মাজার/আওলিয়াদের/বিভিন্ন তরিকা পন্থীদের বিভিন্ন পদ্ধতিতে যিক্‌র করতে দেখা যায়।

(গ) বাজারে বিভিন্ন রকম বই পাওয়া যায়, তাতে যিক্‌র অধ্যায়ে দেখা যায় খুব বেশী বেশী করে সাওয়াব লিখা থাকে যা সহীহ হাদীসের সংগে কোন মিল নেই বিধায় ঐরূপ যিক্‌র করলে কি ধরনের লাভ হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

হালকায়ে যিক্‌র ও যিক্‌রে জলী

❖ যিক্‌রের অর্থগুলি কুরআনের বিভিন্ন জায়গায় বিভিন্নভাবে উল্লেখ রয়েছে, যেমন ঃ

(ক) যিক্‌র অর্থ আল কুরআন। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা ইউসুফ-১০৪, হিজর-৬, ৯, সাদ- ৮, ফুসসিলাত-৪১, যুখরূফ-৫, ৪৪, কলম-৫১-৫২।

(খ) যিক্‌র অর্থ উপদেশ বা নাসীহাত। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা আম্বিয়া-২, ২৪, ৫০, ১০৫; শু'আরা-৫, কামার-১৮, কালাম-৫২, তাকভীর-২৭, মুরসালাত- ৫।

(গ) যিক্‌র অর্থ বাণী। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা আলে ইমরান-৫৮।

(ঘ) যিক্‌র অর্থ ইল্‌ম বা কিতাবধারীকে বুঝানো হয়েছে। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা নাহল-৪৩।

(ঙ) যিক্‌র অর্থ বিবরণ । এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা মারইয়াম-২, সাদ-৪৯।

(চ) যিক্‌র অর্থ গ্রন্থ। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা নাহল-৪৪।

(ছ) যিক্‌র অর্থ উল্লেখ। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা আম্বিয়া-৩৬।

(জ) যিক্‌র অর্থ আল্লাহকে স্মরণ। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা বাকারা-১৫২, মায়িদা-৯১, আম্বিয়া-৪২, নূর-৩৭, আনকাবূত-৪৫, সাদ-৩২, যুমার-২২, যুখরূফ-৩৬, হাদীদ-১৬, মুজাদালা-১৯, মুনাফিকূন-৯, জিন-১৭।

১। তোমরা তোমাদের রাব্বকে বিনয়ের সঙ্গে এবং গোপনে আহ্বান কর, তিনি সীমা লঙ্ঘনকারীদেরকে পছন্দ করেননা। [সূরা আরাফ-৫৫]

২। তোমার রাব্বকে মনে মনে বিনয়ের সঙ্গে ভয়-ভীতি সহকারে অনুচ্চঃস্বরে সকাল-সন্ধ্যায় স্মরণ কর, আর উদাসীনদের দলভুক্ত হয়োনা। [সূরা আরাফ-২০৫]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, আল্লাহ জাল্লা শানুহু বলেন ঃ আমি আমার বান্দার কাছে তার ধারণা অনুযায়ী। যখন সে আমার যিক্‌র করে তখন আমি তার সঙ্গে থাকি। বান্দা আমাকে একাকী স্মরণ করলে আমিও তাকে একাকী স্মরণ করি। আর যদি সে কোন মাজলিসে আমার যিক্‌র (স্মরণ) করে তাহলে আমিও তাকে তাদের চেয়ে উত্তম মাজলিসে স্মরণ করি। যদি সে আমার দিকে এক বিঘত এগিয়ে আসে তাহলে আমি তার দিকে এক হাত অগ্রসর হই। যদি সে আমার দিকে হেঁটে আসে তাহলে আমি তার দিকে দৌড়ে আসি। [মুসলিম/৬৫৬১-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

⧉ আল্লাহ সুবহানাহু ওয়া তা'আলা যখন যিক্‌র শব্দটিকে এতগুলি অর্থে ব্যবহার করলেন তখন কোন বান্দার কোন অধিকার বা এখতিয়ার নেই কেবলমাত্র একটি অর্থে তা ব্যবহার ও প্রয়োগ করার।

আমাদের দেশে এক শ্রেণীর মানুষ যিক্‌র শব্দটি কেবলমাত্র একটি বিশেষ অর্থে ব্যবহার করেন এবং এর প্রয়োগও করেন বিশেষ ব্যবস্থা ও পদ্ধতিতে। যেমন প্রায়ই দেখা যায় একটি স্থানে নির্দিষ্ট সময়ে একদল মানুষ মাথা দুলিয়ে বিশেষ ভঙ্গিতে কিছু শব্দ যিক্‌র রূপে উচ্চারণ করেন। যিক্‌র উচ্চারিত হয় লা ইলাহা

ইল্লাল্লাহ, লাইলাহা, ইল্লাল্লাহ, আল্লাহ, হু ইত্যাদি শব্দ সহকারে, সমস্বরে, উচ্চকণ্ঠে এবং কখনও মাইকযোগে। মাথা ঝুঁকাতে বা দেহ দুলাতে দুলাতে ইশ্কে বুঁদ হয়ে কেহ কেহ একে অন্যের উপরে ঢলে পড়ে। বিশেষ এক পীরের মুরিদরা এ ধরনের যিক্রে অভ্যস্ত। বিভিন্ন দলের ইমাম, নানা পীরের হরেক কিসিমের যিক্র এদেশে চলছে। সালাতের তাকবীরসমূহ, সালাতের কিরা'আত, কুরআন তিলাওয়াত ও হাজ্জ/উমরার তালবীয়া শব্দ করে পাঠ করার অনুমতি বা নির্দেশ কুরআন ও সুন্নাতে আছে। সেগুলি ব্যতীত অন্যান্য সমুদয় যিক্র উচ্চস্বরে করা উচিত নয়।

যাকাত সম্পর্কীত

১। আল্লাহ বলেন ঃ

خُذْ مِنْ أَمْوَالِهِمْ صَدَقَةً تُطَهِّرُهُمْ وَتُزَكِّيهِم بِهَا وَصَلِّ عَلَيْهِمْ إِنَّ صَلاَتَكَ سَكَنٌ لَّهُمْ وَاللّهُ سَمِيعٌ عَلِيمٌ - أَلَمْ يَعْلَمُواْ أَنَّ اللّهَ هُوَ يَقْبَلُ التَّوْبَةَ عَنْ عِبَادِهِ وَيَأْخُذُ الصَّدَقَاتِ وَأَنَّ اللّهَ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ .

এদের সম্পদ হতে 'সাদাকা' গ্রহণ করবে। এর দ্বারা তুমি এদেরকে পবিত্র করবে এবং পরিশোধিত করবে। এরা কি জানেনা যে, আল্লাহ তো তাঁর বান্দাদের তাওবা কবূল করেন এবং 'সাদাকা' গ্রহণ করেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তাওবা-১০৩, ১০৪]

২। আবূ বাকর সিদ্দীক (রাঃ) বলেন ঃ আল্লাহর কসম! আমি সেই ব্যক্তির বিরুদ্ধে অবশ্যই যুদ্ধ করব যে ব্যক্তি সালাত ও যাকাতের মধ্যে পার্থক্য করে। কেননা যাকাত মালের হক। আল্লাহর কসম! যদি তারা একটি উটের রশিও দিতে অস্বীকার করে যা তারা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় যাকাত হিসাবে দিত, তাহলে আমি তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করব। [মুসলিম/৩২, আবূ দাউদ/১৫৫৬]

৩। আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে যা তোমাদের দিয়েছেন, এতে যারা কৃপণতা করে তাদের জন্য তা মঙ্গল এ কথা যেন তারা মনে না করে। [ইব্ন মাজাহ্/১৭৮৪ আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ)]

⊞ উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীস সম্বন্ধে আমরা মুসলিম সমাজ সবাই অবহিত। কিন্তু আমরা কতজন লোক ঠিকমত যাকাত দিই তা আপনি/আমি নিজেই নিজের বিচার করুন।

যাদু বিদ্যা

১। সুলাইমানের রাজত্বকালে শাইতানরা যা পাঠ করত, তারা তা অনুসরণ করত। মূলতঃ সুলাইমান কুফরী করেনি বরং শাইতানরাই কুফরী করেছিল । তারা মানুষকে যাদু শিক্ষা দিত এবং যা বাবিলের দু'জন ফিরিশতা হারূত ও মারূতের

উপর পৌঁছানো হয়েছিল এবং ফিরিশতাদ্বয় কেহকেও শিক্ষা দিতনা, **যে পর্যন্ত না বলত**, আমরা পরীক্ষা স্বরূপ, কাজেই তুমি কুফরী করনা। এতদসত্ত্বেও **তারা উভয়ের** নিকট হতে এমন জিনিস শিক্ষা করত যা দ্বারা তারা স্বামী-স্ত্রীর মধ্যে বিচ্ছেদ সৃষ্টি করতো । মূলতঃ তারা তাদের এ কাজ দ্বারা আল্লাহর বিনা হুকুমে কারও ক্ষতি করতে পারতনা । বস্তুতঃ এরা এমন বিদ্যা শিখত, যা দ্বারা তাদের ক্ষতি সাধন করত আর তাদের কোন উপকার করতনা এবং অবশ্যই তারা জানত যে, যে ব্যক্তি ঐ কাজ অবলম্বন করবে পরকালে তার কোনই অংশ থাকবেনা, আর যার পরিবর্তে তারা স্বীয় আত্মাগুলোকে বিক্রয় করেছে । তা কতই না জঘন্য, যদি তারা জানত। [সূরা বাকারা-১০২]

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শির্‌ক ও যাদু ধ্বংসাত্মক কাজ। তা থেকে তোমরা বেঁচে থাক। [বুখারী/৫৩৩৮]

☐ নিঃসন্দেহ যাদু কুফর্‌ ও শির্‌কের অন্তর্ভুক্ত, সঠিক আকীদাকে নষ্ট করে দেয়। আর মানুষেরা যাদুকর এবং যাদুবিদ্যাকে সহজ করে দিয়েছে, এমন কি অনেকে উহাকে পূর্বের বিষয় হিসাবে গণ্য করেছে।

আর বর্তমান সমাজে যাদুকরদের পুরষ্কার দেয়া হচ্ছে এবং তাদেরকে উৎসাহিত করছে। যাদুকরদের জন্য সংগঠন, সম্মেলন এবং প্রতিযোগিতার অনুষ্ঠান করা হয়। আর সেখানে উপস্থিত হয় হাজার হাজার ভ্রমণকারী ও উৎসাহী লোক। এটা হচ্ছে দীন সম্পর্কে অজ্ঞতার ও আকীদার বিষয়ে অবহেলার কারণে। মুসলিম হিসাবে যাদুবিদ্যা শিক্ষা করা উচিত নয়।

রাসূল (সাঃ) আল্লাহর নির্দেশ ব্যতীত কোন কিছু বলতেননা, করতেননা, অনুমোদনও দিতেননা

১। আর সে মনগড়া কথা বলেনা, তাতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নাজম-৩-৪]

২। আমি তাকে কাব্য রচনা করতে শিখাইনি এবং এটা তার পক্ষে শোভনীয় নয়। ইহাতো শুধু উপদেশ এবং সুস্পষ্ট কুরআন। [সূরা ইয়াসীন-৬৯]

৩। আমি তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নিদর্শন হাযির করার শক্তি কোন রাসূলের নেই। যাবতীয় বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। [সূরা রা'দ-৩৮]

৪। নিশ্চয়ই আমিই কুরআন নাযিল করেছি, আর অবশ্যই আমি তার সংরক্ষক। [সূরা হিজর-৯]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হাক্কাহ-৪৪-৪৬, বাকারা-২৮৫।

☐ উপরে উল্লেখিত আয়াতের মাধ্যমে মহান আল্লাহ তা'আলা আমাদেরকে জানিয়ে দিলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর অহী ছাড়া মনগড়া কোন কথা বলতেননা। দীনের ক্ষেত্রেও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইজমা-কিয়াস করে কোন কথা বলতেননা। কারণ সমস্ত কিয়াসকারীদের সর্দার হল 'ইবলীস', যেহেতু সে সর্ব প্রথম কিয়াস করেছিল।

⊙ আল্লাহ যখন ইবলীসকে বললেন ঃ হে ইবলীস! আমি যাকে নিজ হাতে তৈরী করেছি তাকে সাজদাহ করতে তোকে কিসে বাঁধা দিল? ইবলীস বলল ঃ আমি আদম থেকে উত্তম, যেহেতু আপনি আমাকে সৃষ্টি করেছেন আগুন থেকে, আর আদমকে সৃষ্টি করেছেন মাটি থেকে। [সূরা সা'দ-৭৫, ৭৬]

মহান আল্লাহ তা'আলার আদেশ মানাই ছিল তার কর্তব্য। পক্ষান্তরে ইবলীসের নিজের ধারণা ও বুঝ হল আগুন উত্তম মাটি থেকে। এ বুঝ বা কিয়াসের আশ্রয় নিয়ে মহান আল্লাহর আদেশ অমান্য করল, জাহান্নামে যাবার আদেশ প্রাপ্ত হল, জান্নাত থেকে বিতাড়িত হল, অভিশপ্ত হল। মহান আল্লাহর মাত্র একটা হুকুম না মানার কারণে ইবলীসের এ অবস্থা, আর আমরা মহান আল্লাহ তা'আলার শত শত আদেশ অমান্য করে চলেছি, এর কোন হিসাব নেই, আমাদের অবস্থা কি হবে তার কল্পনা ও চিন্তায় আসেনা। উপরন্তু আমরা মহান আল্লাহর আদেশ-নিষেধ বাদ দিয়ে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ-নিষেধ মান্য না করে, বিভিন্ন দলের ইমাম, বিভিন্ন তরীকার পীর, অলী-আওলিয়া, বুজুর্গান, আলেম-ওলামাগণের ফাতওয়া মান্য করে বিদ'আতী ও সত্য প্রত্যাখ্যানকারী হতেও দ্বিধাবোধ করছিনা। যে যা বলেন তাই মানতে শুরু করি, নিজেরা কুরআন ও সহীহ/বিশুদ্ধ হাদীসের জ্ঞান অর্জন করার প্রয়োজন বোধ করিনা। কুরআন-হাদীসের জ্ঞান যাদের নেই বা জানা ও বুঝার চেষ্টা অথবা জিজ্ঞাসা করে জানারও চেষ্টা করেনা তারাই নিজদেরকে বিজ্ঞ মুসলিম বলে দাবী করে। ডাক্তারী না পড়ে যেমন নিজকে ডাক্তার বলে পরিচয় দেয়া যায়না, ইঞ্জিনিয়ারিং বিদ্যা অর্জন না করে নিজকে ইঞ্জিনিয়ার বলে পরিচয় দেয়া যায়না, আইনশাস্ত্রে জ্ঞান লাভ না করে কেহকে আইনজ্ঞ বলা যায়না, তদ্রুপ ইসলামের (ইবাদাত/আমলসমূহের) জ্ঞান লাভ না করে নিজকে মুসলিম বলে দাবী করাও হয় নাম মাত্র।

রাসূল (সাঃ) যে কেবলমাত্র আল্লাহ তা'আলার নির্দেশই মানতেন তার প্রমাণ

১। বল ঃ আমি রাসূলদের মধ্যে নতুন নই, আর আমি এও জানিনা যে, আমার সঙ্গে কী ব্যবহার করা হবে, আর তোমাদের সঙ্গেই বা কেমন (ব্যবহার করা হবে), আমি কেবল তাই মেনে চলি যা আমার প্রতি অহী করা হয়। আমি তো স্পষ্ট সতর্ককারী মাত্র। [সূরা আহকাফ-৯]

২। বলে দাও ঃ 'যদি তোমরা আল্লাহ্কে ভালবাস তাহলে আমার অনুসরণ কর, আল্লাহ তোমাদেরকে ভালবাসবেন এবং তোমাদের পাপসমূহ ক্ষমা করবেন। বস্তুতঃ আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু'। [সূরা আলে ইমরান-৩১]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফুরকান-৫৭, আম্বিয়া-৪৫।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যদি আল্লাহ তা'আলার উপর যথাযথভাবে তাওয়াক্কুল (ভরসা) করতে পারতে তাহলে তোমরাও অবশ্যই রিয্ক পেতে, যেমন পাখিরা রিয্ক পেয়ে থাকে। ওরা সকালে খালি পেটে বের হয়ে যায় আর বিকালে ফিরে আসে ভরা পেটে। [তিরমিযী/২৩৪৭-উমার ইব্নুল খাত্তাব (রাঃ)]

◫ উপরে বর্ণিত কুরআনের আয়াতের মাধ্যমে আমরা জানতে পারলাম যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর আদেশ ও নির্দেশ ব্যতীত নিজ থেকে কোন কিছুই বলতে বা করতে পারেননি। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা মহান আল্লাহরই কথা। ⊙ এ জন্যই মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ যে রাসূলের আনুগত্য করল, সে তো আল্লাহরই আনুগত্য করল। [সূরা নিসা-৮০]

অতএব রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানলে আল্লাহকেই মানা হল, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মানলে আল্লাহর সাথে শরীক করার কোন প্রশ্নই উঠেনা।

⊙ মহান আল্লাহ বলেন ঃ তোমাদের পালনকর্তার পক্ষ থেকে তোমাদের প্রতি যা নাযিল হয়েছে তার আনুগত্য কর। তাঁকে ব্যতীত কোন আওলিয়াদের অনুসরণ করনা। তোমরা খুব কম লোকই উপদেশ গ্রহণ কর। [সূরা আ'রাফ-৩]

১৪০০ বৎসর পূর্বে অহীর দরজা বন্ধ হয়ে যাবার পর এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পর কারও কথা মানা যাবেনা। শুধু তার কথা মানা যাবে যে আল্লাহর দিকে রুজু হয়ে শুধু কুরআন ও প্রমাণিত সহীহ হাদীসের কথা বলবে। যে আল্লাহর কথা ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা বলবে তার কথা মানা শির্ক হবেনা, যেহেতু এটা তার নিজের কথা নয়। বর্তমান সমাজের কোন কোন মুফতীদের দাবী যে, নাবী-রাসূলগণের অনুসরণ বা আনুগত্যে যেমনভাবে আল্লাহর আনুগত্য অনুসরণের সাথে শির্ক (অংশীদারীত্ব) সাব্যস্ত হয়না ঠিক তদ্রুপ মুজতাহিদ ইমামগণের বা নায়েবে নাবীদের আনুগত্য অনুসরণও শির্ক হিসাবে সাব্যস্ত হতে পারেনা। সমাজের কোন কোন মুফতী সাহেবের এ কথাটা সম্পূর্ণ বেঠিক ও প্রতারণামূলক। কারণ মুজতাহিদ ইমামগণের বা নায়েবে নাবীদের উপর আল্লাহর তরফ থেকে কোন কিছু নাযিল হয়না, অহী আসেনা, বরং তারা ইজমা-কিয়াসের জ্ঞান দ্বারা ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। যার কথা আল্লাহর কথার সাথে মিল হবেনা তাকে রাসূলের (সাঃ) মত মানা যায়না। আল্লাহর আদেশ না মেনে অন্যের আদেশ মানলেই শির্ক হয়ে যাবে। অনেক ফাতওয়া কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিরোধী। শির্ক ইচ্ছাকৃত একটি করলেই সে ক্ষতির মধ্য পতিত হবে। ভুল ভিন্ন জিনিষ এবং বিরোধিতা ক্ষতিকর। আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন।

আল্লাহ তা'আলা বলেন, হে রাসূল! আমি আপনাকে সৃষ্টি না করলে এ বিশ্ব জাহানে কিছু সৃষ্টি করতামনা" এটা কি সত্য?

১। তিনিই তোমাদেরকে যমীনের খালিফা বানিয়েছেন, মর্যাদায় তোমাদের কতককে কতকের উপরে স্থান দিয়েছেন, আমি তোমাদেরকে যা দিয়েছি ওগুলির মাধ্যমে তোমাদেরকে পরীক্ষা করার জন্য, তোমার রাব্ব তো শাস্তি দানে দ্রুত, আর তিনি অবশ্যই বড়ই ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা আন'আম-১৬৫]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাহা-৫৩, বাকারা-২৯-৩০।

৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে ঃ এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে ঃ কে তোমার রাব্বকে সৃষ্টি করেছে? এই পর্যায়ে পৌঁছলে, তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং এ ধরণের ভাবনা থেকে বিরত হও। [মুসলিম/২৪৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

◫ "রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সৃষ্টি না করলে বিশ্ব জাহানে আল্লাহ কিছুই সৃষ্টি করতেননা" এ কথা মহান আল্লাহ তাঁর কুরআনে কোথাও বলেননি এবং রাসূলও (সাঃ) কোন হাদীসের মাধ্যমে বলেননি। এটা বুজুর্গ, পীর, দরবেশের বানানো কথা, যা কুরআন বিরোধী। এ কথাটা যুক্তি হতে পারেনা। কারণ উপরে উল্লিখিত আয়াতসমূহের মর্মে পরিস্কার বুঝা যায় যে, এই পৃথিবীর সব কিছুই আদম এবং আদম সন্তান অর্থাৎ আমাদের জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা সৃষ্টি করেছেন। নাবী/রাসূলগণকে সঠিক পথ প্রদর্শনকারী ও সাবধানকারী হিসাবে আল্লাহ তা'আলা মনোনীত করে পাঠিয়েছেন, আমাদেরকে হিদায়াতের পথ দেখানোর জন্য। এই বিশ্বজগত এবং মানুষদেরকে (আমাদেরকে) সৃষ্টি না করলে নাবী-রাসূলগণকে সৃষ্টি করার কোন প্রয়োজনই ছিলনা।

রাসূল (সাঃ) আমাদের মত মানুষ ছিলেন

১। তাদের অন্তর থাকে অমনোযোগী, যালিমরা গোপনে পরামর্শ করে ঃ উনি তোমাদেরই মত মানুষ ছাড়া কি অন্য কিছু? তোমরা কি দেখে-শুনে যাদুর কবলে পড়বে ? [সূরা আম্বিয়া-৩]

২। তোমার পূর্বেও আমি কোন মানুষকে অনন্ত জীবন দান করিনি। তুমি যদি মারা যাও, তাহলে তারা কি চিরজীবি হবে ? [সূরা আম্বিয়া-৩৪]

৩। বল ঃ আমিতো তোমাদের মতই একজন মানুষ, আমার প্রতি প্রত্যাদেশ হয় যে, তোমাদের ইলাহ একমাত্র ইলাহ। সুতরাং যে তার রবের সাথে সাক্ষাত কামনা করে সে যেন সৎ কাজ করে এবং তার রবের ইবাদাতে কেহকেও শরীক না করে। [সূরা কাহফ-১১০]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আম্বিয়া-৭, যুমার-৩০, হাজ্জ-৭৫, ইবরাহীম-১১, আনকাবূত-৫৭, যুখরুফ-১৪, রাদ-৩৮, বানী ইসরাইল-৯৩-৯৪, যারিয়াত-৫৬, মু'মিনূন-৩৩-৩৪, ফুরকান-২০, কাফ-২, ইবরাহীম-১০।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পৃথিবীর সব জায়গা থেকে এক মুষ্টি মাটি নিয়ে আল্লাহ তা'আলা আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেছেন। যমীনের বৈশিষ্ট্য অনুসারে আদম সন্তানরা এসেছে। তাদের মধ্যে কেহ লাল, কেহ সাদা, কেহ কাল, আর কেহবা এর মাঝামাঝি। তাদের কেহ কোমল, কেহ কঠোর, কেহ মন্দ, কেহবা ভাল। [তিরমিযী/২৯৫৫-আবূ মূসা আশআরী (রাঃ)]

◫ সমাজের অনেক আলেম বলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নূরের তৈরী। তারা আরও বলেন ঃ পৃথিবী সৃষ্টির পূর্বেই তাকে সৃষ্টি করা হয়েছে,

রাসূল গায়িব জানেন, তাঁকে হাজির/নাজির মনে করা, ভাল-মন্দ বা কল্যাণ-অকল্যাণের মালিক মনে করা, নাবীকে সৃষ্টি না করলে আল্লাহ পৃথিবী সৃষ্টি করতেননা, নাবীরা মৃত্যু বরণ করেননা। তাছাড়াও রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে মর্যাদা ও প্রশংসার বিষয়ে অতিরঞ্জন করা ইত্যাদি ইত্যাদি। এ সব কিছুই দলীল বিহীন উক্তি।

রাসূলের (সাঃ) মর্যাদা ও প্রশংসায় সীমালংঘন করা যাবেনা

১। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৯]

২। প্রত্যেকের জন্য মর্যাদা আছে তার কৃতকর্ম অনুসারে, যেন আল্লাহ তাদের কর্মের পুরোপুরি প্রতিফল দেন। তাদের উপর কক্ষনো যুল্ম করা হবেনা। [সূরা আহকাফ-১৯]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নূর-৬৩, আহযাব-৫৬, নিসা-১৭১।

৪। নাসারা সম্প্রদায় যেমনভাবে 'ঈসা ইব্ন মারইয়ামের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করেছিল, তোমরা আমার প্রশংসায় বাড়াবাড়ি করনা। আমি একজন আল্লাহর বান্দা। সুতরাং তোমরা আমাকে আল্লাহর বান্দা এবং রাসূল বল। [বুখারী/১৩৯৪]

৫। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একজনকে আরেক জনের প্রশংসা করতে শুনলেন এবং সে তার প্রশংসায় অতিরঞ্জিত করছিল। তখন তিনি বললেন ঃ তোমরা তো লোকটিকে মেরে ফেললে, অথবা বললেন ঃ লোকটির মেরুদন্ড ভেঙ্গে দিলে। [বুখারী/৫৬২১-আবূ মূসা (রাঃ), ২৪৭৮]

মহান আল্লাহ স্বীয় নাবীর যে সমস্ত প্রশংসা বর্ণনা করেছেন এবং সম্মানে তাকে মর্যাদাবান করেছেন, সে সমস্ত সম্মান ও মর্যাদা বর্ণনায় কোন ক্ষতি নেই। আর উহার উপর বিশ্বাস স্থাপন করা, আর তাঁর এমন উচ্চ মর্যাদা রয়েছে যাতে তাঁকে ভূষিত করা হয়েছে, তা হল ঃ আবদুল্লাহ বা আল্লাহর বান্দা ও তাঁর রাসূল এবং সমস্ত মাখলুকের মধ্যে তিনি সার্বিকভাবে উত্তম এবং তিনি পৃথিবীর সকল মানুষের নিকট একচ্ছত্রভাবে আল্লাহর রাসূল এবং সমস্ত জিন ও ইনসানের নিকট রাসূল হিসাবে প্রেরিত, রাসূলদের মধ্যে সর্বোত্তম/সরদার, তিনি সর্বশেষ নাবী যার পরে আর কোন নাবী নেই। আল্লাহ তার জন্য তাঁর নাবীর বক্ষ খুলে দিয়েছিলেন এবং তাঁর মর্যাদা সমুন্নত করেছেন। যারা তাঁর নির্দেশের বিরোধিতা করেছে, তাদের জন্য লাঞ্ছনা ও অবমাননা নির্ধারিত করেছেন। তিনি মাকামে মাহমুদ বা প্রশংসিত স্থানের অধিকারী ইত্যাদি ছাড়া অতিরঞ্জিত করা যাবেনা। অতএব যে ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা এভাবে করবে যে, তিনি আশ্রয় প্রার্থীদের আশ্রয় দাতা, বিপদ গ্রস্তের আহ্বানে সাড়া দানকারী, তিনি দুনিয়া ও আখিরাতের মালিক, তিনি গায়িবের খবর জানেন ইত্যাদি তাহলে এমন বাক্য দ্বারা প্রশংসা করা হারাম। কেননা ঐ সমস্ত গুণ আল্লাহর। তাই ঐ গুণ মাখলুক বা সৃষ্টি জীবের হয় মনে করা শির্ক। সুতরাং

বেশী বাড়াবাড়ি করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রশংসা করতে গিয়ে শির্কে পতিত হওয়া ঠিক নয়।

রাসূলকে (সাঃ) হাজির, নাজির মনে করা

১। মূসাকে যখন আমি নির্দেশনামা দিয়েছিলাম তখন তুমি (তূওয়া উপত্যকার) পশ্চিম প্রান্তে ছিলেনা, আর ছিলেনা তুমি প্রত্যক্ষদর্শী। [সূরা কাসাস-৪৪]

২। তোমাদের চতুস্পার্শ্বে কতক বেদুঈন হল মুনাফিক, আর মাদীনাবাসীদের কেহ কেহ মুনাফিকীতে অনড়, তুমি তাদেরকে চেননা, আমি তাদেরকে চিনি, আমি তাদেরকে দ্বিগুণ শাস্তি দিব, অতঃপর তাদেরকে মহাশাস্তির দিকে প্রত্যাবর্তিত হবে। [সূরা তাওবা-১০১]

৩। হে নাবী! আমি তোমাকে পাঠিয়েছি সাক্ষী স্বরূপ এবং সুসংবাদদাতা ও সতর্ককারী রূপে। [সূরা আহযাব-৪৫]

৪। আর আল্লাহর অনুমতিক্রমে তাঁর পথে আহ্বানকারী ও আলোকপ্রদ প্রদীপ রূপে। [সূরা আহযাব-৪৬]

☐ হাজির ও নাজির শব্দ দু'টি আরাবী। হাজির অর্থ বিদ্যমান বা উপস্থিত। আর নাজির অর্থ দ্রষ্টা/দেখেন। যখন এ শব্দ দু'টিকে মিলিয়ে ব্যবহার করা হয় তখন অর্থ হয় ঐ সত্তা, যার অস্তিত্ব বিশেষ স্থানে সীমাবদ্ধ নয়, তাঁর অস্তিত্ব গোটা দুনিয়াকে বেষ্টন করে রাখে এবং দুনিয়ার প্রতিটি জিনিসের শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত অবস্থা তার দৃষ্টির সামনে থাকে।

পূর্বোক্ত ব্যাখ্যা অনুসারে হাজির/নাজির কথাটি একমাত্র আল্লাহ তা'আলার ব্যাপারেই প্রযোজ্য। হাজির/নাজির থাকা একমাত্র আল্লাহ তা'আলারই সিফাত। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ব্যাপারে হাজির/নাজিরের আকীদা পোষণ করা শারীয়াত ও যুক্তি উভয় দিক থেকে ভ্রান্ত।

রাসূলকে (সাঃ) আমরা কতটুকু ভালবাসি ও অনুসরণ করি?

১। যারা ঈমান আনে, সৎ কাজ করে এবং মুহাম্মাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তাতে বিশ্বাস করে, আর উহাই (কুরআন) তাদের রাব্ব হতে সত্য; তিনি তাদের মন্দ কাজগুলি ক্ষমা করবেন এবং তাদের অবস্থা ভাল করবেন। [সূরা মুহাম্মাদ-২]

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহ, তাঁর রাসূলের, তাঁর রাসূলের নিকট তিনি যা অবতীর্ণ করেছেন সেই কিতাব এবং পূর্বে নাযিলকৃত কিতাবের উপর ঈমান আন। যে ব্যক্তি আল্লাহকে ও তাঁর ফিরিশতাদেরকে, তাঁর কিতাবসমূহকে, তাঁর রাসূলগণকে এবং শেষ দিবসকে অস্বীকার করে সে সীমাহীন পথভ্রষ্টতায় পতিত হয়। [সূরা নিসা-১৩৬]

৩। আমি এ উদ্দেশেই রাসূল প্রেরণ করেছি যেন আল্লাহর নির্দেশে তাঁর আনুগত্য করা হয়। যখন তারা নিজেদের উপর যুল্ম করেছিল তখন যদি তোমার নিকট চলে আসত, আর আল্লাহর কাছে ক্ষমাপ্রার্থী হত এবং রাসূলও তাদের পক্ষে

ক্ষমা চাইত, তাহলে তারা আল্লাহকে অতিশয় তাওবাহ কবূলকারী ও পরম দয়ালু রূপে পেত। [সূরা নিসা-৬৪]

৪। রাসূল তোমাদেরকে যা দেয় তা গ্রহণ কর, আর তোমাদেরকে যা থেকে নিষেধ করে তা থেকে বিরত থাক। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ কঠিন শাস্তিদাতা। [সূরা হাশর-৭]

৫। বল ঃ আল্লাহর আনুগত্য ও রাসূলের আনুগত্য কর । অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী, আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী । তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে সঠিক পথ পাবে । রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেয়া। [সূরা নূর-৫৪]

৬। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নূর-৫৩, ৫৬, ৬৩, কাসাস-৫০, মায়িদা-৫৪, ৯২, ফুরকান-১, বাকারা-১২৫, ১৬৪, আলে ইমরান-৩১, নিসা-৫৯, আহযাব-৬, ২১, তাওবা-২৪, আনফাল-২০, ৩৩, ৪৬, নাজম-৩-৪, তাগাবুন-১২।

৮। যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করল তারা আল্লাহর আনুগত্য করল। আর যারা মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অবাধ্যতা করল তারা প্রকৃতপক্ষে আল্লাহরই অবাধ্যতা করল। মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হলেন মানুষের মাঝে পার্থক্যের মানদন্ড। [বুখারী/৬৭৭১-জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/৩]

৯। তোমাদের কেহ (ততক্ষণ) পূর্ণ ঈমানদার হতে পারবেনা যতক্ষণ না আমি তার নিকট তার পিতা, তার সন্তান এবং সমস্ত মানুষ অপেক্ষা অধিক প্রিয় হই। [বুখারী /৬১৬৫, মুসলিম/৭৫]

১০। মানুষ (দুনিয়ায়) যাকে ভালবাসবে (কিয়ামাতে) সে তারই সঙ্গী হবে। [বুখারী/৫৭২৪-আবদুল্লাহ (রাঃ), তিরমিযী/২৩৯০]

১১। উমার (রাঃ) বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমার প্রাণ ব্যতীত আপনি আমার নিকট সর্বাধিক প্রিয়। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ না, ঐ মহান সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার প্রাণ! এমন কি আপনার কাছে আপনার প্রাণের চেয়েও আমাকে অধিক প্রিয় হতে হবে। নতুবা আপনার ঈমান পূর্ণ হবেনা। তখন উমার (রাঃ) তাঁকে বললেন ঃ এখন আল্লাহর কসম! আপনি আমার কাছে আমার প্রাণের চেয়েও অধিক প্রিয়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে উমার! এখন আপনার ঈমান পূর্ণ হয়েছে। [বুখারী/৬১৬৫]

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দীনী বিষয়ে যা করতে নির্দেশ দিয়েছেন ও যা করতে নিষেধ করেছেন, তার আনুগত্য করা অবশ্যই কর্তব্য। আর এটা হল রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আল্লাহর রাসূল হিসাবে সাক্ষ্য

দেয়ার অঙ্গীকার। কিন্তু বর্তমান মুসলিম সমাজের লোকেরা নাবীকে বাদ দিয়ে পীর, অলী-আওলিয়া, ফকির-দরবেশদের অনুসরণ করে চলছে।

রাসূলের (সাঃ) প্রদর্শিত ও শিখিয়ে দেয়া পদ্ধতি অনুযায়ী যারা ঈমান ও আকীদা পোষণ করবেনা, দীনের দাওয়াত, সালাত, সিয়াম, হাজ্জ, যাকাত, দান, খাইরাত, বিচার, ফাইসালা ও আইন কানূন মানবেনা তাদের আমল নষ্ট বা নিষ্ফল হয়ে যাবে। কুরআন মেনে চলার দাবীদারদের উদ্দেশেই এই সতর্কবাণী। যারা রাসূলের প্রতি অনুগত হলনা, তারা কুরআন মানলনা। তাহলে কিভাবে তাদের পরিচয় কুরআন-সুন্নাহর অনুসারী বা রাসূলের (সাঃ) অনুসারী হল? এজন্যই কুরআনকে সঠিকভাবে ব্যাখ্যা বিশ্লেষণকারী রূপে রাসূল প্রেরিত হয়েছিলেন, যিনি আল্লাহর বিধান যথাযথভাবে বাস্তবায়ন করেছিলেন।

আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের অনুগত্য করলেই লাভ হবে

১। আল্লাহ ও রাসূলের হুকুম মান্য কর, যাতে তোমরা কৃপাপ্রাপ্ত হতে পার। [সূরা আলে ইমরান-১৩২]

২। যারা আল্লাহ ও রাসূলের আনুগত্য করে তারা নাবী, সিদ্দীক, শহীদ এবং সৎ লোকদের সঙ্গী হবে। যাদের প্রতি আল্লাহ নি'আমাত দান করেছেন তারা কতই না উত্তম সঙ্গী! [সূরা নিসা-৬৯]

৩। এসব আল্লাহর নির্ধারিত সীমা এবং যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের হুকুম অনুযায়ী চলবে, আল্লাহ তাকে জান্নাতে দাখিল করবেন, যার পাদদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তারা তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং এটা বিরাট সাফল্য। [সূরা নিসা-১৩]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাওবা-৭১, ফাতহ-১৭, আলে ইমরান-৩১, ৩২, ১৬৪, আহযাব-২১, ৩৬, নিসা-৫৯, ৬৫, ৮০, ১১৩, নূর-৪৭, ৫৬, ৬৩, আনফাল-১।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার উম্মাতের একটি দল সর্বদা আল্লাহর উপর অবিচল থাকবে, বিরুদ্ধাচরণকারীরা তাদের কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। [ইব্‌ন মাজাহ/৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

☐ উপরোক্ত কুরআন ও হাদীসের আয়াত অনুযায়ী এ কথা পরিস্কার হল যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে বিষয়ে নির্দেশ দিয়েছেন সেই বিষয়ে ভিন্ন কোন নির্দেশ যদি কেহ দেয় তাহলে সে পথভ্রষ্ট। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নির্দেশ দিলেন সালাত পাঁচ ওয়াক্ত। এর বিপরীত যদি কেহ বলে সালাত ৩ ওয়াক্ত তাহলে সে নিশ্চয়ই পথভ্রষ্ট। কুরআনকে মানলে রাসূলকেও (সাঃ) মানতে হবে। তা না হলে কুরআন মানা হয়না। রাসূলকে (সাঃ) অনুসরণ করলে, যেখানে কুরআন বলছে আল্লাহকে অনুসরণ করা হবে, সেখানে রাসূলের হাদীস অমান্য করলে সে তো সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট । উপরোক্ত আয়াতগুলির মাধ্যমে দ্ব্যর্থহীন ভাষায় আল্লাহ তাঁর নাবীকে (সাঃ) অনুসরণ, অনুকরণ করতে শুধু বলেছেন বললে যথার্থভাবে বলা হবেনা, বরং জোরালো ভাষায় তাগিদ দিয়েছেন। কোন কোন আয়াতে শর্তও আরোপ করেছেন যে,

রাসূলের (সাঃ) ভালবাসার মধ্যেই আল্লাহকে ভালবাসা আর রাসূলের **ইত্তেবা** মানেই আল্লাহর ইত্তেবা।

আল্লাহ্ সকল জিনিস সৃষ্টি করার পূর্বে নিজ নূর থেকে কি রাসূলকে (সাঃ) সৃষ্টি করেছেন?

১। বল ঃ 'আমি তোমাদেরই মত একজন মানুষ। আমার নিকট অহী করা হয় যে, তোমাদের ইলাহ কেবল এক ইলাহ। অতএব যে ব্যক্তি তার রবের সঙ্গে সাক্ষাতের আশা করে, সে যেন সৎ 'আমল করে, আর তার রবের 'ইবাদাতে কেহকে শরীক না করে। [সূরা কাহফ-১১০]

২। আমাদের সমাজের আলেমগণ কথা-বার্তায় ও ওয়াজ-মহফিলে প্রায়ই বলেন যে, আল্লাহর নূরে নাবী সৃষ্টি হয়েছেন, যা সম্পূর্ণ মিথ্যা কথা। আল্লাহ বলেন ঃ নিশ্চয়ই তোমাদের নিকট আল্লাহর পক্ষ থেকে নূর এবং প্রকাশ্য গ্রন্থ এসেছে। [সূরা মায়িদা-১৫] এই আয়াতে নূর বলতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বুঝানো হয়নি।

৩। ⦿ আল্লাহ তা'আলা তাওরাতকে নূর বলে অবহিত করেছেন। [সূরা মায়িদা-৪৪] ⦿ ইঞ্জিলকে "নূর" বলেছেন। [সূরা মায়িদা-৪৬] ⦿ পবিত্র কুরআনকে "নূর" বলেছেন। [সূরা আ'রাফ-১৫৭, সূরা তাগাবুন-৮] উক্ত আয়াতসমূহে "নূর" বলতে হিদায়াতের আলো বা নূরের কথা বলা হয়েছে। আল্লাহর নূরের অংশ বুঝানো হয়নি। আল্লাহর নূরের অংশ স্থাপন করা শির্ক। ⦿ তোমরা আল্লাহর কোন সদৃশ স্থির করোনা; আল্লাহ জানেন এবং তোমরা জাননা। [সূরা নাহল-৭৪]

৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শাইতান তোমাদের কারো কাছে আসে এবং বলে ঃ এটা কে সৃষ্টি করেছে, ওটা কে সৃষ্টি করেছে? পরিশেষে এ প্রশ্নও করে ঃ কে তোমার রাব্বকে সৃষ্টি করেছে? এই পর্যায়ে পৌঁছলে, তোমরা আল্লাহর আশ্রয় প্রার্থনা কর এবং এ ধরণের ভাবনা থেকে বিরত হও। [মুসলিম/২৪৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমার হাত ধরে বললেন ঃ আল্লাহ তা'আলা শনিবার মাটি সৃষ্টি করেন। রবিবার তিনি এতে পর্বত সৃষ্টি করেন। সোমবার তিনি বৃক্ষরাজি সৃষ্টি করেন। মঙ্গলবার তিনি আপদ-বিপদ ছড়িয়ে দেন। বুধবার তিনি নূর সৃষ্টি করেন। বৃহস্পতিবার তিনি পৃথিবীতে পশু-পাখী ছড়িয়ে দেন এবং জুমু'আর দিন আসরের পর তিনি আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করেন। অর্থাৎ জুমু'আর দিন সকল মাখলুক আসর থেকে রাত পর্যন্ত সৃষ্টি করেছেন। [মুসলিম/৬৭৯৭]

◫ কোন ব্যক্তি যদি বলে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নূর, মানুষ নন, সে আল্লাহ ও রাসূলের সাথে কুফ্‌রী করল। সে আল্লাহ ও রাসূলের দুশমন, বন্ধু নয়। আল্লাহর একটি নাম নূর। যে গুণ সৃষ্টিকর্তার সেই গুণ সৃষ্ট জীবের হয়না। আল্লাহর গুণ মানুষের মধ্যে আছে এরূপ ধারনা স্পষ্ট শির্ক।

সকল নাবীর শেষে ৫৭০ খ্রীষ্টাব্দে মাক্কা নগরীতে আমীনার গৃহে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জন্মগ্রহণ করেন। "আল্লাহ আমাকে সর্ব প্রথম সৃষ্টি

করেছেন" রাসূলের এ ধরনের কোন উক্তি নেই। ঐ রকম যা কিছু শোনা যায় তা ভিত্তিহীন এবং মনগড়া। আর ঐ ধরনের কথিত কথাকে রাসূলের কথা মনে করা রাসূল (সাঃ) এর নামে অপবাদ দেয়ার শামিল। আর আল্লাহর রাসূল কোন ভবিষ্যত বাণী করতেননা।

রাসূলও (সাঃ) কি মারা গেছেন?

১। মুহাম্মাদ হচ্ছে একজন রাসূল মাত্র, তার পূর্বে গত হয়ে গেছে (সমস্ত) রাসূল । অতএব যদি সে মারা যায় কিংবা নিহত হয় তাহলে কি তোমরা উল্টা দিকে ঘুরে দাঁড়াবে? এবং যে ব্যক্তি উল্টা দিকে ফিরে দাঁড়ায় সে আল্লাহর কোনই ক্ষতি করতে পারবেনা এবং আল্লাহ কৃতজ্ঞদেরকে অতি শীঘ্র বিনিময় প্রদান করবেন। [সূরা আলে ইমরান-১৪৪]

◫ ১১ হিজরী ১২ই রাবীউল আওয়াল, ৬৩ বছর বয়সে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পরলোক গমন করেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবাগণ তাঁর মৃত্যুতে গভীর দুঃখের মধ্যে পতিত হল। উমার (রাঃ) খোলা তলোয়ার নিয়ে গর্জন করে বলতে থাকেন ঃ যে ব্যক্তি বলবে নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মৃতুবরণ করেছেন এই তলোয়ার দ্বারা তাঁর গর্দান উড়িয়ে দিব। এরপর আবূ বাকর (রাঃ) এলেন, তারপর নাবীজীর মুখ হতে চাদর সরিয়ে কপালে চুমু দিলেন এবং কেঁদে ফেললেন। তারপর মাসজিদে নববীতে এসে উপরের আয়াতটি পাঠ করেন এবং জনগণের উদ্দেশে বক্তব্যে বলেন ঃ হে মুসলিম ভ্রাতৃমন্ডলী! যে ব্যক্তি মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করত সে যেন জেনে নেয় যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মারা গেছেন। আর যে ব্যক্তি আল্লাহর ইবাদাত করত তার কোন চিন্তা নেই। আল্লাহ চিরঞ্জীব তিনি কখনও মৃতুবরণ করবেননা। এই রূপ গুণাগুনের কোন সৃষ্ট জীব হবেনা। ⊙ প্রত্যেক নাফস মৃত্যু বরণ করবে। [সূরা আলে ইমরান-১৮৫]

আমাদের উপর রাসূল (সাঃ) এর হকসমূহ

১। বল ঃ আল্লাহর আনুগত্য কর ও রাসূলের আনুগত্য কর । অতঃপর যদি তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও তাহলে তার উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য সে দায়ী, আর তোমাদের উপর অর্পিত দায়িত্বের জন্য তোমরাই দায়ী । তোমরা যদি তার আনুগত্য কর তাহলে সঠিক পথ পাবে । রাসূলের দায়িত্ব হচ্ছে স্পষ্টভাবে (বাণী) পৌঁছে দেয়া। [সূরা নূর-৫৪]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-৬৫, আহযাব-৩৬।

৩। সর্বোত্তম কালাম হল আল্লাহর কিতাব, আর সর্বোত্তম আদর্শ হল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদর্শ। আর সবচেয়ে নিকৃষ্টতম বিষয় হল কু-সংস্কারসমূহ। তোমাদের কাছে যা ঘোষণা করা হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হবেই, তোমরা ব্যর্থ করতে পারবেনা। [বুখারী/৬৭৬৮-আবদুল্লাহ ইব্ন মাসঊদ (রাঃ)]

আমাদের উপর তাঁর কয়েকটি হক হল ঃ আমরা তাঁর সুন্নাত পালন করব এবং সেই সুন্নাত মতে আমাদের যাবতীয় সমস্যার ফাইসালা করব। তিনি যে বিষয়ে আমাদের নির্দেশ দিয়েছেন বা কোন সিদ্ধান্ত জারী করেছেন তা আমাদের মাথা পেতে মেনে চলতে হবে এবং এ বিষয়ে আমাদের কোন ইখতিয়ার থাকবেনা।

শবে মিরাজ উৎযাপন

১। পবিত্র ও মহান তিনি, যিনি ভ্রমণ করিয়েছেন তাঁর বান্দাকে রাতের বেলায় মাসজিদে হারাম থেকে মাসজিদে আকসা পর্যন্ত, বারাকাতময় করেছি যার পরিমন্ডল, এ জন্য যে তাঁকে আমার নিদর্শনাবলী কিছু দেখাব। নিশ্চয়ই তিনি সর্বশ্রোতা, সর্বদ্রষ্টা। [সূরা বানী ইসরাইল-১]

২। সালাত ইসলামের প্রথম ইবাদাত যা মিরাজের রাতে ফারয করা হয়। [মুসলিম/৩০৮-আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ)]

নিঃসন্দেহে মিরাজের ঘটনা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সত্য নাবী হওয়ার অন্যতম একটি দলীল। কুরআন ও সুন্নাহর মাধ্যমে মিরাজের ঘটনা প্রমাণিত হয়েছে। কিন্তু যে রাতে মিরাজ হয়েছিল তার নির্দিষ্ট তারিখের কথা কোন সহীহ হাদীসে বর্ণিত হয়নি, না রজব মাসের কথা প্রমাণিত, না অন্য কোন মাসের কথা । যদি নির্দিষ্ট তারিখ প্রমাণিত হয় তবুও এ রাতকে কেন্দ্র করে বিশেষ কোন ইবাদাত করা বা অনুষ্ঠান করা জায়েয হবেনা। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বা সাহাবায়ে কিরাম (রাঃ) এ রাতকে কেন্দ্র করে কোন অনুষ্ঠান করেননি বা সে ব্যাপারে নির্দিষ্ট কোন নির্দেশনাও দেননি। অথচ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রিসালাত পৌঁছিয়েছেন এবং স্বীয় আমানাতও যথাযথভাবে আদায় করেছেন। যদি এ রাতকে সম্মান করা এবং তা নিয়ে অনুষ্ঠান করা দীনের অন্তর্ভুক্ত হত তাহলে তিনি অবশ্যই তা আমাদের জন্য বর্ণনা করতেন।

শবে বরাত

'শব' একটি ফার্সী শব্দ, এর অর্থ রাত। 'বারায়াত'কে যদি আরাবী শব্দ ধরা হয় তাহলে এর অর্থ হচ্ছে সম্পর্কচ্ছেদ, পরোক্ষ অর্থে মুক্তি। যেমন কুরআন মাজীদে সূরা বারায়াত রয়েছে যা সূরা তাওবা নামেও পরিচিত। ⦿ ইরশাদ হয়েছে ঃ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের পক্ষ থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করার ঘোষণা । [সূরা তাওবা-১]

এখানে বারায়াতের অর্থ হল সম্পর্ক ছিন্ন করা। 'বারায়াত' মুক্তি অর্থেও আল-কুরআনে এসেছে যেমন ঃ ⦿ তোমাদের মধ্যকাররা কি তাদের চেয়ে শ্রেষ্ঠ? নাকি তোমাদের মুক্তির সনদ রয়েছে কিতাবসমূহে? [সূরা কামার-৪৩]

আর 'বারায়াত' শব্দকে যদি ফার্সী শব্দ ধরা হয় তাহলে উহার অর্থ হবে সৌভাগ্য। অতএব শবে বরাত শব্দটার অর্থ দাঁড়ায় সৌভাগ্যের রাত । শবে বরাত শব্দটাকে যদি আরাবীতে তর্জমা করতে চান তাহলে বলতে হবে

'লাইলাতুল বারায়াত'। অর্থাৎ সম্পর্ক ছিন্ন করার রজনী। এখানে বলে রাখা ভাল যে, এমন অনেক শব্দ আছে যার রূপ বা উচ্চারণ আরাবী ও ফার্সী ভাষায় একই রকম, কিন্তু অর্থ ভিন্ন। যেমন, 'গোলাম' শব্দটি আরাবী ও ফার্সী উভয় ভাষায় একই রকম লেখা হয় এবং একই ভাবে উচ্চারণ করা হয়। কিন্তু আরাবীতে এর অর্থ হল কিশোর, আর ফার্সীতে এর অর্থ হল দাস। সার কথা হল, 'বারায়াত' শব্দটিকে আরবী শব্দ ধরা হলে উহার অর্থ সম্পর্কচ্ছেদ বা মুক্তি। আর ফার্সী শব্দ ধরা হলে উহার অর্থ সৌভাগ্য। ইসলামী শারীয়াতে আরাবী ভাষাই ফার্সী ভাষা নিলে ইসলাম হয়না।

আল-কুরআনে শবে বরাত

প্রথমত ঃ শবে বরাত বলুন আর লাইলাতুল বারায়াত বলুন এ শব্দটি কুরআন মাজীদে খুঁজে পাবেননা। সত্য কথাটাকে সহজভাবে বলতে গেলে বলা যায়, পবিত্র কুরআন মাজীদে শবে বরাতের কোন আলোচনা নেই। সরাসরি তো দূরের কথা, আকার ইংগিতেও নেই। অনেককে দেখা যায় শবে বরাতের গুরুত্ব আলোচনা করতে গিয়ে সূরা দুখানের প্রথম চারটি আয়াত পাঠ করেন। ⊙ হা-মীম। শপথ সুস্পষ্ট কিতাবের। আমিতো এটা অবতীর্ণ করেছি এক বারাকাতময় রাতে। আমি তো সতর্ককারী। এই রাতে প্রত্যেক প্রজ্ঞাপূর্ণ বিষয় স্থিরকৃত হয়। [সূরা দুখান-১-৪] শবে বরাত পন্থী আলেম উলামারা এখানে বারাকাতময় রাত বলতে ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন। এখানে স্পষ্টভাবেই বলা যায় যে, যারা এখানে বারাকাতময় রাতের অর্থ ১৫ শাবানের রাতকে বুঝিয়ে থাকেন তারা এমন বড় ভুল করেন যা আল্লাহর কালাম বিকৃত করার মত অপরাধ। কারণ হল (এক) কুরআন মাজীদের এ আয়াতের তাফসীর বা ব্যাখ্যা সূরা আল-কাদর দ্বারা করা হয় ⊙ সেই সূরায় আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ নিশ্চয়ই আমি ইহা অবতীর্ণ করেছি মহিমান্বিত রাতে। আর মহিমান্বিত রাত সম্বন্ধে আপনি জানেন কী? মহিমান্বিত রাত হাজার মাস অপেক্ষা উত্তম। ঐ রাতে (মালাইকা) ফিরিশতাগণ ও রূহ অবতীর্ণ হয় প্রত্যেক কাজে তাদের রবের অনুমতিক্রমে। শান্তিই শান্তি! সেই রাত ফাজরের উদয় পর্যন্ত। [সূরা কাদর-১-৫] অতএব বারাকাতময় রাত হল লাইলাতুল কাদর। ১৫ শাবানের রাত নয়। সূরা দুখানের প্রথম চার আয়াতের ব্যাখ্যা হল এই সূরা আল-কাদর। আর এ ধরনের ব্যাখ্যা অর্থাৎ আল-কুরআনের এক আয়াতের ব্যাখ্যা অন্য আয়াত দ্বারা করা হল সর্বোত্তম ব্যাখ্যা।

দ্বিতীয়ত ঃ সূরা দুখানের লাইলাতুল মুবারাকার অর্থ যদি শবে বরাত (১৫ শাবানের রাত) হয় তাহলে এ আয়াতের অর্থ দাঁড়ায় আল-কুরআন শাবান মাসের শবে বরাতে নাযিল হয়েছে। অথচ আমরা সকলে জানি আল-কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসের লাইলাতুল কাদরে। ⊙ যেমন সূরা বাকারার ১৮৫ নং আয়াতে আল্লাহ রাব্বুল আলামীন বলেন ঃ রামাযান মাস, যাতে নাযিল করা হয়েছে আল-কুরআন। কেননা কুরআন নাযিল হয়েছে রামাযান মাসে।

তৃতীয়ত ঃ অধিকাংশ মুফাস্‌সিরে কিরামের মত হল উক্ত আয়াতে বারাকাতময় রাত বলতে লাইলাতুল কাদরকেই বুঝানো হয়েছে।

হাদীসে শবে বরাতের আলোচনা

প্রশ্ন থেকে যায় হাদীসে কি লাইলাতুল বরাত বা শবে বরাত নেই? সত্যিই সহীহ হাদীসের কোথাও আপনি শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত নামের কোন রাতের নাম খুঁজে পাবেননা। যে সকল হাদীসে এ রাতের কথা বলা হয়েছে তার ভাষা হল 'লাইলাতুন নিস্‌ফ মিন শাবান' অর্থাৎ মধ্য শাবানের রাত্রি। শবে বরাত বা লাইলাতুল বারায়াত শব্দ আল-কুরআনে নেই, হাদীসেও নেই। এটা মানুষের বানানো একটা শব্দ। ভাবতে অবাক লাগে যে, একটি প্রথা ইসলামের নামে শত শত বছর ধরে পালন করা হচ্ছে অথচ এর আলোচনা আল-কুরআনে নেই, সহীহ হাদীসেও নেই। অথচ আপনি দেখতে পাবেন যে, সামান্য নাফল আমলের ব্যাপারেও হাদীসের কিতাবে এক একটি অধ্যায় বা শিরোনাম লেখা হয়েছে। কথিত শবে বরাতের আলোচনা প্রসংগে বর্ণিত হয়ে থাকে ঃ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ১৫ই শাবানের রাত আসবে তখন তোমরা এ রাতে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করবে এবং এ দিনে সিয়াম পালন করবে। কেননা সূর্য অস্তমিত হওয়ার পর আল্লাহ পৃথিবীর নিকটস্থ আকাশে অবতরণ করেন। তারপর তিনি বলেন ঃ আমার কাছে কেহ ক্ষমাপ্রার্থী আছে কি? আমি তাকে ক্ষমা করে দিব। কোন জীবিকার প্রার্থী আছে কি? আমি তাকে রিয্‌ক দিব। কোন রোগগ্রস্ত আছে কি? আমি তাকে শিফা দান করব। এভাবে তিনি বলতে থাকেন, অবশেষে ফাজরের সময় হয়ে যায়। [ইব্‌ন মাজাহ/১৩৮৮]

২। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ এক রাতে আমি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে (বিছানায়) না পেয়ে তাঁর খোঁজে বের হলাম। আমি দেখতে পেলাম তিনি জান্নাতুল বাকীতে, তাঁর মাথা আকাশের দিকে উত্তোলন করে আছেন। তখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হে 'আয়িশা। তুমি কি এই আশংকা করছ যে, আল্লাহ এবং তাঁর রাসূল তোমার উপর অবিচার করবেন? 'আয়িশা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম ঃ এতো আমার জন্য আদৌ সমীচীন নয়। বরং আমি মনে করেছি, আপনি আপনার অপর কোন বিবির কাছে গেছেন। তখন তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ মহান আল্লাহ ১৫ই শাবানের রাতে দুনিয়ার নিকটবর্তী আকাশে অবতরণ করেন এবং কালব গোত্রের বকরীর পশমের চেয়েও অধিক লোককে ক্ষমা করেন। [ইব্‌ন মাজাহ/১৩৮৯]

৩। আবূ মূসা আশ'আরী (রাঃ) সূত্রে থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ ১৫ই শাবানের রাতে রাহমাতের দৃষ্টি দান করেন। মুশরিক ও হিংসুক ব্যতীত তাঁর সৃষ্টির সবাইকে তিনি ক্ষমা করে দেন। [ইব্‌ন মাজাহ/১৩৯০]

শবে বরাত সম্পর্কিত প্রচলিত আকীদাহ বিশ্বাস ও আমল

প্রথমত ঃ উপরোক্ত ১নং হাদীসটি এ যুগের বিখ্যাত মুহাদ্দিস নাসিরুদ্দীন আল-বানী (রহঃ) বলেছেন, হাদীসটি সনদের দিক দিয়ে একেবারেই দুর্বল।
দ্বিতীয়ত ঃ অপর একটি সহীহ হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে এ হাদীসটি গ্রহণযোগ্য নয়। সহীহায়িন হাদীস নামেও পরিচিত, যা ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিম তাদের কিতাবে বর্ণনা করেছেন। ⦿ হাদীসটি হল ঃ আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের রাব্ব আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে দুনিয়ার আকাশে অবতরণ করেন ও বলতে থাকেন ঃ কে আছ আমার কাছে দু'আ করবে আমি কবূল করব। কে আছ আমার কাছে চাইবে আমি দান করব। কে আছ আমার কাছে ক্ষমা প্রার্থনা করবে আমি তাকে ক্ষমা করব। [বুখারী/১০৭৪, মুসলিম/১৬৪২]

আর উল্লিখিত ১ নং হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা'আলা মধ্য শাবানের রাতে নিকটতম আকাশে আসেন ও বান্দাদের দু'আ কবূলের ঘোষণা দিতে থাকেন। কিন্তু বুখারী ও মুসলিম বর্ণিত এই সহীহ হাদীসের বক্তব্য হল আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের এক তৃতীয়াংশ বাকী থাকতে নিকটতম আকাশে অবতরণ করে দু'আ কবূলের ঘোষণা দিতে থাকেন। আর এ হাদীসটি সর্বমোট ৩০ জন সাহাবী বর্ণনা করেছেন এবং সহীহায়িন ও সুনানের প্রায় সকল কিতাবে এসেছে। তাই হাদীসটি প্রসিদ্ধ। অতএব এই মশহুর হাদীসের বিরোধী হওয়ার কারণে ১ নং হাদীসটি গুরুত্ব পায়না। কারণ একদিন বাদে অন্য রাতগুলোতে মানুষদেরকে ইবাদাত করতে নিরুৎসাহীত করে। ফলে লোকদের ক্ষমা চাওয়ার দরজা সংকুচিত করা হয়।

বরং উপরোক্ত ২ নং হাদীসে দেখা যাচ্ছে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিছানা ছেড়ে চলে গেলেন, আর পাশে শায়িতা আয়িশা (রাঃ) কে ডাকলেননা। ডাকলেননা অন্য কেহকেও। তাকে জাগালেননা বা সালাত আদায় করতে বললেননা। অথচ আমরা দেখতে পাই যে, রামাযানের শেষ দশকে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজে রাত জেগে ইবাদাত-বন্দেগী করতেন এবং পরিবারের সকলকে জাগিয়ে দিতেন। অন্যদেরকে বেশী পরিমাণে ইবাদাত-বন্দেগী করতে বলতেন। যদি ১৫ শাবানের রাতে কোন ইবাদাত করার ফাযীলাত থাকত তাহলে রাসূলুল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কেন আয়িশাকে (রাঃ) বললেননা? কেন রামাযানের শেষ দশকের মত সকলকে জাগিয়ে দিতেননা, তিনি তো সৎ কাজের প্রতি মানুষকে আহ্বান করার ক্ষেত্রে আমাদের সকলের চেয়ে অগ্রগামী ছিলেন। এ ব্যাপারে তিনি তো কোন অলসতা বা কৃপণতা করেননি। আল্লাহ আমাদেরকে দীন সমন্ধে জানা ও বুঝার তাওফীক দান করুন। শবে বরাত যারা পালন করেন তারা শবে বরাত সম্পর্কে যে সকল ধারণা উপলব্ধি করে যে সকল কাজ করেন তা উল্লেখ করা হল।

তারা বিশ্বাস করে যে, ১৫ই শাবানের রাতে আল্লাহ তা'আলা সকল প্রাণীর এক বছরের খাওয়া-দাওয়া বরাদ্দ করে থাকেন। এই বছর যারা মারা যাবে ও যারা জন্ম নিবে তাদের তালিকা তৈরী করা হয়। এ রাতে বান্দার পাপ ক্ষমা করা হয়। এ রাতে ইবাদাত-বন্দেগী করলে সৌভাগ্য অর্জিত হয়। এ রাতে কুরআন মাজীদ লাওহে মাহফুজ হতে প্রথম আকাশে নাযিল করা হয়েছে। এ রাতে গোসল করাকে সাওয়াবের কাজ মনে করা হয়। মৃত ব্যক্তিদের রূহ এ রাতে দুনিয়ায় তাদের সাবেক গৃহে আসে। এ রাতে হালুয়া রুটি তৈরী করে নিজেরা খায় ও অন্যকে দেয়া হয়। বাড়ীতে বাড়ীতে মিলাদ পড়া হয়। আতশবাজী করা হয়। সরকারী-বেসরকারী ভবনে আলোক সজ্জা করা হয়। সরকারী ছুটি পালিত হয়। পরের দিন সিয়াম (রোযা) পালন করা হয়। কাবরস্থানগুলোতে আগরবাতি ও মোমবাতি দিয়ে সজ্জিত করা হয়। লোকজন দলে দলে কাবরস্থানে যায়। মাগরিবের পর থেকে মাসজিদগুলি লোকে পরিপূর্ণ হয়ে যায়। যারা পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ও জুমু'আয় মাসজিদে আসেনা তারাও এ রাতে মাসজিদে আসে। মাসজিদগুলিতে মাইক চালু করে ওয়াজ নাসীহাত করা হয়। শেষ রাতে সমবেত হয়ে দু'আ মুনাজাত করা হয়। বহু লোক এ রাতে ঘুমানোকে অন্যায় মনে করে থাকে। বিশেষ পদ্ধতিতে একশত রাক'আত, হাজার রাক'আত ইত্যাদি সালাত আদায় করা হয়।

লোকজন ইমাম সাহেবকে জিজ্ঞেস করে ঃ 'হুজুর! শবে বরাতের সালাতের নিয়ম ও নিয়াতটা একটু বলে দিন।' ইমাম সাহেব আরাবী ও বাংলায় নিয়াত বলে দেন। কিভাবে সালাত আদায় করবে, কোন রাক'আতে কোন্ সূরা তিলাওয়াত করবে তাও বলে দিতে কৃপণতা করেননা। যদি এ রাতে ইমাম সাহেব বা মুয়াজ্জিন সাহেব মাসজিদে অনুপস্থিত থাকেন তাহলে তাদের চাকুরী যাওয়ার উপক্রম হয়। অথচ সত্য-মিথ্যা যাচাই করে সঠিক খবরটি জিজ্ঞেসকারী ব্যক্তিকে না বলতে পারার জন্য তাদের বুক কাঁপেনা। আর এ বিষয়ে আল্লাহর কুরআন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সহীহ হাদীস খোঁজার ব্যাপারেও তারা গাফিল।

শিক্ষা ব্যবস্থা

১। কোন ব্যক্তিকেই আল্লাহ তার সাধ্যের অতিরিক্ত কর্তব্য পালনে বাধ্য করেননা; সে যা উপার্জন করেছে তা তারই জন্য এবং যা সে অর্জন করেছে তা তারই উপর বর্তাবে। হে আমাদের রাব্ব! আমরা যদি ভুলে যাই অথবা ভুল করি সেজন্য আমাদেরকে অপরাধী করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! আমাদের পূর্ববর্তীগণের উপর যেরূপ গুরুভার অর্পণ করেছিলেন আমাদের উপর তদ্রুপ ভার অর্পণ করবেননা। হে আমাদের রাব্ব! যা আমাদের শক্তির বাইরে ঐরূপ ভার বহনে আমাদেরকে বাধ্য করবেননা, এবং আমাদের পাপ মোচন করুন ও আমাদেরকে ক্ষমা করুন, আমাদেরকে দয়া করুন, আপনিই আমাদের

আশ্রয়দাতা! অতএব কাফির সম্প্রদায়ের বিরুদ্ধে আমাদেরকে জয়যুক্ত করুন। [সূরা বাকারা-২৮৬]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাগাবুন-১৬, হিজর-১৩, তাকভীর-২৪।

৩। আনাস (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি ইল্‌ম শিক্ষা দেয়, সে সেই কথা অনুসারে আমলকারীর অনুরূপ সাওয়াব পাবে, এতে আমলকারীর সাওয়াব কোনরূপ হ্রাস পাবেনা। [ইব্‌ন মাজাহ-২৪০, তিরমিযী-২৬৭১]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কিয়ামাতের দিন বান্দার পা নড়বেনা যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে যে, কি কাজে সে সময় শেষ করেছে; তার ইল্‌ম সম্পর্কে তদনুযায়ী কি আমল করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; তার শরীর সম্পর্কে সে কিসে তা বিনাশ করেছে। [তিরমিযী/২৪২০-আবূ বারযা আসলামী (রাঃ)]

⧉ একজন মুসলিমের জন্ম হতে মৃত্যু পর্যন্ত তার জীবনের সাথে সম্পর্কিত ক্ষুদ্র-বৃহৎ প্রতিটি বিষয়কে তার নৈতিক নিয়ন্ত্রনের মধ্যে রাখার জন্য দীন ইসলামের সামাজিক ও ধর্মীয় অবকাঠামোকে কুরআন ও সুন্নাহ অনুযায়ী গড়ে তোলার প্রচেষ্টা থাকা অপরিহার্য। বর্তমানে সকল দেশের শিক্ষা ও সমাজ ব্যবস্থা একটা নতুন ধারার দিকে এগিয়ে যাচ্ছে যার ক্ষতিকর প্রভাব ক্রমশঃ এক অনাকাংখিত পরিবেশের সৃষ্টি করছে। পারিপার্শিক পর্যায়ে সংঘটিত সমস্যাগুলোর যথার্থ সমাধানে নিজেকে দায়িত্বশীল ভাবা এবং সত্যকে প্রতিষ্ঠিত ও মিথ্যাকে নির্মূল করার প্রচেষ্টা চালানোর লক্ষ্যে শিক্ষা গ্রহণ করতে হবে, যেন সেই শিক্ষা পার্থিব জীবনকে দীন ইসলামী আদর্শের মাধ্যমে পূর্ণমাত্রায় পবিত্র ও নিষ্কলুষ করতে পারে। কিন্তু বর্তমানে আমাদের শিক্ষা ব্যবস্থায় অনেক ক্ষেত্রেই শুধুমাত্র ভোগবাদী ও বস্তুবাদী দিক নির্দেশনা দেয়া থাকে। জীবনের কল্যাণসমূহ যেন পারলৌকিক কল্যাণ অর্জনের পথে কোন প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি না করে বাস্তব জীবনের কর্মকাণ্ডকে সেই লক্ষ্যে পরিচালিত করার প্রচেষ্টা রাখতে হবে। বর্তমান শিক্ষা ব্যবস্থা থেকে আমরা কুরআনী শিক্ষা থেকে বঞ্চিত হয়ে কুফর সংস্কৃতি শিখছি ফলে দুনিয়ার জীবনকে একমাত্র জীবন ভেবে পরকালকে ভুলে যাচ্ছি, ফলে সৃষ্টি হচ্ছে অশান্তি। তাৎক্ষণিক পার্থিব সাফল্যই হয়ে গেছে আসল বিবেচ্য বিষয়। রাসূল (সাঃ) সর্বদা অনাবশ্যক জ্ঞান চর্চা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করতেন। আল্লাহ চান একনিষ্ঠ ইবাদাত। এ বিষয়ে দেখুন সূরা বাইয়্যিনাহ্-৫, আনআম-১৬২, বাকারা-২০০-২০১, নাহল-৮১, ১০৭, আলে ইমরান-১৬২। ইসলামী শিক্ষা থেকে দূরে সরে থাকার কারণে মানুষ ইসলামকে পছন্দ করতে পারছেনা। ফলে মুসলিম জাতি আজ ইসলামের খাঁটি রূপটি ভুলে গেছে। তাই তারা যুল্‌মের শিকার হচ্ছে আর কাফির, মুশরিকদের অধিনস্থ থাকতে হচ্ছে।

শারীয়াত ও মারীফাত

১। **মহান** আল্লাহ তা'আলা **বলেন** ঃ

ثُمَّ جَعَلْنَاكَ عَلَىٰ شَرِيعَةٍ مِّنَ الْأَمْرِ فَاتَّبِعْهَا وَلَا تَتَّبِعْ أَهْوَاءَ الَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ

অতঃপর (হে নাবী!) আমি তোমাকে দীনের (সঠিক) পথের উপর প্রতিষ্ঠিত করেছি, অতএব তুমি তারই অনুসরণ কর, আর যারা জানেনা তাদের খেয়ালখুশির অনুসরণ করনা। [সূরা জাসিয়া-১৮]

২। আর যে ব্যক্তি ইসলাম ব্যতীত অন্য কোন দীন গ্রহণ করতে চাবে কক্ষনো তার সেই দীন কবূল করা হবেনা এবং আখিরাতে সেই ব্যক্তি ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা আলে ইমরান-৮৫]

৩। জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন ঃ আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে উপস্থিত ছিলাম। তিনি প্রথমে একটি সোজা রেখা টানলেন এবং তার ডান দিকে দু'টি রেখা টানলেন এবং বাঁ দিকেও দু'টি রেখা টানলেন। এরপর তিনি রেখার মধ্যবর্তী স্থানে হাত রেখে বললেন ঃ এটা আল্লাহর রাস্তা। এ পথই হল সরল পথ। সুতরাং তোমরা এরই অনুসরণ করবে এবং ভিন্ন পথ অনুসরণ করবেনা। করলে তা তোমাদের তাঁর পথ থেকে বিচ্ছিন্ন করবে। [ইব্‌ন মাজাহ/১১]

⧉ এ পর্যায়ে সবচেয়ে মৌলিক বিদ'আত হল শারীয়াত ও তরীকাতকে সম্পূর্ণ ভিন্ন ভিন্ন এবং পরস্পর সম্পর্কহীন দুই স্বতন্ত্র জিনিস মনে করা। মানুষের এতদূর পতন ঘটেছে যে, শারীয়াতকে 'ইল্‌মে জাহির' এবং 'তরীকাত বা মারিফাতকে ইল্‌মে বাতেনী বলে অভিহিত করে দীন-ইসলামকেই দ্বিধাবিভক্ত করে দেয়া হয়েছে। এক শ্রেণীর তরীকাত পন্থী বলতে শুরু করেছে যে, **ইসলামের আসলই** হল তরীকাত বা মারিফাত, আর এই হাকীকাত। এ **হাকীকাত কেহ যদি লাভ** করতে পারল তাহলে তাকে শারীয়াত পালন করতে হয়না, সে তো আল্লাহকে পেয়েই গেছে। তাদের মতে শারীয়াতের আলেম এক, আর **মারিফাত** বা তরীকাতের আলেম অন্য। এই তরীকাতের আলেমরাই উপমহাদেশে পীর, বুজুর্গ, দরবেশ নামে অভিহিত হয়ে থাকে। ধারণা প্রচার করা হয় যে, কেহ যদি শারীয়াতের আলেম হয় আর সে তরীকাতের ইল্‌ম না জানে বা কোন পীরের নিকট মুরীদ না হয়, তাহলে সে ফাসিক, যা বর্তমান সমাজের লোকদের ভ্রান্ত ধারনা। আল্লাহ আমাদেরকে জানা ও বুঝার হিদায়াত দান করুন। (আমীন)

শপথ করা

১। নিশ্চয়ই যারা আল্লাহর প্রতি অঙ্গীকার ও স্বীয় শপথ সামান্য মূল্যে বিক্রি করে, পরকালে তাদের কোনই অংশ নেই এবং উত্থান দিবসে আল্লাহ তাদের সাথে কথা বলবেননা এবং তাদের প্রতি দৃষ্টিপাতও করবেননা এবং পরিশুদ্ধও করবেননা। তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি রয়েছে। [সূরা আলে ইমরান-৭৭]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-২২৪-২২৫, মায়িদা-৮৯, নাহল-৯৪।

৩। যে ব্যক্তি আপন পরিবার পরিজনের ব্যাপারে কসম করে তার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকে, সে সবচেয়ে বড় পাপী। তার উচিত কসমকে পবিত্র করা অর্থাৎ কাফফারা আদায় করা। [বুখারী/৬১৫৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সাবধান! যদি তোমাদের শপথ করতে হয় তাহলে আল্লাহ ব্যতীত অন্য কারও নামে শপথ করনা। লোকজন তাদের বাপ-দাদার নামে শপথ করত। তিনি বলেন ঃ সাবধান! বাপ-দাদার নামে শপথ করনা। [বুখারী/৩৫৪৭-ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/৪১১৩]

নাবী, কাবা, আমানাত, সন্তান, মাতা-পিতা, বংশ, আওলিয়া-পীর অথবা অন্য কোন সৃষ্টির নামে শপথ করা হারাম। কারণ সে যার শপথ করল তাকে আল্লাহর সাথে মর্যাদায় শরীক করে ফেলল। আর এটা হচ্ছে কাবীরা গুনাহের (বড় পাপসমূহ) অন্তর্গত। এই ধরণের পাপ হতে বিরত থাকা, বর্জন করা এবং তা হতে তাওবা করা ফার্‌য ও জরুরী।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের নামে শপথ ইসলামী বিধান অনুযায়ী শপথ নয় । অতএব যে কাজের উপর যে শপথ করল তা করাও আবশ্যক নয় এবং কাফফারাও ওয়াজিব নয়। যে ব্যক্তি আত্মীয়তার সম্পর্ক ছিন্ন করার শপথ করল অথবা কোন পাপকার্য করার জন্য শপথ করল, সে যেন এই ধরণের কাজ না করে । এক্ষেত্রে শপথের কাফফারা দিতে হবেনা কিন্তু তাওবাহ করতে হবে।

আল্লাহর একটি হুকুম না মানায় ইবলীস হল শাইতান (অভিশপ্ত)

১। ছাঁচে ঢালা শুকনা ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে আমি মানুষকে সৃষ্টি করেছি। এর পূর্বে আমি জিনকে আগুনের লেলিহান শিখা থেকে সৃষ্টি করেছি। স্মরণ কর যখন তোমার রাব্ব ফিরিশতাদেরকে বলেছিলেন, 'আমি ছাঁচে ঢালা শুকনা ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে মানুষ সৃষ্টি করছি। আমি যখন তাকে পূর্ণ মাত্রায় বানিয়ে দিব আর তাতে আমার পক্ষ হতে রুহ ফুঁকে দিব তখন তোমরা তার প্রতি সাজদাবনত হয়ো। তখন ফিরিশতারা সবাই সাজদাহ করল, ইবলীস বাদে। সে সাজদাহকারীদের দলভুক্ত হতে অস্বীকৃতি জানাল। আল্লাহ বলেন, 'হে ইবলীস! তোমার কী হল যে তুমি সাজদাহকারীদের দলভুক্ত হলেনা? ইবলীস বলল ঃ 'আমার কাজ নয় মানুষকে সাজদাহ করা যাকে আপনি ছাঁচে ঢালা শুকনা ঠন্‌ঠনে মাটি থেকে সৃষ্টি করছেন।' তিনি বললেন ঃ 'বেরিয়ে যাও এখান থেকে, কারণ তুমি হলে অভিশপ্ত। বিচার দিবস পর্যন্ত তোমার উপর থাকল লা'নত।' সে বলল, 'হে আমার রাব্ব! বিচার দিবস পর্যন্ত আমাকে সময় দিন।' তিনি বললেন ঃ তোমাকে সময় দেয়া হল সেদিন পর্যন্ত, যার নির্দিষ্ট ক্ষণ আমার জানা আছে'। [সূরা হিজর-২৬-৩৮]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৩৪, আ'রাফ-১১-১৯, বানী ইসরাইল-৬১-৬৫, কাহফ-৫০, তাহা-১১৬-১২১, সাদ-৭১-৮৫।

৩। শাইতানের নিকট মর্যাদায় বড় সে, যে সর্বাধিক ফিত্‌না সৃষ্টিকারী। [মুসলিম/৬৮৪৫-জারীর (রাঃ)]

ইবলীস জিন জাতের অন্তর্ভুক্ত হলেও সে ফিরিশতাদের দলভুক্ত হয় তার আমলের দ্বারা, এ জন্য স্রষ্টা সমগ্র ফিরিশতাদেরকে হুকুম করেন আদমকে (আঃ) সাজদা করার জন্য। পৃথকভাবে ইবলীসের নাম উচ্চারিত হয়নি এ ক্ষেত্রে। তবে ফিরিশতা এবং ইবলীস জিনের মধ্যে একটা পার্থক্য স্পষ্ট হয়ে উঠে স্রষ্টার আদেশ পালন ও অমান্য করার মাধ্যমে। জিন তার সৃষ্টি উপাদানের শ্রেষ্ঠত্ব নির্ণয় করে যেমন অহংকারী হল, ঠিক ফিরিশতারাও তো নূরের দ্বারা সৃষ্টির শ্রেষ্ঠত্ব দাবী করতে পারতেন, কিন্তু করেননি। বরং অবনত মস্তকে আদমের (আঃ) সৃষ্টি উপাদান কোন ধর্তব্যে না এনে স্রষ্টার আদেশ পালন করেছেন সাজদাহর দ্বারা। আদমকে (আঃ) আল্লাহ যাবতীয় বস্তুর নাম শিখিয়ে দেন। যা ফিরিশতাকূল জানতেননা। অনুরূপভাবে ঐ জিন ইবলীসও জানতনা। ফলে তার অজ্ঞতাই অহমিকার কারণ রূপে দেখা দেয়। আর এক্ষেত্রে ঈর্ষা ও হিংসা যে কাজ করেনি তাও বলা মুশকিল। কারণ আজও ইনসানের (মানুষের) মধ্যে ঈর্ষা (রাগ) ও হিংসা অজ্ঞতার জন্যই দেখা দেয়, যা ইবলীস শাইতানের প্ররোচণা প্রসূত বৈ আর কিছুই নয়। ফিরিশতাদের মতামত আল্লাহ আদমকে (আঃ) সৃষ্টির প্রাক্কালে চাননি, বরং তার অভিপ্রায়টিই ব্যক্ত করেছেন মাত্র।
তবে ফিরিশতাকূল তাদের পূর্ব অভিজ্ঞতা জিন জাতের মারামারি ও রক্তপাতের বিষয়টি এই নতুন আদম জাতির প্রতি আরোপ করতে চেয়েছেন মাত্র, যার প্রেক্ষিতে আল্লাহ বলেন ঃ আমি যা জানি তোমরা তা জাননা। এ দ্বারা ফিরিশতাদের ঐ অসম্পূর্ণ জ্ঞানের প্রতি আল্লাহ ইঙ্গিত করেন। কেননা শাইতান প্রভাবিত এবং বিপথগামী বণী আদম ছাড়াও ইনসানে কামেল আল্লাহর নাবী, রাসূল, সিদ্দীক, শহীদ, মুত্তাকী, পরহেযগার, মুসল্লী, সায়িম ও হাজী-গাজী, সালফে সালেহীন যে আউওয়ালীন ও আখেরীনদের মধ্যে থাকবে সে কথা ফিরিশতাকূল ভাবতে পেরেছিলেন কি?

শহীদগণ কি জীবিত থাকেন? তাদের জীবন কেমন? তারা কি দুনিয়ায় প্রত্যাবর্তন করতে পারে?

❖ আল্লাহর পথে জিহাদ করতে গিয়ে যারা কাফিরদের হাতে নিহত হয় তারা শহীদ। জিহাদ করার পর যারা জীবিত থাকে তাদেরকে গাযী বলা হয়। দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদরা মৃত। সেহেতু তাদের স্ত্রীগণ বিধবা হয়। সন্তানরা ইয়াতিম হয়। তাদের সম্পদ বন্টন করা হয়। মানুষ শহীদকে দাফন করে। অতএব জানা গেল যে, দুনিয়াবী দৃষ্টিকোণ থেকে শহীদরা মৃত। কিন্তু আল্লাহর কাছে জীবিত থাকেন।

১। শহীদের সম্পর্কে আল্লাহ বলেন ঃ বরং তারা (শহীদরা) তাদের রবের কাছে জীবিত এবং রিযিক প্রাপ্ত, তারা জীবিত কিন্তু তোমরা উপলব্ধি করতে পারনা। [সূরা নিসা-১৬৯]

২। শহীদ দুনিয়ায় ফিরে আসতে পারেনা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ একবার আল্লাহ তা'আলা শহীদগণকে জিজ্ঞেস করেন যে, তোমরা

কি চাও? উত্তরে শহীদগণ বলেন ঃ জান্নাতের মধ্যে যেখানে ইচ্ছা সেখানে বিচরণ, খাওয়া-পান করার আমাদের ইখতিয়ার রয়েছে। এর চেয়ে বেশি কি চাইব হে আল্লাহ! আল্লাহ দ্বিতীয়-তৃতীয় বার জিজ্ঞেস করলেন ঃ (তোমরা কি চাও?) শহীদগণ যখন দেখলেন যে, না চেয়ে কোন উপায় নেই, তখন আল্লাহর কাছে আবেদন করেন ঃ হে আমাদের রাব্ব আপনি আমাদের রূহ আমাদের শরীরে ফিরিয়ে দিন যাতে আমরা দুনিয়ায় ফিরে গিয়ে আপনার রাস্তায় জিহাদ করে পুনরায় শহীদ হতে পারি। শহীদদের চাহিদা না থাকায় আল্লাহ আর প্রশ্ন করলেননা। [মুসলিম/৪৭৩২]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ শহীদ শাহাদাত বরণ করার সময় কোন কষ্টই অনুভব করেনা এতটুকু ছাড়া, যেমন তোমাদের কেহকে পিঁপড়ায় কামড় দিলে তোমরা অনুভব কর। [ইব্‌ন মাজাহ/২৮০২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৪। ঋণ ছাড়া শহীদের সকল পাপই ক্ষমা করে দেয়া হবে। [মুসলিম/৪৭৩০-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রাঃ)]

পার্থিব স্বার্থ হাসিলের উদ্দেশে সৎ কাজ করা শির্‌ক

❖ শির্‌ক এর অর্থ হল অংশীদার করা, শরীক করা, আল্লাহর আদেশের পরিবর্তে অন্যের আদেশ-নিষেধ মান্য করা। আল্লাহর সাথে অংশীদার বা শরীককারীকে ইসলামের পরিভাষায় মুশরিক বলে।

১। যারা এ দুনিয়ার জীবন আর তার শোভা সৌন্দর্য কামনা করে তাদেরকে এখানে তাদের কর্মের পুরোপুরি ফল আমি দিয়ে দিই, আর তাতে তাদের প্রতি কোন কমতি করা হয়না। কিন্তু আখিরাতে তাদের জন্য আগুন ছাড়া কিছুই নেই। এখানে যা কিছু তারা করেছে তা নিস্ফল হয়ে গেছে, আর তাদের যাবতীয় কাজকর্ম ব্যর্থ হয়ে গেছে। [সূরা হুদ-১৫, ১৬]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর কসম! আমার ইন্তিকালের পর তোমরা শির্‌ক করবে এ ভয় আমি করিনা; তবে তোমাদের সম্পর্কে আমার ভয় হয় যে, দুনিয়া অর্জনে তোমরা পরস্পরে প্রতিযোগিতা করবে। [বুখারী/৬১২৬-উকবা ইব্‌ন আমির (রাঃ)]

⧉ <u>বর্তমান সমাজে শির্‌ক এর শ্রেণীবিভাগ</u>

● **<u>দু'আয় শির্‌ক</u>** ঃ নাবী, আওলিয়া বা পীরদের কাছে রিয্‌ক, রোগমুক্তি, সন্তান লাভ ইত্যাদির জন্য দু'আ করা ।

● **<u>মাহব্বাতে শির্‌ক</u>** ঃ কোন পীর, দরবেশ বা আওলিয়াকে আল্লাহর মত ভালবাসা ।

● **<u>আনুগত্যের শির্‌ক</u>** ঃ কুরআন-হাদীসের পরিপন্থী কাজে পীর, ইমাম বা আলেমদের আনুগত্য করা ।

● **<u>সম্পর্কের শির্‌ক</u>** ঃ আল্লাহ তাঁর সৃষ্টির মধ্যে বিলীন হয়ে আছেন এবং স্রষ্টা ও সৃষ্টির মধ্যে পার্থক্য নেই এরূপ ধারনা ।

● **ব্যবস্থাপনায় শিরক ঃ** আওলিয়া ও কুতুবগণ সৃষ্টি জগতের **ব্যবস্থাপনায় রয়েছেন** এই বিশ্বাস করা।

● **গুণের সিফাতে শিরক ঃ** আল্লাহর কোন কোন সৃষ্টিকে ঐ সমস্ত **গুণের অধিকারী** মনে করা যা শুধু মাত্র আল্লাহর। যেমন নাবী, রাসূল, পীর, আওলিয়া কিংবা জিন গায়িবের খবর জানে বলে ধারনা করা ।

● **আমলের শিরক ঃ** আল্লাহ ব্যতীত অন্যের জন্য কুরবানী, মানত করা. নাজর-নিয়াজ দেয়া ইত্যাদি শিরক।

● **তাওয়াফের শিরক ঃ** পীর, অলী-আওলিয়াদের মাজার তাওয়াফ করা ।

● **হিফাযাতের শিরক ঃ** বিদায়ের আগে কারও নিরাপত্তা কামনায় পীর, আওলিয়াদের নাম করে তাদের হিফাযাতে দেয়া ।

● **প্রচারে শিরক ঃ** আল্লাহ ও রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে একই মর্যাদার অধিকারী মনে করা কিংবা কোথাও লিখে রাখা শিরক। যেমন ঘরের দরজায় আল্লাহ ও মুহাম্মাদ লিখে রাখা, টুপির একপাশে আল্লাহ ও অন্য পাশে মুহাম্মাদ লিখে রাখা স্পষ্টত শিরক।

● **ইসলামে দলীয় অনুশীলন মানা শিরক ঃ** মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবন বিধান অমান্য করে যদি কেহ কোন ফাতওয়ার আনুগত্য করে এবং মনে প্রাণে তা মেনে নেয় তাহলে তা "রিসালাতের শিরক" এর অন্তর্ভুক্ত। স্পষ্ট কথা হল, জিন ও মানুষকে আল্লাহর দাসত্ব (ইবাদাত) করার জন্য সৃষ্টি করা হয়েছে। একমাত্র তাঁরই আদেশ-নিষেধ মানতে হবে, আর কারও আদেশ-নিষেধ মানা যাবেনা।

বর্তমান যুগে লোকদের শিরক অপেক্ষা পূর্ববর্তী লোকদের শিরক ছিল অপেক্ষাকৃত হালকা

১। সমুদ্রে যখন বিপদ তোমাদেরকে পেয়ে বসে তখন তাঁকে ছাড়া অন্য যাদেরকে তোমরা আহ্বান কর তারা হারিয়ে যায়। অতঃপর তিনি যখন তোমাদেরকে স্থলে এনে বাঁচিয়ে দেন তখন তোমরা মুখ ফিরিয়ে নাও। মানুষ বড়ই অকৃতজ্ঞ। [সূরা বানী ইসরাইল-৬৭]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-৪০-৪১, লুকমান-৩২, যুমার-৮।

পূর্ব যামানার লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে এমন ব্যক্তিদের আহ্বান করত যারা ছিল আল্লাহর নৈকট্য প্রাপ্ত, তারা হতেন নাবী-রাসূল নতুবা ফিরিশতা। এছাড়াও তারা হয়ত পূজা করত বৃক্ষ অথবা পাথরের । কিন্তু আমাদের এই যুগের লোকেরা আল্লাহর সঙ্গে এমন লোকদের ডাকে এবং তাদের নিকট প্রার্থনা জানায় যারা নিকৃষ্টতম অনাচারী, আর যারা তাদের নিকট ধর্ণা দেয় ও প্রার্থনা জানায় তারাই তাদের অনাচারগুলির কথা ফাঁস করে দেয় । সে অনাচারগুলির মধ্যে রয়েছে ব্যভিচার, চুরি এবং সালাত পরিত্যাগের মত গর্হিত কাজ ।

সমাজে বিভিন্নভাবে শির্কের বিস্তার ঘটছে, যা আজ বেশির ভাগ মুসলিম দেশে দেখা যাচ্ছে

❖ যারা মানুষের জন্য আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে দু'আ করাকে এবং মাসজিদে কাবর দেয়াকে, আর কাবরের চারদিকে তাওয়াফ করাকে, এমন কি আওলিয়াদের কাবরে নাযর বা মানত দেয়াকে এবং অন্যান্য বিদ'আত ও খারাপ কাজকেও জায়েয করে দিয়েছে। এ সম্বন্ধে আল্লাহ বলেন :

১। আর আল্লাহকে বাদ দিয়ে আহ্বান করনা এমন কিছুকে যা না পারে তোমার কোন উপকার করতে, আর না পারে ক্ষতি করতে । যদি তুমি তা কর-তাহলে তুমি যালিমদের মধ্যে শামিল হয়ে যাবে। [সূরা ইউনুস-১০৬]

২। তিনি রাতকে দিনে প্রবেশ করান এবং দিনকে প্রবেশ করান রাতে। তিনি সূর্য ও চাঁদকে করেছেন নিয়ন্ত্রিত; প্রত্যেকে পরিভ্রমণ করে এক নির্দিষ্ট কাল পর্যন্ত। তিনিই আল্লাহ! তোমাদের রাব্ব! সার্বভৌমত্ব তাঁরই। আর তোমরা আল্লাহর পরিবর্তে যাদেরকে ডাক তারাতো খেজুর বীচির আবরণেরও অধিকারী নয়। [সূরা ফাতির-১৩]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-৫৯, বাকারা-১৬৫, তাওবা-৩১, যুমার-৬৫, নিসা-১১৬, হাজ্জ-৭৩, রাদ-১৪, ফাতির-১৪।

❐ বর্তমান সমাজে প্রচলিত বহুবিধ উপায়ে শিরক প্রকাশ পায় যার কয়েকটি নিম্নে দেয়া হল।

- আল্লাহ ছাড়া অন্যের কাছে চাওয়া;
- কথিত আওলিয়া ও নেককার লোকদেরকে মাসজিদে কাবর দেয়া;
- আওলিয়াদের কাবরে নাজর-নিয়ায (মানত) দেয়া;
- আওলিয়াদের কাবরের কাছে যবাহ করা;
- নাবী বা কথিত অলীদের কাবরে তাওয়াফ করা;
- কাবরের দিকে মুখ করে সালাত আদায় করা;
- বারাকাতের জন্য/উদ্দেশে কোন কাবরের স্থানে ভ্রমণ করা;
- আল্লাহর দেয়া বিধান মোতাবেক বিচার পরিচালনা না করা;
- কুরআন ও সহীহ হাদীস অমান্যকারী নেতা, আলেম বা বুজুর্গদের কথা মান্য করা;
- নাবী/আওলিয়াগণ গায়িব জানেন এ কথা বিশ্বাস করা;
- আল্লাহকে ভালবাসার মত কোন আওলিয়াকে ভালবাসা;
- কোন আলেম বা কোন পীরের উদ্ভাবন করা পদ্ধতির আনুগত্য করা;
- মানুষের কল্‌বে আল্লাহর আরশ বলে ধারণা করা;
- কোন কোন আওলিয়া এই সৃষ্টিজগত পরিচালনা করেন বলে বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

শির্কের ভয়াবহতা/পরিনাম

ক) শির্ক বড় ধরনের যুল্‌ম

১। স্মরণ কর, যখন লুকমান তার ছেলেকে নাসীহাত করে বলেছিল ঃ হে বৎস! আল্লাহর সাথে কোন কিছুকে শরীক করনা, শির্ক হচ্ছে অবশ্যই বিরাট যুল্‌ম। [সূরা লুকমান-১৩]

খ) শির্‌ক সবচেয়ে বড় পাপ

১। 'আমি কি তোমাদেরকে সবচেয়ে বড় পাপ সম্পর্কে জানাবনা? আমরা বললাম ঃ 'হ্যাঁ, হে আল্লাহর রাসূল (সাঃ) ! আপনি আমাদেরকে সেটি জানাবেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বললেন ঃ 'আল্লাহর সাথে কেহকে শরীক করা, আর পিতা-মাতার অবাধ্যতা করা।' [বুখারী/৬৪৩৮]

গ) শির্‌ক জঘন্যতম পাপ

১। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেননা। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। [সূরা নিসা-৪৮]

ঘ) শির্‌ক অমার্জনীয় অপরাধ

১। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সঙ্গে শরীক করাকে ক্ষমা করেননা, এছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করেন এবং যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে শরীক করে সে চরমভাবে গোমরাহীতে পতিত হল। [সূরা নিসা-১১৬]

ঙ) শির্‌ক যাবতীয় সৎ আমল নষ্ট করে

১। কিন্তু তোমার কাছে আর তোমাদের পূর্ববর্তীদের কাছে অহী করা হয়েছে যে, তুমি যদি (আল্লাহর) শরীক স্থির কর তাহলে তোমার কর্ম অবশ্যই নিস্ফল হয়ে যাবে, আর তুমি অবশ্যই ক্ষতিগ্রস্তদের অন্তর্ভুক্ত হবে। [সূরা যুমার-৬৫, হুদ-১৫-১৬]

চ) শির্‌ক জান্নাত থেকে বঞ্চিত করে

১। যে ব্যক্তি আল্লাহর সঙ্গে অংশী স্থাপন করে তার জন্য আল্লাহ অবশ্যই জান্নাত হারাম করে দিয়েছেন, আর তার আবাস হল জাহান্নাম। যালিমদের জন্য কোন সাহায্যকারী নেই। [সূরা মায়িদা-৭২]

ছ) শির্‌ক ধ্বংস ও বিপর্যয়ের কারণ

১। আল্লাহর প্রতি একনিষ্ঠ হয়ে, তাঁর সাথে কোন শরীক না করে; যে কেহ আল্লাহর সাথে শরীক করে সে যেন আকাশ থেকে পড়ে গেল, আর পাখী তাকে ছোঁ মেরে নিয়ে গেল কিংবা বাতাস তাকে উড়িয়ে নিয়ে দূরবর্তী স্থানে ছুঁড়ে ফেলে দিল। [সূরা হাজ্জ-৩১]

জ) শির্‌ক হচ্ছে আবর্জনা স্বরূপ, আর মুশরিকরা হল অপবিত্র

১। হে মু'মিনগণ! মুশরিকরা হচ্ছে একেবারেই অপবিত্র, অতএব তারা যেন এ বছরের পর মাসজিদুল হারামের নিকটেও আসতে না পারে, আর যদি তোমরা দারিদ্রতার ভয় কর তাহলে আল্লাহ নিজ অনুগ্রহে তোমাদেরকে অভাবমুক্ত করবেন, যদি তিনি চান। নিশ্চয়ই আল্লাহ অতিশয় জ্ঞানী, বড়ই হিকমাতওয়ালা। [সূরা তাওবা-২৮]

২। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ ইবরাহীম-২৪, ২৫।

ঝ) শির্‌ক চরম এক ব্যর্থতা

১। যেদিন আমি তাদের সবাইকে একত্রিত করব, আর যারা শির্‌ক করেছিল তাদেরকে বলব ঃ যাদেরকে তোমরা আমার শরীক মনে করতে তারা কোথায়? [সূরা আন'আম-২২]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নাহল-৫২, ৮৬, আন'আম-৯৪।

ঞ) শির্ক যারা করে তাদের জন্য ক্ষমা চাওয়া যাবেনা

১। নাবী ও মু'মিনদের জন্য শোভনীয় নয় মুশরিকদের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করা, তারা আত্মীয়-স্বজন হলেও, যখন এটা তাদের কাছে সুস্পষ্ট যে, তারা জাহান্নামের অধিবাসী। [সূরা তাওবা-১১৩]

২। ইবরাহীমের পিতার জন্য ক্ষমা প্রার্থনার ব্যাপারটি কেবলমাত্র তার প্রতিশ্রুতি রক্ষার্থে যা সে তার পিতাকে দিয়েছিল। কিন্তু যখন এটা তার কাছে স্পষ্ট হয়ে গেল যে, সে আল্লাহর শত্রু, তখন সে তার থেকে সম্পর্ক ছিন্ন করল; ইবরাহীম ছিল অতি কোমল হৃদয়, সহিষ্ণু। [সূরা তাওবা-১১৪]

শির্কের মূল কারণসমূহ

(ক) আল্লাহর গুণাবলী সম্পর্কে সুস্পষ্ট ধারনার অভাব

১। হে লোক সকল! একটি উপমা দেয়া হচ্ছে, মনোযোগ সহকারে তা শ্রবণ কর। আল্লাহর পরিবর্তে তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তো কখনও একটি মাছিও সৃষ্টি করতে পারবেনা, এ উদ্দেশে তারা সবাই একত্রিত হলেও; এবং মাছি যদি তাদের নিকট হতে কিছু ছিনিয়ে নিয়ে যায় ওটাও তারা ওর নিকট হতে উদ্ধার করতে পারবেনা। পূজারী ও পূজিত কতই না দুর্বল! [সূরা হাজ্জ-৭৩]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ যুমার-৬৫–৬৭, হাজ্জ-৭৪।

(খ) কারো সম্মান ও মর্যাদার ক্ষেত্রে মাত্রাতিরিক্ত বাড়াবাড়ি করা

১। ওহে কিতাবধারী! তোমরা তোমাদের দীনের ব্যাপারে বাড়াবাড়ি করনা, আর আল্লাহ সম্বন্ধে সত্য ছাড়া কিছু বলোনা । [সূরা নিসা-১৭১]

২। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ মায়িদা-৭৭।

(গ) আল্লাহর নৈকট্য লাভের জন্য অন্যকে সুপারিশকারী হিসাবে গ্রহণ করা

১। জেনে রেখ, খালেস দীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে ঃ আমরা তাদের 'ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দিবে। তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফাইসালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফীর, আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখাননা। [সূরা যুমার-৩]

২। এক আল্লাহর উল্লেখ করা হলেই যারা কিয়ামাতে বিশ্বাস করেনা তাদের অন্তর বিতৃষ্ণায় ভরে যায়। আর আল্লাহ ছাড়া অন্যান্য উপাস্যের উল্লেখ করা হলেই তারা আনন্দে উৎফুল্ল হয়। [সূরা যুমার-৪৫]

(ঘ) বর্তমান সমাজে এবং বাংলাদেশের অনেক/কতিপয় মুসলিমের বিশ্বাস, কর্ম ও অভ্যাস শিরকের পর্যায়ে। তার কয়েকটি নমুনা নিম্নে দেয়া হল ঃ

- গণক, টিয়া পাখি ও বানরের মাধ্যমে ভাগ্য জানার চেষ্টা করা।
- প্রফেসর হাওলাদার ও অন্যান্য জ্যোতিষীদের ভাগ্য সম্পর্কীয় কথায় বিশ্বাস করা।

- আওলিয়ারা বিভিন্ন প্রয়োজন পূরণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।
- আওলিয়াদের মধ্যকার গাউছ ও কুতুবগণ দুনিয়া পরিচালনা করেন এবং মানুষের কল্যাণ ও অকল্যাণ করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।
- আওলিয়ারা নিজস্ব মর্যাদা বলে আল্লাহর কোন পূর্বানুমতি ব্যতীত তাদের ভক্তদের জন্য শাফা'আত করে তাদেরকে মুক্তি দিতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।
- মৃত অলীগণ ভক্তদের সমস্যা সমাধানে হস্তক্ষেপ/সহায়তা করতে পারেন বলে বিশ্বাস করা।
- মাজারের পুকুর ও কূপের পানি পান করা এবং মাছ, কচ্ছপ ও কুমীরকে খাবার দিয়ে রোগ মুক্তি ও বারাকাত কামনা করা।
- মানব রচিত বিধানের আলোকে দেশ শাসন করা।
- দু'আ কবূল হওয়ার জন্য মুরশিদ, পীর ও অলীদের মাজারের দিকে মুখ করে দু'আ করা।
- অলীদের মাজার ও পীরের সামনে বিনয়ের সাথে দাড়ানো।
- বিভিন্ন উদ্দেশে আওলিয়াদের মাজারে মানত করা।
- আল্লাহর হুকুমের উপরে পীরের হুকুমকে প্রাধান্য দেয়া।
- দীন ইসলাম পালনের ক্ষেত্রে সহীহ হাদীসের পরিবর্তে পীর ও দলীয় মতামতকে প্রাধান্য দেয়া।
- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বা পীরের নাম জপ করা।
- আওলিয়াদের মাজার ও তাদের সাথে সম্পর্কিত স্থানসমূহে দূর-দূরান্ত থেকে জিয়ারাত করতে যাওয়া।
- আওলিয়াদের কাবর, কাবরের দেয়াল, গিলাফ ও তাদের স্মৃতিসমূহ স্পর্শ করে বারাকাত হাসিল করা।
- বিভিন্ন তন্ত্র-মন্ত্রের মাধ্যমে ঝাড়-ফুঁক করা।
- রাসূল (সাঃ) নূরের সৃষ্টি বলে মনে করা।
- আকীক, পান্না প্রভৃতি পাথর ও রত্ম মানুষের ভাগ্যের পরিবর্তন ঘটাতে পারে এরূপ বিশ্বাস করা ইত্যাদি।

মুসলিম হিসাবে সালাতের গুরুত্ব

১। সালাত ইসলামের প্রথম ইবাদাত যা মি'রাজের রাতে ফার্‌য করা হয়। [মুসলিম/৩০৮-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হল সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল। [নাসাঈ/৪৬৬-বুরাইদা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/১০৭৯, ১০৮০, মুসলিম/১৫০]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে তখন তাদেরকে সালাত (নামায) আদায়ের নির্দেশ দিবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে (শাস্তি দিবে) এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে। [আবূ দাউদ/৪৯৫-আমর ইব্‌ন শুয়াইব (রাঃ), তিরমিযী/৪০৭]

৪। এ বিষয়ে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা তাহা-১৩২, আন'আম-১৬২, ইবরাহীম-৩১, শু'আরা-২১৮, রূম-৩১, আহযাব-৪২, দাহ্র-২৫-২৬, মাউন-৪-৭, বাকারা-২৩৮, বুখারী/৪৯৭, ৫০০, ৫০১, ৫২৬, ৬২২, মুসলিম/৪২৫, ১৩০৫, ১৩৫৫, ১৩৬১, ১৩৯৪, ১৩৯৭, নাসাঈ/৪৬৫, ৪৬৯, ৬১৩, তিরমিযী/৪১৩, ইব্‌ন মাজাহ/১৪২৬, আবূ দাউদ/৭৯০।

(ক) আমরা ইসলাম ধর্মের অনুসারী হওয়া সত্ত্বেও বাংলাদেশের অধিকাংশ শিক্ষিত/অশিক্ষিত লোক সালাত কায়েম করেনা।

(খ) ইসলামের প্রথম ইবাদাত সালাত। যে সালাত আদায় করবেনা উপরোক্ত হাদীস অনুসারে সে কাফির। অতঃপর তার বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন।

(গ) মুসলিম হিসাবে সন্তানদেরকে ৭ বছর বয়স থেকেই সালাতের আদেশ দিতে হবে এবং দশ বছর বয়সে সালাত না কায়েম করলে প্রহার করতে হবে।

(ঘ) আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষিত ও ধন-দৌলতের অধিকারী লোকেরা নিজেরা সালাত কায়েম করেনা এবং তাদের সন্তানদেরকেও সালাত আদায় করার কথা বলেনা।

(ঙ) আর অশিক্ষিত/গরীব লোকেরা সালাত আদায়ের নিয়ম জানেনা বিধায় তাদের অধিকাংশই সালাত আদায় করেননা।

সালাত ত্যাগকারী সন্তানদের ব্যাপারে পরিবারের প্রধানের করণীয়

১। পরিবারের কোন সন্তান যদি সালাত ত্যাগকারী হয় তাহলে গৃহের কর্তার উপর আবশ্যক হচ্ছে তাদেরকে সালাতের ব্যাপারে বাধ্য করা। তিনি তাদেরকে সালাতের নির্দেশ দিবেন, বুঝাবেন, প্রয়োজনে তাদেরকে প্রহার করবেন। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, "দশ বছর বয়সে সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে এবং বিছানা আলাদা করে দিতে হবে।" [ইব্‌ন মাজাহ/১৪২৬, তিরমিযী/৪১৩, আবূ দাউদ/৪৯৫, ৪৯৬]

এতে যদি কাজ না হয় তাহলে সমাজের আমীরের দায়িত্বশীল ব্যক্তির কাছে তাকে সোপর্দ করবেন যাতে তাকে সালাত আদায় করতে বাধ্য করা হয়। এ ক্ষেত্রে চুপ থাকা জায়েয হবেনা। কেননা এতে কুফরী কাজে সমর্থন হয়ে যায়। সালাত পরিত্যাগ করা কুফরী। সালাত আদায় না করা ব্যক্তি ইসলাম থেকে বের হয়ে যাবে। সালাত ত্যাগকারী কাফির হিসাবে চিরকাল জাহান্নামী। তাই সে মৃত্যুবরণ করলে তাকে গোসল দেয়া, জানাযা পড়া বা মুসলিমদের কাবরস্থানে দাফন করা যায়না। আল্লাহর কাছে নিরাপত্তা কামনা করি এবং সকল মুসলিম যেন আল্লাহর ইবাদাত বন্দেগীতে মশগুল থাকি। আল্লাহ আমাদের হিফাযাত করুন। (আমীন)

মাসজিদে সালাত আদায়ের ফাযীলাত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ যে ব্যক্তি আল্লাহর উদ্দেশে মাসজিদ নির্মাণ করবে, আল্লাহ তার জন্য জান্নাতে অনুরূপ ঘর তৈরী করবেন। [মুসলিম/১০৭১-মাহমুদ ইব্‌ন লাবীদ (রঃ), নাসাঈ/৬৯১, তিরমিযী/৩১৮]

২। আল্লাহ তা'আলার নিকট সবচেয়ে পছন্দনীয় স্থান হল মাসজিদ এবং সব চেয়ে অপছন্দনীয় স্থান হল বাজার। [মুসলিম/১৪০০-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ লোকেরা মাসজিদ সম্পর্কে পরস্পরের মধ্যে (নির্মাণ ও কারুকার্য নিয়ে) গর্ব না করা পর্যন্ত কিয়ামাত সংগঠিত হবেনা। [আবূ দাউদ/৪৪৯-আনাস (রাঃ), নাসাঈ/৬৯২]

৪। মাসজিদে যে যত বেশি দূরত্ব অতিক্রম করে সালাতে আসে তার ততবেশি সাওয়াব হবে। আর যে ব্যক্তি ইমামের সাথে সালাত আদায় করা পর্যন্ত অপেক্ষা করে তার সাওয়াব সেই ব্যক্তির চেয়ে অনেক বেশী, যে একাকী সালাত আদায় করে ঘুমিয়ে পড়ে । [বুখারী/৬১৯-আবূ মূসা (রাঃ)]

৫। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মাসজিদুল হারাম (মাক্কা মুকাররামা), মাসজিদুর রাসূল (মাসজিদে মনোয়ারা) এবং মাসজিদুল আকসা (বাইতুল মুকাদ্দাস) তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদে (ভ্রমণের উদ্দেশে) গমন করা যাবেনা। [বুখারী/১১১১, নাসাঈ/৭০৩]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মাসজিদুল হারাম ব্যতীত আমার এ মাসজিদে (মাসজিদে নাববীতে) একবার সালাত আদায় করা (এর সাওয়াব) অপরাপর মাসজিদে এক হাজার সালাতের (সাওয়াবের) চেয়ে উত্তম। [বুখারী/১১১২-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/৩২৫, নাসাঈ/৬৯৪]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দুনিয়াই তোমার জন্য মাসজিদ। যেখানেই সালাতের ওয়াক্ত হবে সেখানেই তুমি সালাত আদায় করে নিবে। [মুসলিম/১০৪৩, নাসাঈ/৭৩৯]

৮। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৫৪২, ৬১৩, ৬২৪, ৬২৫, ৬২৭, ৬৬৫, ৮২৬, ১১১৭, ৬৭১৭, মুসলিম/১০৪৮, ১০৭১, ১৩৫৯, ১৩৬১, ১৩৮৩, ১৩৯৬, ১৪০০, তিরমিযী/২১৯, ২২০, ৩১৯, নাসাঈ/৬৯১, ৭৩৭, ৮৪৬, ৮৫০, ইব্‌ন মাজাহ/৭৯৩, ৮০০।

(ক) আমরা যারা সালাত কায়েম করি তাদের অধিকাংশই মাসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করিনা।

(খ) একটি হাদীসে উল্লেখ আছে, সালাত বাসায় আদায় করলে কত সাওয়াব, ওয়াক্তিয়া মাসজিদে, জামে মাসজিদে, মাসজিদুল আকসা, মাসজিদুল নাববী, মাসজিদুল হারামে কত সাওয়াব সেই হাদীসটি দুর্বল।

(গ) তাছাড়াও সালাতের যেখানেই সময় হবে সেখানেই অবশ্যই সালাত কায়েম করতে হবে।

(ঘ) আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় যে, কিছু সংখ্যক লোক সফরে বাহিরে গেলে সালাত আদায় করেনা। কেবল তারা বাসায় সালাত আদায় করে। কেহ কেহ মাসজিদেও যায়না। কিন্তু মুসলিমের উচিত যেখানেই সালাতের সময় হবে সেখানেই সালাত আদায় করা।

(ঙ) সাওয়াবের উদ্দেশে উপরোক্ত তিনটি মাসজিদ ব্যতীত অন্য কোন মাসজিদে ভ্রমন করা উচিত নয়।

(চ) মাসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায় করলে ২৭ গুণ সাওয়াব বেশী পাওয়া যায়।

একই মাসজিদে একই ওয়াক্তে একাধিক জামা'আত

১। জামা'আতে সালাতের ফাযীলাত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে সাতাশ গুণ বেশি । [বুখারী/৬১৫-আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/১৩৫০, নাসাঈ/ ৮৪০, ইব্‌ন মাজাহ/৭৮৯]

২। যদি তোমাদের অবস্থান স্থলে সালাত আদায় করে মাসজিদে জামা'আতে আস তাহলে তাদের সঙ্গে জামা'আতে শরীক হয়ে যেও। তোমাদের জন্য তা নাফল হিসাবে গণ্য হবে। [তিরমিযী/২১৯-ইয়াযীদ ইব্‌নুল আসওয়াদ (রাঃ)]

৩। একবার রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত আদায়ের পর জনৈক ব্যক্তি মাসজিদে নাববীতে এলো। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমাদের মধ্যে কে এই ব্যক্তির সাথে সাওয়াব লাভের ব্যবসা করতে চাও ? তখন এক ব্যক্তি উঠে দাঁড়াল এবং তার সাথে সালাত আদায় করল। [তিরমিযী/২২০-আবূ সাঈদ (রাঃ)]

৪। একাকী ফারয সালাত আদায়রত অবস্থায় কিছু লোক এসে তার সাথে সালাতে শামিল হলে তিনি তাদের ইমামতি করবেন। [বুখারী/অনুচ্ছেদ-১০১-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ)]

⧉ নির্ধারিত ইমাম কর্তৃক জামা'আত হবার পরও প্রয়োজন বোধে একই মাসজিদে একাধিকবার জামা'আত করা যাবে। একজন লোক এক ওয়াক্তের সালাত আদায়ের পর অন্য জামা'আতেও ঐ ওয়াক্তের সালাত আদায় করতে পারবে। প্রথমবার ব্যতীত পরের সালাত তার জন্য নাফল হিসাবে গণ্য হবে ।

মাসজিদে প্রবেশ করে দুই রাক'আত সালাত আদায় না করে বসা নিষেধ

১। তোমাদের কেহ যখন মাসজিদে প্রবেশ করে তখন দু' রাক'আত সালাত আদায়ের আগে বসবেনা। [মুসলিম/১৫২৫-আবূ কাতাদা (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ মাসজিদে প্রবেশ করলে বসার পূর্বে দু'রাক'আত দুখুলুল মাসজিদ সালাত আদায় করে নিবে । [বুখারী/৪৩১-আবূ কাতাদা সালামী (রাঃ), ১০৮৯, ইব্‌ন মাজাহ/১০১২, মুসলিম/১৫২৪, তিরমিযী/৩১৬, নাসাঈ/৭৩৩]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুৎবা প্রদানকালে বলেন ঃ তোমরা কেহ এমন সময় মাসজিদে উপস্থিত হলে যখন ইমাম (জুমু'আর) খুৎবা দিচ্ছেন কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য (কক্ষ থেকে) বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে যেন দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নেয় । [বুখারী/১০৯২-আবদুল্লাহ (রাঃ), নাসাঈ/১৩৯৮]

৪। তোমাদের কেহ জুমু'আর দিন মাসজিদে এলে, ইমাম তখন খুৎবারত থাকলে সংক্ষিপ্ত আকারে দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নিবে । [মুসলিম/১৮৯৪-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

(ক) উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী সালাতের ওয়াক্ত হোক বা না হোক যখনই আমরা মাসজিদে প্রবেশ করব তখনই বসার পূর্বে দু' রাক'আত দুখুলুল মাসজিদ সালাত আদায় করতে হবে।

(খ) মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করা সুন্নাত। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করে দু' রাক'আত সালাত আদায় করার পূর্বে বসতে নিষেধ করেছেন। বর্তমান সমাজে কিছু সংখ্যক লোককে দেখা যায় যে, মাসজিদে প্রবেশ করেই প্রথমে বসে, তারপর উঠে সুন্নাত সালাত আদায় করে যা সহীহ্ হাদীসের বিপরীত চর্চা।

(গ) তাছাড়াও জুমু'আর দিন মাসজিদে খুৎবার সময় বা খুৎবার পূর্বে বাংলায় বয়ান দেয়ার সময় আমাদের সমাজের প্রায় মাসজিদেই লাল বাতি জ্বালানো থাকে, যেন কেহ মাসজিদে এসে দু' রাক'আত সালাত আদায় না করতে পারে। আবার খতীব সাহেব অথবা যিনি বয়ান দেন তিনি বলেন ঃ ভাই বসেন পরে সালাতের সময় দেয়া হবে। এই হল আমাদের সমাজে সহীহ্ হাদীসের বিপরীত চর্চা। আল্লাহ আমাদেরকে কুরআন ও সহীহ্ হাদীস অনুযায়ী সালাত কায়েম করার তাওফীক দান করুন।

স্বামী-স্ত্রী যে কোন একজন বেনামাযী থাকা প্রসঙ্গ

১। মুশরিকা নারীরা ঈমান না আনা পর্যন্ত তোমরা তাদেরকে বিবাহ করনা। মূলতঃ মু'মিন ক্রীতদাসী মুশরিকা নারী হতে উত্তম, ওদেরকে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন। ঈমান না আনা পর্যন্ত মুশরিক পুরুষদের সাথে (তোমাদের কন্যাদের) বিবাহ দিওনা। বস্তুতঃ মুশরিককে তোমাদের যতই ভাল লাগুক না কেন, মু'মিন গোলাম তার চেয়ে উত্তম। ওরা আগুনের দিকে আহ্বান করে, আর আল্লাহ নিজের অনুগ্রহে জান্নাত ও ক্ষমার দিকে আহ্বান করেন। তিনি মানুষদের জন্য নিজের হুকুমগুলি বিস্তারিতভাবে বর্ণনা করছেন যাতে তারা শিক্ষা গ্রহণ করে। [সূরা বাকারা-২২১]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইসলামের ভিত্তি (স্তম্ভ) পাঁচটি (১) আল্লাহ ছাড়া কোন ইলাহ নেই এবং নিশ্চয়ই মুহাম্মাদ আল্লাহর রাসূল এ কথার সাক্ষ্য দেয়া (২) সালাত (নামায) কায়েম করা (৩) যাকাত দেয়া (৪) হাজ্জ করা এবং (৫) রামাযান মাসে সিয়াম (রোযা) পালন করা। [বুখারী/৭-ইব্ন উমার (রাঃ), মুসলিম/২০]

৩। সালাত ইসলামের প্রথম ইবাদাত যা মি'রাজের রাতে ফারয করা হয়। [মুসলিম/৩০৮-আনাস ইবন মালিক (রাঃ)]

৪। আমাদের ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হল সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরী করল। [নাসাঈ/৪৬৬-বুরাইদা (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/১০৭৯, ১০৮০, মুসলিম/১৫০]

৫। যে ব্যক্তি পছন্দ করে যে, বিচার দিবসে সে মুসলিম হিসাবে আল্লাহর সাথে সাক্ষাত লাভ করবে তার উচিত এই সালাতসমূহের সংরক্ষণ করা, যেখানে সালাতের জন্য আহ্বান করা হয়। কারণ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের নাবীকে

হিদায়াতের সকল পথ বাতলে দিয়েছেন। আর এই সমস্ত সালাত হল হিদায়াতের পথসমূহের অন্যতম। [মুসলিম/১৩৬১-আবদুল্লাহ (রাঃ)]

- বে-নামাযীকে অবশ্যই নামাযী হওয়ার জন্য আহ্বান জানাতে হবে। বে-নামাযী সম্পর্কে মনীষীগণের অভিমত হল ঃ এক মতানুযায়ী বেনামাযী কাফির। কাফিরের সঙ্গে মুসলিমদের বিয়ে বৈধ হয়না। অতএব, এ অভিমতের সরল অর্থ দাঁড়ায়, নামাযীর সাথে বেনামাযীর বিয়ে বৈধ হবেনা। বেনামাযীর জানাযা ও কাফন/দাফন দেয়া যাবেনা। বেনামাযী নিকটবর্তী আত্মীয়-স্বজনের উত্তরাধিকার থেকে বঞ্চিত হবে। তার যবাহকৃত পশু হালাল নয়। তাকে তাওবার জন্য আ-হবান করতে হবে। সে এতে অস্বীকার করলে এবং তার মৃত্যু হলে তাকে নিয়ম মাফিক কাবরস্থ না করে গর্ত খুঁড়ে মাটি চাপা দিয়ে রাখতে হবে।

সালাত কায়েম এর নিয়ম

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সালাত আদায় কর, যেভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ। [বুখারী/৬০১-মালিক (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন অনেক লোক আছে যারা সালাত আদায় করে কিন্তু তাদের সালাত পুরাপুরি কবূল না হওয়ায় পরিপূর্ণ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়না। বরং তাদের কেহ ১০ ভাগের ১ ভাগ, ৯ ভাগের ১ ভাগ, ৮ ভাগের ১ ভাগ, ৭ ভাগের ১ ভাগ, ৬ ভাগের ১ ভাগ, ৫ ভাগের ১ ভাগ, ৪ ভাগের ১ ভাগ, তিনের-একাংশ বা অর্ধাংশ সাওয়াব প্রাপ্ত হয়ে থাকে। [আবূ দাউদ/৭৯০-আম্মার ইব্ন ইয়াসির (রাঃ)]

৩। হুযাইফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ ও সাজদাহ ঠিকমত আদায় করছেনা । তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার সালাত হয়নি। যদি তুমি (এই অবস্থায়) মারা যাও তাহলে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে। [বুখারী/৭৫২]

৪। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন লোক এসে সালাত আদায় করল। অতঃপর সে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে বললেন ঃ আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা তুমি তো সালাত আদায় করনি। সেই ব্যক্তি ফিরে গিয়ে আগের মত সালাত আদায় করল। তারপর এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। তিনি বললেন ঃ ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন । লোকটি বলল ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানিনা। অতএব আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করে কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পাঠ করবে। এরপর রুকূতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ আদায় করবে। তারপর উঠে সোজা হয়ে

দাঁড়াবে। তারপর সাজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করবে। তারপর সাজদাহ থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই সালাত আদায় করবে। [বুখারী/৭১৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৭৬৯, তিরমিযী/৩০২, ইবনে মাজাহ/১০৬০]

⊕ (ক) আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, বিভিন্ন লোক বিভিন্ন নিয়ম-কানূন/পদ্ধতি অনুযায়ী সালাত (নামায) আদায় করে।

(খ) আবার কেহ কেহ বলেন, সালাত যে কোনভাবে আদায় করলেই আল্লাহ কবূল করবেন।

(গ) এমতাবস্থায় আল্লাহর রাসূলের নিয়ম অনুযায়ী সালাত আদায় না করে বিভিন্ন দল/তরীকার নামকরণ করে সালাত আদায় করলে তা কি ঠিক হবে? এ বিষয়ে পাঠক সমাজের উপর চিন্তা-ভাবনার দায়িত্ব অর্পন করা হল।

মানসুক বলতে কি বুঝায়?

❖ 'মানসুক' অর্থ হল তরক (লংঘন বা পরিত্যাগ) করা। বাদ দেয়া নয়, বরং তার পরিবর্তে তার থেকে উত্তম বা সমকক্ষ আয়াত বা বিধান নাযিল করা।

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি কোন আয়াত রহিত করলে কিংবা ভুলিয়ে দিলে, তা থেকে উত্তম কিংবা তারই মত আয়াত আনয়ন করি। তুমি কি জাননা যে, আল্লাহ প্রত্যেক বস্তুর উপর ক্ষমতাবান? [সূরা বাকারা-১০৬]

২। (এটাই) আল্লাহর বিধান, অতীতেও তাই হয়েছে। তুমি আল্লাহর বিধানে কখনও কোন পরিবর্তন পাবেনা। [সূরা ফাতহ-২৩]

৩। আর তুমি তোমার কাছে অহীকৃত তোমার রবের কিতাব থেকে পাঠ করে শোনাও, তাঁর কথা পরিবর্তন করে দিবে এমন কেহ নেই, আর তাঁকে ছাড়া তুমি কখনও অন্য কেহকে আশ্রয়স্থল হিসাবে পাবেনা। [সূরা কাহফ-২৭]

৪। তোমার পূর্বে আমি যে সব রাসূল পাঠিয়েছিলাম তাদের ক্ষেত্রে এটাই ছিল নিয়ম, আর তুমি আমার নিয়মের কোন পরিবর্তন দেখতে পাবেনা। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৭]

৫। আল্লাহর বাণীর পরিবর্তন হয়না, নাবীগণের কিছু সংবাদ তো তোমার নিকট পৌঁছেছেই। [সূরা আন'আম-৩৪]

৬। (আল্লাহ বলেন) ঃ আমার কথার রদ-বদল হয়না এবং আমি আমার বান্দাদের প্রতি অবিচারকারী নই। [সূরা কাফ-২৯]

৭। তাদের জন্য সুসংবাদ দুনিয়ায় আর আখিরাতেও। আল্লাহর কথার কোন হেরফের হয়না, এটাই হল বিরাট সাফল্য। [সূরা ইউনুস-৬৪]

⊕ আমাদের সমাজের আলেম/ইমামরা সাধারণ লোকদের বিভিন্ন প্রশ্নের জবাবে বলেন যে, এই হাদীস বা নাবীর এই নির্দেশ/আদেশ এখন মানসুক হয়েছে। যেমন সালাতের রুকূতে যেতে এবং এবং রুকূ থেকে উঠতে রাফ'উল ইয়াদাইন (উভয় হাত উঠানো), জোরে আমীন বলা ইত্যাদি সম্বন্ধে আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করলে তারা বলে যে, এ হাদীস মানসুক হয়েছে। এ কথা 'সম্পূর্ণ

মিথ্যা। তারা ধর্মীয় বিষয়ে না জেনে ফাতওয়া দেয়, যা দীন-ইসলামকে বিকৃতি করার নামান্তর।

সালাতের ইকামাত হয়ে গেলে ফারয সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করা যাবেনা

১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর আর রাসূলের আনুগত্য কর। আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন ইকামাত দেয়া হয় তখন ফারয সালাত ব্যতীত আর কোন সালাত নেই। [বুখারী/অনুঃ-৮০, মুসলিম/১৫১৪]

৩। এক ব্যক্তি মাসজিদে প্রবেশ করল। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের (ফারয) সালাত আদায় করছিলেন। লোকটি মাসজিদের কোণায় দু' রাক'আত সালাত (ফাজরের সুন্নাত) আদায় করে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সালাতে শামিল হল। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাম ফিরিয়ে বললেন ঃ হে ওমুক! তুমি এ দু' সালাতের মধ্যে কোনটিকে (আসল) গণ্য করেছ? যা তুমি একাকী আদায় করলে (ফাজরের সুন্নাত) তা, নাকি যা আমাদের সাথে আদায় করলে (ফাজরের ফারয) তা? (অর্থাৎ যে কোনো ওয়াক্তের ফারয সালাতের জামা'আত আরম্ভ হলে অন্য সালাত বাদ দিয়ে ফারয সালাত আগে আদায় করতে হবে)। [মুসলিম/১৫২১-আবদুল্লাহ ইব্‌ন সারজিস (রঃ)]

ক) ফাজর বা অন্য কোন ফারয সালাতের জামা'আত শুরু হবার পর কেহ মাসজিদে এলে অথবা কেহ সুন্নাত সালাত আদায় অবস্থায় থাকলে তাকে সুন্নাত ছেড়ে দিয়ে জামা'আতে শরীক হতে হবে। ইকামাতের পর সুন্নাত সালাত আদায় বৈধ নয়। এমনকি ফাজরের সুন্নাত দু'রাক'আতও আদায় করা যাবেনা।

খ) বর্তমান সমাজের ইমামগণ বলেন ঃ জামা'আত শুরু হওয়ার পর কেহ মাসজিদে প্রবেশ করলে, তাকে সুন্নাত সালাত আদায় করার আগেই জামা'আতে শরীক হতে হবে। তবে ফাজরের সুন্নাত এর থেকে কিছুটা ব্যতিক্রমধর্মী। অর্থাৎ ফাজরের জামা'আত শুরু হয়ে গেলেও যদি ইয়াকীন হয় যে, সে সুন্নাত সালাত আদায় করে জামা'আতে শরীক হতে পারবে তাহলে তার জন্য মাসজিদের বারান্দায় বা জামা'আতের কাতার থেকে দূরে অন্য কোন স্থানে দু' রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করার নির্দেশ রয়েছে। তাদের বক্তব্য সহীহ হাদীসের বিপরীত, ঐ মতামত গ্রহণযোগ্য নয়।

গ) কেহ যদি ফাজরের পূর্বের দু'রাক'আত সুন্নাত আদায় করতে না পারে; তবে ফাজরের ফারয সালাত আদায়ের পর তা আদায় করতে হবে। [তিরমিযী/৪২২]

ফারয ও সুন্নাত সম্পর্কীত

❖ সাধারণত ঃ মহান আল্লাহর কুরআনের সব আদেশ-নিষেধ হল ফারয এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা, কাজ ও সাহাবাগণের (রাঃ) কাজ ও কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় অনুমোদন কৃত হলে তা আমাদের মানতে হবে। এটাই হচ্ছে সুন্নাত।

১। তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূরা আরাফ-৩]

২। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

৩। আর যে ব্যক্তি আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের নাফরমানী করবে এবং তাঁর নির্ধারিত সীমালঙ্ঘন করবে, আল্লাহ তাকে জাহান্নামে দাখিল করবেন, সে তাতে চিরস্থায়ী হবে এবং সে অবমাননাকর শাস্তি ভোগ করবে। [সূরা নিসা-১৪]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-৮০, হাশর-৭।

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের মাঝে দু'টি বস্তু রেখে যাচ্ছি। যতক্ষণ পর্যন্ত তোমরা সেই বস্তু দু'টি আঁকড়ে ধরে থাকবে, তোমরা পথভ্রষ্ট হবেনা। একটি হল আল্লাহর কিতাব, অপরটি রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। [মুসলিম/২৮১৭, আবূ দাউদ/৪৫৩৩]

⧉ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কখনই আবূ বাকর (রাঃ) অথবা উমার (রাঃ) এর তরিকা অনুসরণ করতে বলতে পারেননা, কারণ তাঁদের উপর আল্লাহ তা'আলা কোন কিছু নাযিল করেননি।

হে শিক্ষিত ও জ্ঞানী মুসলিম ভাই ও বোনেরা! আপনারা কোন কিছু আমল করার পূর্বে কারও নির্দেশ পালন করবেননা, যতক্ষণ না কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে প্রমাণ পাবেন। ইসলামের পক্ষে যে কোন কথা যে কেহ বললে তার দলীল কুরআন ও সহীহ হাদীস সমর্থন করে কিনা তা যাঁচাই করে নিবেন। তা না হলে আল্লাহ তা'আলার পথ থেকে বিচ্যুত হয়ে যাবেন।

"ইক্তেদাতু বিহাযাল ইমাম" বলে ইমামের উপর দায়িত্ব অর্পণ নয়, বরং ইমামকে অনুসরণই জামা'আতে সালাতের শর্ত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "ইমাম নিযুক্ত করা হয় তাকে অনুসরণ করার জন্য। তিনি যখন তাকবীর বলেন তোমরাও তাকবীর বলবে, তিনি যখন সাজদাহ করেন তোমরাও সাজদাহ করবে, তিনি যখন উঠেন তোমরাও উঠবে, তিনি যখন "সামিআল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলেন, তোমরা "রাব্বানা ওয়া লাকাল হামদ" বলবে। ইমাম যখন বসে সালাত আদায় করেন, তোমরাও বসে সালাত আদায় করবে।" [মুসলিম/৮০৫, ৮০৬, ৮০৭; বুখারী/৬৫৪, ১১৫৯]

- জামা'আতে সালাত আদায় করতে হলে ইমামের উপর মুক্তাদীদের দায়-দায়িত্ব বা ভার অর্পণ করার নির্দেশ সহীহ কোন হাদীসে নেই।

সমাজে প্রচলিত আছে, ইমামের পিছনে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ না করার **দলীল** হিসাবে বলা হয়-"ইক্তেদাতু বিহাযাল ইমাম" অর্থাৎ ইমামের উপর দায় দায়িত্ব দেয়া হয়েছে, অতএব মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করার প্রয়োজন নেই। যদি প্রশ্ন করা হয় যে, তাহলে সানা, রুকূর তাসবীহ, সাজদাহর তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও সালাম ইত্যাদি পাঠ করতে হয় কেন? তখন ঐ সকল মৌলভীসাহেবগণ কুরআন ও হাদীস মোতাবেক সঠিক উত্তর দিতে পারেনা। জামা'আতের সালাতেও মুক্তাদীগণকে সালাত শুরুর সময় ইমামের তাকবীরে তাহরীমা ও অন্যান্য তাকবীর দেয়ার সময় মনে মনে আল্লাহু আকবার বলতে হয়, মুক্তাদীগণ সালাতে সানা পাঠ করেন, রুকূ ও সাজদাহর দু'আ পাঠ করেন, সালাতের মধ্যে ২য়, ৩য় বা ৪র্থ রাক'আতে বসার পর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও অন্যান্য দু'আ পাঠ করেন। তা ছাড়াও সালাত শেষে সালাম ফিরান। উদহারণ স্বরূপ ঃ উকালতনামায় দস্তখত করে আমরা যেমন মোকদ্দমার দায়-দায়িত্ব উকিলকে অর্পণ করি তখন কোর্টে বিচারকের সামনে উকিলের সাথে তাল মিলিয়ে আমরা হাত-মুখের সঞ্চালন করিনা। দায়িত্ব প্রাপ্ত হয়ে অর্থের বিনিময়ে উকিলই আমাদের পক্ষে কোর্টের যাবতীয় কাজ করেন। সালাতের ক্ষেত্রেও দায়-দায়িত্ব যদি ইমামকে দেয়া হয় তাহলে "ইক্তেদাতু বিহাযাল ইমাম" বলে মাসজিদে বসে থাকতে আপত্তি কোথায়? ইমাম সাহেবরা তো আর ফাঁকি দিবেননা! তারা হলেন বড় বড় ডিগ্রিধারী আলেম! ঐ ইমামই তো আমার পক্ষ থেকে সালাত আদায় করবেন, যেহেতু তার উপর দায়িত্ব দিয়েছি এবং ঐ কাজের জন্য তাকে বেতনও দিচ্ছি । যদি সানা, রুকূর তাসবীহ, সাজদাহর তাসবীহ, আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও সালাম ইত্যাদি পাঠ করতে হয় তাহলে ইমামের উপর ভার-বোঝা বা দায়িত্ব দেয়া হল কোথায়? কুরআন ও সহীহ হাদীসের ভিত্তিতেই মুসলিম ভাইদের উপর বিচারের ভার রইল।

রাসূল (সাঃ) বিভিন্ন সময়ে কি বিভিন্নভাবে আমল করেছেন? অতএব যে যা করে সবই কি ঠিক?

১। তোমার নিকট যে অহী অবতীর্ণ করা হয়েছে তুমি তার অনুসরণ কর, আর তুমি ধৈর্য অবলম্বন কর যে পর্যন্ত না আল্লাহ ফাইসালা প্রদান করেন। বস্তুতঃ তিনিই হলেন সর্বোত্তম ফাইসালাকারী। [সূরা ইউনুস-১০৯]

২। আমি তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নিদর্শন হাযির করার শক্তি কোন রাসূলের নেই। যাবতীয় বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। [সূরা রা'দ-৩৮]

৩। সে (নাবী) যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। [সূরা হাক্কাহ-৪৪-৪৬]

৪। বস্তুত ঃ আমার নিয়মে তুমি কোন পরিবর্তন পাবেনা। [সূরা বানী **ইসরাইল-৭৭**]
৫। তুমি আল্লাহর এ বিধানে কোন পরিবর্তন পাবেনা। [সূরা ফাতহ-২৩]
৬। আল্লাহর বাণী পরিবর্তনযোগ্য নয়। [সূরা আন'আম-৩৪]
৭। তুমি আল্লাহর বিধানে কোন ব্যতিক্রম পাবেনা। [সূরা আহযাব-৬২]

আল্লাহর নিয়মে পরিবর্তন নেই। অর্থাৎ জিবরাঈল (আঃ) আল্লাহর নির্দেশে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে যে সালাত শিক্ষা দিয়েছেন তার পরিবর্তন আল্লাহ করেননি এবং রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামেরও পরিবর্তন করার কোন ইখতিয়ার ছিলনা। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়মে সালাত আদায় করেছেন বলে যে কথা বলা হয় তা আলেম/মুফতী সাহেবদের অনুমান ভিত্তিক কথা এবং কৌশল। যদি কেহ বলতে চান যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন নিয়মে সালাত আদায় করেছেন তাহলে বলতে হচ্ছে, তাদের কুরআন-হাদীসের জ্ঞান অত্যন্ত সীমিত অথবা আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সম্বন্ধে তাদের ধারণা ঐ ধরনের।

যেমন আমাদের সমাজে মহিলাগণ সালাতে বুকে হাত বাঁধেন কোন্ হাদীসের অনুসরণে? ⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম **বলেছেন** ঃ "আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছ সেভাবে সালাত আদায় কর।" [বুখারী/৬০১]

মহিলাগণ পুরুষগণের কাতারের পিছনে কাতার করে জামা'আতে সালাত আদায় করতেন এবং তারা সালাতে বুকে হাত বাঁধেন। আর আপনারা/পুরুষরা, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দেখলেন নাভীর নীচে হাত বাঁধতে? এতে বুঝা গেল জিবরাঈল (আঃ) হয়তো আল্লাহর আদেশে হাত একবার বুকে, আর একবার নাভির নীচে বেঁধেছিলেন। কিন্তু এটাও তো সম্ভব নয়। কারণ আল্লাহ তা'আলার বাণী পরিবর্তনযোগ্য নয় এবং জিবরাঈলও (আঃ) আল্লাহর অবাধ্য নন। হে আল্লাহ ! আমাদের ভ্রান্তির বেড়াজাল থেকে মুক্ত রাখুন। আমীন।

যে সকল স্থানে সালাত আদায় করা নিষেধ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ গোসলখানা ও কবরস্থান ব্যতীত সমস্ত ঐমীনই মাসজিদ হিসাবে গণ্য (অর্থাৎ এই দুই জায়গা ছাড়া যে কোনো স্থানে সালাত আদায় করা যায়)। [আবূ দাউদ/৪৯২-আবূ সাঈদ আল খুদরী (রাঃ)]

(ক) আমাদের সমাজের কিছু সংখ্যক লোককে দেখা যায় যে, বিভিন্ন পীর/অলী-আওলিয়া/গন্যমান্য ব্যক্তিদের কাবরকে সম্মুখে রেখে সালাত আদায় করে, যা সবচেয়ে বড় পাপ (কাবীরা গুনাহ)।

(খ) এ ছাড়াও দেশের বিভিন্ন জায়গায় কাবরকে কেন্দ্র করে মাসজিদ বানানো হয়, যা মোটেই কাম্য নয় এবং কাবর ভিত্তিক মাসজিদে সালাত আদায় করাও জায়েয নয়।

কুরআন ও সহীহ হাদীসের আলোকে পাঁচ ওয়াক্ত ফার্য সালাত আদায়ের সঠিক সময়

১। যখন তোমরা সালাত আদায় করবে, তখন দাঁড়িয়ে, বসে, শুয়ে আল্লাহকে স্মরণ করবে। অতঃপর যখন তোমরা নিরাপদ হবে তখন (যথানিয়মে) সালাত কায়েম করবে। নির্দিষ্ট সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। [সূরা নিসা-১০৩]

২। আর যারা নিজেদের (৫ ওয়াক্ত) সালাতসমূহের ব্যাপারে যত্নবান হবে। [সূরা মু'মিনূন-৯]

৩। তাদের পরে এলো অপদার্থ পরবর্তীরা; তারা সালাত নষ্ট করল ও লালসা পরবশ হল; সুতরাং তারা অচিরেই কুকর্মের শাস্তি প্রত্যক্ষ করবে। [সূরা মারইয়াম-৫৯]

৪। সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ। আর রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে; এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য; আশা করা যায় তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৮-৭৯]

৫। অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে, এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই। [সূরা রূম-১৭-১৮]

৬। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহর নিকটে দু'বার আমার সালাতে ইমামাতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন, যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং সেন্ডেলের এক ফিতার (প্রস্থের) পরিমাণ সামান্য ছায়া বাইতুল্লাহর পূর্ব দিকে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। এর পর তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করেন যখন সিয়াম পালনকারী ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ইশার সালাত আদায় করেন যখন পশ্চিম আকাশের লাল আভা লোপ পায়। পরদিন তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফাজরের সালাত আদায় করেন যখন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের সালাত ঐ সময় আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম পরিমাণ হল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের সালাত আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরিবের সালাত আদায় করেন যখন সিয়াম পালনকারী ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে ইশার সালাত আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফাজরের সালাত ঐ সময় আদায় করেন যখন ঊষা কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি [জিব্রাঈল (আঃ)]

আমাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ইয়া মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আপনার পূর্ববর্তী নাবী/রাসূলদের জন্য এটাই সালাতের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই সালাতের সময়। [আবূ দাউদ/৩৯৩, নাসাঈ/৫০৫,৫০৭, মুসলিম/১২৫৪]।

৭। দৈনিক পাঁচ ওয়াক্ত **সালাত ফারয করা হয়েছে।** [মুসলিম/১২৫৪-ইব্ন শিহাব (রঃ), তিরমিযী/২১৩, নাসাঈ/৪৬২, আবূ দাউদ/৩৯১]

৮। সালাতের বৈধ সময় **থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করা মাকরূহ।** [মুসলিম/অনুচ্ছেদ-৮৬]

৯। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া **সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ কোন** আমলটি আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয়? উত্তরে তিনি **বললেন ঃ সঠিক সময়ে** সালাত আদায় করা। [বুখারী/৫০০-আবূ আমর আশ-শাইবানী (রঃ), তিরমিযী/১৭০]

১০। আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যখন তোমাদের উপর এমন সব আমীর হবে যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে অথবা সালাতের সময় শেষ করে সালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যথাসময়ে সালাত আদায় করবে। পরবর্তিতে যদি সালাতের জামা'আত পাওয়া যায় তাহলে ঐ জামা'আতে অংশ গ্রহন করতে পারবে, তবে এটা হবে তোমার জন্য নাফল। [মুসলিম/১৩৩৮, নাসাঈ/৭৮২, ৮৬২, তিরমিযী/১৭৬, ইব্ন মাজাহ/১২৫৫]

□ সঠিক সময়ে সালাত আদায়ের ব্যাপারে এ দেশের অধিকাংশ মানুষ বে-খেয়াল। তাদের ধারণা যে, সালাত আদায় করলেই হল। সঠিক সময়ের খোঁজ-খবর নেয়া জরুরী নয়। ধরাবাঁধা একটা নিয়ম কে কবে চালু করে দিয়েছিল সেই মুতাবিক চলছে তো চলছেই। কুরআন-হাদীস মোতাবেক করে লাভ কি? আমাদের কি উচিত হবেনা কুরআন ও সহীহ হাদীস মুতাবিক সালাতের সময় নির্ধারণ করা? আমরা কি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুসরণ করবনা? আমরা কি তাঁর সুন্নাতকে ভালবাসবনা? আমরা কি তাঁর হাদীসের প্রতি মুহাব্বাত করবনা? আমরা কি বাপ-দাদার আমলের অন্ধ অনুসরণ করব? কুরআন ও সহীহ হাদীসকে অমান্য করা কতটুকু পাপ হবে, আর এটাকে মেনে চললে কতটুকু সাওয়াব হবে এটা বিবেচনা করার জন্য প্রতিটি মাসজিদ কমিটির নিকট অনুরোধ রইল। কেননা অধিকাংশ মাসজিদ কমিটির সিদ্ধান্তই চূড়ান্ত। ইমাম ও খাতীবের কুরআন ও হাদীসের নাসীহাত করার ইচ্ছা থাকলেও কমিটির লোকদের কুরআন-হাদীসের জ্ঞান সল্প হওয়ার কারণে তাদের নিকট বলা সম্ভব হয়না বা বললেও কাজ হচ্ছেনা। কঠিনভাবে বলাও যায়না কারণ ইমামাতির উপর তাদের রুটি/রুযী নির্ভরশীল।

একজন মনীষী বলেছেন ঃ সঠিক সময় অর্থাৎ সালাতের আউয়াল ওয়াক্তে সালাত আদায় না করার দৃষ্টান্ত এমন যে, একজন লোকের ঘরে যথেষ্ট খাদ্য

(খোরাকী) আছে অথচ সে ভিক্ষা করছে। কথাটি অনুধাবন যোগ্য। আমার হাতে সময় আছে, অথচ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পছন্দের সাথে আমাদের সালাত আদায়ের সময়ের মিল হবেনা এটা কেমন কথা?

তাই আসুন! খায়েশের গোলামীর শিকল ছিড়ে আল্লাহকে রাযী করার লক্ষ্যে প্রিয় নাবীর (সাঃ) সুন্নাহকে মুহাব্বাত করে কুরআন ও সহীহ হাদীসসমূহে বর্ণিত সময়ে পাঁচ ওয়াক্ত ফার্‌য সালাত আদায় করি।

ফাজর সালাতের সময় ঃ

১। সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৮]

২। তারা যা বলে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর, আর সূর্যোদয়ের পূর্বে আর সূর্যাস্তের পূর্বে তোমার রবের মহিমা ও প্রশংসা ঘোষণা কর। আর তাঁর প্রশংসা ঘোষণা কর রাত্রির একাংশে আর সালাতের পরে। [সূরা কাফ-৩৯-৪০]

৩। মহিলাগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে চাদর পরিহিত অবস্থায় ফাজরের সালাত আদায় করে বাড়ি ফিরতেন, আর অন্ধকারের কারণে তাঁদের কেহ চিনতে পারতনা। [নাসাঈ/৫৪৯-আয়িশা (রাঃ)]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় ফাজরের সালাত আদায় করতেন যখন আমাদের একজন তার পার্শ্ববর্তী অপরজনকে চিনতে পারতনা। আর এ সালাতে তিনি ষাট থেকে একশত আয়াত তিলাওয়াত করতেন। [বুখারী/৫১২]

৫। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর ইন্তিকালের পূর্ব পর্যন্ত ফাজর সালাত অন্ধকার থাকতে আদায় করতেন। সূর্যোদয়ের পূর্বে পূর্বাকাশে লাল রং প্রকাশ পাওয়া পর্যন্ত কখনও অপেক্ষা করেননি। [আবূ দাউদ/৩৯৪, বুখারী, নাসাঈ]

☐ আমাদের দেশের অধিকাংশ লোক কুরআন/সহীহ হাদীস বা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জিন্দেগীর আমল অনুযায়ী ফাজরের সালাত ওয়াক্ত মত আদায় না করে সারা রাত নিদ্রা পুরা করে চারিদিকে বেশ ফর্সা হলে তা আদায় করেন, কেন যে করেন তা বোধগম্য নয়। ধরুন আষাঢ় মাস চলছে। সূর্য উদয় ৫.১৫ মিনিটে আর সূর্যাস্ত ৬.৪৫ মিনিটে। ফাজর শুরু হয় ৩.৩৮ মিনিটে। কিন্তু এর ২২ মিনিট পরও ৪.০০ টায় যদি কোন মাসজিদে ফাজরের আযান দেয়া হয় তাহলে কথা উঠে এত রাতে আযান দেয় কারা? অথচ যদি এ সময়টি রামাযান মাস হয় তাহলে কোন আপত্তি করা হয়না। রামাযানে সাহরী শেষ হলেই ফাজরের আযান দিয়ে ফাজরের সঠিক ওয়াক্ত মেনে নিয়ে সালাত আদায় করা হয়। আর যখনই রামাযান মাস চলে গেল, শাওয়াল মাস শুরু হল, তখনই নাবীর (সাঃ) হাদীস না মেনে অতিরিক্ত ফর্সা হলে ফাজর সালাত আদায় শুরু হল এবং চলল পরবর্তী ১১ মাস অর্থাৎ ৩০ বা ২৯ শাবান পর্যন্ত। বর্তমানে আমাদের সমাজে প্রচলিত আছে যে, ফাজর ওয়াক্ত শুরু হওয়ার প্রায়ই এক ঘন্টা পরে অধিকাংশ মাসজিদে ফাজরের জামা'আত আরম্ভ হয়। আল্লাহ বলেনঃ

রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ সালাত কায়েম করবে.......। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৯] রাসূল সাঃ বলেছেন ঃ ফারয সালাতের পর সবচেয়ে ফাযীলাতের সালাত হল তাহাজ্জুদ সালাত। [মুসলিম/২৬২২] এখন যদি কোন মুসলিম ভাই কুরআন ও হাদীস অনুযায়ী তাহাজ্জুদ সালাত কায়েমের ইচ্ছা করে তবে তাকে অবশ্যই ফাজরের ওয়াক্ত শুরু হওয়ার প্রায়ই ৪০ থেকে ৬০ মিনিট আগেই ঘুম থেকে জাগতে হবে। কারণ তার ইসতিনজা, উযূ এরপর তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে হবে। অতঃপর তাহাজ্জুদ সালাতের সময় যখন শেষ হচ্ছে তার প্রায়ই এক ঘন্টা পর ফাজরের জামা'আত শুরু হচ্ছে। এবার সুধী মুসলিম সমাজ আপনারই বিবেক বিবেচনা করে বলুন তো ! যে ব্যক্তি তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের জন্য ঘুম থেকে উঠল এবং ফাজরের সালাত জামা'আতে আদায় করল সে ঐ প্রায়ই ২ ঘন্টা কিভাবে উযূকে অটুট রাখবে। তা ছাড়াও এটা তো প্রতিদিনের রুটিন মাফিক ইবাদাত বিধায় ঐ ব্যক্তির উযূ অটুট রাখা এবং ঘুম থেকে জেগে এক ঘন্টা বসে ফাজরের জামা'আতের জন্য অপেক্ষা করা প্রতিটি মানুষের জন্য অবশ্যই কষ্টকর হবে।

এমতাবস্থায়, রামাযান মাসের ন্যায় ফাজর সালাতের জামা'আত অন্যান্য এগার মাসেও যদি ওয়াক্ত শুরুর ১৫ থেকে ২০ মিনিট পরে শুরু হত তবে অনেক মুসলিম ভাই তাহাজ্জুদ সালাত আদায়ের অভ্যাস করতে পারতেন। কিন্তু বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মাসজিদ কমিটির লোকদের কুরআন ও সহীহ হাদীস মোতাবেক জ্ঞান নেই বললেই চলে। ফলে কমিটির লোকেরা নিজেদের মনগড়া রীতি-নীতি মোতাবেক সালাত আদায়ের সময় নির্ধারন করছেন । যাতে সঠিক সময়ে মুসল্লিরা ফাজরের সালাত জামা'আতে আদায় করতে না পারে এবং তাহাজ্জুদ আদায় করবে এরূপ লোকের সংখ্যা যাতে বৃদ্ধি না পায় সেই প্রচেষ্টায় নিয়োজিত আছেন। বিধায় একটি মাস রাসূলকে (সাঃ) মানা হল, আর বাকী ১১টি মাস নিজের খায়েশ বা ইচ্ছাকে প্রাধান্য দিয়ে সালাতের সময় নির্ধারণ করা হল। এটা নিজেদের ইচ্ছায় করা হয়, তাই উহা পরিত্যাজ্য। রামাযান ছাড়া অন্য মাসেও ঐ সময়ে ফাজর সালাত আদায় করা আবশ্যক।

যুহর সালাতের সময় ঃ

১। অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে, এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই। [সূরা রূম-১৭-১৮]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এমন সময় যুহরের সালাত আদায় করতেন যখন সূর্য পশ্চিম দিকে ঢলে পড়ত। [বুখারী/৫১২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৩। সূর্য যখন পশ্চিমাকাশে হেলে পড়ত তখন বিলাল (রাঃ) যুহরের সালাতের আযান দিতেন। [আবূ দাউদ/৪০৩]

☐ কিন্তু বড়ই আশ্চর্যের বিষয় হল, আমাদের দেশে অধিকাংশ মাসজিদে কি শীত, কি বর্ষা, কি হেমন্ত, কি বসন্ত, কি গ্রীষ্ম দিন ছোট হল না বড় হল, কোন চিন্তা ভাবনা না করে যুহর সালাত ঐ দুপুর পৌনে ১ টায় বা ১ টায় আযান আর

১.১৫ মিনিট বা ১.৩০ মিনিটে জামা'আত করা হয়। এর কোন ব্যতিক্রম নেই। সেই পৌষ মাসের ১০ ঘন্টার দিন হোক, আর আষাঢ় মাসের সাড়ে চৌদ্দ ঘন্টার দিন হোক। কোন বাছ-বিচার নেই। দিন বড় হোক কিংবা ছোট হোক ঐ একটাই সই। সূর্য ৫.১৫ মিনিটে উদয় হয়ে পৌনে সাতটায় অস্ত যাক অথবা ৬.৪৫ মিনিটে উদয় হয়ে ৫.৩৫ মিনিটে অস্ত যাক কোন দেখাদেখি নেই। কিন্তু দিন ছোট/বড় হচ্ছে এটাকে বেমালুম ভুলে গিয়ে যুহরের ওয়াক্ত ঐ একই সময়ে আদায় করলে কি রাসূলের (সাঃ) তরীকা অনুযায়ী হবে? নাকি তাঁকে অবজ্ঞা করা হবে? ফলে আমরা আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) নির্দেশনা অনুযায়ী সঠিক সময়ে সালাত আদায় করা থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

আসর সালাতের সময় ঃ

১। তোমরা সালাতসমূহ ও মধ্যবর্তী সালাতের (আসর) ব্যাপারে যত্মবান হও এবং বিনীতভাবে আল্লাহর উদ্দেশে দন্ডায়মান হও। [সূরা বাকারা-২৩৮]

২। অতএব তারা যা বলছে তাতে তুমি ধৈর্য ধারণ কর এবং তোমার রবের গুণগান কর সূর্যোদয়ের পূর্বে ও তা অস্তমিত হওয়ার পূর্বে এবং তাঁর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর রাত্রিকালে ও দিনের প্রান্তগুলোয়, যাতে তুমি সন্তুষ্ট হতে পার। [সূরা তাহা-১৩০]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করতেন এমন সময়ে যে, আমাদের কেহ যদি মাদীনার শেষ প্রান্তে পৌঁছে আবার ফিরে আসত তখনও সূর্য সতেজ থাকত। [বুখারী/৫১২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করতেন যখন প্রতিটি বস্তুর ছায়া উহার সমান হত। [মুসলিম/১২৮৩-আনাস (রাঃ)]

◻ উপরোক্ত কুরআন ও সহীহ হাদীস অমান্য করে আমাদের বর্তমান সমাজের লোকেরা আসরের সালাত আদায় করে যখন প্রত্যেক বস্তুর ''আসল ছায়া'' বাদে যখন তার ছায়া দ্বিগুন হয় অর্থাৎ সূর্যাস্তের ১ ঘন্টা ২০ মিনিট আগে/পরে এবং সূর্যাস্তের পূর্ব পর্যন্ত আসরের সালাত আদায় করেন। কবে কে যে এ মোক্ষম মন্ত্র শিখিয়ে দিয়েছে তার ইতিহাস কে খোঁজ করে? আসরের সালাত যে সময়ে আদায় করা হচ্ছে এখন সহীহ হাদীসে বর্ণিত সময়ের সাথে তার কি মিল আছে? পড়ন্ত বেলায় আসরের সালাত আদায়ের কথা তো সহীহ হাদীসে নেই। আজও মাক্কা মুকাররামা ও মাদীনা মুনাওয়ারার কোন মাসজিদে ঐ পড়ন্ত বেলায় আসরে সালাত আদায় করা হয়না (প্রয়োজনে যারা হাজ্জ করেছেন তাদের জিজ্ঞেস করুন)। কুরআনে যেমন আসরের সালাতকে "সালাতুল উসতা" বলে তাকে হিফাযাত করার কথা বলা হয়েছে তেমনি হাদীসেও রাসূল (সাঃ) হতে এমন সময়ে আদায় করার কথা বলা হয়েছে যখন সূর্য অনেক উপরে থাকত এবং এর আলো উজ্জ্বল থাকত। এ সব দিকে কোনই দৃষ্টি দেয়া হচ্ছেনা কেন? ⊙ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সাথে নিয়ে জিবরাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহর নিকটে দু'বার সালাতের ইমামতি করে সালাত আদায়ের সময় নির্ধারণ করে দিয়েছেন। সেই সময় ছিল কোন বস্তুর ছায়া যখন

উহার সমান হতে দুই ছায়া পর্যন্ত হয়। [আবূ দাউদ/৩৯৩, নাসাঈ/৫০৫, ৫০৭, মুসলিম/১২৫৪]

মাগরিব সালাতের সময় ঃ

১। অতএব তোমরা আল্লাহর পবিত্রতা ও মহিমা ঘোষণা কর যখন তোমরা সন্ধ্যায় উপনীত হও আর সকালে, এবং অপরাহ্নে ও যুহরের সময়ে; আর আসমানসমূহে ও যমীনে প্রশংসা তো একমাত্র তাঁরই। [সূরা রূম-১৭-১৮]

২। তুমি সালাত প্রতিষ্ঠা কর দিনের দু' প্রান্ত সময়ে আর কিছুটা রাত অতিবাহিত হওয়ার পর, সৎকর্ম অসৎ কর্মকে দূর করে দেয়, যারা উপদেশ গ্রহণ করে এটা তাদের জন্য উপদেশ । [সূরা হুদ-১১৪]

৩। রাফি ইব্ন খাদীজ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করে এমন সময় ফিরে আসতাম যে, আমাদের কেহ (তীর নিক্ষেপ করলে) নিক্ষিপ্ত তীর পতিত হওয়ার স্থান দেখতে পেত। [বুখারী/৫৩০, ইব্ন মাজাহ/৬৮৭]

৪। সূর্য পর্দার আড়ালে ঢাকা পড়ে যাওয়ার সাথে সাথেই আমরা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে মাগরিবের সালাত আদায় করতাম। [বুখারী/৫৩২-সালামা (রাঃ)]

সূর্যাস্তের সাথে সাথে মাগরিবের সালাত আদায়ের কোন গরজ লক্ষ্য করা যায়না। সূর্য অস্ত যাবার পরও বেশ কিছু সময় আলো থাকে, তাই ৫/৬ মিনিট দেরী করে আযান দেয়া হয়। তারপর জামা'আত। আজ বিজ্ঞানের যুগ। সময়ের হিসাবে সেকেন্ডের হেরফের হবার উপায় নেই। অথচ মাগরিবে মুসল্লীদের সূর্য অস্ত যাবার পরও সন্দেহ দূর হয়না, সূর্য অস্তের ৫/৬ মিনিট পরও। দুর্ভাগ্য আর কাকে বলে? মাগরিবের সালাত সূর্য অস্ত গেলেই আদায় করা হত এবং সালাত শেষে সূর্যের আভা এমন স্পষ্ট থাকত যে, একজন তীরন্দাজ তীর নিক্ষেপ করলে তীর পতিত স্থানটি স্পষ্ট প্রত্যক্ষ করা যেত। এখন প্রশ্ন হল, এমন সময় সালাতুল মাগরিব আদায় করে সালাতকে হিফাযাত না করার কারণ কি?

ইশা সালাতের সময় ঃ

১। সূর্য হেলে পড়ার পর হতে রাতের ঘন অন্ধকার পর্যন্ত সালাত কায়েম করবে এবং কায়েম করবে ফাজরের কুরআন পাঠও। কারণ ভোরের কুরআন পাঠ সাক্ষী স্বরূপ। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৮]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত রাতের এক-তৃতীয়াংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে কোনরূপ দ্বিধা করতেননা। আবার বর্ণনাকারী বলেন ঃ রাতের অর্ধাংশ পর্যন্ত পিছিয়ে নিতে অসুবিধা বোধ করতেননা। [বুখারী/৫১২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ ইশার ওয়াক্ত রয়েছে মধ্য রাত পর্যন্ত। [মুসলিম/১২৬২]

৪। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি যদি আমার উম্মাতের পক্ষে কষ্টকর হবে বলে মনে না করতাম তাহলে ইশার সালাত বিলম্বে আদায় করার জন্য আদেশ করতাম। [নাসাঈ/৫৩৭, তিরমিযী/১৬৭]

◫ আমাদের সমাজের মাসজিদগুলিতে ইশার সালাত শুরু হয় সাধারণত মাগরিবের দেড় ঘন্টা থেকে দুই ঘন্টার একটু আগে বা পরে। এ ওয়াক্তের বেলায় বেশ তাড়াতাড়ি। পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায়ের এই তো হল বাস্তব চিত্র । এটা দীর্ঘকাল হতে চলে আসছে।

সালাতের আযান

১। আল্লাহ বলেন ঃ তোমরা যখন সালাতের জন্য আহ্বান কর তখন তারা একে হাসি-তামাশা ও ক্রীড়ার বস্তুরূপে গ্রহণ করে। এটা এ জন্য যে, তারা এমন এক সম্প্রদায় যাদের বোধশক্তি নেই। [সূরা মায়িদা-৫৮]

২। মুআযযিনের আযানের জবাবে যা বলতে হয় তা যদি কেহ বিশুদ্ধ অন্তরে এর জবাব দেয় সে জান্নাতে প্রবেশ করবে। [বুখারী/৫৮২-আবূ সাঈদ আল-খুদরী (রাঃ), ৫৮৩, মুসলিম/৭৩৪, নাসাঈ/৬৭৭]

৩। জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ) বলেন, আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ তোমরা যখন মুআয্যিনকে আযান দিতে শোন তখন মুআয্যিন যা বলে তোমরাও তা বলবে (আযানের জবাব দিবে) এবং এরপর আমার উপর দুরূদ পাঠ করবে। কেননা যে ব্যক্তি আমার উপর একবার দুরূদ পাঠ করে আল্লাহ দশবার তাঁর উপর রাহমাত প্রেরণ করেন। পরে আল্লাহর কাছে আমার জন্য ওয়াসীলার দু'আ করবে। অতএব যে ব্যক্তি আমার জন্য ওয়াসীলা চাইবে সে আমার সুপারিশের অধিকারী হবে।

<u>আযানের দু'আ ঃ</u>

"আল্লাহুম্মা রাব্বা হাযিহিদ দাওয়াতিত তাম্মাতি ওয়াস সালাতিল কাইয়িমাতি আতি মুহাম্মাদানিল্ ওয়াসীলাতা ওয়াল ফাযিলাতা ওয়াবআছহু মাকামাম মাহ্মুদানিল্লাযি ওয়াতত্তাহ।" [বুখারী/৫৮৫, মুসলিম/৭৩৩, ইব্ন মাজাহ/৭২২, নাসাঈ/৬৮৩, আবূ দাউদ/৫২৯, তিরমিযী/২১১]

৪। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা জুমু'আ-৯, বুখারী/৫৭৬, ৫৮০, ৬০৪, ৬২৩, মুসলিম/৭২২, নাসাঈ/৬৩১, ইব্ন মাজাহ/৭১৬, ৭২৩, তিরমিযী/২১২।

◫ (ক) মুসলিম হিসাবে আমরা আযানের জবাব ঠিক মত দিতে জানিনা এবং জানার চেষ্টাও করিনা। আযানের জবাব প্রত্যেক পুরুষ/মহিলাকে দিতে হবে।

(খ) আমাদের দেশের কিছু সংখ্যক মহিলারা রাস্তা-ঘাটে থাকা অবস্থায় আযান শুনলে মাথায় কাপড় দেয়, কিন্তু আযানের আগে বা পরে মাথায় কাপড় রাখেনা, যা সঠিক নয়।

(গ) আযান শুনলেও দুনিয়াবী লাভের জন্য আমাদের সমাজের লোকেরা সময়ের অভাবে মাসজিদে আসেনা। এমনকি সালাতও কায়েম করেনা।

ইকামাতের বাক্যগুলি একবার করে বলা

১। বিলালকে (রাঃ) আযানের শব্দ জোড় সংখ্যায় এবং ইকামাতের শব্দ বেজোড় সংখ্যায় বলার জন্য নির্দেশ দেয়া হয়েছিল। [বুখারী/৫৭৬, মুসলিম/৭২২, ইব্‌ন মাজাহ/৭৩০-আনাস (রাঃ)]

২। প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের জন্য ইকামাত দিতে হবে। [নাসাঈ/৬৬৬-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ]

৩। কাযা ফার্‌য সালাত আদায়ের সময়েও ইকামাত দিতে হবে। [তিরমিযী/১৭৯-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), নাসাঈ/৬৬৫]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন **ঃ যখন সালাতের ইকামাত হয়ে যায় তখন ফার্‌য সালাত ছাড়া অন্য কোন সালাত আদায় করা যাবেনা।** [বুখারী/৬২৮-বুহাইনা (রাঃ), মুসলিম/১৫১৪, তিরমিযী/৪২১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/১১৫১]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৫৯৪, ৬১২, ৬৯৩, ৮৮৫, মুসলিম/১৫১৪, ১৫২১, ১৫৬৪, আবূ দাউদ/৫০৯, ৫২৮, ইব্‌ন মাজাহ/১১৪০, ১১৬২, ১৩২২, তিরমিযী/৪১৫, ৪৩৩, নাসাঈ/ ৮৭৬

(ক) উপরোক্ত সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও ইকামাতের শব্দগুলি আমরা বেজোড় সংখ্যায় বলিনা।

(খ) একবার মাসজিদে জামা'আত হয়ে গেলে দ্বিতীয় জামা'আতের সময় ইকামাত দিইনা, যা সহীহ হাদীসের পরিপন্থী। কারণ প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের জন্য ইকামাত দিতে হবে। [নাসাঈ/৬৬৬]

(গ) তা ছাড়াও কাযা ফার্‌য সালাত আদায়ের সময়েও আমরা না জানার কারণে ইকামাত দিইনা। অর্থাৎ কাযা ফার্‌য সালাত আদায়ের সময়েও ইকামাত দিতে হবে।

(ঘ) একাকী বা জামা'আতে ফার্‌য সালাত আদায়ের সময় পুরুষ/মহিলাদেরকেও ইকামাত দিতে হবে। পুরুষরা শব্দ করে এবং মনীষীরা বলেছেন, মহিলারা শব্দ না করে ইকামাত দিবে।

(ঙ) ফার্‌য সালাতের ইকামাত হলে কোন সুন্নাত/নাফল সালাত আদায় করা যাবেনা। আমাদের দেশের লোকদের দেখা যায় যে হাদীস অমান্য করে ফাজরের সুন্নাত সালাত আদায় করে, যদিও ফাজরের সালাত শুরু হয়ে যায় বা চলতেও থাকে। কিন্তু এটা উচিত নয় । প্রয়োজনে ফাজরের ফার্‌য সালাত আদায় করার পর সুন্নাত সালাত আদায় করতে হবে। আর সময় না থাকলে সূর্যোদয়ের পরে তা আদায় করতে হবে । [তিরমিযী/৪২২, ৪২৩]

আযান ও ইকামাতের মধ্যবর্তী সময়ে সালাত

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক আযান ও ইকামাতের মধ্যে সালাত রয়েছে। এ কথা তিনি তিনবার বলেন। তারপর বলেনঃ তবে যে ইচ্ছা করে। [বুখারী/৫৯৪, ইব্‌ন মাজাহ/১১৬২]

২। রাত ও দিনের সালাত (সুন্নাত/নাফল) দুই দুই রাক'আত করে আদায় করতে হয়। [ইব্ন মাজাহ/১৩২২]
৩। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা মাগরিবের (ফার্যের) আগে (নাফল) সালাত আদায় করবে; (এ কথাটি তিনি তিনবার বললেন) তৃতীয়বার তিনি বললেন ঃ যার ইচ্ছা হয়। [বুখারী/১১০৭]
৪। যখন তোমাদের কেহ মাসজিদে প্রবেশ করে তখন দু' রাক'আত সালাত আদায়ের আগে বসবেনা। [বুখারী/৪৩১, মুসলিম/১৫২৪]
৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ মুসলিম/১৫২৫, ১৫৬৪, বুখারী/৬৯৩, ৮৮৫, তিরমিযী/৪১৫, ৪৩৩, ইব্ন মাজাহ/১১৪০।

(ক) উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমাদের দেশের লোকেরা মাগরিবের ফার্যের পূর্বে ২ (দুই) রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করেনা।
(খ) তা ছাড়াও সহীহ হাদীস অনুযায়ী যুহর, আসর ও ইশার ফার্য সালাতের পূর্বে ২ (দুই) রাক'আত সুন্নাত/নাফল সালাত আদায় করা যায়।

সালাতের কাতারবন্দী হওয়ার নিয়মাবলী

১। তোমরা সালাতের কাতার সোজা করে নিবে, কেননা কাতার সোজা করা সালাতের সৌন্দর্যের অন্তর্ভুক্ত। [বুখারী/৬৮৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৮৫৮, ৮৬০, ইব্ন মাজাহ/৯৯৩, আবূ দাউদ/৬৬৮]
২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা করে নাও। কেননা আমি আমার পিছনের দিক থেকেও তোমাদের দেখতে পাই। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত ঃ আমাদের প্রত্যেকেই তার পার্শ্ববর্তী ব্যক্তির কাঁধে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলাতাম। [বুখারী/৬৮৭-আনাস (রাঃ), বুখারী/৬৮২, আবূ দাউদ/৬৬২]
৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জামা'আতে সালাত শুরু করার সময় সমবেত ব্যক্তিদের নিকট উপস্থিত হয়ে তিনবার বলতেন ঃ তোমরা তোমাদের কাতার সোজা কর। আল্লাহর শপথ! তোমরা কাতার সোজা করে দন্ডায়মান হবে, অন্যথায় আল্লাহ তা'আলা তোমাদের মধ্যে মতানৈক্য সৃষ্টি করবেন। বর্ণনাকারী বলেন ঃ অতঃপর আমি সালাত আদায়কারীদেরকে পরস্পর কাঁধে কাঁধ, পায়ে পা এবং গোড়ালির সাথে গোড়ালি মিলিয়ে দাঁড়াতে দেখেছি। [আবূ দাউদ/৬৬২-নুমান ইব্ন বাশীর (রাঃ), নাসাঈ/৮১৬]
৪। আনাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা কাতারে পরস্পর মিশে দাঁড়াও। দুই কাতারের মাঝে কিছু ফাঁক রাখ এবং কাঁধে কাঁধ মিলিয়ে দাঁড়াও। যার হাতে মুহাম্মাদের জীবন তাঁর শপথ! আমি শাইতানকে দেখেছি ছোট ছোট বকরীর আকারে কাতারে প্রবেশ করছে। [নাসাঈ/৮১৮, আবূ দাউদ/৬৬৭]
৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৬৮০, ৬৮৫, ৬৮৯, ৬৯০, মুসলিম/৮৫১, ৮৫৫, ৮৬১, ৮৬৮, তিরমিযী/২২৪, ২২৭, ২৩০-২৩৪, ইব্ন

মাজাহ/৯৯৩, ৯৯৪, ১০০৩, নাসাঈ/৮০৪, ৮০৬, ৮১৪, ৮২২, ৮৪৩, ৮৪৪, আবূ দাউদ/৬৭৪।

বর্তমানে অধিকাংশ মাসজিদে জামা'আতের সাথে সালাত আদায়ের সময় মুসল্লীরা পায়ের গোড়ালীর সঙ্গে পার্শ্বের লোকেরা গোড়ালী এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে দাড়াননা । রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুক্তাদিগণকে সালাতে কাঁধের সাথে কাঁধ এবং পায়ের সাথে পা মিলিয়ে কাতার সোজা করে দাঁড়ানোর আদেশ দিয়েছেন, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত। কিন্তু সমাজের আলেমরা বলেন যে, সালাতে কাঁধ ও পায়ের সাথে পা মিলানো নেই; তবে নিজের দু'পায়ের মাঝে আট বা চার আঙ্গুল ফাঁক করে দাঁড়ানোর হুকুম আছে এবং ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুল দাঁড়ানোর স্থানে সব সময় একই জায়গায় চেপে রাখতে হবে, উঠানো বা সরানো যাবেনা। এগুলি শুধু তথা কথিত কথাবার্তা, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণীত নয়। জামা'আতে সালাত আদায়কারীদের উচিৎ হবে যার দেহের প্রস্থ যেমন তিনি তেমন তার কাঁধ বরাবর পা নিচে লম্বালম্বিভাবে দাঁড়াবেন এবং দেখবেন পায়ের আঙ্গুল সবগুলো কিবলামুখী করা সহজ হবে এবং অন্য মুক্তাদীর পায়ের সাথে পা এবং কাঁধের সঙ্গে কাঁধ মিলানো সহজ হবে এবং সহীহ হাদীস অনুযায়ী সালাত আদায় করা হবে। আল্লাহ আমাদেরকে সঠিকভাবে সালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন।

মাসজিদের স্তম্ভ (খুঁটিকে) জামা'আতের সালাতে কাতারের মাঝে রেখে কাতার করা প্রসঙ্গ

১। মু'আবিয়া ইব্ন কুতাইবা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যামানায় আমাদেরকে মাসজিদের ভিতর দুই খুঁটির (স্তম্ভের) মাঝখানে সারি বানাতে নিষেধ করা হত এবং এ থেকে আমাদের কঠোরভাবে বিরত রাখা হত। [ইব্ন মাজাহ/১০০২, তিরমিযী/২২৯, নাসাঈ/৮২৪]

উপরোক্ত হাদীসকে অমান্য করে অথবা না জানার কারণে মাসজিদের ভিতরে যেখানে পিলার বা খুটি থাকে সেখানে সালাতের কাতার করা হয় যা উচিত নয়। প্রয়োজনে পিলার বা স্তম্ভের সম্মুখে বা পিছনে কাতার করা উচিত। কারণ আল্লাহর দুনিয়া প্রশস্ত। তাছাড়াও অনেক মাসজিদে সালাতের কাতারের মাঝে লম্বালম্বিভাবে জুতার বাক্স রাখেন। তাতেও কাতারে মুক্তাদীদের মধ্যে ফাকা থাকে। বিধায় কাতারের মাঝে জুতার বাক্সও রাখা উচিত নয়।

মুখে উচ্চারণ করে নিয়াত পাঠ করা

১। প্রত্যেক কাজ নিয়াতের সাথে সম্পর্কিত । আর মানুষ তার নিয়াত অনুযায়ী ফল পাবে । [বুখারী/১-আলকামা ইব্ন ওয়াক্কাস আল লায়েসা (রাঃ)]

(ক) নিয়াত এর অর্থ মনের সংকল্প বা অন্তরে খেয়াল করা। কিন্তু মুখে আস্তে বা জোরে উচ্চারণ করা নয়। সালাত আদায় করার সময় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুখে নিয়াত (নাওয়ায় তুআন উসাল্লীয়া----) উচ্চারণ করেছেন বলে কোন প্রমাণ নেই।

(খ) কিন্তু আমাদের সমাজে প্রচলিত যে সকল নামায শিক্ষা বই পাওয়া যায় তাতে প্রত্যেক সালাতের (নামাযের) নিয়াত লেখা থাকে। অনেক মুসলিম ভাই উক্ত নিয়াত না জানার কারণে সালাত আদায় করেনা, আবার কেহ নিয়াত পাঠ করতে গিয়ে ইমামের রুকূতে যেতে যেতে সূরা ফাতিহা পাঠ ছুটে যায়, যা দুঃখ জনক।

সালাতের শুরুতে "ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু" পাঠ করা প্রসঙ্গ

১। জায়নামাযে দাড়িয়ে "ইন্নি ওয়াজ্জাহাতু .... মিনাল মুশরিকীন" পাঠ করতে হবে এরূপ কোন সহীহ হাদীস নেই।

☐ বর্তমানে আমাদের শহর/গ্রামের হাট-বাজারে, রাস্তা-ঘাটে, বাস-লঞ্চ টার্মিনালে, রেল স্টেশনে, বইয়ের লাইব্রেরীতে, হকার ও ফেরীওয়ালাদের নিকট যে নামায (সালাত) শিক্ষার বই পাওয়া যায় এগুলোই বেশির ভাগ মুসলিম লোকের একমাত্র ভরসা। মুসলিমরা কাজ/কর্মে সব সময় ব্যস্ত থাকে, বিধায় তারা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে সালাত (নামায) শিক্ষার সময় পাননা এবং জানার চেষ্টাও করেননা। ঐ দশ টাকা মূল্যের বই ফেরীওয়ালাদের নিকট হতে ক্রয় করে এবং তা থেকে শিক্ষা নিয়ে গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত নামায (সালাত) আদায়ে মশগুল হয়ে যায়। ঐ নামায শিক্ষা বইটি আদৌ কুরআন ও সঠিক হাদীস থেকে সংকলন করা কিনা তাও আমরা চিন্তা করিনা। এরূপ অন্যান্য ইবাদাত-বন্দেগীর ক্ষেত্রেও মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের জানার/জ্ঞানের দৌড় লক্ষ্য করা যায়। এ বিষয়ে প্রত্যেক মুসলিম পুরুষ ও মহিলাদের চিন্তা করা উচিত যে, তাদের পালনীয় প্রতিদিনের ইবাদাত-বন্দেগীগুলি কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী হচ্ছে কিনা। ⊙ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কথা ও আমলের পূর্বে ইলম (জ্ঞান) যরুরী । [বুখারী/পরিচ্ছদ-৫২]

সালাতের শুরুতে তাকবীর-তাহরীমা বলা সম্পর্কে

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে দুই হাতের আঙ্গুলসমূহ খাড়াভাবে কিবলামুখী করতেন এবং কাঁধ বরাবর উঠাতেন। [বুখারী/৬৯৭, ৬৯৮, ৭০০, মুসলিম/৭৪৫, ৭৪৬, ৭৪৭, তিরমিযী/২৫৫]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাত শুরু করার সময় প্রথম তাকবীরের সাথে সাথে দুই হাতের অঙ্গুলিসমূহ খাড়াভাবে কিবলামুখী করতেন এবং কান বরাবর উঠাতেন। [মুসলিম/৭৪৯-মালিক ইব্নুল হুওয়ায়রিছ (রাঃ), ৭৫০,৭৮০, আবূ দাউদ/৭২২, ৭৩০,৭৩১, নাসাঈ/৮৮২, ইব্ন মাজাহ/৮৫৯]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত আরম্ভ করতেন তখন তিনি তাঁর উভয় হাত উঠাতেন। তখন তাঁর বৃদ্ধাঙ্গুলীদ্বয় তাঁর দু' কানের নিম্নভাগ ছুঁই ছুঁই অবস্থা হত । [নাসাঈ/৮৮৫-ওয়াইল (রাঃ)]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন-[বুখারী/৬৯৬, ৭৫০, মুসলিম/৭৫২, নাসাঈ/৮৮৬, ৮৮৭, ১১৪৫, তিরমিযী/২৩৮, ২৩৯, ২৪০, ২৫৩, ২৫৪, ইব্‌ন মাজাহ/৮০৩।

(ক) আমরা সালাত আরম্ভের সময় তাকবীর তাহরীমা (প্রথম তাকবীর) দেয়ার জন্য হাত, হাতের তালু ও আঙ্গুলসমূহ ঠিকমত কিবলামুখী করিনা। কারণ আমরা জানিনা।

(খ) তা ছাড়াও লক্ষ্য করতে হবে হাতের আঙ্গুল কানের লতির উর্ধে যাবেনা বা কাঁধের নিম্নেও যাবেনা ।

(গ) আবার কেহ কেহ কানকে স্পর্শ করে, তাও ঠিক নয়।

সালাতে হাত বাঁধা প্রসঙ্গ

১। সাহল ইব্‌ন সাদ (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের তরফ থেকে লোকদের নির্দেশ দেয়া হত যে, সালাতে প্রত্যেকে ডান হাত বাম হাতের "যেরার"** উপর রাখবে। [বুখারী/৭০২]

**** "যেরা" অর্থ কনুই থেকে মধ্যমা আঙ্গুলের অগ্রভাগ পর্যন্ত দীর্ঘ হাত।**

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে ডান হাত বাম হাতের উপর রাখতেন। [মুসলিম/৭৮০]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন আমাদের ইমামাতি করতেন তখন ডান হাত দিয়ে তাঁর বাম হাত ধারণ করতেন। [তিরমিযী/২৫২, নাসাঈ/৮৯০]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতরত অবস্থায় ডান হাত বাম হাতের উপর স্থাপন করে তা নিজের বুকের উপরে রাখতেন। [আবূ দাউদ/৭৫৯]

আমাদের সমাজের অধিকাংশ পুরুষ নাভীর নীচে হাত বেঁধে সালাত আদায় করেন, কিন্তু মহিলাগণ বুকে হাত বেঁধে সালাত আদায় করেন। পুরুষরা কোন দলীলের অনুসরণ করে তা বোধগম্য নয়।

আবার কোন কোন আলেম বলেন ঃ নাফল সালাতে বুকের উপর হাত বাঁধা জায়েয, আর ফারয সালাতে হাত বাঁধা মাকরুহ, বরং উভয় হাত ছেড়ে দেয়া মুস্তাহাব। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ হাত বাঁধা সুন্নাত, আর বুকের নীচে ঠিক নাভীর উপরে বাঁধা মুস্তাহাব, নাভীর নীচেও বাঁধতে পারে, নাভীর উপরেও বাঁধতে পারে তবে নাভীর নীচে বাঁধাই শ্রেয়। কিন্তু এই কথাগুলোর কোন সহীহ হাদীস নেই। সমাজের কিছু সংর্খক আলেমগণ বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কোন সময় বুকে হাত বেঁধে সালাত আদায় করতেন, আবার কোন সময় নাভীর নীচেও হাত বেঁধে সালাত আদায় করতেন। তাহলে জিবরাঈলকে (আঃ) আল্লাহ তা'আলা বিভিন্ন সময় বিভিন্ন রকম করে সালাত শিক্ষা দেয়ার জন্য রাসূল (সাঃ) এর নিকট প্রেরণ করেছিলেন বলে কি আমরা বিশ্বাস করব? (নাউযুবিল্লাহি মিন যালিক) বিধায় উপরোক্ত সহীহ হাদীসের নির্দেশনা মোতাবেক সালাতে হাত বাঁধতে হবে।

[বিঃ দ্রঃ পরম পরিতাপের বিষয় বুখারী শরীফ ২য় খন্ড, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত, প্রকাশ কাল ফেব্রুয়ারী/১৯৯১, হাদীস নং-৭০২ এর অর্থের অনুবাদে 'যেরা' শব্দের অর্থ "কব্জি" করে কৌশলে নাভির নিচে হাত বাঁধার দলীল দেয়ার অপচেষ্টা করেছেন। হাদীস অনুবাদে এই ধৃষ্টতা প্রদর্শন করা কোন মুসলিমের কাম্য নয়]

সালাতে সানা পাঠ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর তাহরীমা ও কিরা'আতের মাঝে কিছুক্ষণ চুপ করে থাকতেন। এ সময় তিনি বলতেন ঃ আল্লাহুম্মা বা'ইদ বাইনী ওয়া বাইনা খাতাইয়া ইয়া কামা বা'আদতা বাইনাল মাশরিকি ওয়াল মাগরিবি। আল্লাহুম্মা নাককিনী মিনাল খাতাইয়া, কামা ইউনাককাছ ছাওবুল আবইয়াযু মিনাদ দানাসি। আল্লাহুম্মাগসিল খাতা ইয়া ইয়া বিলমায়ি ওয়াছ ছালজি ওয়াল বারাদি। [বুখারী/৭০৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/৮৯৮, মুসলিম/১২৩০, ইব্‌ন মাজাহ/৮০৫, আবূ দাউদ/৭৮১]

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন রাতে সালাতে দাঁড়াতেন তখন তাকবীরের পর বলতেন ঃ সুবহানাকা আল্লাহুম্মা ওয়া বিহামদিকা ওয়া তাবারা কাসমুকা ওয়া তা'আলা জাদ্দুকা ওয়া লা ইলাহা গাইরুকা। [তিরমিযী/২৪২,২৪৩-আয়িশা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৮০৪, ৮০৬, নাসাঈ/৯০২] ইমাম তিরমিযী (রঃ) বলেন ঃ এই হাদীস শুধু হারিছা ব্যতীত অন্য কোন সূত্রে পাইনি। কিন্তু হারিছার স্মৃতিশক্তি সম্পর্কে সন্দেহ ও সমালোচনা আছে বিধায় হাদীসটি দুর্বল।

(খ) যেহেতু ইমাম তিরমিযী (রহঃ) বলেছেন যে, উক্ত হাদীসটি দুর্বল। কিন্তু উহা জানা সত্ত্বেও আমাদের দেশের মুসলিম সমাজের অধিকাংশ লোকেরা কেবল এই সানাটি পাঠ করে এবং কোন কোন নামায শিক্ষা বইয়ে শুধু এই সানাটিই দেখা যায়। আর এ সানাটি পাঠ করা কতটুকু যুক্তিসংগত তা আল্লাহই ভাল জানেন।

"বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সূরা ফাতিহার অংশ কি?

১। ইসলামী বিশ্বের আরাব দেশসমূহে ও বিভিন্ন মহাদেশের প্রকাশিত/ছাপানো কুরআনুল কারীমে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সূরা ফাতিহার অংশ হিসাবে দেখা যায়, যা নিম্নে দেয়া হল ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [1]

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ [2] الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ [3] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [4] إِيَّاكَ نَعْبُدُ وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [5] اهدِنَا الصِّرَاطَ الْمُستَقِيمَ [6] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ [7]

উচ্চারণ ঃ (১) বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (২) আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল 'আলামীন (৩) আর রাহমানির রাহীম (৪) মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (৫) ইইয়াকা না'বুদু ওয়া ইইয়াকা নাস্তাঈন (৬) ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম (৭) সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম গাইরিল মাগযুবি 'আলাইহিম ওয়া লায্‌যাল্লীন (আমীন)।

অর্থ ঃ (১) পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) (২) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের রাব্ব (৩) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৪) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৫) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই কাছে সাহায্য প্রার্থনা করি (৬) তুমি আমাদেরকে সোজা-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন কর! (৭) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ ; তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। [(আমীন) তুমি কবূল কর]

শুধু ভারতীয় উপমহাদেশের প্রকাশিত/ছাপানো কুরআনুল কারীমে "বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম" সূরা ফাতিহার অংশ হিসাবে দেখা যায়না। যা নিম্নে দেয়া হল ঃ

بِسْمِ اللهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ للهِ رَبِّ الْعَالَمِيْنَ [1] الرَّحْمٰنِ الرَّحِيمِ [2] مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ [3] إِيَّاكَ نَعْبُدُ

وإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ [4] اهدِنَـــا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ [5] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ

[6] غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّيْنَ [7]

উচ্চারণ ঃ বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম। (১) আলহাম্‌দু লিল্লাহি রাব্বিল আ'লামীন (২) আর রাহমানির রাহীম (৩) মালিকি ইয়াওমিদ্দীন (৪) ইইয়াকা না'বুদু ওয়া ইইয়াকা নাস্তাঈন (৫) ইহ্‌দিনাস সিরাতাল মুস্তাকীম (৬) সিরাতাল্লাযীনা আন'আমতা 'আলাইহিম (৭) গাইরিল মাগযুবি 'আলাইহিম ওয়া লায্‌যাল্লীন (আমীন)।

অর্থ ঃ পরম করুণাময় ও অসীম দয়ালু আল্লাহর নামে (শুরু করছি) (১) যাবতীয় প্রশংসা আল্লাহর জন্য, যিনি জগতসমূহের রাব্ব (২) যিনি করুণাময় কৃপানিধান (৩) যিনি বিচার দিবসের মালিক (৪) আমরা একমাত্র তোমারই ইবাদাত করি এবং একমাত্র তোমারই সাহায্য প্রার্থনা করি (৫) তুমি আমাদেরকে সোজা-সুদৃঢ় পথ প্রদর্শন কর! (৬) এমন লোকদের পথ, যাঁদেরকে তুমি পুরস্কৃত করেছ (৭) তাদের পথ নয়, যারা অভিশপ্ত ও পথভ্রষ্ট হয়েছে। [(আমীন) তুমি কবূল কর]

- কুরআন হযরত মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের সংকলন। যখন কোন আয়াত অবতীর্ণ হত তখন মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম্ সঙ্গে সঙ্গে মুখস্থ করে নিতেন। অনেক সাহাবীও (রাঃ) সেটা মুখস্থ করতেন।

তারপরও মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম সে অংশগুলি নির্বাচিত কয়েকজন সাহাবী (রাঃ) এর তত্ত্বাবধানে বিভিন্নভাবে যেমন তাল পাতা, পাতলা জিনিসপত্র, পাথর, তরবারীর পাত ইত্যাদির উপর লেখাতেন। পরে বিভিন্নভাবে সেগুলি তিনি পরখ করতেন। যদিও তিনি পড়তে পারতেননা তবু একজনের লিখিত অংশ অন্যদের দিয়ে পড়িয়ে নিজে শোনতেন এবং বিভিন্নভাবে পরখ করে কুরআনের বিশুদ্ধতা সম্পূর্নভাবে নিশ্চিত করতেন। এ ক্ষেত্রে মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই কোন আয়াত কোন সূরার কোন আয়াতের পরে অবস্থান পাবে তাও তিনি বলে দিয়েছেন এবং সেভাবেই পবিত্র কুরআনের পরিপূর্ন, স্বয়ং সম্পূর্ণ পরিমার্জিত ও সুসাঞ্জস্য একটি সংলকন। যা মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজেই করে দিয়ে গেছেন। আমরা এখন যেভাবে কুরআন সাজানো ও ধারাবাহিকভাবে সূরায় সূরায় বিন্যস্ত পাই, এটা কোন সাহাবী (রাঃ) বা খুলাফায়ে রাশেদীনের মাধ্যমে নয় বরং মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের তত্ত্বাবধানে সমাপ্তি হয়েছে। কুরআনুল কারীমের প্রথম সূরা ফাতিহা হল সাতটি আয়াত সম্বলিত একটি সূরা। আর এ সূরার প্রথম আয়াত হল 'বিস্‌মিল্লাহির রাহমানির রাহীম'। কুরআনুল কারীম লিপিবদ্ধ হওয়ার শুরু থেকেই অদ্যবধি 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত হিসেবে লিখিত হয়ে আসছে। তাছাড়াও মহানাবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের ওফাতের পূর্ববর্তী রামাযানে তিনি দু'বার কুরআন খতম করেছেন এবং সাহাবী (রাঃ) তা শোনে আবার মিলিয়ে নেন।

কিন্তু ভারতীয় উপমহাদেশেই কুরআনুল কারীম প্রকাশিত/ছাপানোর ক্ষেত্রে সূরা ফাতিহার শুরুতে 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' পৃথক করে [1] الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ এ আয়াতকে প্রথম আয়াত করেছেন এবং শেষে [6] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ এরপরে কৃত্রিম ছয় নম্বর আয়াত সৃষ্টি করে সাত আয়াত পূর্ণ করেছেন। অথচ ইসলামী বিশ্বের আরাব দেশসমূহে ও বিভিন্ন মহাদেশের প্রকাশিত/ছাপানো কুরআনে তা নেই। সেথায় আছে [1] بِسْمِ الله الرَّحْمنِ الرَّحِيمِ সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত এবং [2] الْحَمْدُ لله رَبِّ الْعَالَمِينَ দ্বিতীয় আয়াত। শেষে صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ এরপর আর কোন আয়াত নম্বর নেই বরং [7] صِرَاطَ الَّذِينَ أَنعَمتَ عَلَيهِمْ غَيرِ المَغضُوبِ عَلَيهِمْ وَلاَ الضَّالِّينَ এরপুরো বাক্যটাই হলো সূরা ফাতিহার সাত নম্বর আয়াত।

এমতাবস্থায়, ইসলামী বিশ্বের আরাব দেশসমূহে ও বিভিন্ন মহাদেশের প্রকাশিত/ছাপানো কুরআনুল কারীমে সূরা ফাতিহার প্রথম আয়াত 'বিসমিল্লাহির রাহমানির রাহীম' দেখা যায়। বিধায় উক্ত নিয়ম মোতাবেক সূরা ফাতিহা পাঠ করা উচিত।

সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ প্রসঙ্গ

১। আল্লাহ বলেন ঃ

وَلَقَدْ آتَيْنَاكَ سَبْعًا مِّنَ الْمَثَانِي وَالْقُرْآنَ الْعَظِيمَ

আমি তো তোমাকে দিয়েছি সাত আয়াত (এর অর্থ সূরা ফাতিহার সাত আয়াত) যা পুনঃ পুনঃ আবৃত্তি করা হয় এবং দিয়েছি মহান কুরআন। [সূরা হিজর-৮৭]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতে সূরা ফাতিহা পাঠ করলনা তার সালাত হলনা। [বুখারী/৭১৮-উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ), তিরমিযী/২৪৭, মুসলিম/৭৫৮, ৭৫৯, ৭৬০, ৭৬৫, ইব্ন মাজাহ/৮৩৭, ৮৩৮, ৮৪০; ৮৪১, নাসাঈ/৯১৩]

৩। উবাদাহ ইব্নুস সামিত (রাঃ) বলেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাথে ফাজরের সালাতের জামা'আতে অংশ নিয়েছিলাম। সালাতে কুরআন পাঠের সময় তাঁর পাঠ তাঁর জন্য কঠিন হয়ে পড়ে। সালাত শেষে তিনি বলেন ঃ সম্ভবতঃ তোমরা ইমামের পিছনে কিরা'আত পাঠ করেছ। আমরা বলি ঃ হ্যাঁ, ইয়া রাসূলাল্লাহ ! তখন তিনি বলেন ঃ তোমরা সূরা ফাতিহা ব্যতীত অন্য কিছু পাঠ করবেনা। কেননা যে ব্যক্তি সূরা ফাতিহা পাঠ করবেনা, তার সালাত হবেনা। [আবূ দাউদ/৮২৩, নাসাঈ/৯২৩, তিরমিযী/৩১১]

৪। মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) অবস্থায় হোক কিংবা সফরে, সরব কিরা'আতের হোক কিংবা নীরবের, সকল সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী। [বুখারী/অনুচ্ছেদ-১৩৫]

৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে নির্দেশ দেন ঃ আমি যেন ঘোষণা করে দিই যে, সূরা ফাতিহা এবং তার সাথে আল কুরআনের কিছু অংশ (সূরা বা আয়াত) না মিলালে কিছুতেই সালাত শুদ্ধ হবেনা। [আবূ দাউদ/৮২০, ৮২২, নাসাঈ/৯১৪]

৬। এক ব্যক্তি আবূ হুরাইরাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করল ঃ আমি যদি সালাতে সূরা ফাতিহার চেয়ে বেশী পাঠ না করি তাহলে কি হবে? তিনি বললেন ঃ তুমি যদি সূরা ফাতিহা পাঠের পর কুরআনের কিছু আয়াত পাঠ কর তাহলে তা হবে উত্তম। আর যদি শুধু সূরা ফাতিহাই পাঠ কর তাহলে তা হবে তোমার জন্য যথেষ্ট। [মুসলিম/৭৬৭, ৭৬৮]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৪৩৩৩, মুসলিম/৭৬২, ৭৬৩, ৭৬৪, ৭৬৫, ৭৬৭, ৭৬৮, নাসাঈ/৯১২, ৯২৩, ৯২৭, ইব্ন মাজাহ/৮৩৮, আবূ দাউদ/৮১৯, ৮২০, ৮২১, ৮৩২।

◫ কেহ কেহ বলেন, অপ্রকাশ্য কিরা'আতের সালাতে মুক্তাদীদের সূরা ফাতিহা পাঠ করা ফারয। কিন্তু প্রকাশ্য কিরা'আতের সালাতে ফারয নয়। আবার কারও মতে সর্বাবস্থায় মুক্তাদীগণকে সূরা ফাতিহা ইমামের পাঠের ফাঁকে ফাঁকে মনে

মনে পাঠ করা ফার্‌য। আবার কারও কারও অভিমত, প্রকাশ্য বা অপ্রকাশ্য যে কোন সালাতেই ইমামের পিছনে মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ জায়িয নয়। এমতাবস্থায় কুরআন ও সহীহ হাদীসের নির্দেশনা অনুযায়ী মুকিম (স্থায়ী বাসিন্দা) অবস্থায় হোক কিংবা সফরে, সরব কিরা'আতের হোক কিংবা নীরবের, সকল সালাতেই ইমাম ও মুক্তাদীর সূরা ফাতিহা পাঠ করা জরুরী। [বুখারী/ অনুচ্ছেদ ১৩৫] নতুবা সালাত হবেনা।

ইমাম ও মুক্তাদীর উচ্চঃস্বরে আমীন বলা প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ (সালাতে) আমীন বলে, তখন আসমানের ফিরিশতারাও আমীন বলে এবং উভয়ের আমীন পরস্পর মিলিত হলে (অর্থাৎ তোমাদের ও ফিরিশতাদের আমীন বলা একই সময় উচ্চারিত হলে) তার (আমীন উচ্চারণকারীর) পূর্ববর্তী সকল পাপ ক্ষমা করে দেয়া হয়। [বুখারী/৭৪২-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৭৯৯, নাসাঈ/৯২৮, ৯৩৩, তিরমিযী/২৫০, ইব্‌ন মাজাহ/৮৫১, ৮৫২]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করে "আমীন" বলতেন এবং তা বলার সময় তাঁর স্বর উচ্চ করতেন। [নাসাঈ/৮৮২-ওয়ায়িল (রাঃ), আবূ দাউদ/৯৩৩, তিরমিযী/২৪৮]

৩। লোকেরা আমীন বলা ছেড়ে দিয়েছে। অথচ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন "গাইরিল মাগযূবি আলাইহিম ওয়ালায যাল্লীন" বলতেন তখন তিনি বলতেন, আমীন। এমনকি প্রথম সারির লোকেরা তা শুনতে পেত এবং এতে মাসজিদ গুঞ্জরিত হত। [ইব্‌ন মাজাহ/৮৫৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৪। ইয়াহুদীরা তোমাদের কোন ব্যাপারে এত ঈর্ষান্বিত (রাগ হওয়া) হয়না, যতটা না তারা তোমাদের সালাম ও আমীনের উপর ঈর্ষান্বিত হয়। [ইব্‌ন মাজাহ/৮৫৬, ৮৫৭-আয়িশা (রাঃ)]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/১৫১, ১৫৩, ৭৪১, ৭৪৩।

(ক) আমাদের সমাজে দেখা যায় যে, কিছু লোক উপরোক্ত সহীহ হাদীস অনুযায়ী জোরে আমীন বলে।

(খ) আবার কেহ কেহ আস্তে বলে। কেন আস্তে বলেন জিজ্ঞেস করলে কুরআন/হাদীসের কথা না বলে উত্তর দেন, আমাদের ইমাম সাহেব উচ্চস্বরে বলতে নিষেধ করেছেন অথবা আমাদের মাযহাব অনুযায়ী উচ্চস্বরে আমীন বলার নিয়ম নেই। এখন প্রশ্ন হচ্ছে, ইমাম/মাযহাব এর কথা শুনব, নাকি আল্লাহ ও রাসূলের (সাঃ) বিধান অনুযায়ী সালাত কায়েম করব? এর জবাব/উত্তরের ভার পাঠক সমাজের উপর রইল।

রুকূ, সাজদাহ অবশ্যই ঠিকমত করতে হবে

১। একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাসজিদে প্রবেশ করলেন, তখন একজন লোক এসে সালাত আদায় করল। অতঃপর সে নাবী সাল্লাল্লাহু

'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। তিনি সালামের জবাব দিয়ে **বললেন** ঃ আবার গিয়ে সালাত আদায় কর। কেননা তুমিতো সালাত আদায় করনি। সেই ব্যক্তি ফিরে গিয়ে আগের মত সালাত আদায় করল। তারপর এসে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাম করল। তিনি বললেন ঃ ফিরে গিয়ে আবার সালাত আদায় কর। কেননা তুমি সালাত আদায় করনি। এভাবে তিনবার বললেন । লোকটি বলল ঃ সেই মহান সত্তার শপথ, যিনি আপনাকে সত্যসহ প্রেরণ করেছেন। আমি তো এর চেয়ে সুন্দর করে সালাত আদায় করতে জানিনা। অতএব আপনি আমাকে শিখিয়ে দিন। তখন তিনি বললেন ঃ যখন তুমি সালাতের জন্য দাঁড়াবে তখন তাকবীর বলবে। তারপর সূরা ফাতিহা পাঠ শেষ করে কুরআন থেকে যা তোমার পক্ষে সহজ তা পাঠ করবে। এরপর রুকূতে যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে রুকূ করবে। তারপর উঠে সোজা হয়ে দাঁড়াবে। তারপর সাজদায় যাবে এবং ধীরস্থিরভাবে সাজদাহ করবে। তারপর সাজদাহ থেকে উঠে স্থির হয়ে বসবে। আর এভাবেই সালাত আদায় করবে। [বুখারী/৭১৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৭৬৯, তিরমিযী/৩০২, ইব্ন মাজাহ/১০৬০]

২। হুযাইফা (রাঃ) এক ব্যক্তিকে দেখলেন যে, সে রুকূ ও সাজদা ঠিকমত আদায় করছেনা । তিনি তাকে বললেন ঃ তোমার সালাত হয়নি। তুমি যদি (এই অবস্থায়) মারা যাও তাহলে আল্লাহ কর্তৃক মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে প্রদত্ত আদর্শ হতে বিচ্যুত অবস্থায় তুমি মারা যাবে। [বুখারী/৭৫২]

৩। সালাতে দাঁড়ানো ও বসা অবস্থা ছাড়া নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রুকূ, সাজদাহ এবং দু' সাজদাহর মধ্যবর্তী সময় এবং রুকূ থেকে উঠে দাঁড়ানো, এগুলি প্রায় সমপরিমাণ ছিল। [বুখারী/৭৫৩-বারা (রাঃ), তিরমিযী/২৭৯, মুসলিম/৯৩৯]

৪। এ বিষয়ে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা-শু'আরা-২১৮-২১৯, বুখারী/৭০৪, মুসলিম/৮৪১, ৯৫৬, তিরমিযী/২৬৫, নাসাঈ/১০৩০, ইব্ন মাজাহ/৮৭১।

⧉ উপরোক্ত সহীহ হাদীস অনুযায়ী আমরা সালাত আদায় করিনা। কারণ দুনিয়াবী নিজেদের কাজের স্বার্থে এবং সময়ের অভাবের অযুহাতে ফারয সালাতগুলি কায়েম এর জন্য ২৪ ঘন্টায় পাঁচ ওয়াক্ত সালাতের জন্য গড়ে কয়েক মিনিট করে সময় আমরা ব্যয় করিনা। সালাতের সময় হলেই আমরা খুবই তাড়াহুড়া করি এবং ঠিকমত রুকূ, সাজদাহ, সালাতে উঠা-বসা করিনা। এমতাবস্থায় তাড়াহুড়া করে সালাত আদায় করলে তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে আল্লাহই ভাল জানেন।

রুকূ করার নিয়ম

১। রুকূর সময় দু' হাত দিয়ে হাঁটুদ্বয়ে ভর দিতে হবে। [বুখারী/অনুঃ-১৫৮- আবূ হুমাইদ (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে যখন রুকূ করতেন তখন তাঁর হাতের তালু দ্বারা হাঁটু মাযবূতভাবে ধরতেন এবং হাতের আংগুলগুলি পরস্পর বিচ্ছিন্ন রাখতেন এবং এ সময় তিনি স্বীয় মাথা পিঠের সমান্তরালে রাখতেন। [আবূ দাউদ/৭৩০, ৭৩১-মুহাম্মাদ ইব্ন আমর আল-আমিরী)।

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ ইব্ন মাজাহ/৮৭২, ৮৭৪, তিরমিযী/২৬১, নাসাঈ/১০৪০।

◫ সালাতের সময় প্রায়ই লক্ষ্য করা যায়, আমরা উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী রুকূ করার জন্য ঠিকমত হাটুতে ভর দিইনা এবং ঠিকমত ধরিনা। তাছাড়াও মাথা ও পিঠ সমান্তরাল রাখার চেষ্টা করিনা।

সালাতের তাকবীরে তাহরীমা, রুকূ এবং রুকূ থেকে উঠার সময় উভয় হাত উঠানো (রাফ'উল ইয়াদাইন) প্রসঙ্গ

১। অতএব দুর্ভোগ সে সব সালাত আদায়কারীর যারা নিজেদের সালাতের ব্যাপারে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য তা করে। [সূরা মাউন-৪-৬]

২। শুধু আল্লাহর পক্ষ হতে পৌছানো এবং তাঁর বাণী প্রচার করাই আমার কাজ। যে কেহ আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে, তার জন্য আছে জাহান্নামের আগুন; তাতে তারা চিরকাল থাকবে। [সূরা জিন-২৩]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শুরু করতেন তখন উভয় হাত তাঁর কাঁধ বরাবর উঠাতেন। আর যখন রুকূতে যাওয়ার জন্য তাকবীর বলতেন এবং যখন রুকূ থেকে মাথা উঠাতেন তখনও অনুরূপভাবে দু' হাত উঠাতেন এবং "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন। কিন্তু সাজদাহর সময় এরূপ করতেননা। [বুখারী/৬৯৭, ৬৯৮, ৬৯৯,৭০০]

৪। ইব্ন উমার (রাঃ) যখন সালাত শুরু করতেন তখন তাকবীর বলতেন এবং দু' হাত উঠাতেন, আর যখন রুকূ করতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। এরপর যখন "সামি'আল্লাহু লিমান হামিদাহ" বলতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন এবং দু' রাক'আত শেষে (তৃতীয় রাক'আতের জন্য) যখন দাঁড়াতেন তখনও দু' হাত উঠাতেন। এ সমস্তই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে বর্ণিত বলে ইব্ন উমার (রাঃ) বলেছেন। [বুখারী/৭০১, নাসাঈ/১১৮৫, আবূ দাউদ/৭৪৩]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাতের জন্য দাঁড়াতেন তখন উভয় হাত উঠাতেন। এমনকি তা তাঁর উভয় কাঁধ বরাবর হয়ে যেত। তারপর তাকবীর বলতেন। পরে যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখনও অনুরূপ করতেন। আবার রুকূ থেকে যখন উঠতেন তখন অনুরূপ করতেন। কিন্তু সাজদাহ থেকে যখন মাথা তুলতেন তখন এরূপ করতেননা। [মুসলিম/৭৪৫-ইব্ন উমার (রাঃ), মুসলিম/৭৪৬,৭৪৮,৭৪৯,৭৮০]

৬। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ তিরমিযী/২৫০, ২৫৬, নাসাঈ/৮৭৯-৮৮৩, ইব্ন মাজাহ/৮৫৮-৮৬৮, আবূ দাউদ/৭২৫, ৭৩০, ৭৩১, ৭৩৮, ৭৪৩।

আমাদের সমাজের অনেক আলেম গল্পের মত বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রথম যুগে সালাতে "রাফ'উল ইয়াদাইন" করেছেন নও মুসলিমদের পুতুল ফেলে দেয়ার জন্য। কারণ তারা নাকি পুতুল বগলে করে সালাত আদায় করতে আসতেন। নও মুসলিমগণ নাকি পুতুলের মুহাব্বাত ছাড়তে পারেননি। তাই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের মধ্যে বার বার দু' হাত উঠাতেন যাতে মুক্তাদীগণের বগলের পুতুল পড়ে যায়। তারা অবশ্য দাবী করেন যে, পরে যখন মুসলিমদের ঈমান শক্ত হয়ে যায় তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আর হাত উঠাননি। না জেনে গল্পের ছলে এমন মিথ্যা বলার আশ্রয় নিয়ে তারা কেন সত্যকে প্রত্যাখ্যান করছেন? জীবিত অবস্থায় যারা জান্নাত লাভের সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন সেই খলিফা চতুষ্টয়সহ বিলাল (রাঃ) এবং আরও অনেক সাহাবী যারা পৌত্তলিকতার পূজা থেকে ফিরে আসার কারণে চরমতম শাস্তি ভোগ করেও আল্লাহর একাত্মবাদকে পরিত্যাগ করেননি, তাদের নামে পৌত্তলিকতার লালন পালনের উদ্দেশে বগলে পুতুল রাখার (সালাত আদায়ের সময়) যে অপবাদ দেয়া হচ্ছে সেই মিথ্যা অপবাদকারী একবারও ভেবে দেখেছে কি যে, আল্লাহর এসব মনোনীত বান্দার প্রতি অপবাদকারীর শাস্তি কি হতে পারে?

আলেমগণ আরও বলেন ঃ পরবর্তীতে "রাফ'উল ইয়াদাইন" বন্ধ হয়ে যায়। বন্ধ হলে বলুনতো, তারা এখন কোন্ পুতুল ফেলার জন্য "তাকবীরে তাহরীমার" সময় একবার এবং কেনই বা ঈদের সালাতে ছয়বার দুই হাত একেবারে কান পর্যন্ত উঠাচ্ছেন?

যে সাহাবীগণ (রাঃ) "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" কালেমা পাঠ করে মুসলিম হলেন তারা ভাল করেই বুঝেছিলেন "লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ" এর মর্মার্থ কি। ইবাদাত পাবার উপযুক্ত কেহ বা কোন কিছু নেই, একমাত্র আল্লাহ ছাড়া। বহু সাহাবী (রাঃ) পুতুল পরিত্যাগ করে মুসলিম হওয়ার কারণে কত অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করেছেন তা সবারই জানা। সেই সাহাবীগণের (রাঃ) চরিত্রে যদি দুর্বল ঈমানের অপবাদ দেয়া হয় যে, তারা পুতুলের মুহাব্বাত ছাড়তে পারলেননা যদিও তারা নিজ আত্মীয়স্বজন ও ধন দৌলতের মুহাব্বাত ছাড়তে পেরেছিলেন। এমন অপবাদ সাহাবীগণের (রাঃ) উপর আরোপ করা কাফিরদের অপেক্ষাও অধম ছাড়া আর কারো পক্ষে সম্ভব নয়।

তারপর জিবরাঈল (আঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে দুই দিন কাবা ঘরের নিকটে পাঁচ ওয়াক্ত সালাতে ইমামাতি করে সালাত আদায়ের সময় ও নিয়ম-কানূন শিক্ষা দিয়াছেন। যদি তিনি শুধুমাত্র তাকবীরে তাহরীমার সময়েই দু' হাত উঠানো শিখিয়ে থাকেন তাহলে পুতুল ফেলার জন্য যদি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে অতিরিক্ত আরও ৩ বার দু' হাত উঠান তাহলে আল্লাহর শিখানো সালাত রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এবং তাঁর সাহাবীগণের (রাঃ) সালাত এর মত হলনা, বরং সালাতকে ধ্বংস করলেন (নাউযুবিল্লাহ্)।

আর যদি বলেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) সালাতে ৪ বারই দু' হাত তোলার শিক্ষা দান করেন তাহলে পরবর্তীতে মাত্র একবার দু' হাত তুললে কি আর আল্লাহর দেয়া সালাত আদায় করা হবে?

সালাতে যে (রাফ'উল ইয়াদাইন এর সময়) দু'হাত তুলতে হয় তা দেখা যায় মাক্কা ও মাদীনায় সালাত আদায় করার সময়। আমাদের দেশের হাজ্জযাত্রীগণ নিশ্চয়ই মাক্কা ও মাদীনার ইমামগণের সালাতে "রাফ'উল ইয়াদাইন" করতে দেখেছেন। মুসলিম হতে হলে আমাদেরকে পড়তে ও বিশ্বাস করতে হবে যে, "ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, আল্লাহর ফিরিশতাদের উপর, আল্লাহর কিতাবসমূহের উপর এবং আল্লাহর রাসূলগণের উপর।" কই কোথাও তো বলা হলনা যে, ঈমান আনলাম কোন ইমামের উপর। আমরা সাক্ষ্য দেই যে ঈমান আনলাম আল্লাহর উপর, তাঁর ফিরিশতা, কিতাবসমূহ ও রাসূলুল্লাহর উপর; আর মানতে শুরু করলাম আমাদের তরীকার ইমামদেরকে। ঈমান ও আমলে কত বিরাট তফাৎ। শুধু মানতে হবে আল্লাহ ও রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে, অথচ মানছি ইমামকে, পীরকে, বিভিন্ন তরীকা প্রচলনকারীকে। তাহলে কি আমরা মুসলিম থাকলাম? আল্লাহর আদেশ না মেনে অন্যের আদেশ মানলে মুশরিক হওয়ার আর বাকী থাকলো কি? সালাত আদায় করার সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম "রাফ'উল ইয়াদাইন" করেননি বা করতে নিষেধ করেছেন এরূপ কোন একটিও সহীহ হাদীস পাওয়া যায়না। আল্লাহ আমাদেরকে নাবীর (সাঃ) সহীহ সুন্নাহ অনুযায়ী সালাত আদায় করার তাওফীক দান করুন।

সালাতে সাজদাহ করার নিয়মাবলী

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সালাত আদায় কর, যেমনভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ। [বুখারী/৬০১]

২। ইব্‌ন উমার (রাঃ) সাজদায় যাওয়ার সময় হাঁটু রাখার আগে হাত রাখতেন। [বুখারী/১৬৬]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাজদাহ করার সময় উটের ন্যায় বসবেনা এবং সাজদায় যেতে মাটিতে হাঁটু রাখার পূর্বে হাত রাখবে। [আবূ দাউদ/৮৪০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/১০৯৪]

৪। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি সাতটি অঙ্গের দ্বারা সাজদাহ করার জন্য আদিষ্ট হয়েছি। কপাল দ্বারা (তিনি হাত দিয়ে নাকের প্রতি ইশারা করেন) দু' হাত, দু' হাঁটু এবং দু' পায়ের আঙ্গুলসমূহ দ্বারা । [বুখারী/৭৭২-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুসলিম/৯৭৮, তিরমিযী/২৭২, নাসাঈ/১০৯৭]

৫। সাজদাহর অংগসমূহ ঠিকভাবে রাখতে হবে, যথা ঃ দু' হাতের তালু মাটিতে রাখা, দুই কনুই পাঁজর থেকে ও পেট উরু থেকে পৃথক রাখতে হবে। [মুসলিম/অনুচ্ছেদ-৪৪]

৬। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাজদাহর সময় তাঁর নাক ও কপালকে মাটিতে স্থির করে স্থাপন করতেন এবং দু' হাতের তালু কানের কাছাকাছি রাখতেন। [তিরমিযী/২৭১-আবূ ইসহাক (রাঃ)]

৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সাজদাহর সময় মধ্যম পন্থা অবলম্বন করবে। আর তোমাদের কেহ যেন কুকুরের ন্যায় তার দু' হাত মাটিতে বিছিয়ে দিয়ে সাজদাহ না করে। [বুখারী/৫০৫-আনাস (রাঃ), তিরমিযী/ ২৭৫, নাসাঈ/১০৩১, ইব্‌ন মাজাহ/৮৯২]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তুমি সাজদাহ করবে তখন তোমার দুই হাতের তালু (ভূমিতে) রাখবে এবং দুই কনুই (ভূমি থেকে) উঠিয়ে রাখবে। [মুসলিম/৯৮৫-বারা (রাঃ)]

৯। সালাতরত অবস্থায় সাজদাহর স্থান থেকে মাটি সমান করা বা কংকর সরানোর একান্তই প্রয়োজন হলে তা একবার করা যাবে। [বুখারী/১১২৯-মু' আয়েকীব (রাঃ)]

১০। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে সাজদাহর সময় দু'বাহু প্রসারিত করে পাঁজর থেকে পৃথক রাখতেন এবং তাঁর উভয় বগলের শুভ্রতা প্রকাশ হয়ে পড়ত। [বুখারী/৭৬৭-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক ইব্‌ন বুহাইনা (রাঃ)]

১১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সাজদাহ করতেন তখন তিনি তাঁর হস্তদ্বয়কে এত দূরে রাখতেন যে, কোন বকরীর বাচ্চা ইচ্ছা করলে বুকের নীচ দিয়ে চলে যেতে পারত। [মুসলিম/৯৮৮-মাইমুনা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/৮৮০, আবূ দাউদ/৮৯৮, নাসাঈ/১১১২]

১২। রুগ্ন ব্যক্তি (রোগী) সাজদাহ করতে না পারলে মাথা দ্বারা শুধু ইশারা করবে। আর কপালের দিকে কোন বস্তু উঁচু করে রাখবেনা। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)- ১ম খন্ড ২২৬ পাতা]

১৩। এ বিষয়ে কুরআনের আয়াত ও অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা বাকারা-৩৪, নাহল-৪৮, ৪৯, হা-মীম আস্-সাজদাহ-৩৭, নাজম-৬২, রাদ-১৫, বুখারী/৭৬৬, ১০১৩, মুসলিম/৭৮০, ৯৬৫, ৯৭৫, নাসাঈ/১১০৫, ১১৪০, ১১৪৩, ১০৪৮, তিরমিযী/৬০৭, ইব্‌ন মাজাহ/১৪২৩।

(ক) উপরোক্ত হাদীস অমান্য করে আমরা সাজদায় যাওয়ার সময় মাটিতে আগে হাটু তারপর হাত রাখি।

(খ) সাজদায় নাক অবশ্যই মাটিতে স্থির থাকবে যেমন কপাল মাটিতে স্থির থাকে। অনেকেই নাক মাটিতে স্থির রাখেননা যা ঠিক নয়।

(গ) তাছাড়াও সাজদাহ থেকে উঠার সময় নাক আগে নাকি কপাল আগে উঠাতে হয় তা নিয়ে তর্ক-বিতর্ক করা উচিত নয়।

(ঘ) সাজদাহর সময় অবশ্যই দুই হাতের তালু কানের কাছাকাছি রাখতে হবে, দুই হাতের কনুই ভূমি থেকে উপরে রাখতে হবে। আমাদের সমাজের মহিলারা হাতের কনুই ভূমিতে বিছিয়ে রাখেন যা উচিত নয়।

(ঙ) মহিলাদের জন্য রুকূ/সাজদাহর নিয়ম আলাদা আছে বলে বর্তমান আলেম সমাজ যে প্রচার করেন তা কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে তারা কখনও দেখাতে সক্ষম হবেনা। এটা তাদের বানানো মতবাদ।

(চ) সালাত আদায়ের সময় ডান পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী এক জায়গায় স্থির থাকবে বলে ফাতওয়া দেয়া হয়। তা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়।

(ছ) সাজদাহর সময় আমরা কেবল দুই পায়ের বৃদ্ধাঙ্গুলী মাটির সহিত স্পর্শ করি। কিন্তু নিয়ম হচ্ছে প্রতিটি পায়ের আঙ্গুলী ভুমির সঙ্গে স্পর্শ করে সাজদাহ করার চেষ্টা করতে হবে।

(জ) রুগ্ন ব্যক্তি সাজদাহ করতে না পারলে ইশারায় সাজদাহ দিতে হবে। কিন্তু বর্তমান সমাজে কোন কোন মাসজিদে/বাসায় দেখা যায় যে, রুগ্ন লোকেরা সাজদাহর জন্য উচু টেবিলে/উঁচু বস্তুর উপর সাজদাহর জায়গার ব্যবস্থা করেন, যা করা উচিত নয়।

সাজদাহ্ করা সম্বন্ধে কুরআনের আদেশ বনাম আমাদের সাজদাহ্

ক) আল্লাহ্র নির্দেশেই কেবল সাজদাহ্ করতে হবে।

১। আর তোমার রবের 'ইবাদাত করতে থাক সুনিশ্চিত ক্ষণের (অর্থাৎ মৃত্যুর) আগমন পর্যন্ত। [সূরা হিজর-৯৯]

২। হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সাজদাহ কর আর তোমাদের রবের 'ইবাদাত কর ও সৎকাজ কর যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। [সূরা হাজ্জ-৭৭]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হিজর-৯৮, আলাক-১৯, নাজম-৬২।

খ) আল্লাহ্কে সাজদাহ্ করে মানুষ ছাড়া অন্যান্যরাও

১। আকাশ ও পৃথিবীতে যা কিছু আছে আর জীব-জন্তু ও ফিরিশতা, সমস্তই আল্লাহকে সাজদাহ করে; তারা অহংকার করেনা। [সূরা নাহল-৪৯]

২। তুমি কি দেখনা যে, আল্লাহকে সাজদাহ করে যারা আকাশে আছে, আর যারা পৃথিবীতে আছে আর সূর্য, চন্দ্র, তারকারাজি, পর্বতসমূহ, বৃক্ষরাজি, জীবজন্তু এবং মানুষের মধ্যে অনেকে? আর অনেকের প্রতি শাস্তি সাব্যস্ত হয়ে গেছে। আল্লাহ যাকে লাঞ্ছিত করতে চান তাকে সম্মানিত করার কেহ নেই। আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তাই করেন। [সূরা হাজ্জ-১৮]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নূর-৪১, ফুসসিলাত-৩০, শু'আরা-৫, নাহল-২।

গ) আল্লাহ্কে সাজদাহ্ করে তৃণলতা ও বৃক্ষরাজির ছায়াগুলোও

১। তৃণলতা গাছপালা (তাঁরই জন্য) সাজদায় অবনত। [সূরা রাহমান- ৬]

২। আসমানে আর যমীনে যা কিছু আছে ইচ্ছায় বা অনিচ্ছায় সকাল-সন্ধ্যায় আল্লাহর প্রতি সাজদায় অবনত হয় আর তাদের ছায়াগুলোও। [সূরা রাদ- ১৫]

৩। তারা কি আল্লাহর সৃষ্টি করা জিনিসের দিকে লক্ষ্য করেনা, যার ছায়া আল্লাহর প্রতি সাজদাহ অবস্থায় ডানে-বামে পতিত হয়, আর তারা বিনয় প্রকাশ করে? [সূরা নাহল-৪৮]

৪। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মুলক-৪, ৫।

ঘ) দুনিয়ায় সাজদাহ্ অস্বীকারকারীরা আখিরাতে সাজদাহ্ করতে পারবেনা

১। স্মরণ কর, গোছা পর্যন্ত পা খোলার দিনের কথা, সেদিন তাদেরকে আহ্বান করা হবে সাজদাহ করার জন্য, কিন্তু তারা তা করতে সক্ষম হবেনা। তাদের দৃষ্টি

অবনত, হীনতা তাদেরকে আচ্ছন্ন করবে, অথচ যখন তারা নিরাপদ ছিল তখনতো তাদেরকে আহ্বান করা হয়েছিল সাজদাহ করতে। যারা আমাকে এবং এই বাণীকে প্রত্যাখ্যান করে তাদেরকে ছেড়ে দাও আমার হাতে, আমি তাদেরকে এমনভাবে ক্রমে ক্রমে ধরব যে, তারা জানতে পারবেনা। আর আমি তাদেরকে সময় দিয়ে থাকি, আমার কৌশল অত্যন্ত বলিষ্ঠ। [সূরা কালাম-৪২-৪৫]

ঙ) রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহ্ করার আদেশ

১। যে ব্যক্তি রাতের বিভিন্ন সময়ে সাজদাহবনত হয়ে ও দাঁড়িয়ে আনুগত্য প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে এবং তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে সে কি তার সমান যে তা করেনা? বল ঃ যারা জানে এবং যারা জানেনা তারা কি সমান? বোধশক্তি সম্পন্ন লোকেরাই শুধু উপদেশ গ্রহণ করে। [সূরা যুমার-৯]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ দাহর-২৬, ফুরকান-৬৩-৬৫।

চ) আহলে কিতাবীদের সাজদাহ

১। তারা সকলে সমান নয়; আহলে কিতাবের মধ্যে কিছু লোক রয়েছে যারা গভীর রাত পর্যন্ত আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং সাজদাহ করে। [সূরা আলে ইমরান-১১৩]

২। এ বিষয়ে অন্য সূরার আয়াত দেখুন ঃ ইসরা-১০৭।

ছ) জিবরাঈল (আঃ) রাসূল (সাঃ) এর নিকট সাজদাহর হুকুম শোনালেন

১। তাদেরকে যখন বলা হয় 'রাহমান'-এর উদ্দেশে সাজদায় অবনত হও, তারা বলেঃ 'রাহমান আবার কী? আমাদেরকে তুমি যাকেই সাজদাহ্ করতে বলবে আমরা তাকেই সাজদাহ করব নাকি?' এতে তাদের অবাধ্যতাই বেড়ে যায়। [সূরা ফুরকান- ৬০]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আলাক-১-৫, ইনশিকাক-২১- ২২।

জ) আল্লাহ্ সমস্ত আম্বিয়া কিরামকে (আঃ) সাজদাহর আদেশ দেন

১। আর স্মরণ কর, যখন আমি ইবরাহীমের জন্য নির্ধারণ করে দিয়েছিলাম সেই গৃহের স্থান তখন বলেছিলাম ঃ আমার সাথে কোন শরীক স্থির করনা এবং আমার গৃহকে পবিত্র রেখ তাদের জন্য যারা তাওয়াফ করে এবং যারা দন্ডায়মান থাকে, রুকূ করে ও সাজদাহ করে। [সূরা হাজ্জ-২৬]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ মারইয়াম-৫৮, বাকারা-১২৫, আলে ইমরান-৪৩, ইউসুফ-৪ ।

ঝ) বাণী ইসরাইলীদের প্রতি সাজদাহর আদেশ

১। স্মরণ কর, যখন আমি বললাম ঃ এ জনপদে প্রবেশ কর, সেখানে যা ইচ্ছা স্বাচ্ছন্দে আহার কর, দ্বার দিয়ে নতশিরে প্রবেশ কর এবং বল, 'ক্ষমা চাই' আমি তোমাদের অপরাধ ক্ষমা করব এবং সৎকর্মশীলদের প্রতি আমার দান বৃদ্ধি করব। [সূরা বাকারা-৫৮]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-১৬১, নিসা-১৫৪।

ঞ) আল্লাহর প্রতি ফিরাউনের যাদুকরদের সাজদাহ

১। যাদুকরেরা সাজদায় লুটিয়ে পড়ল। তারা বলল, 'আমরা বিশ্বজগতের রবের প্রতি ঈমান আনলাম, মূসা আর হারূনের রবের প্রতি। [সূরা আ'রাফ-১২০-১২২]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ তাহা-৭০, শু'আরা-৪৬-৪৮, ইউনুস-৯০।

ট) আদমকে (আঃ) সাজদাহ্ করার জন্য সমস্ত ফিরিশতাদের প্রতি হুকুম দেন

১। যখন আমি ফিরিশতাদেরকে বললাম ঃ আদমকে সাজদাহ কর, তখন ইবলীস ছাড়া সকলেই সাজদাহ করল, সে অমান্য করল ও অহংকার করল, অতএব সে কাফিরদের অন্তর্ভুক্ত হয়ে গেল। [সূরা বাকারা-৩৪]

২। আমি তো তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছি, অতঃপর তোমাদের আকৃতি দিয়েছি, অতঃপর ফিরিশতাদের নির্দেশ দিলাম আদমকে সাজদাহ করার জন্য। তারা সাজদাহ করল, ইবলীস ছাড়া। সে সাজদাহকারীদের অন্তর্ভুক্ত হলনা। [সূরা আরাফ-১১]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আ'রাফ-১২, কাহফ-৫০, হিজর-২৯-৪০, বানী ইসরাইল-৬১-৬৫, তাহা-১১৬-১২৩, সাদ-৭১-৮৩।

ঠ) রাসূলের (সাঃ) উম্মাতের প্রতি সাজদাহ্ করার নির্দেশ

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা রুকূ কর, সাজদাহ কর আর তোমাদের রবের 'ইবাদাত কর ও সৎকাজ কর যাতে তোমরা সাফল্য লাভ করতে পার। [সূরা হাজ্জ-৭৭]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাজদা-১৫, ফাত্হ-২৯।

ড) আল্লাহ্ ছাড়া অন্য কেহকে সাজদাহ্ করা যাবেনা

১। তোমরা সূর্যকে সাজদাহ করনা, চন্দ্রকেও নয়; সাজদাহ কর আল্লাহকে, যিনি এগুলো সৃষ্টি করেছেন, যদি তোমরা তাঁরই ইবাদাত কর। [হা মীম-আস-সাজদাহ-৩৭]

২। এ বিষয়ে দেখুন ঃ সূরা নামল-২৩-২৫।

ঢ) আল্লাহ্ সাজদাহ্কারীদের প্রতি বিশেষ নজর রাখেন

১। যিনি তোমাকে দেখেন যখন তুমি (সালাতের জন্য) দন্ডায়মান হও। আর (তিনি দেখেন) সাজদাকারীদের সঙ্গে তোমার উঠা-বসা। তিনি সব কিছু শোনেন, সব কিছু জানেন। [সূরা শুআরা-২১৮-২২০]

◻ চন্দ্র, সূর্য, গ্রহ, নক্ষত্র, আকাশ, পৃথিবী এবং তাতে যা কিছু আছে তার স্রষ্টা একমাত্র আল্লাহ। তাই আল্লাহ ছাড়া ঐ সব সৃষ্ট বস্তুকে আদৌ সাজদাহ করা যাবেনা। জন্মস্থানকে মাতৃভূমি বলা হয়। তার প্রতি ভালবাসা ও টান সবার আছে। তবুও সেই মাতৃভূমিকেও মা বলে মাথা ঠুকালে চলবেনা। এর অর্থ হল- মাতৃভূমি যেমন মা নয়, তেমনি মাকেও সাজদাহ করা যাবেনা এবং ভূমিকেও সাজদাহ করা যাবেনা। মহানবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যদি আল্লাহ ভিন্ন আর কেহকে সাজদাহ্ করার অধিকার থাকত তাহলে স্ত্রী তার স্বামীকে সাজদাহর অধিকার পেত। পিতা অপেক্ষা মাতার হক তিনগুণ বেশী। সন্তানের জন্য তবুও মাতা বা পিতাকে সাজদাহ করার হুকুম নেই শারীয়াতে। যারা কদমবুচি বা যমীনবুচি করে এগুলি সবই শির্ক। পীর পন্থীরা তো কেহ কেহ সাজদাহকে জায়েয করেছে সম্মান/শ্রদ্ধার সাজদাহ রূপে। তাই মুর্শিদ, পীর, জিন্দা, মুর্দা সবাইকে সাজদাহর প্রথা বহাল রেখেছে মুরিদদের জন্য।

সমাজের গণ্যমান্য লোকেরা মহান সেনাপতি ও মুবাল্লিগে দীন শাহজালাল (রহঃ) এর মাযারে আর বাইজীদ বোস্তামী (রহঃ) এর কল্পিত মাযারে যথাক্রমে সিলেট ও চট্টগ্রামে কাবরে সাজদাহ এবং পদচুম্বন করে। আল্লাহ ব্যতীত আর কেহকে সাজদাহ করা যাবেনা। ⊙মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্পষ্ট বলেছেন ঃ এমনভাবে সালাত আদায় কর যেন তুমি প্রভুকে দেখছ অথবা তিনি তোমাকে দেখছেন। আর কুকুর, শৃগাল এবং মোরগের ন্যায় সালাত আদায় করবেনা। [বুখারী/৪৮, ৫০৫]। ⊙ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ তোমরা আমাকে যেভাবে সালাত আদায় করতে দেখছ সেইভাবে সালাত আদায় কর। [বুখারী/৬০১]

⊙ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরও বলেছেন ঃ কথা ও আমলের পূর্বে ইল্‌ম (জ্ঞান) জরুরী ।[বুখারী/পরিচ্ছদ-৫২]

সালাতে বেজোড় রাক'আতে সাজদাহ শেষে দাঁড়ানোর পূর্বে বসা প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে যখন বেজোড় রাক'আতের সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন তখন একটু বসতেন। তারপর মাটিতে ভর দিয়ে দাঁড়াতেন। [বুখারী/৭৮৩-আবূ কিলাবা (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন প্রথম রাক'আতের দ্বিতীয় সাজদাহ থেকে মাথা উঠাতেন তখন সোজা হয়ে বসতেন। তারপর মাটিতে ঠেক (ভর দিয়ে) দিয়ে দাঁড়াতেন। [নাসাঈ/১১৫৬-আবূ কিলাবা (রাঃ)]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতের বেজোড় রাক'আতে (সাজদাহ থেকে) উঠে একটু না বসে দাঁড়াতেননা। [বুখারী/৭৮২-মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস আল-লাইসী (রাঃ), আবূ দাউদ/৮৪৩, নাসাঈ/১১৫৫]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বেজোড় রাক'আতের সাজদাহ থেকে উঠতেন তখন সোজা হয়ে না বসে উঠতেননা। [তিরমিযী/২৮৭-মালিক ইব্‌ন হুয়াইরিস আল-লাইসী (রাঃ), বুখারী/৬৪১]

◫ (ক) আমরা যারা সালাত আদায়কারী (নামাযী) তাদের মধ্যে বৃদ্ধ লোক ছাড়া উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক কেহই দু' হাত মাটিতে ভর দিয়ে উঠার চেষ্টা করেনা।

(খ) কারোও উঠতে কষ্ট বোধ হলেও হাত মাটিতে ভর না দিয়ে, কসরত করে উঠর চেষ্টা করেন।

(গ) আবার কেহ কেহ মনে করেন যে, মাটিতে ভর দিয়ে উঠা ঠিক নয়, তাহলে সালাত নষ্ট হয়ে যাবে।

(ঘ) এমতাবস্থায় উপরোক্ত হাদীস অমান্য করে সালাত আদায় করলে আল্লাহর নিকট তা কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে?

সালাতের মধ্যে ইমামের পূর্বে রুকূ, সাজদাহ ও সালাম ফিরানো প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি তোমাদের ইমাম। সুতরাং রুকূ, সাজদাহ, কিয়াম (সালাতে দাঁড়ানো) ও সালাম ফিরানোর ক্ষেত্রে আমার হতে আগে করনা। [মুসলিম/৮৪৪-আনাস (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন ইমামের আগে মাথা উঠিয়ে ফেলে তখন সে কি ভয় করেনা যে, আল্লাহ তা'আলা তার মাথা গাধার মাথার ন্যায় করে দিবেন, কিংবা তার আকৃতি গাধার আকৃতি করে দিবেন। [বুখারী/৬৫৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/৮৪৭, তিরমিযী/৫৮২, নাসাঈ/৮৩১, ইবন মাজাহ/৯৬১]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৬৫৪, ১১৫৯, তিরমিযী/২৮১।

(ক) আমরা যারা জামা'আতে সালাত কায়েম করি তাদেরকে প্রায় সময়ই দেখা যায় যে, মুক্তাদী হয়েও ইমামের পূর্বেই রুকূতে যায়, সাজদাহ থেকে মাথা উঠায় ও আগেই সালাম ফিরিয়ে থাকে যা অতীব দুঃখজনক। ইমামের পূর্বে কখনও এরূপ করা যাবেনা। ইমামের অনুসরণ তথা সালাতের প্রত্যেক কাজ তার পর পর করতে হবে।

(খ) ইমামের আগে বেড়ে কোন কাজ করা সম্পূর্ণভাবে নিষেধ। ইমামের পর পর দেরী না করে তার অনুসরণ করতে হবে। এটাই হচ্ছে সুন্নাত পদ্ধতি।

সালাতে শেষ বৈঠকে বসা

১। আর সে মনগড়া কথাও বলেনা। তাতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নাজম-৩-৪]

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম চার অথবা তিন রাক'আত বিশিষ্ট সালাতে যখন দু' রাক'আতের পর বসতেন তখন বাঁম পায়ের উপর বসে ডান পা খাড়া করে রাখতেন এবং যখন শেষ রাক'আতে বসতেন তখন বাঁম পা এলিয়ে দিয়ে ডান পা খাড়া করে নিতম্বের (পাছার) উপর বসতেন। [বুখারী/৭৮৭, আবূ দাউদ/৯৬৩, ৯৬৪, ৯৬৫]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৭৮৬, মুসলিম/৯৯১, ১১৮৩, নাসাঈ/১১৬০, ১২৬৫।

(ক) আমরা উপরোক্ত হাদীসকে অমান্য করে চার/তিন রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের দ্বিতীয় রাক'আতের পর যেভাবে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় বসি একই ভাবে শেষ রাক'আতেও বসি যা সহীহ হাদীস মোতাবেক হয়না।

(খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সালাতে শেষ বৈঠকে বাম পা ডান পায়ের (নলার) নিচ দিয়ে ডান দিকে বাড়িয়ে দিতেন এবং নিতম্বের (পাছার) উপর বসতেন। [আবূ দাউদ/৭৩০, নাসাঈ/১২৬৫]

(গ) আমাদের সমাজের পুরুষেরা সালাতের শেষ বৈঠকে যমীনে বাম পাছার উপর বসেননা, কিন্তু মহিলাগণ বাম পা ডান পায়ের নীচ দিকে বিছিয়ে দিয়ে বাম পাছার উপর বসেন। পুরুষ ও মহিলাদের জন্য দু'রকম নিয়ম কি করে হল? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তো দু'নিয়মে সালাত আদায় করতে বলেননি। কারণ মহান আল্লাহর আদেশে জিবরাঈল (আঃ) নিজে ইমামাতি করে দুই দিন (প্রথম দিন আউয়াল ওয়াক্তে এবং দ্বিতীয় দিন শেষ ওয়াক্তে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে পাঁচ ওয়াক্ত সালাত আদায় করার পদ্ধতি শিখিয়েছেন। আল্লাহ তা'আলার আদেশ, রীতি-নীতি

পরিবর্তনশীল নয়। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামও নিজের ইচ্ছামত কোন কিছু করতে, বলতে বা অনুমতি দিতে পারতেননা। কেহ যদি বিশ্বাস করেন বা বলেন যে, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এটাও করতেন ওটাও করতেন, তাহলে ইসলামী শারীয়াত কি তার ইচ্ছাধীন? তা কিন্তু নয়, অর্থাৎ তা তিনি করেননি। মানুষ নিজেরাই পরিবর্তন করে নিয়েছে, যা আকীদাগত পার্থক্য।

সালাতে আত্তাহিয়্যাতু পড়ার সময় আঙ্গুল নাড়ানো প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাশাহ্হুদ (আত্তাহিয়্যাতু) পাঠ করার জন্য বসতেন তখন তাঁর বাম হাত বাম উরুর উপর এবং ডান হাত ডান উরুর উপর রাখতেন। আর (ডান হাতের) বৃদ্ধাঙ্গুলিকে মধ্যমার উপর রেখে তিপ্পান্ন (আরাবী অক্ষরের ন্যায়) বানিয়ে শাহাদাত আঙ্গুল দ্বারা ইশারা করতেন। [মুসলিম/১১৮৬-আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), মুসলিম/১১৮৪, নাসাঈ/১২৬৬, তিরমিযী/২৯৪, ইব্ন মাজাহ/৯১১, ৯১২, ৯১৩]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীস সমূহ দেখুন ঃ নাসাঈ/৮৯২, ১২৭১।

❐ আমরা কেবল আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় "আশহাদু আল লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু" বলার সময় শাহাদাত আঙ্গুল একবার উঁচু করে ইশারা করি, যা সহীহ হাদীস দ্বারা প্রমাণিত নয়। এই পদ্ধতি আমরা কোথা থেকে বা কেমন করে শিখলাম তা বোধগম্য নয়। বিধায় উপরিক্ত সহীহ হাদীস মোতাবেক আঙ্গুল নাড়ানো উচিত।

সালাতে সালাম ফিরিয়ে ইস্তিগফার করা ও মুক্তাদীর দিকে মুখ ফিরানো

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন সালাত শেষ করতেন তখন আমাদের দিকে মুখ ফিরাতেন। [বুখারী/৮০২-সামুরা ইব্ন জুনদুব (রাঃ)]

২। কুতাইবা (রাঃ) বলেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদের ইমামাতি করতেন। আর তিনি (সালাত শেষে) মুক্তাদীর দিকে ডান অথবা বাম যে কোন দিক থেকে ঘুরে মুখ ফিরাতেন। [তিরমিযী/২৯৫, ৩০১, নাসাঈ/১৩২০, ১৩৩৭]

৩। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাতের সমাপ্তি তাকবীর দ্বারা বুঝতে পারতাম। [মুসলিম/১১৯২]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন তাঁর সালাত শেষ করতেন তখন তিনবার ইস্তিগফার করতেন (ইস্তিগফার করার নিয়ম হল 'আস্তাগফিরুল্লাহ, 'আস্তাগফিরুল্লাহ, 'আস্তাগফিরুল্লাহ বলা)। ('আস্তাগফিরুল্লাহ অর্থ ঃ আমি আল্লাহর নিকট ক্ষমা প্রার্থনা করছি)। এরপর বলতেন ঃ

اَللّٰهُمَّ أَنْتَ السَّلَامُ وَمِنْكَ السَّلَامُ تَبَارَكْتَ يَاذَاالْجَلَالِ وَالْأَكْرَام

উচ্চারণ ঃ আল্লাহুম্মা আন্তাস সালামু ওয়া মিনকাস সালামু তাবারাকতা ইয়া যাল জালালী ওয়াল ইকরাম।

অর্থ ঃ হে আল্লাহ! তুমি শান্তিময় এবং তোমার থেকেই শান্তি। তুমি বারাকাতময় হে মহিমান্বিত ও সম্মানিত। [মুসলিম/১২১০-ছাওবান (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/ ৯২৪, ৯২৮, তিরমিযী/৩০০, নাসাঈ/১৩৪০]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের পর এমন কিছু যিক্‌র আছে যা থেকে পাঠকারী কিংবা আমলকারী কখনও বঞ্চিত হবেনা। তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" ও চৌত্রিশবার "আল্লাহু আকবার"। [মুসলিম/১২২৫-কা'ব ইব্‌ন উজরা (রাঃ), নাসাঈ/১৩৫২]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি প্রত্যেক সালাতের পর তেত্রিশবার "সুবহানাল্লাহ", তেত্রিশবার "আলহামদুলিল্লাহ" ও তেত্রিশবার "আল্লাহু আকবার" বলবে, এই নিরানব্বই-আর "লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু ওয়াহদাহু লা শারিকালাহু লাহুল মুলকু ওয়া লাহুল হামদু ওয়া হুয়া 'আলা কুল্লি সাইয়িন কাদীর" বলে একশত পূর্ণ করবে, তার পাপসমূহ ক্ষমা হয়ে যাবে, যদিও তা সমুদ্রের ফেনার মত হয়। [মুসলিম/১২২৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৭। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৭৯৬, ৮০২, মুসলিম/৮৫৩, ১১৯১, তিরমিযী/২৩৮, আবূ দাউদ/১৫১৪, নাসাঈ/১৩২৩, ইব্‌ন মাজাহ/৯১৪।

(ক) বর্তমান সমাজের অধিকাংশ মাসজিদের ইমামদেরকে দেখা যায় তারা কেবল ফাজর এবং আসর সালাতে সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসেন। এটা সঠিক নয়। প্রত্যেক ফার্‌য সালাতের সালাম ফিরানোর পর ইমামের উচিত মুক্তাদীদের দিকে মুখ ফিরিয়ে বসা।

(খ) কিন্তু দুঃখ জনক হলেও সত্য যে, উপরোক্ত হাদীসগুলি অধিকাংশ ইমাম/খতীব মান্য করেনা। তারা সালাম ফিরানোর সঙ্গে সঙ্গে নির্ধারিত তাসবীহ, দু'আ পাঠ না করেই অতি সত্তর মুনাজাত করা আরম্ভ করেন। যা সহীহ হাদীসের বিরোধী।

দু'জন লোক হলেও জামা'আত করে সালাত আদায় অপরিহার্য

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা যখন সফরে বের হবে (সালাতের সময় হলে) তখন আযান দিবে, এরপর ইকামাত দিবে এবং তোমাদের মধ্যে যে বয়সে বড় সে ইমামাতি করবে। [বুখারী/৬০০, বুখারী/৬২৩]

২। জামা'আতে সালাতের ফাযীলাত একাকী আদায়কৃত সালাতের থেকে সাতাশ গুণ বেশি। [বুখারী/৬১৫, মুসলিম/১৩৫০, নাসাঈ/৮৪০, ইব্‌ন মাজাহ/৭৮৯]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ কোন গ্রামে অথবা অনাবাদী স্থানে তিনজন লোক থাকা অবস্থায় সেখানে সালাত প্রতিষ্ঠিত না হলে তাদের উপর শাইতানের আধিপত্য বিস্তার লাভ করে। অতএব তোমরা জামা'আতকে অত্যাবশ্যকীয় রূপে গ্রহণ করবে। কেননা বাঘ বিচ্ছিন্ন ছাগলকে খেয়ে ফেলে। [নাসাঈ/৮৫০]

- দু'জন লোক হলেই সেখানে জামা'আত সহকারে সালাত আদায় করতে হবে। নির্ধারিত ইমাম কর্তৃক জামা'আত হবার পরও প্রয়োজন বোধে একই মাসজিদে একাধিকবার জামা'আত করা যাবে। একজন লোক একাধিকবার এক ওয়াক্তের সালাত জামা'আতে আদায় করতে পারবে। তবে প্রথমবারের সালাত ফারয আর বাকী জামা'আতের সালাতগুলো তার নাফল হিসাবে গণ্য হবে।

জামা'আতে সালাত আদায় করার পর বা অন্য সময়ে হাত তুলে মুনাজাত প্রসঙ্গ

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইস্তিসকার সালাত (বৃষ্টি হওয়ার জন্য যে নামায) ব্যতীত অন্য কোন দু'আয় হাত উঠাতেননা। ইস্তিসকা সালাতে এমনভাবে হাত উঠাতেন যে, উভয় বগলের শুভ্রতা দৃষ্টিগোচর হত। [বুখারী/৯৬৮-আনাস ইব্ন মালিক (রাঃ), মুসলিম/১৯৪৬, নাসাঈ/১৫১৬, আবূ দাউদ/১১৭০]

২। বারাকাতসহ সম্পদের প্রাচুর্যের জন্য দু'আ করা যায়। [বুখারী/৫৯২৫]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিজের মৃত্যুর সময় মৃত্যু যন্ত্রণা থেকে রক্ষা পাওয়ার জন্য দু'হাত তুলে আল্লাহর নিকট দু'আ করেছেন। [বুখারী/৬০৫৩]

৪। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন, একদা খালিদ ইব্ন ওয়ালীদকে (রাঃ) বানী জাযিমার বিরুদ্ধে এক অভিযানে পাঠিয়েছিলেন। সেখানে খালিদ (রাঃ) বন্দীদেরকে হত্যার আদেশ দিয়েছিলেন । যখন নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বন্দী হত্যার কথা শুনলেন তখন তিনি দু'হাত তুলে দু'আ করেছেন ঃ হে আল্লাহ! খালিদ (রাঃ) যা করেছে আমি তা থেকে অসন্তোষ প্রকাশ করছি। [বুখারী/৩৯৮৯]

৫। বদর যুদ্ধের রাতে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এত দীর্ঘ মুনাজাত করেন যে, পাশেই আবূ বাকর (রাঃ) উদ্বেলিত হয়ে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের হাত চেপে বলেন, আপনার জন্য যথেষ্ট হয়েছে। [বুখারী/৩৬৫৫]

৬। আবূ মূসা আল আশ্‌আরী (রাঃ) বলেন ঃ আমার চাচা আবূ আমিরকে আওতাস গোত্রের বিরুদ্ধে যুদ্ধের সেনাপতি করে পাঠান । তিনি শহীদ হবার পূর্বে আমাকে বলেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমার সালাম জানাবে এবং আমার জন্য দু'আ করতে বলবে। যুদ্ধের পর মাদীনায় এসে আমি আমার চাচার শাহাদাত ও দু'আর আবেদনের কথা বললে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উযূ করলেন এবং দু'হাত এতদূর তুললেন যেন আমি তাঁর বগলের শুভ্রতা দেখতে পাচ্ছিলাম এবং আবূ আমিরের মাগফিরাত এবং আমার জন্যও দু'আ করলেন (হাদীসটি অনেক লম্বা তাই সংক্ষেপে উল্লেখ করা হল)। [বুখারী/৩৯৭৩]

৭। ইব্ন উমার (রাঃ) বলেন ঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জে মিনায় প্রথম জামরায় সাতটি কংকর নিক্ষেপের পর সামনে অগ্রসর হয়ে সমতল ভূমিতে গিয়ে কিবলামুখী হয়ে হাত তুলে অনেকক্ষণ দু'আ করতেন এবং ২য়

জামরায় কংকর নিক্ষেপের পরও হাত তুলে দু'আ করতেন। [বুখারী/ ১৬৩৪, ১৬৩৫]

(ক) সালাত (নামায) তাকবীরে তাহরীমা দ্বারা শুরু হয় এবং সালাম দ্বারা শেষ হয় (অর্থাৎ ঃ সালাতে আল্লাহু আকবার বলে দু'হাত বাধার পর দুনিয়াবী সকল কাজ হারাম হয়ে যায়। আর সালাতের সালাম ফিরানোর পর দুনিয়াবী সকল কাজ হালাল হয়ে যায়, বিধায় তাকবীরে তাহরীমার পর থেকে সালাম ফিরানো পর্যন্ত সময় হল সালাতের সময়)। [তিরমিযী/২৩৮-আবূ সাঈদ (রাঃ)] (অতএব জানা গেল যে, আমরা ইমামের সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে যে মুনাজাত করি তা সালাতের (নামাযের) কোন অংশ নয়)।

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফার্‌য সালাতে সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে দু'আয় ইমামাতি করেছেন বলে কোন সহীহ হাদীসে প্রমাণ পাওয়া যায়না। যে কাজ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম করেননি তা এখনও মাক্কা ও মাদীনায় করা হয়না। সালাম ফিরানোর পর মাক্কা ও মাদীনার ইমামগণ যে মুনাজাত বা দু'আ করেননা তা সমস্ত হাজীগণ অবশ্যই জানেন।

⊙ মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ "রাসূল (সাঃ) তোমাদেরকে যা দেন তা গ্রহণ কর, যা নিষেধ করেন তা থেকে বিরত থাক।" [সূরা হাশর-৭]

গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফার্‌য সালাত শেষ করে সালাম ফিরানোর পর দু'হাত তুলে মুনাজাতের ইমামাতি আমাদেরকে দিয়ে যাননি। অতএব ফার্‌য সালাতের সালাম ফিরানোর পর হাত তুলে মুনাজাত করা কতটুকু যুক্তিসঙ্গত তা ভেবে দেখার দায়িত্ব আপনাদের উপরই রইল ।

ঘ) আমাদের সমাজের ইমাম ও আলেমরা মুনাজাতের স্বপক্ষে কুরআন ও হাদীস বর্হিভূত যে কথা বলেন তা নিম্নে দেয়া হল ঃ

● যখন তোমরা সালাত থেকে ফারিগ (পৃথক) হবে তখন আল্লাহর নিকট দু'আয় মশগুল হয়ে যাবে। কেননা এ সময় দু'আ কবূল হওয়ার বেশী সম্ভাবনা।

● ফার্‌য সালাতের পর দু'আ করা সুন্নাত। এরূপভাবে দু'আর সময় হাত উঠানো এবং পরে হাত চেহারায় মুছে নেয়া সুন্নাত।

মুনাজাতের ব্যাপারে উলামাগণের ইজমা হয়েছে যে, নামাযের পর যিক্‌র ও দু'আ করা মুস্তাহাব।

● সালাত শেষে ইমাম ও মুসল্লীগণ নিজের জন্য এবং মুসলিমদের জন্য হাত উঠিয়ে দু'আ করবেন। অতঃপর মুনাজাত শেষে হাত চেহারায় মুছবেন।

● সালাতের পরে জরুরী মনে না করে হাত উঠিয়ে সম্মিলিতভাবে আল্লাহর নিকট দু'আ করা মুস্তাহাব ইত্যাদি মন্তব্য করে থাকেন। কিন্তু কুরআন ও সহীহ হাদীস এর স্বপক্ষে কোন দলীল পেশ করেননা। পক্ষান্তরে সালাতের সালাম ফিরানোর পর সুন্নাহ সম্মত ইস্তিগফার, তাসবীহ, যিক্‌র ও অন্যান্য দু'আ পাঠ থেকে মু'মিনদেরকে বিরত রাখছে।

তাসবীহ পাঠ করা প্রসঙ্গ

১। আল্লাহ বলেন ঃ তুমি কি দেখনি যে, আসমান ও যমীনে যা কিছু আছে তারা সবাই এবং উড়ন্ত পাখিরা তাদের পাখা বিস্তার করে আল্লাহর তাসবীহ পাঠ করে। তারা প্রত্যেকেই তাদের সালাত ও তাসবীহ পাঠের নিয়ম-পদ্ধতি জানে। বস্তুতঃ তারা যা করে সে সম্পর্কে আল্লাহ জ্ঞাত। [সূরা নূর-৪১]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কংকর দ্বারা তাসবীহ পাঠের হিসাব রাখতে নিরুৎসাহীত করেছেন। (এ ক্ষেত্রে কংকর ব্যবহারের চেয়ে উত্তম হল আঙ্গুলের গিরার দ্বারা তাসবীহ গণনা করা) [আবূ দাউদ/১৫০০-আয়িশা বিনতে সাদতার হতে বর্ণিত]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাকবীর اَللّٰهُ اَكْبَرُ (আল্লাহু আকবার), তাসবীহ سُبْحَانَ اللهِ (সুবহানাল্লাহ) ও তাহলীল لاَ اِلٰهَ اِلاَّ اللهُ (লা ইলাহা ইল্লাল্লাহ)-এর শব্দগুলিকে হিফাযাত ও গণনার জন্য নির্দেশ দিয়েছেন এবং তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) এসব আঙ্গুলের গিরার দ্বারা গণনা করতে বলেছেন। কেননা কিয়ামাতের দিন আঙ্গুলসমূহকে এ ব্যাপারে জিজ্ঞেস করা হবে এবং তারা এর সাক্ষ্য প্রদান করবে। [আবূ দাউদ/১৫০১- হু, ই, বিন্‌তে ইয়াসির (রাঃ) ও ইউসায়রা (রাঃ)]

৪। এ বিষয়ে হাদীস দেখুন ঃ আবূ দাউদ/১৫০২।

(ক) আমাদের সমাজের ইমাম/খতীব/শিক্ষিত/অশিক্ষিত মুসলিম লোকেরা তাসবীহ এর ছড়া হিসাবে ১০/২০/৩৩/৫০/১০০/২০০/১০০০টি দানার গুটি সূতায় মালার মত গেঁথে গণনার জন্য ব্যবহার করেন। আবার কেহ কেহ কাউন্টিং মেশিনের মাধ্যমে তাসবীহ গণনা করেন। এ ক্ষেত্রে কংকর/কাউন্টিং মেশিনের ব্যবহারের চেয়ে উত্তম হল আঙ্গুলের গিরার দ্বারা তাসবীহ গণনা করা। তাহলেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপরোক্ত সহীহ হাদীস মোতাবেক আমল হবে।

(খ) তাসবীহ গণনার ক্ষেত্রে নিজ নিজ হাতের আঙ্গুলের গিরা গণনা করা উচিত। আল্লাহ আমাদের সঠিকভাবে আমল করার তাওফীক দান করুন।

ইমামাতি করার হকদার ও তার কর্তব্য

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি তোমাদের ইমামতি করে, যদি সে সঠিকভাবে তা আদায় করে তাহলে তার সাওয়াব তোমরা পাবে। আর যদি সে ত্রুটি করে তাহলে তোমাদের জন্য সাওয়াব রয়েছে, আর ত্রুটি তার (ইমামের) উপরই বর্তাবে। [বুখারী/৬৫৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

২। ফারয সালাত আদায়ের জন্য ইমাম নিযুক্ত করা না থাকলে তখন একাধিক ব্যক্তি কিরা'আতে সমমানের হলে, তাদের মধ্যে বয়োজ্যেষ্ঠ ব্যক্তিই ইমাম হবে। [বুখারী/৬৪৯]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা সালাত আদায় কর যেমনভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ। [বুখারী/৬০১-মালিক (রাঃ)]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৬০০, ৬৬৭, ৬৭০, ৬৭১, মুসলিম/৯২৪, ৯২৮, আবূ দাউদ/৫৯৫, ৫৯৯।

(ক) বাংলাদেশে অধিকাংশ মাসজিদের ইমাম/খতীব কেবল কুরআনে হাফিয। তারা কুরআন ভাল করে মুখস্ত বলতে পারে। কিন্তু তাদের কুরআন ও সহীহ হাদীসের বিধানাবলীর জ্ঞান খুবই সীমিত।

(খ) অনেক ইমাম/খতীব অর্থের অভাবে যেমন কুরআনের তাফসীর/সহীহ হাদীসের কিতাবসমূহ ক্রয়ের সামর্থ্য রাখেনা অনুরূপ যাদের সামর্থ্য আছে তারা আবার কুরআনের তাফসীর ও সহীহ হাদীস জানার জন্য পাঠও করেনা।

(গ) অনেক ইমাম/খতীবকে দেখা যায় যে তারা মক্তব/মাদ্রাসা থেকে যা শিখেছে ঐ নিয়মেই সালাত আদায় করে এবং ইমামাতিও করে। কখনও সহীহ হাদীস গ্রন্থ পাঠ/জানার প্রয়োজন বোধ করেনা।

(ঘ) এমনকি সমাজের গন্যমান্য লোকেরা ঐ সকল ইমাম/খতীবকে বিভিন্ন বিষয়ের মাস'আলা মাসায়েল জানার জন্য জিজ্ঞেস করলে কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে উত্তর দিতে পারেনা। অনেক ইমাম/খতীব সাহেব জানুক বা না জানুক, সঙ্গে সঙ্গে উত্তর দিয়ে থাকেন । কারণ ইমাম যদি সঙ্গে সঙ্গে উত্তর না দেয় তাহলে সমাজের লোকেরা চিন্তা করবে যে, ইমাম/খতীব কিছুই জানেনা। তা ছাড়াও ইমাম/খতীব চাকুরী বাঁচানোর স্বার্থে/চক্ষু লজ্জার ভয়ে মাস'আলা মাসায়েলের উত্তর না জেনেও দিয়ে থাকেন। তা কুরআন ও সহীহ হাদীস সম্মত হোক বা না হোক। বর্তমান সমাজে এরূপ চিত্র প্রায়ই দেখা যাচ্ছে।

দাঁড়ানো/বসা/শোয়া অবস্থায় সালাত আদায় করা

১। কেহ যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এটা তার জন্য উত্তম। বসে সালাত আদায় করলে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার অর্ধেক সাওয়াব পাবে। আর শোয়া অবস্থায় সালাত আদায় করলে, সে বসে সালাত আদায়ের অর্ধেক সাওয়াব পাবে। [বুখারী/১০৪৪-ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ), তিরমিযী/৩৭১, নাসাঈ/১৬৬৩, ইব্‌ন মাজাহ/১২৩১]

২। উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁকে নাফল সালাত বসে আদায় করতে দেখিনি। [তিরমিযী/৩৭৩]

৩। রুগ্ন ব্যক্তি (রোগী) সাজদাহ করতে না পারলে মাথা দ্বারা শুধু ইশারা করবে। আর কপালের দিকে কোন বস্তু উঁচু করে রাখবেনা। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)-২২৬ পাতা ১ম খন্ড]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৩৬২, ইব্‌ন মাজাহ/১২২৩, তিরমিযী/৩৭২, ৩৭৪।

(ক) আমাদের দেশের অধিকাংশ পুরুষ/মহিলাকে প্রায়ই দেখা যায় যে, বিনা কারণে তারা সুন্নাত/নাফল সালাত বসে আদায় করেন।

(খ) তাছাড়াও যে সকল লোক বসে সালাত আদায় করেন, কিন্তু মাটিতে সাজদাহ্ দিতে অক্ষম তারা সাজদাহর জায়গায় বালিশ বা উচু টেবিল ইত্যাদি রেখে সাজদাহ করে যা উপরোক্ত হাদীসের বিপরীত। এ অভ্যাস অবশ্যই পরিত্যাগ করা উচিত।

জামা'আতের সালাতে কোন্ সময় যোগদান করলে ঐ রাক'আত পাওয়া যাবে?

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন সালাতের এক রাক'আত পায় সে উক্ত সালাত পেল। [বুখারী/৫৫১-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/১২৪৬, নাসাঈ/৫৫৬]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যদি সালাতে শরীক হতে আসে এবং ইমাম যদি (সালাতের) কোন এক অবস্থায় থাকেন তাহলে সে ইমাম যা করছেন তাই করবে। [তিরমিযী/৫৯১-মুআয ইব্ন জাবাল (রাঃ)]

৩। এক রাক'আত সালাত হল ঃ সালাতে দাঁড়ানো অবস্থায় কমপক্ষে সূরা ফাতিহা পাঠ করা। এরপর রুকূ করা ও রুকূতে কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠ করা। তারপর রুকূ থেকে সোজা হয়ে দাঁড়ানো, অতঃপর সাজদাহ করা ও সাজদায় কমপক্ষে তিনবার তাসবীহ পাঠ করা। এর পর সাজদাহ থেকে সোজা হয়ে বসা, আবার অনুরূপভাবে সাজদাহ করে উঠা, তবেই এক রাক'আত সালাত পূর্ণ হবে। [বুখারী/৭১৮,৭১৯, মুসলিম/৭৫৯, ৭৬২, ইব্ন মাজাহ/৮৪০, আবূ দাউদ/৮২৩, নাসাঈ/৯২৩]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীস সমূহ দেখুন ঃ মুসলিম/১২৫২, তিরমিযী/৫২৪।

☐ আমাদের দেশের আলেমগণ বলেন যে, কেহ যদি জামা'আতের সালাতে শুধু রুকূ পায় তাহলে সে ঐ রাক'আত পূর্ণ করেছে। কিন্তু সহীহ হাদীসে এরূপ কোন উল্লেখ নেই, বিধায় উপরোক্ত হাদীস মোতাবেক সালাত কায়েম করা উচিত।

ফারয সালাত আদায়ের পর সুন্নাত/নাফল সালাত আদায় করার জন্য স্থান পরিবর্তন করা প্রসঙ্গ

১। মুআবিয়া (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নির্দেশ দিয়েছেন, আমরা যেন এক সালাতের সাথে অন্য সালাতকে মিলিয়ে না দেই যতক্ষণ পর্যন্ত কথা না বলি অথবা বের না হয়ে যাই। [মুসলিম/১৯১২]

☐ এ থেকে বিদ্বানগণ বলেন, ফারয সালাত শেষ করে যদি পরবর্তিতে সুন্নাত/নাফল আদায়ের প্রয়োজন হলে তখন সুন্নাত/নাফল সালাত আরম্ভের পূর্বে পার্শ্বের মুক্তাদীর সঙ্গে কথা বলতে হবে অথবা ফারয সালাতের স্থান থেকে ডান-বাম বা সামনে-পিছনে একটু স্থান পরিবর্তন করে সুন্নাত/নাফল সালাত আদায় করা উচিত।

জামা'আতের প্রথম এক রাক'আত বা দু' রাক'আত ছুটে গেলে তা আদায় করার নিয়ম কি?

১। আবূ কাতাদাহ (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সালাত আদায় করছিলাম। হঠাৎ তিনি লোকদের (আগমনের) আওয়াজ শুনতে পেলেন। সালাত শেষে তিনি জিজ্ঞেস করলেন ঃ তোমাদের কি হয়েছিল? উত্তরে তাঁরা বললেন ঃ আমরা সালাতের জন্য তাড়াহুড়া করে আসছিলাম। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ এরূপ করবেনা, যখন সালাত আদায় করতে আসবে ধীরস্থির ভাবে আসবে, (ইমামের সাথে) যতটুকু পাও আদায় করবে, আর যতটুকু ছুটে যায় তা (ইমামের সালাম ফিরানোর পর) পুরা করে নিবে। [বুখারী/৬০৫, ৮৫৭, মুসলিম/১২৩৪, তিরমিযী/৩২৭, নাসাঈ/৮৬৪]

বিশুদ্ধ কথা হচ্ছে, ইমামের সালামের পর মুক্তাদী যে সালাতটুকু পুরা করে থাকে তা হচ্ছে তার নিজস্ব সালাতের শেষ অংশ। তাই সে শুধু সূরা ফাতিহাই পাঠ করবে। এটা হচ্ছে- যদি চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের ছুটে যাওয়া রাক'আতের সংখ্যা এক বা দুই হয় বা মাগরিবের এক রাক'আত ছুটে থাকে। আর ফাজরের কোন রাক'আত ছুটে গেলে ফাতিহার সাথে অন্য সূরা মিলাতে হবে। চার রাক'আত বিশিষ্ট সালাতের মুক্তাদীর ছুটে যাওয়া রাক'আতের সংখ্যা যদি তিন হয়। তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদী উঠে প্রথম এক রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করতে হবে। এরপর আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠক করতে হবে এবং শেষের দুই রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। যদি মাগরিবের দু'রাক'আত সালাত ছুটে যায়, তাহলে ইমামের সালাম ফিরানোর পর মুক্তাদী প্রথম এক রাক'আতে সূরা ফাতিহার সাথে অন্য সূরা পাঠ করতে হবে এরপর আত্তাহিয়্যাতুর বৈঠক করতে হবে। অতঃপর উঠে শেষের এক রাক'আতে শুধু সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে। ইমামের ফারয সালাত কিছু আদায় করার পর ঐ জামা'আতের সালাতে মুক্তাদি হিসাবে যোগদান করার পর হতে ইমামের সঙ্গে বৈঠক করার সময় শুধু আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করতে হয়। যদি মুক্তাদীর শেষ বৈঠক হয় তখন কেবল আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ, দু'আ ইত্যাদি পাঠ করতে হয়।

জামা'আতের সালাতে মুক্তাদী যদি ইমামকে সাজদাহ অবস্থায় পায় তখন মুক্তাদীর করণীয় কি?

১। যে ব্যক্তি ইমামের ফারয সালাত কিছু আদায় করার পর জামা'আতে যোগ দেয় তাকে মাসবুক বলে। মাসবুককে রুকূ, সাজদাহ, দাঁড়ান কিংবা বসা যে অবস্থায়ই হোক জামা'আতে অংশগ্রহণ করতে হবে। সে ইমামের সঙ্গে সালাত আদায় করতে থাকবে। জামা'আতে সম্পূর্ণ সালাত না পেলে ইমামের সঙ্গে শুধু আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে সালাম না ফিরিয়ে বসে থাকবে এবং ইমামের সালাম ফিরানোর পর অবশিষ্ট সালাত একা আদায় করে নিবে। ইমামের সঙ্গে সে যে

কয় রাক'আত আদায় করেছে সেটা তার সালাতের প্রথম অংশ ধরে নিয়ে অবশিষ্ট সালাত আদায় করবে। [আউনুল মাবুদ]

◫ উত্তম হচ্ছে ইমামকে সালাতে যে অবস্থায়ই পাবে মুক্তাদীরা সালাতে সেই অবস্থায় শামিল হবে, কোনরূপ অপেক্ষা করবেনা। ⊙ কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তোমরা (ইমামের সাথে) যা ছুটে যাবে তা আদায় করবে। [বুখারী/৮৫৭]

সালাতের নির্ধারিত সময়ে জামা'আত না হলে একা সালাত আদায় করতে হবে

১। আবূ যার (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে বললেন ঃ যখন তোমাদের উপর এমন সব আমীর হবে যারা নির্ধারিত সময় থেকে বিলম্বে সালাত আদায় করবে অথবা সালাতের সময় শেষ করে সালাত আদায় করবে, তখন তুমি কি করবে? আবূ যার (রাঃ) বলেন ঃ আপনি আমাকে কি করতে বলেন? রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তুমি যথা সময়ে সালাত আদায় করে নিবে। পরবর্তিতে যদি সালাতের জামা'আত পাওয়া যায় তাহলে ঐ জামা'আতে অংশ গ্রহন করতে পারবে, তবে এটা হবে তোমার জন্য নাফল। [মুসলিম/১৩৩৮, নাসাঈ/৮৬২, ৭৮২, তিরমিযী/১৭৬, ইব্‌ন মাজাহ/১২৫৫]

◫ বর্তমান সমাজের প্রায় মাসজিদেই বিশেষ করে ফাজর ও আসর সালাত আউয়াল ওয়াক্তে আদায় করেনা। কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী কোন এলাকার মাসজিদে সঠিক ওয়াক্তে সালাত আদায় না করলে ঐ সকল এলাকার লোকদের উচিত উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী আমল করা। আল্লাহই ভাল জানেন।

সালাতরত অবস্থায় চোখের দৃষ্টি রাখার স্থান

১। আল্লাহ বলেন ঃ

قُلْ أَمَرَ رَبِّي بِالْقِسْطِ وَأَقِيمُواْ وُجُوهَكُمْ عِندَ كُلِّ مَسْجِدٍ وَادْعُوهُ مُخْلِصِينَ لَهُ الدِّينَ

كَمَا بَدَأَكُمْ تَعُودُونَ

প্রত্যেক সালাতে তোমাদের লক্ষ্য স্থির রাখবে এবং তাঁরই আনুগত্যে বিশুদ্ধচিত্ত হয়ে একনিষ্ঠভাবে তাঁকে ডাকবে। তিনি যেভাবে প্রথমে তোমাদেরকে সৃষ্টি করেছেন তোমরা সেভাবে ফিরে আসবে। [সূরা আরাফ-২৯]

২। সালাতরত অবস্থায় আকাশের দিকে চোখ তুলে তাকানোর ব্যাপারে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যেন তারা অবশ্যই এ থেকে বিরত থাকে, অন্যথায় নিশ্চিত তাদের দৃষ্টিশক্তি কেড়ে নেয়া হবে। [বুখারী/৭১২-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), মুসলিম/৮৪৯, নাসাঈ/১১৯৬]

৩। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সালাতে এদিক ওদিক তাকানো সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। উত্তরে তিনি

বললেন ঃ এটা এক ধরনের ছিনতাই, যা দ্বারা শাইতান মানুষের সালাত থেকে অংশ বিশেষ কেড়ে নেয়। [বুখারী/৭১৩, তিরমিযী/৫৯০, নাসাঈ/১১৯৯]

৪। জামা'আতে সালাত আদায়ের সময় ইমামের পিছনের মুক্তাদীরা ইমামের দিকে দৃষ্টি রাখবে। [বুখারী/অনুঃ-১৩১]

৫। একাকী বা জামা'আতের সালাতে মুক্তাদীরা সাজদার জায়গায় দৃষ্টি রাখবে। [ইব্‌ন মাজাহ/১৬৩৪-আবূ উসমান (রাঃ)]

৬। আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করার সময় ডান হাতের শাহাদাত আঙ্গুলের দিকে দৃষ্টি রাখতে হবে। [নাসাঈ/১১৬৩-আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ)]

৭। সাজদার সময় দৃষ্টি নাকের দিকে থাকবে।

মুসল্লীরা! এবার আপনি নিজেই বলুন, সালাত আদায় করার সময় আপনার/আমার চোখের অবস্থান ঠিক ঠিক জায়গায় থাকে কিনা?

সালাতরত অবস্থায় হাই তোলা এবং হাঁচি দেয়া

১। তোমাদের কেহ যদি হাঁচি দেয় এবং আল্লাহর প্রশংসা করে তাহলে তোমরা তার হাঁচির জবাব দিবে। আর যদি সে আল্লাহর প্রশংসা না করে তাহলে তোমরাও তার হাঁচির জবাব দিবেনা। [মুসলিম/৭২১৮-আবূ বুরদা (রাঃ), আবূ দাউদ/৪৯৫৫]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন হাঁচি দেয় তখন সে যেন বলে, اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ (উচ্চারণ ঃ 'আলহামদুলিল্লাহ্')। আর তার পাশে যে থাকবে সে শুনে যেন বলে يرحمك الله (উচ্চারণ ঃ 'ইয়ারহা-মুকাল্লাহ')। উত্তরে হাঁচিদাতার আবার বলা উচিত يَهْدِ يْكُمُ اللهُ وَيُصْلِحُ بَا لَكُمْ (উচ্চারণ ঃ 'ইয়াহদিকুমুল্লাহ্ ওয়া ইয়ুসলিহু বা-লাকুম')। [ইব্‌ন মাজাহ/৩৭১৫-আলী (রাঃ)]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ হাঁচিকে পছন্দ করেন এবং হাই তোলাকে অপছন্দ করেন। অতএব তোমাদের কারও যখন হাই আসে তখন তা যথাসম্ভব প্রতিরোধ করতে চেষ্টা করবে এবং হা-হা শব্দ করবেনা। কেননা হাই শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে, আর শাইতান এজন্য খুশি হয় এবং হাসে। [আবূ দাউদ/৪৯৪৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৩০৫১]

৪। সালাতরত অবস্থায় হাঁচির জবাব দেয়া নিষেধ। [আবূ দাউদ/৯৩০-মুয়াবিয়া ইব্‌নুল হাকাম আস-সালীম (রাঃ)]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ মুসলিম/৭২১৬, ৭২২০, ৭২২১, তিরমিযী/৩৭০, ইব্‌ন মাজাহ/৯৬৮, আবূ দাউদ/৪৯৪৫, ৪৯৪৬, ৪৯৫৫ ।

(ক) বর্তমান সমাজের মুসলিমরা হাঁচি দিলে ইংরেজীতে বলে Sorry (সরি)।
(খ) হাঁচি দিলে কি বলতে হয় এবং শুনলে কি উত্তর দিতে হয় তারা নিজেরাও জানেনা বিধায় উত্তর দেয়না এবং অন্যকেও বলার সুযোগ দেয়না।
(গ) অনেক সময় দেখা যায়, সালাতরত অবস্থায় শিক্ষিত/অশিক্ষিত লোকেরা না জানার ফলে সালাতে হাই তোলে, যা উচিত নয়।

জামা'আতের সালাতে ইমামের ভুল হলে সংশোধন করে (লোকমা) দেয়ার নিয়ম

১। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জামা'আতে সালাত আদায় করার সময় জটিলতার সৃষ্টি হলে ইমামের দৃষ্টি আকর্ষণের জন্য বিধান হল মহিলাদের জন্য হাতে হাত রেখে আওয়ায করা, আর পুরুষদের জন্য "সুবহানাল্লাহ" বলা। [বুখারী/১১২৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ৬৪৮, মুসলিম/৮৩৭, তিরমিযী/৩৬৯, নাসাঈ/১২১০, ইব্‌ন মাজাহ/১০৩৪]

☐ আমাদের মাসজিদসমূহে প্রায়ই দেখা যায়, ইমামের ভুল সংশোধনের জন্য লোকমা দেয়ার ক্ষেত্রে মুক্তাদীগণ "আল্লাহু আকবার" বলে। কিন্তু "আল্লাহু আকবার" বলে ইমাম সাহেবের ভুল ধরিয়ে দেয়ার বিধান সহীহ হাদীসে নেই। এ ক্ষেত্রে অবশ্যই "সুবহানাল্লাহ" বলতে হবে।

সাজদায়ে সাহু এর পদ্ধতি

১। সাজদায়ে সাহুর পরে তাশাহহুদ (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ, দু'আ মাসুরা ইত্যাদি) পাঠ করতে হয়না। [বুখারী/১১৫১-সালামা ইব্‌ন আলকামাহ (রাঃ), বুখারী/ অনুঃ ৪২৭]

☐ বর্তমান সমাজের ইমাম/খতীবগণ সহীহ হাদীস অমান্য করে সাজদায়ে সাহুর পরে তাশাহহুদ (অর্থাৎ আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ, দু'আ মাসুরা ইত্যাদি) পাঠ করেন। আমাদের সমাজে প্রচলিত সাহু সাজদাহ করা হয়, শেষ রাক'আতে আত্তাহিয়্যাতু পাঠ করে ডান দিকে সালাম ফিরিয়ে তারপর 'আল্লাহু আকবার' বলে দুইটি সাজদাহ করে, তারপর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আ মাসূরা পাঠ করে উভয় দিকে সালাম ফিরিয়ে সালাত শেষ করে। আর সালাত শেষ করার পর ভুল ধরা পড়লে সালাত নতুন করে পুনরায় আদায় করেন, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত।

এমতাবস্থায়, প্রচলিত নিয়মে সাজদায়ে সাহু করায় আমাদের সালাত সঠিক নিয়মে হচ্ছে কিনা তা আল্লাহই ভালই জানেন।

সালাম ফিরানোর পূর্বে সাহু সাজদাহ প্রসঙ্গ

১। আ, ই, বুহাইনা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাদেরকে নিয়ে সালাত আদায় করলেন। প্রথম দু' রাক'আতের পর না বসে তিনি দাঁড়িয়ে গেলেন। এভাবেই সালাত আদায় করতে থাকলেন। সালাত শেষ করলে লোকেরা তাঁর সালামের অপেক্ষা করছিল। তিনি আল্লাহু আকবার বলে সালামের পূর্বে সাজদাহ করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন। আবার আল্লাহু আকবার বলে সাজদাহ করলেন। এরপর মাথা উত্তোলন করলেন এবং সালাম ফিরালেন। [বুখারী/৬২০২,১১৪৬, তিরমিযী/৩৯১, নাসাঈ/১১৮০, মুসলিম/১১৪৯, ১১৫১]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৭৮৮, ১১৪৭, মুসলিম/১১৪৯, ১১৫২, তিরমিযী/৩৯৭, ৩৯৮, ইব্‌ন মাজাহ/১২০৯, নাসাঈ/১২৪১।

☐ প্রিয় পাঠক, সহীহ হাদীস থাকা সত্ত্বেও কেন আমরা অন্য নিয়মে সাহু সাজদাহ দিচ্ছি এর বিচারের ভার আপনাদের উপরই রইল।

সালাম ফিরানোর পরে সাহু সাজদাহ প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত তিন রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন। তারপর নিজ গৃহে প্রবেশ করলেন। তখন (কিঞ্চিত) লম্বা দুই হস্তবিশিষ্ট খিরবাক নামক জনৈক ব্যক্তি তাঁর উদ্দেশে উঠে দাঁড়ালেন এবং "হে আল্লাহর রাসূল" বলে সম্বোধন করে বিষয়টি সম্পর্কে তাঁকে জানালেন। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) চাদর হেঁচড়াতে হেঁচড়াতে রাগান্বিত হয়ে বেরিয়ে এলেন। লোকদের নিকট এসে বললেন ঃ এই লোকটি কি সত্য বলছে ? তারা বলল ঃ জি হ্যাঁ। তারপর তিনি এক রাক'আত আদায় করে সালাম ফিরালেন এবং দু'টি সাজদাহ (সাহু) করে পুনরায় সালাম ফিরালেন। [মুসলিম/১১৬৯-ইমরান ইব্‌ন হুসাইন (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/১২১৪, ১২১৫]

২। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৬৭৭, ৬৭৮, ১১৪৮, মুসলিম/১১৫৮, ১১৫৯, ১১৬৬, নাসাঈ/১২৩০, ১২৫৮, তিরমিযী/৩৯২, ৩৯৯, ইব্‌ন মাজাহ/১২০৫, ১২০৮।

☐ বর্তমান সমাজে জামা'আতের সালাতে এরূপ ভুল হলে সম্মিলিতভাবে নতুন করে পুনরায় ঐ সালাত আদায় করা হয়, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত নিয়ম।

ওয়াক্ত মত যে সালাত আদায় করা যায়নি সেই কাযা সালাত আদায়ের নিয়ম

মুসলিমদের অবশ্যই সময় মত সালাত আদায় করতে হবে। এ বিষয়ে দেখুন ঃ

১। নির্দিষ্ট সময়ে সালাত কায়েম করা মু'মিনদের জন্য অবশ্যই কর্তব্য। [সূরা নিসা- ১০৩]

২। মু'মিনরা সফলকাম হয়ে গেছে, যারা নিজেদের সালাতে বিনয় নম্রতা অবলম্বন করে। [সূরা মু'মিনূন-১-২]

৩। তোমার পরিবারবর্গকে সালাতের আদেশ দাও এবং ওতে দৃঢ় থাক, আমি তোমার নিকট কোন জীবনোপকরণ চাইনা, আমিই তোমাকে জীবনোপকরণ দিই এবং শুভ পরিণাম তো মুত্তাকীদের জন্য। [সূরা তাহা-১৩২]

৪। মু'মিনদেরকে বল সালাত কায়েম করতে । [সূরা ইবরাহীম-৩১]

৫। দুর্ভোগ সেই সালাত আদায়কারীদের যারা তাদের সালাত সম্বন্ধে উদাসীন, যারা লোক দেখানোর জন্য উহা করে, এবং গৃহস্থালীর প্রয়োজনীয় ছোট-খাট জিনিস সাহায্যদানে বিরত থাকে। [সূরা মাউন-৪-৭]

৬। সালাত ইসলামের প্রথম ইবাদাত যা মিরাজের রাতে ফারয করা হয়। [মুসলিম/৩০৮-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ)]

৭। মু'মিনদের ও কাফিরদের মধ্যে পার্থক্যকারী আমল হল সালাত। যে সালাত ছেড়ে দিল সে কুফরি করল। [নাসাঈ/৪৬৬-বুরাইদা (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ/১০৭৯, ১০৮০, মুসলিম/১৫০]

৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের সন্তানরা সাত বছরে উপনীত হবে তখন তাদেরকে সালাত (নামায) আদায়ের নির্দেশ

দিবে এবং তাদের বয়স যখন দশ বছর হবে তখন সালাত আদায় না করলে তাদেরকে প্রহার করবে (শাস্তি দিবে) এবং তাদের (ছেলে-মেয়েদের) বিছানা পৃথক করে দিবে। [আবূ দাউদ/৪৯৫-আমর ইব্ন শুয়াইব (রাঃ), তিরমিযী/৪০৭]

৯। আল্লাহর নিকট অধিক প্রিয় আমল হচ্ছে যথাসময়ে সালাত আদায় করা, মাতা-পিতার সাথে ভাল ব্যবহার করা এবং আল্লাহর রাস্তায় জিহাদ করা। [বুখারী/৫০০-আবদুল্লাহ ইব্ন মাসউদ (রাঃ), নাসাঈ/৬১৩]

১০। আবূ হুরাইরা (রাঃ)থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সূর্য উঠার আগে ফাজরের এক রাক'আত পায়, সে ফাজরের সালাত পেল। আর যে ব্যক্তি সূর্য অস্ত যাবার পূর্বে আসরের এক রাক'আত পেল, সে আসরের সালাত পেল। [বুখারী/৫৫০]

১১। কিয়ামাতের দিন মানুষের আমলের মধ্যে সর্ব প্রথম সালাতের হিসাব-নিকাশ নেয়া হবে। যদি সালাত পরিপূর্ণরূপে পাওয়া যায় তাহলে পরিপূর্ণ লেখা হবে। যদি কিছু কম পাওয়া যায় তাহলে আল্লাহ বলবেন ঃ তার নাফল সালাত কিছু আছে কি? (যদি থাকে) সেগুলির দ্বারা ফারয সালাতের ক্ষতি পূরণ করে দেয়া হবে। তারপর অন্যান্য আমলের ক্ষেত্রেও এরূপ করা হবে। [নাসাঈ/৪৬৯-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/৪১৩, ইব্ন মাজাহ/১৪২৬]

১২। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেন, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) বাইতুল্লাহর নিকটে দু' বার আমার সালাতে ইমামতি করেছেন। প্রথমবার তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের সালাত আদায় করেন- যখন সূর্য পশ্চিম আকাশে সামান্য ঢলে পড়েছিল এবং সেন্ডেলের এক ফিতার (প্রস্থের) পরিমাণ সামান্য ছায়া বাইতুল্লাহর পূর্ব দিকে দেখা দিয়েছিল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে আসরের সালাত আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সমপরিমাণ হল। পরে তিনি আমাকে নিয়ে মাগরিবের সালাত আদায় করেন যখন সিয়াম পালনকারী ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ইশার সালাত আদায় করেন যখন পশ্চিম আকাশের লাল আভা লোপ পায়। পরদিন তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় ফাজরের সালাত আদায় করেন যখন সিয়াম পালনকারী ব্যক্তির জন্য পানাহার হারাম হয়। পরের দিন তিনি আমাকে নিয়ে যুহরের সালাত ঐ সময় আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার সম-পরিমাণ হল। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় আসরের সালাত আদায় করেন যখন প্রত্যেক বস্তুর ছায়া তার দ্বিগুণ হল। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ঐ সময় মাগরিবের সালাত আদায় করেন যখন সিয়াম পালনকারী ইফ্তার করে। অতঃপর তিনি আমাকে নিয়ে রাতের এক-তৃতীয়াংশে ইশার সালাত আদায় করেন। পরে তিনি আমাকে নিয়ে ফাজরের সালাত ঐ সময় আদায় করেন যখন উষা কিছুটা উজ্জ্বল হয়ে যায়। অতঃপর তিনি [জিব্রাঈল (আঃ)] আমাকে লক্ষ্য করে বলেন ঃ ইয়া মুহাম্মাদ (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম)! আপনার এবং পূর্ববর্তী নাবী/রাসূলদের জন্য এটাই

সালাতের নির্ধারিত সময় এবং এই দুই সময়ের মাঝখানেই সালাতের সময়। [আবূ দাউদ/৩৯৩, নাসাঈ/৫০৫, ৫০৭, মুসলিম/১২৫৪]।

ওয়াক্ত মত সালাত আদায় করতে না পারলে সেই সালাত আদায়ের নিয়ম ঃ

১। **খন্দকের** দিন উমার ইব্‌নুল খাত্তাব (রাঃ) এসে কুরাইশ গোত্রীয় কাফিরদের **গালমন্দ** করতে লাগলেন এবং বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমি এখনও আসরের সালাত আদায় করতে পারিনি, এমনকি সূর্য অস্ত যায় যায়। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ আল্লাহর শপথ! আমিও তা আদায় করিনি। তারপর আমরা উঠে বুতহানের (একটি জায়গার নাম) দিকে গেলাম। সেখানে তিনি সালাতের জন্য উযূ করলেন এবং আমরাও উযূ করলাম; এরপর সূর্য ডুবে গেলে প্রথমে আসরের সালাত আদায় করেন, তারপর মাগরিবের সালাত আদায় করেন। [বুখারী/৫৬৭-জাবির ইব্‌ন আবদুল্লাহ (রাঃ)]

২। আসরের ফারয সালাতের পরও কাযা সালাত আদায় করা যায়। [বুখারী/অনুচ্ছেদ-৩৪- উম্মে সালামা (রাঃ)]

৩। আবূ কাতাদা (রাঃ) বলেন, লোকেরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট সালাত আদায় না করে ভুলে ঘুমিয়ে যাওয়া সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ ঘুমের বেলায় কোন পাপ নেই, পাপ হল জেগে থাকার বেলায়। তোমাদের কেহ যদি সালাত আদায় করতে ভুলে যায় বা ঘুমিয়ে যায় তাহলে যে সময়ই মনে পড়বে তা আদায় করে নিবে। [তিরমিযী/১৭৭]

৪। মুশরিকরা খন্দক যুদ্ধের সময় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে চার ওয়াক্ত সালাত আদায়ে বিঘ্ন সৃষ্টি করে। এমনকি রাতেরও কিছু অংশ অতিবাহিত হয়ে যায়, কিন্তু তিনি সালাত আদায় করতে পারেননি। পরে তিনি বিলালকে (রাঃ) আযান দিতে বললেন। বিলাল (রাঃ) আযান দিয়ে ইকামাত দিলেন। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহরের সালাত আদায় করলেন, পরে আবার তিনি ইকামাত দিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আসরের সালাত আদায় করলেন, পরে তিনি [বিল্লাল (রাঃ)] আবার ইকামাত দিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাত আদায় করলেন। এরপর তিনি পুনরায় ইকামাত দিলেন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ইশার সালাত আদায় করলেন। [তিরমিযী/১৭৯-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসঊদ (রাঃ), নাসাঈ/৬২৫]

৫। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি সালাতের কথা ভুলে যায়, স্মরণ হওয়া মাত্র সে তা আদায় করে নিবে। এর কোন কাফফারা নেই, বরং আদায় করাই কাফফারা। [বুখারী/৫৬৮, মুসলিম/১৪৩৬, নাসাঈ/৬১৬, আবূ দাউদ/৪৪২]

৬। **আবূ** কাতাদা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা আমরা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি **ওয়া সাল্লামের** সঙ্গে সারা রাত সফর করলাম। পরে রাতের শেষাংশে ফাজরের **নিকটবর্তী** সময়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক স্থানে অব-তরণ **করলেন** এবং কিছুক্ষণ পরই ঘুমিয়ে গেলেন। তাঁর সঙ্গীগণও ঘুমিয়ে

গেলেন। সূর্যের আলোকরশ্মি স্পর্শ না করা পর্যন্ত কেহই জাগ্রত হলেননা। পরে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মুআযযিনকে আযান দিতে আদেশ করলেন। মুআযযিন আযান দিলে তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) দুই রাক'আত ফাজরের সুন্নাত আদায় করলেন। এরপর ইকামাত দিলেন, পরে সাহাবীদের (রাঃ) নিয়ে ফারয সালাত আদায় করলেন। [বুখারী/৫৬৬, মুসলিম/১৪৩৩, নাসাঈ/৬২৪]

৭। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় অবস্থানকালে (একবার) যুহর ও আসরের আট রাক'আত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাক'আত (দুই ইকামাতে) একত্রে আদায় করেন। [বুখারী/ ৫১৪, নাসাঈ/৫৯২]

৮। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) বলেছেন ঃ তাবূকের যুদ্ধের সময় (মনযিল থেকে) বের হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে বের হলে তিনি যুহর উহার শেষ সময়ে এবং আসরের প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবেও তাই করতেন, অর্থাৎ বের হওয়ার পূর্বে সূর্য অস্ত গেলে তিনি মাগরিব ও ইশা উহার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন, আর বের হওয়ার পরে সূর্য অস্ত গেলে তিনি মাগরিব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন। [আবূ দাউদ/১২০৮]

৯। ইবরাহীম (রহঃ) বলেন ঃ কেহ যদি বিশ বছরও এক ওয়াক্তের সালাত ছেড়ে দিয়ে থাকে (উক্ত সালাতের কথা স্মরণ হলে) তাহলে তাকে শুধু সেই (এক) ওয়াক্তের সালাতই পুনরায় আদায় করতে হবে। [বুখারী/অনুচ্ছেদ-৩৮, ২য় খন্ড]

১০। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন নিদ্রা, অসুখ-বিসুখ বা ব্যথা-বেদনার কারণে রাতে তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করতে পারতেননা, তখন তিনি দিনের বেলা ফাজর ও যুহরের সালাতের মাঝে বার রাক'আত সালাত আদায় করে নিতেন। [মুসলিম/১৬১৫, তিরমিযী/৫৮১, নাসাঈ/১৭৯২]

☐ সালাত নির্ধারিত সময়ে আদায় করার জন্য মহান আল্লাহ তা'আলা সূরা নিসার ১০৩ নং আয়াতে ইরশাদ করেন। যে সালাত যে সময়ে আদায় করার জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিবরাঈল (আঃ) শিখিয়েছেন সেই সালাত সেই সময়েই আদায় করা ফারয। উদাহরণ স্বরূপ বলা যায়, আজকের যুহরের সালাত দুপুরে সূর্য একটু পশ্চিম দিকে হেলে যাবার পর থেকে কোন বস্তুর ছায়া পূর্ব দিকে ঐ বস্তুর সমান হওয়া পর্যন্ত সময়ের মধ্যে আদায় করা ফারয। [মুসলিম/১২৬২, ১২৮৩)। উল্লেখিত সময়ের পর ঐ দিনের যুহরের সালাত আর সাধারণভাবে ফারয থাকলনা।

আমাদের সমাজের আলেমগণ, পিছনে ছুটে যাওয়া সালাত বর্তমান ওয়াক্তিয়া সালাতের সাথে ঐ ওয়াক্তের পূর্বের কাযা সালাত আদায় করার ফাতওয়া দিয়ে থাকেন। এ সালাতকে তারা "উমরী কাযা" বলে থাকে। এই প্রকার সালাতের

রেওয়াজ রাসূলাল্লাহু সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সহীহ হাদীসে নেই। বর্তমান সমাজের আলেমগণ উমরী কাযা সালাত জায়েয বলে ফাতওয়া দেয়ার কারণে, অনেকেই নগণ্য অজুহাতে সালাত সময় মত আদায় না করে পরে আদায় করার অভ্যাস করে নিয়েছেন।

আমাদের সমাজে প্রায়ই দেখা যায় যে, যারা নিয়মিত সালাত আদায় করে তাদের মধ্যে শিক্ষিত লোকেরা অনেক দেরিতে রাত্রিতে ঘুমান, ফলে তারা প্রতিদিন ফাজরের সালাত কাযা করেন। তা আল্লাহর নিকট কতটুকু গ্রহণযোগ্য হবে তা আল্লাহই ভাল জানেন।

সারা দিন ইচ্ছা করে সালাত আদায় না করে রাতে ইশার সাথে পিছনের ফাজর, যুহর, আসর বা মাগরিবের সালাতের কাযা আদায়ের কোন দলীল সহীহ হাদীসে নেই। সালাত আপনাকে সময় মত আদায় করতেই হবে। তবে কিছু ব্যতিক্রম আছে। যেমন ভুলে গেলে বা ঘুমিয়ে থাকলে বা অন্য কোন অসুবিধা হলে কি করতে হবে তার সমাধান রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দিয়েছেন।

খৃষ্টানরা যেমন কোন অন্যায় ভুল/ত্রুটি করলে তাদের পাদরী সাহেব হিসাব নিকাশ করে ঐ ব্যক্তির জন্য পাপ মুক্তির লক্ষ্যে জরিমানা সাব্যস্ত করে দেন, অনুরূপভাবে আমাদের মৌলভীগণ কোন লোক সালাত কাযা করে মারা গেলে প্রতি ওয়াক্ত সালাতের (নামাযের) জন্য একটা নির্দিষ্ট টাকার অংক হিসাব করে বের করে মৃত ব্যক্তির ওয়ারীসগণের উপর তা আদায় করার ফাতওয়া জারি করেন। এই টাকার অংককে বলা হয় সালাতের কাফ্ফারা অর্থাৎ অনাদায়ী সালাতের মূল্য। আবার কোন কোন মৌলভীরা কাফফারা না দিলে জানাযার সালাত পড়ানো যাবেনা বলেও মত প্রকাশ করেন।

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, সালাতের কোন কাফ্ফারা নেই। মৌলভীরা এক ওয়াক্ত সালাতের মূল্য কিভাবে নির্ধারণ করল, তার দলীল কি কুরআন কিংবা সহীহ হাদীসে আছে? কোথাও থাকতে পারেনা। কারণ সালাতের মূল্য কোন পার্থিব ধন/দৌলতের বিনিময়ে হতে পারেনা। যদি টাকা দিয়ে সালাত ক্রয় করা যেত তাহলে তো কোটিপতিরা টাকার বিনিময়ে সহজে জান্নাতে চলে যেতে পারত। তাদের সালাত, সিয়াম পালন করার কোনই প্রয়োজন হতনা। এই কাফ্ফারার নির্ধারিত টাকাটা আপনি পরিশোধ করলেন অর্থাৎ সালাতের মূল্য দিয়ে দিলেন। এবার মৌলভীকে জিজ্ঞেস করুন, ঐ সালাতগুলি কি আল্লাহ তা'আলা মৃত ব্যক্তির পক্ষ থেকে কবূল করে নিলেন? আর এ বিষয়ে আপনারাই বিচার করুণ।

ইচ্ছা/অনিচ্ছায় যে কোন কারণেই হোক আল্লাহর নির্দেশ/আদেশ পালন করতে না পারলে তাওবা করাই হল এর প্রতিকার ঃ

১। যখন কেহ অশ্লীল কাজ করে কিংবা স্বীয় জীবনের প্রতি অত্যাচার করে অতঃপর আল্লাহকে স্মরণ করে এবং অপরাধসমূহের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে, এবং

আল্লাহ ব্যতীত কে অপরাধসমূহ ক্ষমা করতে পারে? এবং তারা যা করছে সেই ব্যাপারে জেনে শুনে হঠকারিতা করেনা। [সূরা আলে ইমরান-১৩৫]

২। আর যে তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎকাজ করে আর সৎপথে অটল থাকে, আমি তার জন্য অবশ্যই অতি ক্ষমাশীল। [সূরা তাহা-৮২]

৩। তারা নয় যারা তাওবাহ করে, ঈমান আনে ও সৎ কাজ করে; আল্লাহ তাদের পাপ পরিবর্তন করে দিবেন উত্তম আমলের দ্বারা; আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা ফুরকান-৭০]

৪। নিশ্চয়ই আল্লাহ তাঁর সাথে শরীক করা ক্ষমা করবেননা। এটা ছাড়া অন্য সব যাকে ইচ্ছা ক্ষমা করবেন এবং যে আল্লাহর সাথে শরীক করল, সে এক মহা অপবাদ আরোপ করল। [সূরা নিসা-৪৮]

৫। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ নিসা-১১৬, যুমার-৫৩-৫৪, তাওবা-৭৪।

দুই ওয়াক্তের সালাত একত্রে আদায় করা প্রসঙ্গ

১। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাদীনায় অবস্থানকালে (একবার) যুহর ও আসরের আট রাক'আত এবং মাগরিব ও ইশার সাত রাক'আত (পৃথক ইকামাতের মাধ্যমে) একত্রে মিলিয়ে আদায় করেন । [বুখারী/৫১৪-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), নাসাঈ/৫৯২]

২। মু'আয ইব্‌ন জাবাল (রাঃ) বলেছেন ঃ তাবূকের যুদ্ধের সময় (মানযিল থেকে) বের হওয়ার পূর্বে সূর্য ঢলে পড়লে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যুহর ও আসরের সালাত একত্রে আদায় করতেন এবং সূর্য ঢলে পড়ার পূর্বে বের হলে তিনি যুহর উহার শেষ সময়ে এবং আসরের প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন। তিনি মাগরিবেও তাই করতেন, অর্থাৎ বের হওয়ার পূর্বে সূর্য অস্ত গেলে তিনি মাগরিব ও ইশা উহার প্রথম সময়ে একত্রে আদায় করতেন, আর বের হওয়ার পরে সূর্য অস্ত গেলে তিনি মাগরিব বিলম্ব করে ইশার সাথে একত্রে আদায় করতেন। [আবূ দাউদ/১২০৮]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৫৩৩, ৫৬৮।

(ক) সফরে বা যে কোন বিপদ-আপদে, অসুস্থ অবস্থায় উপরোক্ত নিয়মে একত্রে সালাত আদায় করা যায়।

(খ) কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে জানা যায় যে, আসর এবং ইশা সালাত কাযা করা উচিত নয়। এমতাবস্থায় উপরোক্ত নিয়ম-কানূন না জানার ফলে লোকেরা সালাত ঠিকমত আদায় করেনা।

মহিলাদের সালাতের নিয়ম

১। মহিলারা জুমু'আর দিন মাসজিদে যেতে পারবে। [বুখারী/ ৮২৬]

২। মহিলাদের জামা'আতে মহিলা ইমামতি করলে কাতারের মাঝখানে দাঁড়াবে। [বাইহাকী]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কারো স্ত্রী মাসজিদে যেতে চাইলে তাকে নিষেধ করবেনা। [মুসলিম/৮৭৩-ইব্‌ন উমার (রাঃ)]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে নারী মাসজিদে আসবে সে যেন খুশবু স্পর্শও না করে। [মুসলিম/৮৮০-যাইনাব (রাঃ)]

৫। মাসজিদে মহিলারা সালাত আদায় করতে এলে অবশ্যই চাদর/পর্দা ব্যবহার করতে হবে। [নাসাঈ/৫৪৯-আয়িশা (রাঃ)]

৬। আয়িশা (রাঃ) বলেন, নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ প্রাপ্ত বয়স্ক মহিলারা ওড়না ছাড়া সালাত আদায় করলে তা আল্লাহর দরবারে কবূল হবেনা। [বুখারী/৩৬৫, আবূ দাউদ/৬৪১]

৭। ঈদের জামা'আতে মহিলারা উপস্থিত হতে পারবে।

(ক) হাফসা (রাঃ) বলেছেন ঃ বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তঃপুরবাসিনী ও ঋতুবতী মহিলাগণ সৎ (পুণ্য) কাজে এবং মুসলিমদের দু'আর মাজলিসে উপস্থিত হতে পারবে এবং ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। [আবূ দাউদ/১১৩৬-উম্মে আতিয়া (রাঃ), নাসাঈ/৩৯০]

(খ) উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেছেন ঃ (ঈদের সালাতের উদ্দেশে) সাবালিকা পর্দানশীল মেয়েদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হত। [বুখারী/৯২৪]

(গ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালিকা, তরুণী, গৃহিনী, যুবতী সকল মহিলাকেই সালাতুল ঈদে বের হওয়ার জন্য বলতেন। তবে রজঃবতী মহিলারা সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকতেন। তারা কেবল মুসলিমদের সঙ্গে দু'আয় শরীক হতেন। জনৈক মহিলা একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ যদি কারো চাদর না থাকে তাহলে সে কিভাবে বের হবে? তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বললেন ঃ তার কোন বোন তাকে একটি চাদর ধার দিবে। [তিরমিযী/৫৩৯-আতিয়া (রাঃ)]

৮। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/৬৪৮, ৬৮৯, ১১২৫, মুসলিম/৮৩৭, আবূ দাউদ/৫৯২, ৬৩৯, তিরমিযী/৩৬৯, নাসাঈ/১২১০, ইব্‌ন মাজাহ/১০৩৪।

⧉ (ক) মুসলিম হিসাবে এবং উপরোক্ত সহীহ হাদীস অমান্য করে মহিলাদেরকে আমরা জুমু'আ বা ঈদের সালাতে গমন করতে দিইনা। কিন্তু চাকুরিতে, ব্যবসা-বানিজ্যে, কেনা-কাটা করতে, ভ্রমন করতে মহিলাদেরকে নিষেধ করিনা, যা অতীব দুঃখ জনক। রাসূল (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেছেন ঃ তোমরা সালাত আদায় কর, যেমনভাবে আমাকে সালাত আদায় করতে দেখছ। [বুখারী/৬০১]

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জিবরাঈল (আঃ) কাবা ঘরের নিকট দু'বার ইমামতি করে সালাত আদায় করা শিক্ষা দান করেন। কিন্তু মহিলাদের জন্য আলাদাভাবে সালাতের কোন শিক্ষা দেননি বলেই তা হাদীসে উল্লেখ নেই। [আবূ দাউদ/৩৯৩]

(গ) সালাত আদায় করার ব্যাপারে পুরুষ ও মহিলাদের জন্য কোন আলাদা নিয়ম-পদ্ধতি নেই।

(ঘ) মহিলাগণ যখন জামা'আতে সালাত আদায় করবেন তখন পুরুষদের পিছনে পৃথক সারি বেঁধে দাঁড়াবেন, মহিলা একজন হলেও পিছনে একাই কাতার করে দাড়াবেন। [বুখারী/৬৮৯, নাসাঈ/৮০৪, ৮০৬, তিরমিযী/২৩৪]

(চ) সালাতে মহিলারা মুখে কোন শব্দ উচ্চারণ করবেনা। ইমামের ভুল ধরাতে হলে পুরুষ "সুবহানাল্লাহ" বলবেন এবং মহিলাগণ হাতের পিঠে হাত মেরে 'শব্দ' করবেন। [বুখারী/১১২৫, ৬৪৮, মুসলিম/৮৩৭, তিরমিযী/৩৬৯, নাসাঈ/১২১০]

(ছ) মহিলাগণ পুরুষদের শেষে মাসজিদে আসবেন এবং পুরুষদের আগে মাসজিদ হতে চলে যাবেন। [আবূ দাউদ/১০৪০]

(ক) বর্তমান সমাজের আলেমগণ কুরআন ও সহীহ হাদীসকে অমান্য করে তাদের মনগড়া ফাতওয়া দিয়ে মহিলাদের সালাত আদায়ে নূতন নিয়ম-কানুন বানিয়ে দিয়েছেন, যা নিম্নরূপ ঃ

(১) তাদের জন্য মাসজিদে জামা'আতে শরীক হওয়া নিষিদ্ধ বলে মনে করে।

(২) মহিলাদের জন্য কোন পুরুষ ইমাম হওয়া জায়েয নয় বলে মন্তব্য করেন।

(৩) মহিলারা তাকবীরে তাহরীমা বাঁধার সময় হাত কাঁধ পর্যন্ত উঠাবে। (৪) মহিলারাই শুধু সালাতে হাত বুকের উপর রাখবে। (৫) মহিলারা রুকূতে পুরুষদের তুলনায় কম ঝুঁকাবে এবং রুকূতে উভয় বাহু পাঁজরের সঙ্গে পরিপূর্ণ মিলিয়ে রাখবে। (৬) তারা সাজদায় পুরুষের ন্যায় কনুইদ্বয় খোলা ও ছড়িয়ে রাখবেনা। (৭) সাজদায় উভয় রানের সঙ্গে পেট মিলিয়ে রাখবে। (৮) বাহুদ্বয় সাধ্যনুযায়ী পাঁজরের সঙ্গে মিলিয়ে রাখবে। (৯) সাজদায় উভয় হাতের কনুইও মাটিতে রাখবে। (১০) সাজদায় যাওয়ার সময় প্রথমে বসে তারপর সাজদায় যায় ইত্যাদি, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত পদ্ধতি। মুসলিম হিসাবে আল্লাহ যেন সকল পুরুষ ও মহিলাকে কুরআন ও সহীহ হাদীস অনুযায়ী সালাত কায়েম করার তাওফীক দান করেন।

মাসজিদের মধ্যে হারানো জিনিষের ঘোষণা দেয়া প্রসঙ্গ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন লোককে মাসজিদে কোন হারানো বস্তু (উচ্চস্বরে) তালাশ করতে শুনবে তখন সে বলবেঃ আল্লাহ তোমাকে তা ফিরিয়ে না দিক। কেননা মাসজিদ এ জন্য তৈরী হয়নি। [মুসলিম/১১৪০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ইব্ন মাজাহ/৭৬৭]

আমাদের মাসজিদসমূহে প্রায় সময়ই মাইকে শোনা যায় যে, অমুক গ্রামে অমুক জিনিস চুরি হয়েছে বা মাসজিদে অমুক জিনিস হারানো গেছে বা অমুক জিনিস পাওয়া গেছে। বিধায় মাসজিদ থেকে যে কোন প্রচার করা সহীহ হাদীসের প্রতিকূল ।

উযূর পর সালাত প্রসঙ্গ

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদিন ফাজরের সালাতের সময় বিলালকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ হে বিলাল! ইসলাম গ্রহণের পর সর্বাধিক আশাব্যঞ্জক যে আমল তুমি পালন করেছ, তার কথা আমাকে ব্যক্ত কর। কেননা জান্নাতে আমার সামনে তোমার পায়ের আওয়াজ শুনতে পেয়েছি। বিলাল (রাঃ) বললেন ঃ দিন রাতের যে কোন প্রহরে যখনই আমি উযূ ও পবিত্রতা অর্জন করেছি তখনই ঐ উযূ দ্বারা সালাত আদায় করেছি যে পরিমাণ সালাত আদায় করা আমার তাকদীরে লেখা ছিল। এর চেয়ে (অধিক) আশাব্যঞ্জক এমন কোন বিশেষ আমল আমি করিনি। [বুখারী/১০৭৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ), ৫৯৭৭]

◫ উপরোক্ত হাদীসটির তাৎপর্য ভাল করে বুঝিনা বলেই আমরা উযূ করার পর বাসায় হোক বা মাসজিদে হোক দুই রাক'আত সালাত আদায় করিনা। এ সালাত আদায়ে অত্যাধিক সাওয়াব আছে।

সালাতুয যুহা বা চাশতের সালাত

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমাদের কেহ যখন ভোরে উঠে তখন তার প্রতিটি জোড়ার উপর একটি সাদাকা রয়েছে। প্রতি সুবহানাল্লাহ সাদাকা, প্রতি আলহামদুলিল্লাহ সাদাকা, প্রতি লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ সাদাকা, প্রতি আল্লাহু আকবার সাদাকা, আমর বিল মারুফ (সৎ কাজের আদেশ) সাদাকা, নাহি আনিল মুনকার (অসৎ কাজে নিষেধ) সাদাকা। অবশ্য চাশতের সময় দু' রাক'আত সালাত আদায় করা এ সবের পক্ষ থেকে যথেষ্ট। [মুসলিম/১৫৪১-আবূ যার (রাঃ)]

২। আল্লাহ প্রেমিকদের সালাতের সময় হল যখন উট শাবকের পায়ে উত্তাপ লাগে (অর্থাৎ মাটি গরম হয়ে যায়, উক্ত সময়ের সালাত হল চাশ্‌ত সালাত)। [মুসলিম / ১৬১৭- যায়িদ ইব্‌ন আরকাম (রাঃ)]

৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আমাকে দু' রাক'আত চাশ্‌ত সালাত আদায়ের জন্য বিশেষভাবে আদেশ করেছেন। [বুখারী/১০৯৩]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য হাদীসসমূহ দেখুন ঃ বুখারী/১১০৩, মুসলিম/১৫৩৩, ১৫৪২, তিরমিযী/৪৭৫, ৪৭৬, ইব্‌ন মাজাহ/১৩৮১, ১৩৮২।

◫ সালাতুয যুহা বা চাশত এর ফাযীলাত অনেক। তবে উক্ত সালাতের মর্মার্থ ও সাওয়াবের কথা চিন্তা করিনা বলেই আমরা এই সালাত আদায় করার চেষ্টাও করিনা, যা আদায় করা উচিত।

তাহাজ্জুদ সালাত প্রসঙ্গ

১। আল্লাহ বলেন ঃ

وَمِنَ اللَّيْلِ فَتَهَجَّدْ بِهِ نَافِلَةً لَّكَ عَسَى أَن يَبْعَثَكَ رَبُّكَ مَقَامًا مَّحْمُودًا

এবং রাতের কিছু অংশে তাহাজ্জুদ কায়েম করবে, এটা তোমার এক অতিরিক্ত কর্তব্য। আশা করা যায়, তোমার রাব্ব তোমাকে প্রতিষ্ঠিত করবেন প্রশংসিত স্থানে। [সূরা বানী ইসরাইল-৭৯]

২। রাত্রি জাগরণ কর (ইবাদাতের জন্য), কিছু অংশ ব্যতীত, অর্ধ রাত কিংবা তদপেক্ষা অল্প অথবা তদপেক্ষা বেশি। [সূরা মুয্যাম্মিল-২-৪]

৩। ফার্য সালাতের পর সবচেয়ে ফাযীলাতের সালাত হল রাতের (তাহাজ্জুদ) সালাত। [মুসলিম/২৬২২-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/ ৪৩৮, নাসাঈ/১৬১৬]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ মহামহিম আল্লাহ তা'আলা প্রতি রাতের শেষ তৃতীয়াংশ অবশিষ্ট থাকাকালে নিকটবর্তী আসমানে অবতরণ করে ঘোষণা করতে থাকেন, কে আছে এমন যে আমাকে ডাকবে? আমি তার ডাকে সাড়া দিব। কে আছে এমন যে আমার কাছে প্রার্থনা করবে? আমি (তার প্রার্থিত বস্তু) তাকে দান করব। কে আছে এমন যে আমার কাছে ক্ষমা চাইবে? আমি তাকে ক্ষমা করব। [বুখারী/১০৭৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/৪৪৬, মুসলিম/১৬৪২, ১৬৪৩, ১৬৪৪, ইব্ন মাজাহ/১৩৬৬]

৫। এ বিষয়ে কুরআনের অন্যান্য আয়াত ও হাদীসসমূহ দেখুন ঃ সূরা দাহর-২৬, হা মীম আস সাজদাহ-১৬-১৭। বুখারী/১০৬৫, ১০৬৬, ১০৭১, ১০৭৫, ১০৭৬, ১০৮২, ৪২০১, ৪২০২, ৪২০৩, মুসলিম/১৫৯৩, ১৫৯৮, ১৬১৫, ১৬১৮, ১৬৩৩, ১৬৮৯, নাসাঈ/১৬১০, ১৬১৩, ১৬২০, ১৬৭৪, ১৭৬৭, ১৭৯২, ইব্ন মাজাহ/১৩১৮, ১৩২৯, ১৩৩৬, ১৩৫৬, ১৩৬৫, ।

(ক) বর্তমান সমাজের অধিকাংশ লোক তাহাজ্জুদ সালাত সম্বন্ধে উদাসীন।

(খ) ফার্য সালাতের পর এই সালাতের ফাযীলাত বেশী। কিন্তু আমরা গুরুত্ব দিইনা।

(গ) কেহ কেহ বলেন যে, এই সালাত কেহ আদায় করা শুরু করলে আর ছাড়া যাবেনা। এ সকল কথা ঠিক না।

(ঘ) সকল বয়সের প্রত্যেক পুরুষ ও মহিলাদের তাহাজ্জুদ সালাত আদায় করা উচিত।

বিত্‌র সালাত সম্পর্কীত

১। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ বিত্‌রকে তোমাদের রাতের শেষ সালাত কর। [বুখারী/৯৩৯-আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ), ৪৫৮, তিরমিযী/৪৩৭, নাসাঈ/১৬৮৫, মুসলিম/১৫৯৯]

২। একই রাতে দুইবার বিত্‌রের সালাত আদায় করা যায়না। [আবূ দাউদ/১৪৩৯-কায়েস ইব্ন তাল্‌ক (রহঃ), নাসাঈ/১৬৮২]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুবহে সাদিকের আগেই তোমরা বিত্‌র আদায় করে নিবে। [তিরমিযী/৪৬৭-ইব্ন উমার (রাঃ), তিরমিযী/৪৬৬, মুসলিম/১৬২৩, নাসাঈ/১৬৮৭]

৪। যে ব্যক্তি নিদ্রা বা ভুলের কারণে বিত্‌র সালাত আদায় করেনি সে যেন তা স্মরণ হওয়ার পরপরই আদায় করে নেয়। [আবূ দাউদ/১৪৩১-আবূ সায়ীদ (রাঃ)]

৫। রাতের সব অংশেই রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বিত্‌র আদায় করেছেন। রাতের প্রথম অংশে, মাঝরাতে এবং শেষ রাতে। শেষ পর্যায়ে তাঁর বিত্‌রের অভ্যাস ছিল সাহরীর সময়। [মুসলিম/১৬০৭-আয়িশা (রাঃ), বুখারী/৯৩৭, তিরমিযী/৪৫৭, ইব্‌ন মাজাহ/১১৮৬]

৬। বিত্‌রের সালাতে কিরা'আত জোরে অথবা আস্তে উভয় অবস্থায় পাঠ করা যায়। [আবূ দাউদ/১৪৩৭-আবূ কায়েস (রাঃ)]

৭। বিত্‌র সালাতের শেষ রাক'আতে রুকূর পর দাঁড়িয়ে বা রুকূর আগে দু'আ কুনূত পাঠ করা যায়। [বুখারী/৯৪২-মুহাম্মাদ ইব্‌ন সীরিন (রঃ), ৯৪৩, ইব্‌ন মাজাহ/১১৮৩]

৮। সফর করা অবস্থায় বিত্‌র সালাত আদায় করতে হবে। [বুখারী/৯৪১-ইবন উমার (রাঃ)]

৯। এক, তিন ও পাঁচ রাক'আত বিতর সালাতে বৈঠক একটি ঃ

(১) বিত্‌র সালাত ১ রাক'আত ঃ

রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাক'আত বিত্‌র সালাত আদায় করতেন এবং উম্মাতকেও এক রাক'আত আদায় করতে নির্দেশ দিয়েছেন। [বুখারী/৪৫৯, ৯৩৪, ১০৬৬, তিরমিযী/৪৬১, মুসলিম/১৫৯৭, ১৬১৯, নাসাঈ/১৬৯২, ১৭১৩, ইব্‌ন মাজাহ/১১৭৪, ১১৭৭, ১১৯০]

(২) বিত্‌র সালাত ৩ রাক'আত ঃ

(ক) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তিন রাক'আত বিত্‌র সালাত আদায় করেছেন। [বুখারী/৯৩৪, নাসাঈ/১৭১৩, তিরমিযী/৪৬০, ইব্‌ন মাজাহ/১১৯০]

(খ) আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা তিন রাক'আত বিত্‌র সালাত মাগরিবের সালাতের মত আদায় করবেনা (অর্থাৎ মাগরিবের সালাতের মত তিন রাক'আত বিত্‌রের ২য় রাক'আতে আত্তাহিয়াতু পাঠ করবেনা। বরং একটানা তিন রাক'আত আদায় করার পর আত্তাহিয়্যাতু, দুরূদ ও দু'আয়ে মাসুরা পড়ে সালাম ফিরাতে হবে)। [দারাকুতনী, নাইলুল আওতার]

(৩) বিত্‌র সালাত ৫ রাক'আত ঃ

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পাঁচ রাক'আত বিত্‌র আদায় করেছেন। এর শেষ রাক'আত ছাড়া কখনও বসতেননা। [মুসলিম/১৫৯০, তিরমিযী/৪৫৯, ইব্‌ন মাজাহ/১১৯০, নাসাঈ/১৭১৩, ১৭২০]

(৪) বিতর সালাত ৭ রাক'আত অথবা ৯ রাক'আতও আদায় করা যায়। [নাসাঈ/১৭২১, মুসলিম/১৬০৯]

⧉ (ক) বিতর সালাত এক রাক'আত আদায় করা যায় এ কথা আমাদের সমাজের লোকেরা অনেকেই জানেনা।

(খ) আমরা যারা তিন রাক'আত বিতর সালাত আদায় করি তারা মাগরিবের ফার্য সালাতের ন্যায় দু'রাক'আত আদায় করার পর তাশাহহুদ পাঠ করার জন্য বসি। কিন্তু উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী দেখা যায় যে, তিন রাক'আত বিতর সালাতে কেবলমাত্র শেষ রাক'আতে বসতে হয়। অনুরূপভাবে পাঁচ রাক'আত বিতর সালাতেও কেবলমাত্র শেষ রাক'আতে বসতে হয়।

(গ) বিতর সালাতে হাদীস অনুযায়ী শেষ রাক'আতে রুকূর পর দাঁড়িয়ে মুনাজাতের ন্যায় অথবা রুকুর পূর্বে সূরা ফাতিহা, অন্য সূরা এবং দু'আ কুনূত পাঠ করতে হয়। কিন্তু আমরা শেষ রাক'আতে সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করে তাকবীর তাহরীমার ন্যায় আবার তাকবীর দিয়ে হাত বেঁধে দু'আ কুনূত পাঠ করি। সহীহ হাদীসে এরূপ নিয়ম পাওয়া যায়না ।

সফরের সালাত সম্পর্কীত

১। আল্লাহ বলেন ঃ

وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الأَرْضِ فَلَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَن تَقْصُرُواْ مِنَ الصَّلاَةِ إِنْ خِفْتُمْ أَن يَفْتِنَكُمُ الَّذِينَ كَفَرُواْ إِنَّ الْكَافِرِينَ كَانُواْ لَكُمْ عَدُوًّا مُّبِينًا

তোমরা যখন দেশ বিদেশে সফর করবে, তখন যদি তোমাদের আশংকা হয় যে, কাফিরেরা তোমাদের জন্য ফিতনা সৃষ্টি করবে তাহলে সালাত সংক্ষিপ্ত করলে তোমাদের কোন দোষ নেই। কাফিরেরা তোমাদের প্রকাশ্য শত্রু। [সূরা নিসা- ১০১]

২। ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ) বলেন ঃ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার সফরে উনিশ দিন পর্যন্ত অবস্থান করেন এবং সালাতে কসর করেন। সুতরাং (কোথাও) আমরা উনিশ দিনের সফরে থাকলে কসর করি এবং এর চেয়ে বেশি হলে পুরোপুরি সালাত আদায় করি। [বুখারী/১০১৪,৩৯৫৫, তিরমিযী/৫৪৯, ইব্‌ন মাজাহ/১০৭৫]

৩। সফরে সুন্নাত সালাত নেই। [মুসলিম/১৪৫০-হাফস ইব্‌ন আসিম (রঃ)]

৪। সফরকালে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ফাজরের দু' রাক'আত সুন্নাত সালাত আদায় করেছেন। [বুখারী/অনুঃ-৩৫৫]

৫। সফরের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাত বিলম্বে (দেরীতে) আদায় করেছেন, এমনকি মাগরিবের তিন রাক'আত ও ইশার দু'রাক'আত পৃথক ইকামাতের মাধ্যমে একত্রে আদায় করেছেন। [বুখারী-১০২৫, ১০৩৭- আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/১৪৯১, ১৪৯২, তিরমিযী/৫৫৩, ৫৫৫]

৬। সফরে থাকাকালীন সময়ে কেবল মুসাফিরের জন্য চার রাক'আত বিশিষ্ট ফার্য সালাতগুলির (যুহর, আসর, ইশা) কসর হিসাবে দু' রাক'আত আদায় করতে হবে। [মুসলিম/১৪৪৫, ১৪৪৬]

(ক) কুরআন/হাদীসের নির্দেশনা না জানার কারণে আমাদের অনেকেরই সফরের সালাত কিভাবে এবং কেন পড়তে হয় তা জানা নেই।

(খ) সহীহ হাদীস অনুযায়ী দেখা যায় যে, সফরে ১৯ দিন পর্যন্ত কসর সালাত আদায় করা যায়। কেহ কেহ বলেন যে, ১৫ দিন পর্যন্ত সফরে সালাত কসর করতে হবে। তা কতটুকু যুক্তিযুক্ত আল্লাহই ভাল জানেন।

(গ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশ অনুযায়ী সফরের সময় ফাজর ছাড়া অন্য ওয়াক্তের সালাতে সুন্নাত নেই । উক্ত হাদীস অমান্য করে আমরা অনেকেই অন্যান্য ওয়াক্তের সুন্নাত সালাত আদায় করি। এ বিষয়ে আল্লাহই ভাল জানেন ।

সফরে সালাত জমা করা প্রসঙ্গ

১। সফরের কারণে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাগরিবের সালাত বিলম্বে (দেরীতে) আদায় করেছেন, এমনকি মাগরিবের তিন রাক'আত ও ইশার দু'রাক'আত পৃথক ইকামাতের মাধ্যমে একত্রে আদায় করেছেন। [বুখারী/১০২৫, ১০৩৭-আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/১৪৯১, ১৪৯২, তিরমিযী/৫৫৩, ৫৫৫]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সূর্য ঢলে পড়ার আগে সফর শুরু করলে আসরের ওয়াক্ত পর্যন্ত যুহর বিলম্বিত করতেন এবং দু'টি একত্রিত করতেন। আর (সফর শুরু করার আগেই) সূর্য ঢলে গেলে যুহর আদায় করে সফরের উদ্দেশে আরোহণ করতেন। [বুখারী/১০৪০-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), মুসলিম/১৪৯৫, ১৪৯৭]

(ক) আমরা যারা সালাত নিয়মিত আদায় করি তাদের অধিকাংশ সফরে গেলে সচরাচর ঠিক মত সালাত আদায় করিনা।

(খ) কোন মুসলিমের যাতে সফরের সময় সালাত আদায় করতে কষ্ট না হয় সে দিক বিবেচনা করেই রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর তরফ থেকে উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী সালাত আদায়ের সুন্দর পদ্ধতি আমাদেরকে বাতলে দিয়েছেন, যাতে সফরের সময় কেহ যেন সালাত আদায় করা থেকে বিরত না থাকে।

জুমু'আর সালাতের গুরুত্ব

১। আল্লাহ বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِذَا نُودِيَ لِلصَّلَاةِ مِن يَوْمِ الْجُمُعَةِ فَاسْعَوْا إِلَىٰ ذِكْرِ اللَّهِ وَذَرُوا الْبَيْعَ ذَٰلِكُمْ خَيْرٌ لَّكُمْ إِن كُنتُمْ تَعْلَمُونَ

হে মু'মিনগণ ! জুমু'আর দিন যখন সালাতের জন্য আহ্বান করা হয় তখন তোমরা আল্লাহর স্মরণে ধাবিত হও এবং ক্রয় বিক্রয় ত্যাগ কর। এটা তোমাদের জন্য অতি উত্তম, যদি তোমরা উপলব্ধি কর। [সূরা জুমু'আ-৯]

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সূর্য উদিত হয় এমন সকল দিনের মধ্যে শ্রেষ্ঠ দিন হল জুমু'আর দিন। এই দিনই আদমকে (আঃ) সৃষ্টি করা হয়। এ দিনই তাঁকে জান্নাতে প্রবেশ করান হয়। এ দিনই তাঁকে তা থেকে বের করা হয়। আর এই জুমু'আর দিনই কিয়ামাত সংঘটিত হবে। [মুসলিম/১৮৪৭, তিরমিযী/৪৮৮]

৩। ঐ সমস্ত লোক যারা জুমু'আর সালাতে শামিল হয়না তাদের সম্পর্কে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমি ইচ্ছা করি যে, এক ব্যক্তিকে লোকদের নিয়ে সালাত আদায়ের নির্দেশ দিই, আর যারা জুমু'আয় শামিল হয়না, সে সব লোকসহ তাদের ঘর আগুন দিয়ে জ্বালিয়ে দিই। [মুসলিম/১৩৫৮-আবদুল্লাহ (রাঃ)]

৪। জুমু'আর দিন যে সকাল সকাল গোসল করল এবং গোসল করার পর ইমামের কাছে গিয়ে বসে চুপ করে মনোযোগ দিয়ে খুৎবা শুনল তার প্রত্যেক পদক্ষেপের বিনিময়ে রয়েছে এক বছরের সিয়াম ও কিয়ামের (সালাতের) সাওয়াব। [নাসাঈ/৪৯৬, ১৩৮৪, তিরমিযী/৪৯৬]

৫। প্রত্যেক সাবালক ব্যক্তির উপর শুক্রবার গোসল করা ও মিসওয়াক করা কর্তব্য এবং সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করবে। [বুখারী/৮৩১-আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ), ৮৩৮, মুসলিম/১৮৩০, নাসাঈ/ ১৩৭৮, তিরমিযী/৪৯৭]

(ক) জুমু'আর দিনের ফাযীলাত কুরআন ও সহীহ হাদীসে বিদ্যমান থাকা সত্ত্বেও আমরা যারা নিয়মিত সালাত আদায় করি তারাও জুমু'আর দিন বিভিন্ন কাজের অজুহাতে মাসজিদে দেরিতে গমন করি।

(খ) জুমু'আর দিন গোসল করা, সুন্দর পোশাক পরা, মিসওয়াক করা ও সামর্থ্য অনুযায়ী সুগন্ধি ব্যবহার করা উচিত। কিন্তু উক্ত নিয়ম নীতি না জানার ফলে এবং সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও আমরা অনেক সাওয়াব থেকে বঞ্চিত হচ্ছি।

কেহকে উঠিয়ে দিয়ে বা ডিঙ্গিয়ে মাসজিদের মধ্যে সামনে যাওয়া প্রসঙ্গ

১। নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম নিষেধ করেছেন, কেহ যেন তার ভাইকে জুমু'আ ও অন্যান্য সময় তার বসার জায়গা থেকে উঠিয়ে দিয়ে নিজে সেই স্থানে না বসে । [বুখারী/৮৬০-ইবন উমার (রাঃ)]

২। শুক্রবার মাসজিদের ভিতর এক ব্যক্তি মানুষের ঘাড় ডিংগিয়ে সম্মুখে আসছিল, তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁকে বললেন ঃ বসে পড়, তুমি মানুষকে কষ্ট দিচ্ছ। [নাসাঈ/১৪০২-আবদুল্লাহ ইব্ন বুসর (রাঃ), তিরমিযী/৫১৩]

৩। ইমাম খুৎবা প্রদানের সময় দুই হাঁটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে হাত দিয়ে বা কোন কাপড় দিয়ে হাঁটুদ্বয় বেষ্টন করে বসা নিষেধ। [তিরমিযী/৫১৪-মু'আয (রাঃ)]

(ক) আমাদের মাসজিদগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, শিক্ষিত লোকেরা মাসজিদে এসেই পূর্বের বসা লোককে বলেন যে, ভাই একটু চাপেন/সরে বসুন, সালাত আদায় করব, যা করা উচিত নয়।

(খ) জুমু'আর দিন কিছু সংখ্যক শিক্ষিত লোক দেরিতে মাসজিদে আসেন, আর অন্য লোকদের ঘাড় ডিঙ্গিয়ে মাসজিদের ভিতরে ১ম বা ২য় সারিতে যাওয়ার চেষ্টা করেন, যা উচিত নয়।

(গ) তা ছাড়াও জুমু'আর দিন মাসজিদে প্রায়ই দেখা যায়, লোকেরা দুই হাটু খাড়া করে নিতম্বের উপর বসে হাত দিয়ে হাটুদ্বয় বেষ্টন করে বসে, যা হাদীসের পরিপন্থী।

মাতৃ ভাষায় খুৎবাহ প্রদান

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ আমি সমস্ত রাসূলদেরকেই তাঁদের নিজ জাতির ভাষা-ভাষী করেই প্রেরণ করেছি, যাতে তাদেরকে পরিস্কার করে বুঝাতে পারে। [সূরা ইবরাহীম-৪]

২। তার নির্দশনাবলীর মধ্যে রয়েছে আকাশমন্ডলী ও পৃথিবীর সৃষ্টি এবং তোমাদের ভাষা ও বর্ণের বৈচিত্র। এতে জ্ঞানীদের জন্য অবশ্যই নিদর্শন রয়েছে। [সূরা রূম-২২]

খুৎবাহ শব্দটির অর্থ বক্তৃতা। জুমু'আর দিন যে খুৎবাহ বা বক্তৃতা দেয়া হয় তার একমাত্র উদ্দেশ্য হল মানুষদেরকে শারীয়াতের আহকাম, বিধি-বিধান, নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেয়া, যাতে মানুষ জীবনকে সঠিক সরল পথে পরিচালিত করতে পারে এবং দুনিয়া ও আখিরাতের কল্যাণ হাসিল করতে পারে। তাইতো আল্লাহ তা'আলা সমস্ত নাবী/রাসূলদেরকে তাদের কাওমের কাছে তাদের নিজ ভাষা-ভাষী করে প্রেরণ করেছেন। অতএব বুঝা গেল, মানুষদেরকে বুঝানোর জন্য খুৎবাহ বা বক্তৃতা দিতে হবে তাদের নিজের ভাষায়। এখন যদি কেহ কোন বাংলা ভাষীকে আরাবীতে কোন মাস'আলা শিক্ষা দেয় তাহলে তার কোন উপকারেই আসবেনা। কারণ সে তো আরাবী বুঝেনা। তাকে মাস'আলা বাংলাতেই শিক্ষা দিতে হবে। আর ইসলামের নিয়ম-কানূন শিক্ষা দেয়ার জন্যই খুৎবাহ দেয়া হয়। খুৎবাহ না বুঝলে তা দেয়ার কোন মূল্যই হলনা। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম মাতৃভাষায় খুৎবাহ দিয়েছেন। আমাদেরকেও মাতৃভাষায় খুৎবাহ প্রদান করতে হবে। এটাই সুন্নাহ।

কারণ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আরাবীতে কথা বলেছেন। সেই অনুসারে আমাদের আরাবীতে কথা বলা সুন্নাহ নয়। বরং তিনি মাতৃভাষায় কথা বলেছেন। আমরাও মাতৃভাষায় কথা বলতে বাধ্য, এটাই সুন্নাহ। রাসূল (সাঃ) এর মাভৃভাষা ছিল আরাবী আর আমাদের মাতৃভাষা হল বাংলা।

নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর খুৎবাহ দিয়েছেন দু'টি। অনুবাদের নামে বসে বসে বা দাঁড়িয়ে খুৎবাহর সংখ্যা তিনটি করা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আমলের বিপরীত, এটা গ্রহণীয় নয়। তাই আসুন কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করি এবং তিনটি খুৎবাহ পরিত্যাগ করে মাতৃভাষায় দু'টি খুৎবাহ দিয়ে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের দু' খুৎবার অনুকরণ করি। এটিই ইসলাম।

আল্লাহ আমাদেরকে সঠিক বুঝ দান করে কুরআন ও হাদীসের উপর আমল করার তাওফীক দান করুন । আমীন।

জুমু'আর সালাতের রাক'আতসমূহ

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর খুৎবা প্রদানকালে বলেছেন ঃ তোমরা কেহ এমন সময় মাসজিদে উপস্থিত হলে যখন ইমাম (জুমু'আর) খুৎবা দিচ্ছেন, কিংবা মিম্বরে আরোহণের জন্য বেরিয়ে পড়েছেন, তাহলে সে যেন দু' রাক'আত সালাত আদায় করে নেয় । [বুখারী/১০৯২-আবদুল্লাহ (রাঃ), নাসাঈ/১৩৯৮]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জুমু'আর ফারয সালাত মাসজিদে আদায়ের পর নিজের ঘরে ফিরে না যাওয়া পর্যন্ত সালাত আদায় করতেননা। (ঘরে গিয়ে) দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। [বুখারী/ ৮৮৫-আবদুল্লাহ ইব্‌ন উমার (রাঃ), মুসলিম/১৯০৯, তিরমিযী/৫২১]

৩। তোমরা জুমু'আর পর সালাত আদায় করলে চার রাক'আত (দু' দু' রাক'আত করে) আদায় করবে। যদি তোমার তাড়াহুড়া থাকে তাহলে মাসজিদে দু' রাক'আত ও বাড়ীতে দু' রাক'আত আদায় করে নাও । [মুসলিম/১৯০৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/১৪২৯, তিরমিযী/৫২২]

৪। কেহ যদি জুমু'আর এক রাক'আত পায় তাহলে সে আরেক রাক'আত আদায় করে তা পুরা করবে। আর যদি সালাতের শেষ বৈঠকে সালাত আদায়কারীদের পায় তাহলে সে চার রাক'আত যুহরের সালাত আদায় করবে। [তিরমিযী/৫২৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

(ক) মাসজিদে প্রবেশ করে বসার পূর্বেই ইমাম খুৎবা দিক বা মিম্বারে আরোহন করুক বা না করুক দু'রাক'আত সালাত আদায়ের নির্দেশ আছে।
(খ) উক্ত আদেশ অমান্য করে আমরা মাসজিদে লাল বাতি জ্বালিয়ে রাখি যাতে মুসল্লীরা সালাত আদায় করতে না পারে। কোন কোন ইমাম/খতীব বলেন, পরে সময় দেয়া হবে ইত্যাদি। যা সহীহ হাদীসের বিপরীত চর্চা।
(গ) তাছাড়া জুমু'আর দিন চার রাক'আত কাবলাল জুমু'আ ও চার রাক'আত বাদাল জুমু'আ সালাত আদায় করে। আবার কেহ কেহ চার রাক'আত আখিরী যুহর, দু'রাক'আত ওয়াক্ত সুন্নাত ইত্যাদি সালাত আদায় করে, যা সহীহ হাদীস এর বিপরীত। জুমুআর দিনে যুহরের পরিবর্তেই জুমুআ।

জুমু'আর খুৎবার সময় অন্যকে চুপ থাকতে বলা

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ জুমু'আর দিন যখন তোমার সাথী বা পাশের মুসল্লীকে বলবে চুপ থাক, অথচ ইমাম তখন খুৎবা দিচ্ছে তাহলে তুমি একটি অনর্থক কথা বললে। [বুখারী/৮৮২-আবূ হুরাইরা (রাঃ), মুসলিম/১৮৩৫, নাসাঈ/১৪০৫, তিরমিযী/৫১২, ইব্‌ন মাজাহ/১১১০]

২। জুমু'আর দিন ইমামের খুৎবা দেয়ার সময় যে ব্যক্তি কংকর সরালো সেও অনর্থক কাজ করল। [মুসলিম/১৮৫৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

⧉ আমাদের মাসজিদগুলিতে প্রায়ই দেখা যায় যে, জুমু'আর খুৎবার সময়ে এক মুসল্লী অন্য মুসল্লীর সঙ্গে কথা/গল্প করে । আবার অন্য মুসল্লী তাদেরকে চুপ থাকতে বলে। আমরা না জানার ফলে এরূপ করে থাকি। এগুলো করতে রাসূল (সাঃ) নিষেধ করেছেন।

মৃতদেরকে গালি না দেয়া

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সামনে এক মৃত ব্যক্তি সম্পর্কে খারাপ মন্তব্য করা হলে তিনি বললেন ঃ তোমরা মৃত ব্যক্তিদের সম্পর্কে ভাল মন্তব্য ছাড়া কোন মন্তব্য করবেনা। [নাসাঈ/১৯৩৯-আয়িশা (রাঃ)]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা (মুসলিম) মৃত ব্যক্তিদের খারাপ বলবেনা। কেননা তারা স্বীয় কৃতকর্মের ফল ভোগ করবে। [নাসাঈ/১৯৪০-আয়িশা (রাঃ)]

⧉ আমাদের সমাজের শিক্ষিত/অশিক্ষিত লোকেরা তাদের নিজেদের/দেশের মৃত লোকদের সম্বন্ধে বিভিন্ন সময়ে বিভিন্ন জায়গায় খারাপ মন্তব্য করে থাকেন, যা সহীহ হাদীসের বিপরীত। এরূপ খারাপ মন্তব্য করা উচিত নয়। তবে জনগণের সেবক নামে পরিচিত রাজনীতিবিদদের কথা ভিন্ন। তাদের কেহ ধোকাবাজি করলে তা মানুষের কাছে বলে দিতে হবে যাতে তারা আরও প্রতারিত করতে না পারে।

জানাযা সালাতের নিয়ম

১। জানাযার সালাতে রুকূ ও সাজদাহ নেই এবং এতে কথা বলা যায়না, এতে রয়েছে তাকবীর ও সালাত। আবদুল্লাহ ইব্ন উমার (রাঃ) বলতেন ঃ তাহারাত (পবিত্রতা) ছাড়া (জানাযার) সালাত আদায় করা যাবেনা। সূর্যোদয়, সূর্যাস্তকালেও ঐ সালাত আদায় করা যাবেনা। (তাকবীরের সময়) দু'হাত উত্তোলন করবে। হাসান (বাসরী) (রঃ) বলেন ঃ আমি লোকদের (সাহাবীগণকে) এ অবস্থায় পেয়েছি যে, তাঁদের জানাযার (ইমামতির) জন্য তাঁকেই অধিকতর যোগ্য মনে করা হত যাকে তাঁদের ফার্‌য সালাতসমূহের (ইমামাতির) জন্য তাঁরা পছন্দ করতেন। [বুখারী/অনুচ্ছেদ-৪৮৭]

২। সালাতুল জানাযায় প্রত্যেক তাকবীরেই হাত উঠাতে হবে। [তিরমিযী/১০৭৭]

৩। তালহা ইব্ন আবদুল্লাহ (রহঃ) বলেছেন ঃ আমি ইব্ন আব্বাস (রাঃ) এর পিছনে জানাযার সালাত আদায় করেছি। তাতে তিনি সূরা ফাতিহা এবং অন্য একটি সূরা তিলাওয়াত করেন এবং এতটুকু উচ্চঃস্বরে তিলাওয়াত করেন যে, আমরা তা শুনতে পেয়েছি। যখন তিনি অবসর হলেন আমি তাঁর হাত ধারণ পূর্বক জিজ্ঞেস করলে তিনি বললেন ঃ এটা সুন্নাত এবং সঠিক। [বুখারী/১২৪৯, নাসাঈ/১৯৯১, ১৯৯২]

⧉ (ক) জানাযার সালাতের নিয়াত ইমাম সাহেবরা জানাযা দেয়ার পূর্বে বলেন যা সহীহ হাদীসে কোথাও পাওয়া যায়না।

(খ) সহীহ হাদীসে দেখা যায় যে, জানাযা সালাতে ইমামের প্রত্যেক তাকবীরেই মুক্তাদীদেরকেও হাত উঠাতে হয়, কিন্তু অধিকাংশ লোকেরা প্রত্যেক তাকবীরে হাত উঠায়না।

(গ) জানাযা সালাতে সানা পাঠ করতে হয়না। কিন্তু আমাদের সমাজের অধিকাংশ ইমামেরা জানাযা সালাতে সানা পাঠ করেন।

(ঘ) সহীহ হাদীস অনুযায়ী জানাযার সালাতে ইমামের সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরাও পাঠ করার নিয়ম। কিন্তু আমাদের দেশের অধিকাংশ ইমাম সূরা ফাতিহা ও অন্য সূরা পাঠ করেনা। এখানেও মুক্তাদীদেরকে সূরা ফাতিহা পাঠ করতে হবে।

(ঙ) জানাযার সালাতে শুধু ডান দিকে একবার সালাম ফিরিয়ে সালাত সমাপ্ত করা যায়।

(চ) এভাবে মত পার্থক্য করে জানাযার সালাত আদায় কতটুকু যুক্তি সংগত আল্লাহই তা ভাল জানেন।

রামাযান মাসে রাতের সালাত বা তারাবীহ্ সালাত সম্পর্কে

১। তারাবী অর্থ আরাম করা, বিশ্রাম করা, ধীরে ধীরে। বর্তমানে মুসলিম সমাজে রামাযানে ইশার সালাতের পর রাতের সালাতটি 'তারাবী' সালাত নামেই বিশেষভাবে পরিচিত। কুরআন ও হাদীসের কোথাও এই তারাবীহ শব্দটির উল্লেখ নেই। হাদীসে এ সালাতকে صلوةُ اللَّيْلِ (সালাতুল লাইল), قِيَامِ رَمَضَانَ (কিয়ামে রামাযান), قِيَامُ اللَّيْلِ (কিয়ামুল লাইল) ও তাহাজ্জুদ নামে উল্লেখ করা হয়েছে।

২। তারা সবাই সমান নয়। আহলে কিতাবদের এমন কতক লোকও আছে যারা দীনের উপর প্রতিষ্ঠিত আছে, তারা রাত্রিকালে আল্লাহর আয়াতসমূহ পাঠ করে এবং তারা সাজদাহ করে থাকে। [সূরা আলে ইমরান-১১৩]

৩। আর রাতের কিছু অংশে তাঁর জন্য সাজদায় অবনত হও, আর রাতের দীর্ঘ সময় ধরে তাঁর মহিমা বর্ণনা কর। [সূরা দাহর-২৬]

৪। যে রাত্রির বিভিন্ন প্রহরে সাজদাহ ও দন্ডায়মান অবস্থায় বিনয় ও শ্রদ্ধা-ভক্তি প্রকাশ করে, আখিরাতকে ভয় করে, আর তার রবের অনুগ্রহ প্রত্যাশা করে? বলঃ যারা জানে আর যারা জানেনা তারা কি সমান? বিবেক-বুদ্ধিসম্পন্ন লোকেরাই কেবল উপদেশ গ্রহণ করে । [সূরা যুমার-৯]

৫। তারা রাত্রিকালে খুব কমই শয়ন করত। আর তারা রাত্রির শেষ প্রহরে ক্ষমা প্রার্থনা করত। [সূরা যারিয়াত-১৭, ১৮]

৬। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ একদা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম গভীর রাতে বের হয়ে মাসজিদে সালাত আদায় করেন, কিছুসংখ্যক পুরুষ তাঁর পিছনে সালাত আদায় করে। সকালে লোকেরা এ সম্পর্কে আলোচনা করে, ফলে লোকেরা অধিক সংখ্যায় সমবেত হয়। তিনি সালাত আদায় করেন এবং লোকেরা তাঁর সংগে সালাত আদায় করে। সকালে তারা এ বিষয়ে

আলাপ-আলোচনা করে। তৃতীয় রাতে মাসজিদে মুসল্লীর সংখ্যা আরো বেড়ে যায়। এরপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বের হয়ে সালাত আদায় করেন ও লোকেরা তাঁর সংগে সালাত আদায় করে। চতুর্থ রাতে মাসজিদে মুসল্লীর সংকুলান হলনা, কিন্তু তিনি রাতে আর বের না হয়ে ফাজরের সালাতে বেরিয়ে এলেন এবং সালাত শেষে লোকদের দিকে ফিরে প্রথমে তাশাহহুদ পাঠ করলেন। এরপর বললেন ঃ 'আম্মা বাদ' শোন! তোমাদের (গতরাতের) অবস্থান আমার অজানা ছিলনা, কিন্তু আমি এই সালাত তোমাদের উপর ফার্য হয়ে যাবার আশংকা করেছি (তাই বের হইনি)। কেননা তোমরা তা আদায় করায় অপারগ হয়ে পড়তে। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মৃত্যু হয়ে যায়, আর ব্যাপারটি এভাবেই থেকে যায়। [বুখারী/১৮৮০]

৭। যে ব্যক্তি রামাযান মাসের রাতে ঈমানের সাথে সাওয়াব লাভের আশায় সালাত আদায় করবে তার পূর্ববর্তী পাপসমূহ ক্ষমা করে দেয়া হবে। [বুখারী/১৮৭৭-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৮। আবূ সালামা ইব্ন আবদুর রহমান (রাঃ), আয়িশাকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলেন ঃ রামাযানে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের সালাত কিরূপ ছিল? তিনি বললেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম রামাযান মাসে এবং রামাযান মাস ছাড়াও (অন্যান্য মাসে রাতের সালাত) এগার রাক'আতের অধিক সালাত আদায় করতেননা। চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তার সৌন্দর্য ও দীর্ঘতা সম্বন্ধে তোমার প্রশ্নের অবকাশ নেই। তারপর চার রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর তিন রাক'আত সালাত আদায় করতেন। তিনি বলেন, তখন আমি জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আপনার বিতর আদায়ের আগে কি আপনি নিদ্রা যান ? তিনি বললেন ঃ হে আয়িশা! উভয় চোখ তো ঘুমায়, কিন্তু আমার অন্তর ঘুমায়না। [বুখারী/১০৭৬, মুসলিম/১৫৯৩]

৯। আবূ সালামা (রাঃ) বলেছেন, আমি আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম । তিনি বললেন ঃ তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন। আট রাক'আত সালাত আদায় করতেন, তারপর বিত্র। পরে বসে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন এবং যখন রুকূ করার ইচ্ছা করতেন তখন উঠে দাঁড়িয়ে রুকূ করতেন, তারপর আযান ও ইকামাতের মাঝে দু' রাক'আত সালাত আদায় করতেন। [মুসলিম/১৫৯৪]

১০। আয়িশা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাতের বেলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সালাত ছিল দশ রাক'আত, এক রাক'আত দিয়ে বিত্র আদায় করতেন। আর ফাজরের দু' রাক'আতও (সুন্নাত) আদায় করতেন। এই হল তের রাক'আত। [মুসলিম/১৫৯৭]

১১। যায়িদ ইব্ন খালিদ আল-জুহানী (রাঃ) বলেন ঃ (আমি স্থির করলাম) আজ রাতে আমি অবশ্যই রাসূলুল্লাহ (সাঃ) এর প্রতি দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখব। তিনি প্রথমে

সংক্ষেপে দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দীর্ঘ থেকে দীর্ঘ দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন। তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, যা তার পূর্ববর্তী রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ ছিল । তারপর দু' রাক'আত সালাত আদায় করলেন, যা তার পূর্ববর্তী রাক'আতের চেয়ে কম দীর্ঘ। তারপর বিত্‌র আদায় করলেন। এই হল মোট তের রাক'আত। [মুসলিম/১৬৭৪]

১২। মাসরুক (রাঃ) বলেন, আমি আয়িশাকে (রাঃ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের সালাত সম্পর্কে জিজ্ঞেস করলাম। তিনি বললেন ঃ ফাজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত) ব্যতীত সাত বা নয় কিংবা এগার রাক'আত । [বুখারী/১০৬৮]

১৩। আয়িশা (রাঃ) বলেন ঃ নাবী (সাঃ) রাতের বেলা তের রাক'আত সালাত আদায় করতেন, বিত্‌র এবং ফাজরের দু' রাক'আত (সুন্নাত)-ও এর অন্তর্ভুক্ত । [বুখারী/১০৬৯]

১৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন ঃ একদা রামাযানের রাতে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম স্বীয় গৃহ হতে বের হয়ে দেখতে পান যে, মাসজিদের এক পাশে কিছু লোক সালাত আদায় করছে। তিনি (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) জিজ্ঞেস করেন ঃ এরা কি করছে ? তাঁকে বলা হয় ঃ এদের কুরআন মুখস্ত না থাকায় তারা উবাই ইব্‌ন কা'বের (রাঃ) পিছনে (মুক্তাদী হিসাবে) তারাবীর সালাত আদায় করছে। নাবী কারীম (সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম) বলেন, তারা ঠিক করছে। [আবূ দাউদ/১৩৭৭]

১৫। সায়িব ইব্‌ন ইয়াযিদ (রাঃ) বলেছেন ঃ উমার ইব্‌ন খাত্তাব (রাঃ), উবাই ইব্‌ন কা'ব এবং তামীমদারীকে (রাঃ) লোকজনের (মুসল্লীগণের) জন্য ১১ রাক'আত (তারাবীহ) কায়েম করতে (পড়াতে) নির্দেশ দিয়েছিলেন। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)/১ম খন্ড, ১৭১ পৃষ্ঠা] [বিতর ৩ রাক'আত আদায় করলে তারাবী ৮ রা-ক'আত আর বিতর ১ রাক'আত আদায় করলে তারাবী ১০ রাক'আত আদায় করতে হবে]

□ উপরোক্ত সহীহ হাদীসের বর্ণনাগুলির সার সংক্ষেপ হল, রামাযান মাস বা রামাযান ছাড়া অন্য যে কোন মাসে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রাতের নাফল সালাত ছিল ৮ বা ১০ রাক'আত, যা খলিফা উমার (রাঃ) নির্দেশেও পাওয়া গেল ৮/১০ রাক'আত । ২০ রাক'আত তারাবী সালাতের বর্ণনা কোন সাহাবী থেকে বর্ণিত হয়নি এবং খলিফা উমার (রাঃ) এর নির্দেশের কথাও বলা হয়নি। এই ২০ রাক'আত তারাবী সম্পর্কে কোন কোন মহাদ্দিস যঈফ বা দুর্বল বলেছেন [মিশকাত শরীফ, তারাবী অধ্যায়, ৩য় খন্ড, লেখক- নূর মোহাম্মাদ আযমী]। তা ছাড়াও গুরুত্বপূর্ণ তারাবীর সালাত ২০ রাক'আতের বর্ণনা সিহাহ সিত্তাহ অর্থাৎ বুখারী, মুসলিম, তিরমিযী, নাসাঈ, ইব্‌ন মাজাহ, আবূ দাউদ এই সকল হাদীসে উল্লেখ নাই। খলিফা উমার (রাঃ) এর সুস্পষ্ট নির্দেশের হাদীসে ১১ রাক'আত বিতরসহ তারাবী সালাতের কথা পাওয়া যায়

যা রাসূল (সঃ) এর আমলের সাথেও মিল আছে। ১১ রাক'আত থেকে বিতর ১ রাক'আত আদায় করলে তারাবী হবে ১০ রাক'আত আর বিতর ৩ রাক'আত আদায় করলে তারাবী হবে ৮ রাক'আত। সে কারণে ৮ বা ১০ রাক'আত তারাবীহ সালাত আদায় করা সুন্নাত ও দলীল সম্মত । আর সব কিছু আল্লাহই ভাল জানেন।

সাদাকাতুল ফিত্‌র (রামাযানের ফিতরা)

১। প্রতিটি আযাদ-গোলাম, নারী-পুরুষ, প্রাপ্ত বয়স্ক, অপ্রাপ্ত বয়স্ক মুসলিমের উপর রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাদাকাতুল ফিত্‌র স্বরূপ খেজুর হোক, যব হোক এক 'সা' পরিমাণ আদায় করা ধার্য করেছেন এবং ঈদের সালাতে যাবার পূর্বেই আদায় করার নির্দেশ দিয়েছেন। [বুখারী/১৪১০-ইব্‌ন উমার (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ্/১৭৫৫, নাসাঈ/২৫১৩, মুসলিম/২১৪৭ ও ২১৫৭]

২। আবূ সাঈদ খুদ্‌রী (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশায় ঈদের দিন এক সা' পরিমাণ খাদ্য সাদাকা দিতাম। তিনি আরো বলেন ঃ আমাদের খাদ্যদ্রব্য ছিল যব, শুষ্ক আঙ্গুর, খেজুর ও পনির। [বুখারী/১৪১৭, নাসাঈ/২৫১৪]

৩। আবূ সাঈদ খুদরী (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যতদিন আমাদের মাঝে জীবিত ছিলেন ততদিন আমরা সাদাকাতুল ফিত্‌র হিসাবে এক সা' 'খাদ্য, এক সা' খেজুর, এক সা' যব, এক সা' পনির অথবা এক সা' কিশমিশ আদায় করতাম। আমরা দীর্ঘদিন যাবত এ নিয়ম পালন করে আসছিলাম। অবশেষে মুয়াবিয়া (রাঃ) মাদীনায় আমাদের নিকট আসেন। এ সময় তিনি লোকদের সাথে আলোচনা প্রসঙ্গে বলেন ঃ আমি তো শ্যাম দেশের উত্তম গমের দুই মুদ (অর্থাৎ অর্ধ সা) পরিমাণকে এখানকার এক সা' বরাবর মনে করি। তখন লোকেরা এ কথাটিই গ্রহণ করে নিল। আবূ সাঈদ (রাঃ) বলেন ঃ আমি কিন্তু সারা জীবন ঐ হিসাবেই সাদাকাতুল ফিত্‌র আদায় করে যাব, যে হিসাবে আমি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে আদায় করতাম। [মুসলিম/২১৫৩, ইব্‌ন মাজাহ্/১৮২৯, তিরমিযী/৬৭০]

** মাদীনার ১ সা' = ৪ মুদ, ১ মুদ = ০.৬৭ কেজি। ১ সা' = ২.৬৮ কেজি। [কেহ কেহ ১ সা' = ২.৫০ কেজি উল্লেখ করেন]

□ (ক) আমাদের দেশের অভাবী, গরীব, ফকির, মিসকিনরা ফিতরা দেয়না। কিন্তু সহীহ হাদীস অনুযায়ী প্রাপ্ত বয়স্ক/অপ্রাপ্ত বয়স্ক প্রত্যক মুসলিমকে ফিতরা অবশ্যই দিতে হবে। ফিতরার বিষয়ে গরীব বা অভাবী এরূপ কোন ভেদাভেদ নেই। এ বিষয়ে এক মুসলিম অন্য মুসলিমকে অবশ্যই জানাতে হবে।

(খ) রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক সা' পরিমান খাদ্যের কথা বলেছেন এবং আমাদের দেশের প্রধান খাদ্য হল চাল। অতএব চাল (এক সা') মাথা প্রতি দেয়াই হল রাসূলুল্লাহ 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত। খাদ্যের পরিবর্তে টাকা পয়সা দেয়ার কথা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের

কোন সহীহ হাদীসে নেই। তা ছাড়া আমরা বিভিন্ন লোক বিভিন্ন দামের চাল খাই, যে যে প্রকারের চাল খাইনা কেন সে সেই চালই এক সা' দিবে। আমাদের দেশে প্রতি বৎসরই জাতীয় ফিতরা কমিটি ফিত্‌রা নির্ধারণ করে, যা ইসলামী ফিত্‌রা নয়। এই ফিতরা ইজমা/কিয়াস দ্বারা লব্ধ ফিতরা, এই ফিতরা বিভিন্ন তরীকা পন্থীদের ফিতরা। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ফিতরা নয়। ফিতরা যে কোন দেশের প্রধান খাদ্যর এক "সা" পরিমান দেয়া উচিত। কিন্তু আমাদের সমাজে গমের অর্ধ "সা" পরিমান করে ফিতরা আদায় করে। তা কতটুকু যুক্তি সংগত আল্লাহই ভাল জানেন। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশের বিপরীতে আর কারো আদেশ মানলে শির্‌ক হয়ে যাবে।

⊙ আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ তোমাদের রবের নিকট হতে তোমাদের প্রতি যা অবতীর্ণ হয়েছে তোমরা তা মেনে চল, তাঁকে ছাড়া (অন্যদের) অভিভাবক মান্য করনা, তোমরা খুব সামান্য উপদেশই গ্রহণ কর। [সূরা আ'রাফ-৩] । তাই আসুন, আমরা সকলে একমাত্র আল্লাহ ও তাঁর রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের আদেশ মেনে তাঁদের প্রদর্শিত পথের অনুসরণ করি। তা না হলে পরকালে কোনই পরিত্রান নেই।

ঈদের সালাত ও তাকবীর প্রসঙ্গ

১। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের দিন আযান ও ইকামাত ব্যতীত ঈদের সালাত আদায় করেছেন। [ইব্‌ন মাজাহ্‌/১২৭৪-জাবির (রাঃ), নাসাঈ/১৫৬৫]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ঈদের সালাতের প্রথম রাক'আতের (তাক্‌বীরে তাহরীমা ও সানা পাঠের পরে) কির'আতের পূর্বে সাত তাকবীর এবং শেষ রাক'আতে কির'আতের পূর্বে পাঁচ তাকবীর বলতেন। [ইব্‌ন মাজাহ্‌/১২৭৭-মু'য়ায বিন সা'দ (রাঃ), তিরমিযী/৫৩৬, আবূ দাউদ/১১৫১]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক রাস্তা দিয়ে ঈদগাহে যেতেন এবং অন্য রাস্তা দিয়ে ফিরতেন। [বুখারী/৯২৯-জাবীর (রাঃ), ইব্‌ন মাজাহ্‌/১৩০১, তিরমিযী/৫৪১]

৪। আতা (রহঃ) বলেন ঃ যখন কারো ঈদের সালাত ছুটে যায় তখন সে দু'রাক'আত সালাত আদায় করবে। [বুখারী/অনু-২৭৫]

⧉ (ক) হাদীস গ্রন্থ বুখারী, মুসলিম, নাসাঈ এর মধ্যে ঈদের সালাত আদায়ের তাকবীরের সংখ্যা সম্পর্কিত কোন হাদীস নেই। এতদভিন্ন আবূ দাউদ, তিরমিযী, ইব্‌ন মাজাহসহ অন্যান্য সকল হাদীস গ্রন্থেই ১২ তাকবীর সম্পর্কে ১৫০টিরও অধিক হাদীস রয়েছে।

(খ) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম জীবনে যে কয়টি ঈদের সালাত আদায় করেছেন প্রতিটিতেই ১২ তাকবীর সহকারে আদায় করেছেন। তিনি কোনদিন ১২ তাকবীর ব্যতীত ঈদের সালাত আদায় করেননি।

(গ) প্রখ্যাত দার্শনিক আল্লামা ইমাম গাযালী তাঁর ইহ্ইয়াউ উলূমুদ্দীন এর মধ্যে বলেন ঃ ঈদের সালাত আদায়ের সময় প্রথম রাক'আতে তাকবীরে তাহরীমা ও রুকূর তাকবীর ব্যতীত সাত তাকবীর দিতে হবে এবং দ্বিতীয় রাক'আতে অতি-রিক্ত তাকবীর হল দাঁড়ানোর ও রুকূর তাকবীর ব্যতীত পাঁচ তাকবীর। [ইহ্ইয়াউ উলূমুদ্দীন ১ম খন্ড ১৪৫ পৃষ্ঠা]

(ঘ) শাইখ আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) তাঁর লিখিত গুনিয়াতুত তালেবীনে ১২ তাকবীরের কথা লিখেছেন। অর্থাৎ 'আবদুল কাদের জিলানী (রহঃ) ১২ তাকবীরের সহিত ঈদের সালাত আদায় করতেন।

(ঙ) অতএব সকল মত, রায়, কিয়াস পরিহার করে নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা ও আমল ১২ তাকবীরের সহিত ঈদের সালাত আদায় করুন এবং রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথার মুকাবিলায় মানব রচিত মত পরিহার করুন। "হে আল্লাহ! আমাদের সকলকে তোমার নাবীর (সাঃ) পথে চলার তাওফীক দীন।" আমীন।

মহিলাদের ঈদের জামা'আতে যোগদান সম্পর্কে

১। হাফসা (রাঃ) বলেছেন ঃ বালেগা হওয়ার নিকটবর্তী বয়সের বালিকা, অন্তপুরবাসিনী ও ঋতুবতী মহিলাগণ সাওয়াবের কাজে এবং মুসলিমদের দু'আর মাজলিসে উপস্থিত হতে পারে এবং ঋতুবতী মহিলাগণ সালাতের স্থান থেকে দূরে থাকবে। [আবূ দাউদ/১১৩৬-উম্মে আতিয়া, নাসাঈ/৩৯০]

২। উম্মে আতিয়া (রাঃ) বলেছেন ঃ ঈদের সালাতের উদ্দেশে সাবালিকা পর্দানশীল মেয়েদেরকে ঈদগাহে নিয়ে যাওয়ার জন্য আমাদেরকে আদেশ করা হত । [বুখারী/৯২৪]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বালিকা, তরুণী, গৃহিণী, যুবতী সকল মহিলাকেই সালাতুল ঈদে বের হওয়ার জন্য বলতেন। তবে রজঃবতী মহিলারা সালাত স্থল থেকে দূরে থাকতেন। তারা কেবল মুসলিমদের সঙ্গে দু'আয় শরীক হতেন। জনৈক মহিলা একবার রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ যদি কারও চাদর না থাকে তাহলে সে কিভাবে বের হবে? তিনি বললেন ঃ তার কোন বোন তাকে একটি চাদর ধার দিবে। [বুখারী/৯২৩-আতিয়া (রাঃ), তিরমিযী/৫৩৯]

⧉ আমাদের সমাজের মহিলারা জুমু'আর সালাতে ও ঈদের সালাতে মাসজিদ/ঈদগাহে যায়না। কিন্তু রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাত অনুযায়ী মহিলাদেরও অবশ্যই যাওয়া উচিত। বিধায় তাদেরকে ঈদের সালাতের সাওয়াব থেকে বঞ্চিত করা হয় এবং তাদেরকে ঈদের সালাত আদায় করতে না দিয়ে তাদের অধিকার ছিনিয়ে নেয়া হচ্ছে । এটা সম্পূর্ণ রূপে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নির্দেশের বিপরীত। বরং মহিলাদেরকেও পূর্ণ পর্দায় ঈদের জামা'আতে শরীক হবার সুযোগ করে দিতে হবে। ⊙ উম্মে আতিয়াহ (রাযিঃ) বলেছেন, আমাদের নারীদেরকে আদেশ

করা হয়েছে যে, আমাদের ঋতুবর্তী মহিলাগণ ও পর্দানশীল মহিলাগণ যেন দু'ঈদের দিনেই ঈদগাহে বের হয়। যাতে তারা মুসলিমদের জামা'আতে উপস্থিত হতে পারে এবং দু'আয় অংশ গ্রহণ করতে পারে। আর ঋতুবতী নারীরা যেন তাদের সালাতের স্থান হতে একপাশে সরে বসে । তখন এক মহিলা প্রশ্ন করল, হে আল্লাহর রাসূল! আমাদের কারও কাছে যদি শরীর ঢাকার মতো বড় চাদর না থাকে? তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন, তার বান্ধবী আপন চাদর ধার হিসাবে পরাবে। কতবড় আদেশ-নির্দেশ ও উপদেশ। এমতাবস্থায় পুরুষ/মহিলা পাঠক সমাজের উপরেই ঈদের সালাত কায়েম করার গুরুত্ব ও তাৎপর্যের চিন্তার ভার রইল।

রুগী কিভাবে সালাত আদায় করবে?

১। আল্লাহর বান্দাদের মধ্যে যারা জ্ঞানী তারাই তাঁকে ভয় করে; নিশ্চয়ই আল্লাহ পরাক্রমশালী, ক্ষমাশীল। [সূরা ফাতির-২৮]

২। হে মু'মিনগণ! আল্লাহকে ভয় কর, প্রত্যেকেই ভেবে দেখুক যে, আগামী কালের জন্য সে কি অগ্রিম পাঠিয়েছে। আর আল্লাহকে ভয় কর; তোমরা যা কর আল্লাহ সে সম্পর্কে অবহিত। [সূরা হাশর-১৮]

৩। ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা ভয় কর আল্লাহকে ভয় করার মত, আর কখনও মৃত্যুবরণ করনা মুসলিম না হয়ে। [সূরা আলে ইমরান-১০২]

৪। তোমরা তোমাদের সাধ্যমত আল্লাহকে ভয় করে চলো। [সূরা তাগাবুন-১৬]

৫। কেহ যদি দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করে এটা তার জন্য উত্তম। বসে সালাত আদায় করলে সে দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করার অর্ধেক সাওয়াব পাবে। আর শুইয়ে সালাত আদায় করলে, সে বসে সালাত আদায়ের অর্ধেক সাওয়াব পাবে। [বুখারী/১০৪৪-ইমরান ইব্‌ন হুসায়ন (রাঃ), তিরমিযী/৩৭১, নাসাঈ/১৬৬৩, ইব্‌ন মাজাহ/১২৩১]

৬। বসে সালাত (নামায) আদায় করতে অক্ষম ব্যক্তি ডান পাশে শুইয়ে সালাত আদায় করবে। আতা (র) বলেন ঃ কিবলার দিকে মুখ করতে অক্ষম ব্যক্তি যে দিকে সম্ভব মুখ করে সালাত আদায় করবে। [বুখারী/অনুঃ-৩৬২, ইব্‌ন মাজাহ/১২২৩]

৭। অসুস্থ ব্যক্তি যদি বসেও সালাত আদায় করতে না পারে তাহলে সে কিভাবে সালাত আদায় করবে সে বিষয়ে আলেমদের মতবিরোধ রয়েছে। কোন কোন আলেম বলেন ঃ ঐ ধরনের ব্যক্তি ডান পাশে শুইয়ে সালাত আদায় করবে। আবার কেহ কেহ বলেন ঃ কিবলার দিকে পা করে চিত হয়ে শুইয়ে সালাত আদায় করবে। [তিরমিযী/৩৭২]

৮। উম্মুল মু'মিনীন হাফ্‌সা (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ইন্তিকালের এক বৎসর পূর্ব পর্যন্ত আমি তাঁকে নাফল সালাত বসে আদায় করতে দেখিনি। [তিরমিযী/৩৭৩]

৯। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যখন বসে সালাত আদায় করতেন তখন কিরা'আতও বসে পাঠ করতেন। শেষে ত্রিশ বা চল্লিশ আয়াত পরিমাণ বাকি

থাকতে তিনি উঠে দাঁড়াতেন এবং ঐ অংশটুকু দাঁড়িয়ে কিরা'আত পাঠ শেষে রুকূ-সাজদাহ করতেন। এরপর দ্বিতীয় রাক'আতেও একই রূপ করতেন। [তিরমিযী/৩৭৪-আয়িশা (রাঃ)]

১০। রুগীর জন্য ওয়াজিব হচ্ছে রুকূ, সাজদাহ করা। যদি সে তা করতে সমর্থ না হয় তাহলে মাথা দ্বারা ইশারা করে করবে। সাজদাহ করার সময় রুকূর চেয়ে বেশি মাথা ঝুকাবে। যদি শুধু রুকূ করতে সমর্থ হয় তাহলে রুকূ করবে এবং ইশারায় সাজদাহ করবে, আর যদি শুধু সাজদাহ করতে সমর্থ হয় তাহলে সাজদাহ করবে এবং রুকূ ইশারায় করবে। এই অবস্থায়ও বালিশের উপর অথবা উচু করা কোন স্থানে সাজদাহ করা যাবেনা। [মুয়াত্তা ইমাম মালিক (র)/২২৬ পাতা ১ম খন্ড]

১১। প্রতিটি ওয়াক্তের সালাত যথাসময়ে আদায় করা যদি রুগীর জন্য কঠিন হয়ে যায় তাহলে (দুই দুই ওয়াক্ত) যুহর ও আসর এবং মাগরিব ও ইশা একত্রে আদায় করবে। হয় আসরের সালাত যুহরের সাথে এবং ইশার সালাত মাগরিবের সাথে মিলিয়ে 'জমা তাকদীম' অথবা যুহরের সালাত 'আসরের সাথে এবং মাগরিবের সালাত ইশার সাথে মিলিয়ে 'জমা তা'খীর' আদায় করবে। যেটা তার জন্য সহজ তা করবে। কিন্তু ফাজরের সালাতের আগের কিংবা পরের সালাতের সাথে কোন জমা নেই। [আবূ দাউদ/২৯৪, নাসাঈ/২১৪]

১২। রুগী যদি চিকিৎসার জন্য তার বাসস্থান থেকে বাইরে অবস্থান করে তাহলে সে চার রাক'আতের সালাত দুই রাক'আত করে আদায় করবে (যুহর, আসর ও ইশা) । এ ক্ষেত্রে রুগী যদি সফরের পর্যায়ে থাকে। [মুসলিম/১৪৪৫]

রুগীর সালাত আদায়ের ক্ষেত্রে বিদ্বানদের অভিমত ঃ

(ক) যদি অবস্থা এমন হয় যে, রুকূ ও সাজদায় মাথা দিয়ে ইশারা করাও সম্ভব নয় তাহলে চোখ দিয়ে ইশারা করবে। রুকূর সময় অল্প এবং সাজদাহর সময় বেশি চোখ বন্ধ করবে। আঙ্গুল দিয়ে ইশারা করা সহীহ নয়। এ ব্যাপারে কুরআন ও হাদীসে কোন দলীল নেই।

(খ) যদি মাথা কিংবা চোখ দিয়ে ইশারা করতেও সমর্থ না হয় তাহলে সে মনে মনে সালাত আদায় করবে। মনে মনে তাকবীর বলবে, সূরা পাঠ করবে, রুকূ-সাজদায় দাঁড়ানো ও বসার নিয়াত করবে এবং দু'আ পাঠ করবে।

(গ) রুগীর জন্য উত্তম হচ্ছে নির্ধারিত সময় হওয়ার পরেও দেরী করে সালাত আদায় না করে প্রতি ওয়াক্তের সালাত সঠিক সময়ে আদায় করা এবং সেই সাথে যে সমস্ত ইবাদাত আছে তাও তার সাধ্যমত আদায় করতে চেষ্টা করা। সুস্থ থাকা অবস্থায় সালাতের প্রতি যে গুরুত্ব ছিল, রোগাক্রান্ত সময়েও অনুরূপ গুরুত্ব সহকারে সালাত আদায় করতে হবে। যদিও সে রুগী, কিন্তু তার হুশ/জ্ঞানতো রয়েছে। সাধ্যমত নির্ধারিত সময়ে সালাত আদায় করতে সক্ষম এরূপ ব্যক্তি ইচ্ছা করে সালাত ত্যাগ করলে পাপী হবে। কোন কোন বিশেষজ্ঞ বলেন ঃ এরূপ করা কুফরী ছাড়া আর কিছু নয়।

(ঘ) রুগীর অবস্থা যদি এমন হয় যে, দাঁড়িয়ে সালাত আদায় করতে পারলেও এবং রুকূ করতে সক্ষম হলেও পায়ে ব্যথা কিংবা অন্য কোন কারণে সঠিকভাবে বসে সাজদাহ করতে পারছেনা, এমতাবস্থায় তিলাওয়াত ও রুকূ করার পর সে চেয়ারে বসে ইশারায় সাজদাহ করবে, তবে টেবিলে কিংবা বালিশের উপর মাথা রেখে সাজদাহ করবেনা। আর রুকূর চেয়ে সাজদায় বেশি মাথা সম্মুখে ঝুকাবে। রুগী যদি এক পা বাঁকা করতে সক্ষম হয় তাহলে চেয়ারে না বসে ঐ পা বাঁকা করে অপর পা সামনের দিকে সোজা বিছিয়ে দিয়ে সাজদাহ করবে এবং ঐ অবস্থায়ই তাশাহহুদ, দু'আ ইত্যাদি পাঠ করে সালাম ফিরাবে।

(ঙ) রুকূ করতে গিয়ে রুগী যদি পিঠ বাঁকা করতে সক্ষম না হয় তাহলে ঘাড় বাঁকা করে রুকূ করবে। আর পিঠ যদি সব সময়েই ধনুকের ন্যায় বাঁকা থাকে তাহলে রুকূ করার সময় একটু বেশি বাঁকা করবে এবং সাজদাহর সময় আরও একটু বাঁকা করে যমীনের কাছে পৌঁছাবে।

সালাম বনাম হ্যালো-হ্যালো

❖ সালাম এর অর্থ শান্তি, নিরাপত্তা, শুভেচ্ছা প্রকাশ, অভিবাদন ইত্যাদি।

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

وَإِذَا حُيِّيْتُم بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّواْ بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا إِنَّ اللهَ كَانَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ حَسِيبًا.

আর যখন তোমাদের অভিবাদন করা হয় তখন তোমরাও তার চেয়েও উত্তমরূপে অভিবাদনের উত্তর দিবে, অথবা অনুরূপ উত্তর দিবে। নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ববিষয়ের হিসাব গ্রহণকারী। [সূরা নিসা-৮৬]

২। ছোট বড়কে, পথচারী উপবিষ্ট লোককে এবং অল্প সংখ্যক লোক বেশী সংখ্যক লোকদেরকে সালাম দিবে। [বুখারী/৫৭৮৫-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/২৭০৪, আবূ দাউদ/৫১০৮]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন কোন আহলে কিতাব (অন্য ধর্মের লোক) তোমাদের সালাম দেয় তখন তোমরা বলবে 'ওয়া আলাইকুম' (তোমাদের উপরও)। [বুখারী/৫৮১১-আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ), মুসলিম/৫৪৬৯, তিরমিযী/৫১১৭]

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করা হল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! দুই ব্যক্তি সামনা-সামনি হলে কে প্রথম সালাম দিবে? তিনি বললেন ঃ যে তাদের মধ্যে আল্লাহ তা'আলার (রাহমাতের) অধিক নিকটবর্তী সে। [তিরমিযী/২৬৯৪-আবূ উমামা (রাঃ)]

৫। যখন তোমাদের কেহ তার ভাইয়ের সাথে মিলবে তখন তাকে সালাম করবে। এরপর যদি উভয়ের মাঝে কোন গাছ, দেয়াল বা পাথরের আড়াল হয়, পরে আবার দেখা হয়, তখন পুনরায় তাকে সালাম করবে। [আবূ দাউদ/৫১১০-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। আনাস ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেন, আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ! আমরা কি একে অপরের সামনে মাথা নীচু করব? তিনি বললেন ঃ না। আমরা জিজ্ঞেস করলাম ঃ আমরা কি একে অপরকে আলিঙ্গন করব? তিনি বললেন ঃ না, তবে পরস্পর মুসাফাহা করবে। [ইবনে মাজাহ/৩৭০২]

বর্তমান মুসলিমগণ "অভিবাদন ও বিদায়কালে" বিধর্মী রেওয়াজ অবলম্বন করে চলছে। তারা ইসলামের স্বতন্ত্র পদ্ধতি "সালাম" এর পরিবর্তে টাটা (Tata) দেয়া, মাথা ঝুকানো, হাত নাড়ানো, আঙ্গুল ও তালু দ্বারা ইশারা করা, ফোনে সর্বপ্রথম সালাম না দিয়ে হ্যালো-হ্যালো বলা, হাত, পা ও মাথা ছুঁয়ে 'সালাম' করা এমনকি তা ছোট ছেলে-মেয়েদেরকে Training দেয়া হচ্ছে।

আবার 'বিদায়কালে' সালামের পরিবর্তে আসি বলা, হাত ও তালু দ্বারা ইশারা করা ইত্যাদি, যা ইসলামী শারীয়াত সম্মত নয়। বরং তা কাফির/মুশরিকদের অনুকরণীয় কু-সংস্কারের অন্যতম কু-সংস্কার যা মুসলিম সম্প্রদায়ের জন্য নিষেধ। সুতরাং মুসলিম ভাই-বোনকে "অভিবাদন ও বিদায়কালে" সালাম প্রদান করতে হবে এবং বিজাতীয় কু-সংস্কার বর্জন করতে হবে।

সালাম সম্পর্কীত বিদ'আতসমূহ ঃ

• শুধু বিশেষ বিশেষ ও পরিচিতদেরকে সালাম প্রদান করা • সাক্ষাতের সময় সালামের পূর্বে কথা বলা • সালাম নিয়ে ঠাট্টা মসকরা করা • আদাব বা নমস্কার বলে বিধর্মীদের সালাম জানান • সালামের পরিবর্তে শুভ সকাল, শুভ দুপুর বা শুভ সন্ধা এ জাতীয় কথা বলা • শুধু আসার সময় সালাম মুসাফাহা করা সুন্নাত মনে করা, যাওয়ার সময় সুন্নাত সম্মত মনে না করা • মহিলাদের সাথে মুসাফাহা করা • পিতা-মাতা নিজ সন্তানদের বা সন্তানেরা নিজ পিতা-মাতাকে সালাম না দেয়া ও মুসাফাহা না করা • স্বামী-স্ত্রী পরস্পরকে সালাম না দেয়া • কারো পায়ে বা শরীরের কোন অংগে পা লাগলে সালাম করা • সালামের পরিবর্তে কদমবুসি করা ইত্যাদি।

মুসাফাহা এক হাতে নাকি দুই হাতে এবং কদমবুসি প্রসঙ্গ

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা নিজেদের গৃহ ব্যতীত অন্য কারও গৃহে গৃহবাসীদের অনুমতি না নিয়ে এবং তাদেরকে সালাম না করে প্রবেশ করনা; এটাই তোমাদের জন্য শ্রেয়, যাতে তোমরা উপদেশ গ্রহণ কর। [সূরা নূর-২৭]

২। এক ব্যক্তি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে জিজ্ঞেস করল ঃ ইসলামের কোন কাজ উত্তম? তিনি বললেন ঃ তুমি ক্ষুধার্তকে খাবার দিবে, আর সালাম দিবে যাকে তুমি চিন এবং যাকে তুমি চিননা। [বুখারী/৫৭৮৯, আবূ দাউদ/৫১০৪, মুসলিম/৬৭]

৩। জনৈক ব্যক্তি বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! আমাদের কারো যদি তার ভাই বা তার বন্ধুর সাথে সাক্ষাৎ হয় তাহলে কি সে তার অভিবাদনের জন্য মাথা ঝুঁকাবে? তিনি বললেন ঃ না। লোকটি বলল ঃ তাহলে কি তাকে জড়িয়ে ধরবে এবং চুমু দিবে? তিনি বললেন ঃ না। লোকটি বলল ঃ

তাহলে কি তার হাত ধরবে এবং তার সাথে মুসাফাহা করবে? তিনি বললেন, হ্যাঁ। [তিরমিযী/২৭২৮-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মালিক (রাঃ)]

৪। মহান আল্লাহর কাছে সেই ব্যক্তি শ্রেয় যে আগে সালাম দেয়। [আবূ দাউদ/৫১০৭-আবূ উসমান (রাঃ)]

৫। যখন তোমাদের কেহ তার ভাইয়ের সাথে মিলবে তখন তাকে সালাম করবে। এরপর যদি উভয়ের মাঝে কোন গাছ, দেয়াল বা পাথরের আড়াল হয়, পরে আবার দেখা হয়, তখন পুনরায় তাকে সালাম করবে। [আবূ দাউদ/৫১১০-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। দুই মুসলিমের যখন সাক্ষাত হয় আর তারা পরস্পর মুসাফাহা করে তখন তাদের পৃথক হওয়ার আগেই আল্লাহ তা'আলা তাদের পাপ ক্ষমা করে দেন। [তিরমিযী/২৭২৭, আবূ দাউদ/৫১২২]

৭। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ও সাহাবাগণের (রাঃ) মধ্যে মুসাফাহার প্রচলন ছিল। [বুখারী/৫৮১৬-আবূ কাতাদা (রাঃ)]

যখন মানুষ নিজের ডান হাতের তালু অপর মানুষের ডান হাতের তালুতে স্থাপন করে এবং উভয়ের হাতের তালু মিলিত হয় এবং উভয়ে পরস্পরের মুখামুখি হয়ে পড়েন সেই অবস্থাকেই বলা হয় এক মানুষ অপর মানুষের সঙ্গে মুসাফাহা করছেন। বিদ্বানগণ বলেন আভিধানিক ভাবে মুসাফাহার তাৎপর্য হচ্ছে এক হাতের তালু দিয়ে আরেক হাতের তালু আঁকড়ে ধরা। যা এক জনের ডান হাত অপর জনের ডান হাতের মাধ্যমে হয়ে থাকে। এক জনের দুই হাত ব্যবহার করলে এক জনের বাম হাতের তালু অপর জনের ডান হাতের পিঠের সাথে লেগে যায়। সে কারণে উভয়ের উভয় হাত পরস্পরের সাথে মিলিত করার কার্যকে মুসাফাহা বলা যেতে পারেনা। এতদ্ব্যতীত উভয় হাতকে অপর ব্যক্তির উভয় হাতের সহিত মিলিত করলে এক হাতের পিঠ ও অপর হাতের তালূ অন্য ব্যক্তির এক হাতের পিঠ ও অপর হাতের তালুর সহিত মিলিত হবে এবং এরূপ ভঙ্গীর ধরাকে আরাবী ভাষায় মুসাফাহা বলা হয়না। আরাবী ভাষায় কোন অভিধানে চার হাতের সংযোগকে মুসাফাহা বলে অভিহিত করেনি এবং মুসলিম ব্যতীত অন্যান্য আহলে কিতাব যথা, ইয়াহুদী ও নাসারাদের মধ্যে এবং পূর্ববর্তী জাতিসমূহের মধ্যে মুসাফাহার যে প্রাচীন রীতি প্রচলিত ছিল তাও চার হাত দ্বারা মুসাফাহা নয়।

আবার অনেককে দেখা যায় মুসাফাহা শেষ করে পরস্পর পরস্পরের হাত পৃথক করে নেয়ার পর নিজের বুকে হাত স্পর্শ করেন, তাও সঠিক নয়। বর্তমানকালে বুজুর্গ, পীর, দরবেশ ও কিছু আলেমদের কাছে কদমবুসির (মাথা নিচের দিকে করে পায়ে হাত বুলানো) বেশী প্রচলন দেখা যায়। মুরীদ হলেই পীরের কদমবুসি করতে হয়, মাদ্রাসার ছাত্র হলেই ওস্তাদ-হুজুরের কদমবুসি করতে বাধ্য। তা না করলে মুরীদ তার পীরের 'ফায়িয' পেতে পারেনা, ছাত্র তার ওস্তাদের নিকট থেকে লাভ করতে পারে না ইলম। বরং সে বে-আদব বলে

দোষী সাব্যস্ত হয় এবং সঙ্গে সঙ্গে দলীল পেশ করে বলা হয় ঃ বে-আদব লোক আল্লাহর অনুগ্রহ থেকে বঞ্চিত থেকে যায়।

সাহাবীদের (রাঃ) মধ্যে এরূপ কোন প্রচলন ছিলনা। তাবিঈন ও তাবে তাবিঈনের যুগেও মুসলিম সমাজে এর কোন রেওয়াজ দেখা যায়নি। ইসলামের সোনালী যুগের ইতিহাসে এ কদমবুসির কোন নাম-নিশানাই পাওয়া যায়না। তাদের সময়ে ছিল সালাম ও মুসাফাহা। বুজুর্গ, পীর, ওস্তাদ, কোন মুরব্বী যেই হোন না কেন, তাকে যে কদমবুসি করতে হবে, ইসলামী শারীয়াতে তার কোন নিয়ম নেই। আর এ কাজ রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের সম্পূর্ণ পরিপন্থী, এক অতি বড় বিদআ'ত এবং প্রয়োগভেদে শির্কও বটে।

এই উপমহাদেশের আলেম ও পীরদের কাছেই এর প্রচলন দেখা যায়। অন্যান্য মুসলিম দেশে ও সমাজে এর নাম নিশানাও নেই। এ কারণে এ কথা অনায়াসেই বলা যেতে পারে যে, কদমবুসি কাজটি এ দেশের হিন্দু সমাজের পদ-প্রনাম থেকে মুসলিম সমাজে এসে তা মুসলমানী রূপ গ্রহণ করেছে। অথচ আমাদের সমাজের তথাকথিত পীরপন্থী সমাজে কদমবুসি একটি অপরিহার্য রীতি, যার রেওয়াজ কুরআনে নেই, হাদীসে নেই, রাসূলে কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের গড়া সমাজেও নেই। অতএব এটি বিদ'আত, মুশরিকী রীতি হবার ব্যাপারে কোন সন্দেহই থাকেনা। তাই কদমবুসি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুন্নাতের বিপরীত, মানবতার পক্ষে অপমানকর। এ জন্য অনতিবিলম্বে এ প্রথা বন্ধ হওয়া একান্ত বাঞ্ছণীয়।

স্বপ্নের ফাইসালা মেনে নেয়া

১। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সৎ ও ভাল স্বপ্ন আল্লাহর পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। আর মন্দ স্বপ্ন শাইতানের পক্ষ থেকে হয়ে থাকে। অতএব তোমাদের কেহ যখন এরূপ মন্দ স্বপ্ন দেখে যা তার জন্য ভীতিজনক হয়, তখন সে যেন তার বাম দিকে থুথু নিক্ষেপ করে আর সে যেন শাইতানের অনিষ্টতা থেকে আল্লাহর কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে। তাহলে এরূপ স্বপ্ন তার কোন ক্ষতি করতে পারবেনা। [বুখারী/৩০৫৪-আবূ কাতাদা (রাঃ), ৬৫০২, মুসলিম/৫৭০০, তিরমিযী/২২৮০]

২। মু'মিনের স্বপ্ন নাবূওয়াতের ছিচল্লিশ ভাগের এক ভাগ। [বুখারী/৬৫০৩-উবাদা ইব্ন সামিত (রাঃ), মুসলিম/৫৭০৯, ৫৭১৬, তিরমিযী/২২৭৪, ২২৮১, ইব্ন মাজাহ/৩৮৯৪]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যখন তোমাদের কেহ অপছন্দীয় স্বপ্ব দেখে তখন সে যেন তার বাম দিকে তিনবার থুথু ফেলে, তিনবার আল্লাহর কাছে শাইতান থেকে আশ্রয় চায় ("আউযূবিল্লাহি মিনাশ শাইতানির রাজীম" পড়ে) এবং সে যে পাশে কাত হয়ে শুইয়ে ছিল তা যেন পরিবর্তন করে নেয়। [ইব্ন মাজাহ/৩৯০৮-জাবির ইব্ন আবদুল্লাহ (রাঃ), বুখারী/৫৩২২]

সাধারণ মানুষের স্বপ্ন সত্য হতে পারে, তবে তা থেকে সে নিজে কোন আগাম সুখবর লাভ করবে বা কোন বিষয়ে সতর্কতা অবলম্বনের ইঙ্গিত পেতে পারে। সে জন্য তার উচিত আল্লাহর শোকর করা। কিন্তু কোন অবস্থায়ই স্বপ্নের উপর নির্ভরতা, স্বপ্ন দ্বারা পরিচালিত হওয়া, স্বপ্নের ভিত্তিতে কোন কাজ করা বা না করা কোন শারীয়াত পন্থীর নীতি বা শারীয়াতের বিধান হতে পারেনা কিংবা স্বপ্ন দ্বারা ফারয-ওয়াজিব, হালাল-হারাম ও জায়েয-নাজায়েয কিংবা করণীয়-বর্জণীয় প্রমাণিত হতে পারেনা। একমাত্র নাবীগণের স্বপ্ন ব্যতীত অন্য কোন স্বপ্ন ইসলামী আইন বা বিধানগত প্রমাণ সাব্যস্ত হতে পারেনা। কাজেই স্বপ্ন দেখলেই তদনুযায়ী কাজ করতে হবে, ইসলামে এমন কথা অচল।

সত্যের সাথে মিথ্যা মিশ্রিত করা যাবেনা

১। বল ঃ 'সত্য এসেছে এবং মিথ্যা বিলুপ্ত হয়েছে, মিথ্যা তো বিলুপ্ত হওয়ারই। [সূরা বানী ইসরাইল-৮১]

২। বল ঃ প্রত্যেকেই স্বীয় রীতি-পন্থা অনুযায়ী কাজ করে। এখন তোমার রাব্বই ভাল জানেন কে চলার পথে অধিকতর সঠিক পথে আছে। [সূরা বানী ইসরাইল-৮৪]

৩। আমি কুরআন হতে অবতীর্ণ করি যা মু'মিনদের জন্য আরোগ্য ও রাহমাত, কিন্তু তা যালিমদের ক্ষতিই বৃদ্ধি করে। [সূরা বানী ইসরাইল-৮২]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-৪২, ৭৯, ১৫৯, ১৭৩, ১৭৪, ১৭৫, আলে ইমরান-৭১।

৫। যদি কেহ বলে যে (ক) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাঁর রাব্বকে দেখেছেন তাহলে সে মিথ্যাবাদী। (খ) যে ব্যক্তি বলবে যে, আগামীকাল কি হবে সে তা জানে তাহলে সে মিথ্যাবাদী (গ) যে ব্যক্তি বলবে যে, মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কোন কথা গোপন রেখেছেন তাহলেও সে মিথ্যাবাদী। [বুখারী/৪৪৮২-আয়িশা (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলতে শুনেছি ঃ ধ্বংস সেই ব্যক্তির জন্য যে লোকদের হাসানোর জন্য কথা বলতে গিয়ে মিথ্যা বলে, ধ্বংস তার জন্য, ধ্বংস তার জন্য। [তিরমিযী/২৩১৮]

সমাজ জীবনে প্রতিদিন যে জিনিসটি আমরা সকলে খুঁজি তা হল আসল, নির্ভেজাল এবং খাঁটি। দুধ, ঘি, মাখন, মিষ্টি খাদ্যদ্রব্য, চাল, ডাল, আটা, ময়দা, চিনি, লবণ, তেল, ঔষধ, ফলমূল, কাঠ, কাপড়, পোশাক, সিমেন্ট, রড, ইট, বালু, আসবাবপত্র, তৈজষপত্র, রান্না খাবার, শুকনা খাবার অর্থাৎ যা কিছু মানুষের জন্য নিত্য প্রয়োজন তার সবটাই নির্ভেজাল হোক, খাঁটি হোক, আসল হোক এটাই চাই। কোনভাবেই পচা-বাসী, নোংরা, ভেজাল, নকল, জাল আমরা চাইনা। কিন্তু বাজারে কি সত্যিই আসলটাই বেশী পাওয়া যায়, নাকি নকল বা ভেজালটা বেশী পাওয়া যায়? সবাই বলবেন, ভেজাল আর নকলটাই বেশী পাওয়া যায়, আসলটা কম পাওয়া যায়। তাহলে ঐ নকল, ভেজাল, জাল বা ২ নম্বরটা কোথা হতে আসছে? কারা

সরবরাহ করছে? কারা তৈরী বা বাজারজাত বা বিক্রয় বা আমদানী করছে? নিশ্চয়ই তারাও মানুষ। তাহলে যে মানুষ সত্য, নির্ভেজাল খাঁটি আসলটা চাইছে নিজের জন্য সেই মানুষটি অন্যের জন্য ভেজাল, নকলটাই উৎপাদন, আমদানী বা বিক্রি করছে কিসের জন্য? দু'টি পয়সা অতিরিক্ত মুনাফার জন্য। হোকনা ক্ষতি অন্যের। তাতে কি আসে যায়? নিজের তো লাভ হল। আসলে নকলবাজ, ভেজালকারীরা কার্যতঃ বাজারের প্রভাব থেকে বাদ পড়ছেনা। আল কুরআন মানুষের কল্যাণের যাবতীয় বিধান দিয়েছে যাতে সবাই সকলের ন্যায্য পাওনা প্রদান করে সম্মানের সাথে জীবন ও জীবিকা নিরাপদে নির্বাহ করতে পারে। এজন্য কেহকে বঞ্চিত করে, কেহকে দাবিয়ে রেখে, কুরআনী কানূনকে ঢেকে রাখা চলবেনা। গোপন রাখাও যেমন যাবেনা, তেমনি হকের সাথে বাতিলের মিশ্রণও ঘটানো যাবেনা। সত্য/মিথ্যা ভেজাল দিয়ে মামলা মোকদ্দমা যেমন চলবেনা, তেমনি বিচার কাজও চলবেনা। হাট-বাজারের বেচা-কেনাও ঠিক রাখতে হবে। সত্যের সাথে মিথ্যা ভেজাল যেমন অন্যায়, তেমনি ভেজাল মানুষও স্বয়ং স্রষ্টার ও সকল সৃষ্টির লা'নতপ্রাপ্ত । আসলে সকলের এ সত্যটা উপলব্ধি করা উচিত যে, দ্রব্যে ভেজাল হয়না যদি মানুষটি ভেজাল না হয়। মানুষটির চিন্তা ভাবনা এবং কর্মটি ভেজাল, তাই দ্রব্যটিকে ভেজাল হতে হয়েছে। আল্লাহর সৃষ্টি কখনও ভেজাল নয়। যা কিছু তিনি মানুষের উপকারের জন্য দিয়েছেন, মানুষ তা অসৎ উদ্দেশ্য চরিতার্থ করার অপকৌশল ও অপচেষ্টায় ব্যবহার করেছে।

দেশের মুদ্রা সকলের জন্য চাই। সেই মুদ্রা ও নোটও নকল বা জাল করে বাজারে ছাড়ছে তারা কতবড় মানবতার দুশমন ! শিশুর খাদ্য দুধও ভেজাল করছে, জীবন-ব্যাধি প্রতিষেধক ঔষধও নকল করছে। চাল, ডাল, তৈল এগুলিতো প্রতিদিন সবার প্রয়োজন। তাতেও বালি, কাকর, পাথর, চর্বি এবং নিম্ন মানের সস্তা মূল্যের দ্রব্য মিশ্রিত করে বিক্রি করছে। অথচ আল কুরআন তো এটা নিষেধ করেছে কঠোর শাস্তির পরিণতির স্মরণ করিয়ে দিয়ে।

বই পত্রও নকল হচ্ছে। আর রাসূলের (সাঃ) নামে হাদীস তৈরী করে তাও হাদীসে রাসূল বলে বর্ণিত হচ্ছে, প্রতিপালন বা অনুসরণ করা হচ্ছে। আর এগুলো করছে এক শ্রেণীর নামধারী আলেম। পূর্বের আসমানী কিতাবগুলি ঐ সব কিতাবের ধারক/বাহকরা নিজেদের মর্জি মাফিক রদবদল করেছে। আসল আসমানী কিতাব আর নেই। না যাবুর, না তাওরাত, আর না ইঞ্জিল। ৮০ বারের অধিক সংস্কার করা হয়েছে ইঞ্জিলের। আর তাওরাত যে পরিবর্তন হয়েছে তার কথা আল কুরআনেও বর্ণিত। একমাত্র আল কুরআনই মাহফূজে সুরক্ষিত যাবতীয় রদবদল থেকে। কেননা জগতের বুকে সকল যুগে যেখানে মুসলিমরা আছেন সেখানেই কুরআনের হাফিয বর্তমান। আর লিখিত গ্রন্থাকারে আল কুরআন সকল দেশে সকল যুগে এক অভিন্ন। একটি অক্ষরও এদিক সেদিক হয়নি। আল্লাহ আমাদেরকে সত্য-মিথ্যার পার্থক্য বুঝার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

সত্যবাদী হওয়া

১। ওহে বিশ্বাসীগণ! তোমরা আল্লাহকে ভয় কর এবং সত্যপন্থীদের অন্তর্ভুক্ত হও। [সূরা তাওবা-১১৯]

২। আল্লাহ বলেন ঃ আজকের দিনে সত্যপন্থীদের সত্যপন্থা উপকার দিবে, তাদের জন্য রয়েছে জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, তাতে তারা স্থায়ী হয়ে চিরকাল থাকবে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট হয়েছেন আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট। এটাই হল মহাসাফল্য। [সূরা মায়িদা-১১৯]

৩। সত্য আঁকড়ে ধরা তোমাদের একান্ত কর্তব্য। কেননা সত্য সাওয়াবের দিকে পরিচালিত করে, আর সাওয়াব জান্নাতের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি সর্বদা সত্য বলার অভ্যাস রপ্ত করলে ও সত্যের উপর সংকল্পবদ্ধ হলে আল্লাহর কাছে সে সত্যবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়। আর তোমরা মিথ্যা থেকে সাবধান থেক! কেননা মিথ্যা পাপের দিকে পরিচালিত করে। আর পাপ নিশ্চিত (জাহান্নামের) আগুনের দিকে পরিচালিত করে। কোন ব্যক্তি মিথ্যার উপর প্রতিষ্ঠিত থাকলে এবং মিথ্যার উপর সংকল্পবদ্ধ হলে তার নাম আল্লাহর কাছে মিথ্যাবাদীরূপে লিপিবদ্ধ হয়। [মুসলিম/৬৪০১-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ), বুখারী/৫৬৫১, তিরমিযী/১৯৭৭]

☐ হককে হক হিসাবে এবং বাতিলকে বাতিল রূপে প্রদর্শনের জন্য মু'মিনগণ প্রচেষ্টা চালাবেন যদিও অপরাধীরা তা অপছন্দ করে। সর্বদা সত্য কথা বলার মধ্যেই মানুষের মনুষ্যত্ব, আস্থা এবং সম্মান নির্ভর করে। মিথ্যাবাদীকে সবাই অবিশ্বাস করে, কিন্তু সত্যবাদীকে কেহ অবিশ্বাস করেনা।

সুদ

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ لاَ تَأْكُلُواْ الرِّبَا أَضْعَافًا مُّضَاعَفَةً وَاتَّقُواْ اللّهَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ.

ওহে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা সুদ খেওনা চক্রবৃদ্ধি হারে। আর ভয় কর আল্লাহকে, আশা করা যায় তোমরা সফলকাম হবে। [সূরা আলে ইমরান-১৩০]

২। মানুষের ধন সম্পদ বৃদ্ধি পাবে, এ আশায় সুদে যা কিছু তোমরা দিয়ে থাক, আল্লাহর দৃষ্টিতে তা বৃদ্ধি পায়না। বরং আল্লাহর সন্তুষ্টি লাভের আশায় তোমরা যা দান কর তার পরিবর্তে তোমরা বহুগুণ প্রাপ্ত হবে। [সূরা রূম-৩৯]

৩। আল্লাহ নিশ্চিহ্ন করে দেন সুদকে এবং বর্ধিত করেন দানকে। আর আল্লাহ ভালবাসেননা কোন অকৃতজ্ঞ পাপীকে। [সূরা বাকারা-২৭৬]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-২৭৮, ২৭৯।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম লা'নত করেছেন, সুদখোরের উপর, সুদদাতার উপর, এর লেখকের উপর ও উহার সাক্ষীদ্বয়ের উপর এবং বলেছেন এরা সকলেই সমান। [মুসলিম/৩৯৪৮-জাবির (রাঃ), আবূ দাউদ/৩৩০০, তিরমিযী/১২০৯]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সুদ হল সত্তর প্রকারের পাপের সমষ্টি। [ইব্‌ন মাজাহ/২২৭৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

◻ মুসলিমকে অবশ্যই সুদ থেকে বেঁচে থাকার জন্য সদা-সর্বদা সংগ্রাম চালিয়ে যেতে হবে। কেননা সুদ দেয়া ও নেয়া হারাম, সুদ সম্পর্কীত অর্থ দ্বারা পার্থিব কাজ করলে তাদের ইবাদাত কবূল হবার নয়। বিধর্মীরা চায় ইসলাম থেকে মুসলিমরা বিচ্ছিন্ন হয়ে পড়ুক। আজ শিক্ষা ব্যবস্থায় সুদের অংক শিক্ষা দেয়া হয়। দুধে পানি দেয়া অর্থাৎ ভেজাল দেয়ার অংক শিক্ষা দেয়া হয়। এই শিক্ষার পরিণতিতে শিক্ষিত সমাজ সুদহীন কারবার বুঝতে পারেনা। এটা মুসলিম জাতির চরম দুর্ভাগ্য। এ পাপের বোঝা মাথায় নিয়ে দৈনন্দিন জীবন মরণ পথের যাত্রী আমরা। এর থেকে বাঁচার হিম্মাত সৃষ্টি করতে হবে। সুদহীন ইসলামী অর্থনীতি চালু করতে হবে একেবারে প্রাথমিক পর্যায় থেকে। আল্লাহ আমাদের সুদের কবল থেকে মুক্ত থাকার তাওফীক দান করুন। (আমীন)

স্বামী-স্ত্রীর অধিকার

১। হে ঈমানদারগণ! জোরপূর্বক নারীদের ওয়ারিশ হওয়া তোমাদের জন্য বৈধ নয়, আর তাদেরকে দেয়া মাল হতে কিছু উসূল করে নেয়ার উদ্দেশে তাদের সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবেনা, যদি না তারা সুস্পষ্ট ব্যভিচার করে। তাদের সাথে দয়া ও সততার সঙ্গে জীবন যাপন কর, যদি তাদেরকে পছন্দ না কর । তবে হতে পারে যে, তোমরা যাকে না পছন্দ করছ, বস্তুতঃ তারই মধ্যে আল্লাহ বহু কল্যাণ দিয়ে রেখেছেন। [সূরা নিসা-১৯]

২। তোমরা কখনও স্ত্রীদের মধ্যে সমতা রক্ষা করতে পারবেনা যদিও প্রবল ইচ্ছা কর। অতএব তোমরা একজনের দিকে সম্পূর্ণরূপে ঝুঁকে পড়না এবং অন্যকে ঝুলিয়ে রেখনা। যদি তোমরা নিজেদেরকে সংশোধন কর এবং তাকওয়া অবলম্বন কর তাহলে আল্লাহ অতি ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা নিসা-১২৯]

৩। নারী পাঁজরের হাড়ের ন্যায় (বাঁকা)। যখন তুমি তাকে সোজা করতে যাবে তখন তা ভেংগে যাবে, আর তার মাঝে বক্রতা রেখে দিয়েই তা থেকে তুমি উপকার হাসিল করবে। [মুসলিম/৩৫০৮-আবূ হুরাইরা (রাঃ), বুখারী/৪৭৯৭, ৩০৮৮]

◻ স্বামীর উচিত তার স্ত্রীর নিকট থেকে যতটুকু ফাইদা গ্রহণ করা যায় তা সহজভাবে গ্রহণ করা, কেননা যে স্বভাবের বৈশিষ্ট্য করে স্ত্রীকে সৃষ্টি করা হয়েছে তা পরিপূর্ণ নয়, বরং তার মধ্যে অবশ্যই বক্রতা থাকবে। নারীকে যে প্রকৃতিতে সৃষ্টি করা হয়েছে সেভাবেই তার মাধ্যমে পুরুষের উপকৃত হতে হবে । মানুষের উচিত নারীর ভাল-মন্দ উভয় চরিত্র ও বৈশিষ্ট্যের তুলনা করা। কেননা যদি তার কোন একটি অভ্যাস অপছন্দ হয় তাহলে তার অন্য এমন চরিত্রও রয়েছে যা সে পছন্দ করবে। তাকে শুধু অপছন্দ ও কড়া নজরেই যেন না দেখে।

অনেক স্বামী রয়েছে যারা তাদের স্ত্রীদের পক্ষ থেকে পরিপূর্ণ গুণাবলী কামনা করে, কিন্তু তা অসম্ভব। এ জন্যই তারা পতিত হয় দুর্দশা ও দুর্ভোগে এবং স্ত্রীদের দ্বারা উপকৃত হতে পারেনা বরং কখনো তাদের মধ্যে তালাক-বিচ্ছেদ ঘটে যায়।

পুরুষের স্বর্ণ ব্যবহার করা প্রসঙ্গে

১। আল্লাহ ও তাঁর রাসূল কোন নির্দেশ দিলে কোন মু'মিন পুরুষ ও মু'মিন নারী উক্ত নির্দেশের ভিন্নতা করার কোন অধিকার রাখেনা। যে আল্লাহ ও তাঁর রাসূলকে অমান্য করে সে হয় সুস্পষ্ট পথভ্রষ্ট। [সূরা আহযাব-৩৬]

২। আমার উম্মাতের নারীদের জন্য স্বর্ণ ও রেশম ব্যবহার বৈধ করা হয়েছে এবং পুরুষদের জন্য তা হারাম করা হয়েছে। [তিরমিযী/১৭২৬]

◻ মানুষের সৌন্দর্য বৃদ্ধির জন্য স্বর্ণ হচ্ছে সর্বাধিক মূল্যবান বস্তু। স্বর্ণ ব্যবহার হয় সৌন্দর্য ও গহনা হিসাবে । আর পুরুষের এটা দরকার নেই। অর্থাৎ পুরুষ এমন মানুষ নয় যে, তাকে অন্যের সাহায্য নিয়ে পরিপূর্ণ হতে হবে। বরং তার পৌরুষত্বের কারণে সে নিজেই পরিপূর্ণ মানুষ। তাছাড়া নিজের দিকে অন্য মানুষকে আকৃষ্ট করার জন্য পুরুষের সৌন্দর্য অবলম্বন করারও দরকার নেই। কিন্তু নারী এর বিপরীত। নারী অপূর্ণ, তার সৌন্দর্যকে পূর্ণতা দান করা দরকার। এ কারণে সর্বোচ্চ মূল্যে গহনা দিয়ে তাকে সৌন্দর্যমন্ডিত করার প্রয়োজন দেখা যায়, যাতে তার ঐ সৌন্দর্য স্বামী-স্ত্রীর মাঝে সদ্ভাব সৃষ্টি করে, স্বামীর কাছে স্ত্রী হয়ে উঠে আবেগময়ী ও আকর্ষণীয়া।

আল্লাহ ছাড়া অন্যের সাহায্য কামনা করা

১। আর তারা আল্লাহ্ ছাড়া এমন বস্তুসমূহের ইবাদাত করে যারা তাদের কোন অপকার করতে পারেনা এবং তাদের কোন উপকারও করতে পারেনা। আর তারা বলে, এরা হচ্ছে আল্লাহর নিকট আমাদের সুপারিশকারী। তুমি বলে দাও ঃ তোমরা কি আল্লাহকে এমন বিষয়ের সংবাদ দিচ্ছ যা তিনি অবগত নন, না আসমানে, আর না যমীনে? তিনি পবিত্র এবং তাদের মুশরিকী কার্যকলাপ হতে তিনি অনেক উর্ধ্বে। [সূরা ইউনুস-১৮]

২। জেনে রেখ, খালেস দীন কেবল আল্লাহরই জন্য। যারা তাঁকে বাদ দিয়ে অন্যদেরকে অভিভাবক বানিয়ে নিয়েছে তারা বলে ঃ আমরা তাদের ইবাদাত একমাত্র এ উদ্দেশেই করি যে, তারা আমাদেরকে আল্লাহর নৈকট্যে পৌঁছে দিবে। তারা যে মতভেদ করছে, আল্লাহ তার চূড়ান্ত ফাইসালা করে দিবেন। যে মিথ্যাবাদী ও কাফির আল্লাহ তাকে সঠিক পথ দেখাননা। [সূরা যুমার-৩]

৩। আল্লাহ ছাড়া তোমরা যাদেরকে ডাক তারা তোমাদের সাহায্য করার কোন ক্ষমতা রাখেনা এবং নিজেদেরকেও সাহায্য করতে পারেনা। [সূরা আ'রাফ- ১৯৭]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বানী ইসরাইল-৫৬, ৫৭, সাবা-২, আলে ইমরান-৮০, মারইয়াম-৯১, ৯৫, শু'আরা-২১৪, তাওবা-১১৩।

৫। আল্লাহর নির্দেশ নাবীর (সাঃ) প্রতি, বল ঃ "আল্লাহ যা ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত আমার নিজের ভাল-মন্দের উপরও আমার কোন অধিকার নেই। আমি যদি অদৃশ্যের খবর জানতাম তাহলে তো আমি বহু কল্যাণ সঞ্চয় করতাম এবং কোন অকল্যাণই আমাকে স্পর্শ করতে পারতনা। আমি তো বিশ্ববাসীর জন্য

একজন সতর্ককারী ও শুভ সংবাদদাতা ছাড়া আর কিছুই নই।" [সূরা আ'রাফ-১৮৮]

- অসীলা তালাশ করা, যা এক শ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা করে, তারা নাবী, অলী এবং সৎ আমলকারীদের ব্যক্তিসত্ত্বার মাধ্যমে আল্লাহ তা'আলার নিকট প্রার্থনা করে। অথচ তাদেরকে আল্লাহর নৈকট্য লাভের উপায় কিংবা অসীলা রূপে গন্য করা যায়না। কেননা আল্লাহর উপর তাদের কোন প্রভাব নেই। সুতরাং ইহা একটি নতুন আবিস্কার করা প্রথা ও মিথ্যা প্রতারণা, ইহা শাইতানী ধোঁকা ও ভ্রান্তি ছাড়া আর কিছু নয়, আর ইহা অকাট্ট রূপে অবৈধ, বরং উহা মুশরিকদের কাজ যা আহলে-কিতাবদের, প্রতিমা-পূজারীদের (ইয়াহুদী ও খৃষ্টান) নিকট হতে এক শ্রেণীর মুসলিম নামধারীদের মধ্যে অনুপ্রবেশ করেছে এবং বর্তমান সমাজে ব্যাপকভাবে প্রসার লাভ করছে। আমাদের সকলের জানা বা বুঝা উচিত যে, নিজের পূন্য কাজের অসীলায় দু'আ কবূল হয়।

জীবিত এবং উপস্থিত ব্যক্তিদের নিকট সাহায্য চাওয়া যাবে কি?

১। আল্লাহ বলেন ঃ তাক্ওয়া এবং ভালো কাজে একে অপরকে সাহায্য কর। [সূরা মায়িদা-২]

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম-বলেছেন ঃ "বান্দা যতক্ষণ তার ভাইকে সাহায্য করে ততক্ষণ আল্লাহ নিজ বান্দাকে সাহায্য করে থাকেন।" [তিরমিযী/১৪৩১]

- যেমন ঃ যে ব্যক্তির কাছে টাকা আছে, তার কাছে আর্থিক সাহায্য নেয়া বৈধ। তবে কোন ব্যক্তির কাছে সাহায্য চাওয়া বৈধ নয় যে বিষয়ের ক্ষমতা আল্লাহ তাকে দেননি। যেমন রুযীতে বারাকাত চাওয়া, আরোগ্য লাভের প্রার্থনা করা, সন্তান চাওয়া ইত্যাদি। যে বস্তুর উপর আল্লাহ তা'আলা জীবিত মানুষকে শক্তি দিয়েছেন সেগুলোতে আমরা সাহায্য নিতে পারি। এ সমস্ত শর্ত সাপেক্ষে সাহায্যের জন্য মৃত নাবী, অলীকে ডাকা কখনও দলীল হতে পারেনা। কোন শর্ত ছাড়া সাধারণভাবে তাদের কাছে সাহায্য তলব করা শির্ক, এ কথা কুরআন/হাদীসের অসংখ্য আয়াত দ্বারা প্রমাণিত।

দুনিয়াবী জীবনে জীবিত ব্যক্তির সুপারিশ কি বৈধ?

১। যে ব্যক্তি ভাল কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে (সাওয়াবের) অংশ আছে এবং যে মন্দ কাজের জন্য সুপারিশ করবে, তার জন্য তাতে অংশ আছে। আল্লাহ সকল বিষয়ে খোঁজ রাখেন। [সূরা নিসা-৮৫]

২। সৎকাজ ও তাকওয়ার ব্যাপারে তোমরা পরস্পরকে সহযোগিতা কর, পাপ ও সীমা লঙ্ঘনের কাজে পরস্পরকে সহযোগিতা করনা। আল্লাহকে ভয় কর, আল্লাহ শাস্তি দানে অত্যন্ত কঠোর। [সূরা মায়িদা-২]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সৎ কাজের জন্য সুপারিশ কর, এরূপ করলে তুমি সাওয়াবের অধিকারী হবে। [মুসলিম/৬৪৫২]

- দুনিয়াবী বিষয়ে জীবিত ব্যক্তির সুপারিশ বৈধ। তবে আমাদের স্মরণ রাখতে হবে যে, দুনিয়াবী জীবনের সুপারিশ তলব থেকে এ কথার দলীল গ্রহণ করা বৈধ হবেনা যে, আখিরাতের সুপারিশও দুনিয়াবী জীবনের সুপারিশের মত। আখিরাতের সুপারিশ কি ধরনের হবে তা অবশ্যই আমাদেরকে জানতে হবে।

সুপারিশ (শাফা'আত) সম্বন্ধে আল্লাহর নির্দেশ এবং সুপারিশ পাওয়ার যোগ্য কে?

১। আল্লাহ! তিনি ব্যতীত কোন উপাস্য নেই। তিনি চিরঞ্জীব, সব কিছুর ধারক। তন্দ্রা ও নিদ্রা তাঁকে স্পর্শ করেনা। নভোমন্ডল ও ভূমন্ডলে যা কিছু রয়েছে সবই তাঁর। কে আছে এমন, যে তাঁর অনুমতি ব্যতীত তাঁর নিকট সুপারিশ করতে পারে? সম্মুখের অথবা পশ্চাতের সবই তিনি অবগত আছেন। একমাত্র তিনি যতটুকু ইচ্ছা করেন তা ব্যতীত, তাঁর অনন্ত জ্ঞানের কোন বিষয়েই কেহ ধারণা করতে পারেনা। তাঁর আসন আসমান ও যমীন ব্যাপী হয়ে আছে এবং এতদুভয়ের সংরক্ষণে তাঁকে বিব্রত হতে হয়না। তিনিই সর্বোচ্চ, মহীয়ান। [সূরা বাকারা-২৫৫]

২। সেদিন কারো সুপারিশ কোন কাজে আসবেনা, দয়াময় যাকে অনুমতি দিবেন, আর যার কথায় সন্তুষ্ট হবেন তার (সুপারিশ) ব্যতীত। [সূরা তাহা- ১০৯]

৩। তোমরা সেদিনকে ভয় কর যেদিন কেহ কারো উপকারে আসবেনা এবং কারও সুপারিশ গৃহীত হবেনা এবং কারও নিকট থেকে ক্ষতিপূরণ গ্রহণ করা হবেনা, আর তারা কোন রকম সাহায্যও পাবেনা। [সূরা বাকারা-৪৮]

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ বাকারা-১২৩, ২২৫, ২৫৪, নিসা-২৫, আন'আম-৫১, ৭০, ৯৪, আ'রাফ-৫৩, আম্বিয়া-২৮, শু'আরা-৯৯, ১০০, ১০১, ইউনুস-৩, ১৮, মারইয়াম-৮৫, সাবা-২৩, ইয়াসীন-২৩, মু'মিন-১৮, নাজম-২৬, নাবা-৩৮, যুমার-৪৪, আলে ইমরান-৮৫।

৫। আল্লাহ বলেন ঃ 'তোমার নিকটাত্মীয়বর্গকে সতর্ক করে দাও' [সূরা শু'আরা-২১৪]। যখন এই মর্মে আয়াত নাযিল হল তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাফা পর্বতে আরোহণ করেন এবং বললেন ঃ হে ফাতিমা বিনত মুহাম্মাদ! হে সাফিয়া বিনত আবদুল মুত্তালিব! হে আবদুল মুত্তালিবের বংশধর! আল্লাহর আযাব থেকে তোমাদেরকে রক্ষা করার আমার কোন ক্ষমতা নেই। তোমরা আমার কাছে আমার সম্পদের যা খুশি চাইতে পার। [মুসলিম/৩৯৭]

- রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের প্রতি আল্লাহ তা'আলা যা নাযিল করেছেন এবং যা আল্লাহ তা'আলা অধিকার দিয়েছেন উহার জন্য কোন অবস্থায়ই শাফা'আতের জন্য রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে সরাসরি ডাকা যাবেনা। তাই আমাদের প্রার্থনা হওয়া উচিত "হে আল্লাহ! আমাকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সুপারিশ হতে বঞ্চিত করনা।" "হে আল্লাহ! আমাদের প্রিয় রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে আমাদের জন্য সুপারিশের অনুমতি দিও," ইত্যাদি। আরেকটি কথা ঃ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম ছাড়া অন্যদেরকেও আল্লাহ শাফা'আতের অধিকার দিয়েছেন, যেমন আল্লাহর অনুমতি প্রাপ্ত হয়ে

ফিরিশতারা সুপারিশ করবেন এবং মাসুম বাচ্চারা (তাদের পিতা মাতার জন্য) সুপারিশ করবে। তাই বলে কি আমরা সুপারিশের জন্য তাদেরকে সরাসরি ডাকব? যেহেতু কোন সুপারিশকারীই আল্লাহর অনুমতি ছাড়া নিজ হতে সুপারিশ করার ক্ষমতা রাখেনা, সেহেতু আল্লাহ ব্যতীত অন্য কেহকেও তার ক্ষমতার বর্হিভূত কাজের জন্য প্রার্থনা করা শির্‌কী কার্যকলাপ। কারণ আমরা জানিনা কে সুপরিশ করার সুযোগ লাভ করবে কিংবা কার জন্য সুপারিশ করতে পারবে। কারণ আল্লাহ যার প্রতি রাযী-খুশি থাকবেন তার জন্যই শুধু সুপারিশ করার সুযোগ মিলবে। শির্‌কী কার্যকলাপের জন্য আল্লাহ কেহকেও ক্ষমা করবেননা এবং এরূপ ব্যক্তিরা চিরকাল জাহান্নামের অধিবাসী হবে। এরূপ হুশিয়ারী কুরআনের বহু জায়গায় উল্লেখ আছে।

প্রিয় মুসলিম ভাই/বোনেরা সময় দ্রুত শেষ হয়ে যাচ্ছে। আর বুজুর্গ, পীর, দরবেশের কাছে যেয়ে নাজাতের মিথ্যা আশ্বাসে বিশ্বাস করবেননা। আল্লাহর কুরআনকে কি বিশ্বাস হয়না? ঐ আয়াতগুলি কি অবিশ্বাস করবেন, নাকি মিথ্যা বিশ্বাসের ভিত ভেংগে ফেলবেন? এখনই স্থির করুন। মৃত্যুর ফিরিশতা তো একেবারেই নিকটে। শির্‌কের পাপ আল্লাহ কখনও মাফ করবেননা। আল্লাহ আমাদেরকে তাঁর নির্দেশিত পথে চলার তাওফীক দান করুন।

সাহাবীগণের মর্যাদা অতি উচ্চ এবং তাদেরকে গালি দেয়া বৈধ নয়

১। মুহাজির ও আনসারদের মধ্যে যারা প্রথম সারির অগ্রণী আর যারা তাদেরকে যাবতীয় সৎকর্মে অনুসরণ করেছে, আল্লাহ তাদের প্রতি সন্তুষ্ট আর তারাও তাঁর প্রতি সন্তুষ্ট, তাদের জন্য তিনি প্রস্তুত করে রেখেছেন জান্নাত যার তলদেশে ঝর্ণাধারা প্রবাহিত, সেখানে তারা চিরকাল থাকবে। এটাই মহান সফলতা। [সূরা তাওবা-১০০]

২। যে ব্যক্তি সত্য পথ প্রকাশিত হওয়ার পরও রাসূলের বিরোধিতা করে এবং মু'মিনদের পথ বাদ দিয়ে ভিন্ন পথ অনুসরণ করে, আমি তাকে সেই পথেই ফিরাব যে পথে সে ফিরে যায়, আর তাকে জাহান্নামে দগ্ধ করব, কত মন্দই না সে আবাস! [সূরা নিসা-১১৫]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ ফাত্‌হ-২৯, হাশর-৮-১০।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার সাহাবীদের সম্পর্কে কোনরূপ কটুক্তি করবেনা। যার নিয়ন্ত্রণে আমার জীবন তাঁর শপথ! যদি তোমাদের কেহ উহুদ পাহাড় পরিমাণ সোনা (আল্লাহর রাস্তায়) খরচ কর তাহলে তারা দীনের জন্য যে এক বা অর্ধ মুদ সম্পদ (যা খুবই নগণ্য) খরচ করেছে, তার সমান হবেনা। [আবূ দাউদ/৪৫৮৬-আবূ সাঈদ (রাঃ), মুসলিম/৬২৫৬]

হাজ্জ সম্পর্কীত

১। আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

فِيهِ آيَاتٌ بَيِّنَاتٌ مَّقَامُ إِبْرَاهِيمَ وَمَن دَخَلَهُ كَانَ آمِنًا وَلِلّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ مَنِ اسْتَطَاعَ إِلَيْهِ سَبِيلاً وَمَن كَفَرَ فَإِنَّ الله غَنِيٌّ عَنِ الْعَالَمِينَ

এতে অনেক সুস্পষ্ট নিদর্শন আছে, যেমন মাকামে ইবরাহীম। আর যে কেহ সেখানে প্রবেশ করে সে নিরাপদ। মানুষের মধ্যে যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ আছে, আল্লাহর উদ্দেশে ঐ গৃহের হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য এবং কেহ প্রত্যাখ্যান করলে সে জেনে রাখুক, নিশ্চয়ই আল্লাহ বিশ্বজগতের মুখাপেক্ষী নন। [সূরা আলে ইমরান-৯৭]

২। ইসলাম পূর্ববর্তী সকল অন্যায় মিটিয়ে দেয়। হিজরাত পূর্বেকৃত পাপসমূহ মিটিয়ে দেয় এবং হাজ্জও পূর্বের সকল পাপ মিটিয়ে দেয়। [মুসলিম/২২-ইব্‌ন শুমাসা আল-মাহরী (রঃ)]

৩। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার এই মাসজিদে (মাসজিদে নাববীতে) এক (রাক'আত) সালাত, মাসজিদুল হারাম ব্যতীত অন্য যে কোন মাসজিদে এক হাজার (রাক'আত) সালাতের চেয়েও উত্তম। [মুসলিম/৩২৪০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/২৯০১]

৪। সাওয়াবের আশায় কেবলমাত্র তিনটি মাসজিদের উদ্দেশে সফর করা যাবে। যথা ঃ কা'বা মাসজিদ, আমার এই মাসজিদ এবং ইলিয়ার মাসজিদ (বাইতুল মুকাদ্দাস)। [মুসলিম/৩২৫২-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। যে ব্যক্তি এ ঘরের হাজ্জ আদায় করল, অশ্লীলতায় লিপ্ত হলনা এবং আল্লাহর নাফরমানী করলনা, সে মাতৃগর্ভ থেকে সদ্যপ্রসূত শিশুর মত হয়ে (হাজ্জ থেকে) প্রত্যাবর্তন করবে। [বুখারী/১৬৯৬, ১৪২৬-আবূ হুরাইরা (রাঃ), নাসাঈ/২৬২৯]

(ক) প্রত্যক মুসলিমের উচিত যাদের হাজ্জে যাওয়ার সামর্থ্য আছে তাদের অবশ্যই হাজ্জ করা।

(খ) আমাদের সমাজের প্রায় লোকেরই ধারনা যে, চাকুরি/ব্যবসা থেকে অবসরের পর বৃদ্ধ বয়সে হাজ্জে গমন করতে হবে।

(গ) বর্তমান সমাজের কিছু লোক একে অন্যের দেখা দেখি হাজ্জ করেন। এটি একটি ফ্যাশানে পরিণত করেছেন। কিন্তু হাজ্জ থেকে এসেই যতরকম আল্লাহর নাফরমানী কাজ আছে ঐগুলি বাদ দেয়া তাদের পক্ষে সম্ভব হচ্ছেনা।

উমরাহ বা হাজ্জকারী যদি দু'আ না জানে তাহলে তাওয়াফ, সা'ঈ প্রভৃতির সময় কোন বই হাতে নিয়ে দেখে দেখে দু'আ পাঠ করা প্রসঙ্গ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট থেকে তোমরা হাজ্জের নিয়ম-কানূন শিখে নাও। [মুসলিম/৩০০৩]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ "আল্লাহর ঘরের তাওয়াফ, সাফা-মারওয়ার সা'ঈ ও জামরায় কঙ্কর নিক্ষেপ প্রভৃতির লক্ষ্য হচ্ছে আল্লাহর যিক্র প্রতিষ্ঠা করা।" [আবূ দাউদ/১৮৬৬]

হাজ্জ বা উমরাহকারী যে সমস্ত দু'আ জানে এগুলিই তার জন্যে যথেষ্ট। কেননা সাধারণতঃ সে যা জানে তাই সে বুঝে। আর বুঝে-শুনেই আল্লাহর কাছে প্রার্থনা করা উচিত। কিন্তু যদি কোন বই হাতে নিয়ে দু'আ পড়ে বা কেহকে ভাড়া নিয়ে তার শিখিয়ে দেয়া দু'আ পড়ে, যার কিছুই সে বুঝেনা, তাতে কোনই উপকার হবেনা। তাছাড়া বাজারের এরূপ বইগুলোতে তাওয়াফ-সা'ঈর জন্য যে দু'আ নির্দিষ্ট করা হয়েছে তা বিদ'আত এবং বিভ্রান্তি কর। কোন মুসলিমের জন্য এগুলো পাঠ করা উচিত নয়। কেননা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম উম্মাতকে প্রত্যেক চক্করের জন্য আলাদা ও বিশেষ কোন দু'আ শিক্ষা দেননি। সাহাবায়ে কিরাম থেকেও এর প্রমাণ পাওয়া যায়না।

তাই সকল মু'মিনের উপর কর্তব্য হচ্ছে এ ধরনের বই-পুস্তক থেকে সতর্ক থাকা। আর নিজের দরকারের কথা আল্লাহর কাছে এমন ভাষায় পেশ করা যার অর্থ নিজে বুঝবে ও সাধ্যানুযায়ী সেরূপ আল্লাহর যিক্র করবে। অর্থ বুঝেনা এমন শব্দ ব্যবহার করার চেয়ে নিজের ভাষা দিয়ে মনে মনে নিজের/অন্যের জন্য দু'আ করাই উত্তম। অনেকে এমনও আছে যে, অর্থ বুঝা তো দূরের কথা বইয়ের শব্দ বা বাক্যগুলোও ভালভাবে পড়তে পারেনা।

কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে দু'আ বা কান্নাকাটি করা প্রসঙ্গ

১। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম প্রত্যেক তাওয়াফেই রুকুনে ইয়ামীন এবং হাজরে আসওয়াদ স্পর্শ করতেন। [নাসাঈ/২৯৫০, তিরমিযী/৯৫২]

কা'বা ঘরের গিলাফ ধরে বারাকাত কামনা করা বা দু'আ বা কান্নাকাটি করা বিদ'আত। কেননা এ কাজ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে প্রমাণিত নয়। মুআবিয়া বিন আবূ সুফিয়ান (রাঃ) তাওয়াফ করার সময় যখন কা'বা ঘরের প্রতিটি কোণা স্পর্শ করছিলেন তখন আবদুল্লাহ বিন আব্বাস (রাঃ)-এর প্রতিবাদ করেছেন। মুআবিয়া বললেন ঃ কা'বা ঘরের কোন অংশই ছাড়ার নয়।' তখন ইব্ন আব্বাস (রাঃ) জবাবে বললেন ঃ "নিশ্চয়ই আল্লাহর রাসূলের মধ্যে তোমাদের জন্য রয়েছে উত্তম আদর্শ। আমি দেখেছি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম শুধু মাত্র দু'টি কোনা স্পর্শ করেছেন। অর্থাৎ হাজরে আসওয়াদ ও রুকুনে ইয়ামীন। অতএব আমাদের উপর আবশ্যক হচ্ছে কা'বা ঘরকে ছোঁয়া বা স্পর্শ করার ব্যাপারে শুধুমাত্র সুন্নাত থেকে প্রমাণিত দলীলেরই অনুসরণ করা। কেননা এতেই আমরা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উত্তম আদর্শকে আঁকড়ে থাকতে পারব।

উমরাহ্ করতে গিয়ে কোন ব্যক্তির মাথার একদিক থেকে চুল অল্প করে খাটো করা প্রসঙ্গ

১। চুল ছাঁটার চেয়ে কামানো উত্তম এবং ছাঁটাও জায়েয। [মুসলিম/৫১]

২। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম হাজ্জের সময় মাথার চুল মুন্ডনকারীদের প্রতি এবং চুল ছোটকারীদের প্রতিও দু'আ করেছেন। [মুসলিম/৩০১০-৩০১৫]

৩। একদা নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একটি বাচ্চাকে এ অবস্থায় দেখেন যার মাথার কিছু চুল মুন্ডন করা হয়েছে এবং কিছু অবশিষ্ট রয়েছে। তিনি তাদের এরূপ করতে নিষেধ করে বলেন ঃ হয় সব চুল মুন্ডন করবে, অথবা সব রেখে দিবে। [আবূ দাউদ/৪১৪৭-ইব্ন উমার (রাঃ)]

উপরোক্ত হাদীস অনুযায়ী মনে হয় ঐ লোকের চুল খাটো করা ঠিকমত হয়নি। তার উপর ওয়াজিব হচ্ছে বিশুদ্ধভাবে মাথার সম্পূর্ণ অংশ থেকে চুল খাটো করা, তারপর হালাল হওয়া।

কোন কাজের মাধ্যমে আল্লাহর ইবাদাত করতে চাইলে পূর্বেই তার উক্ত কাজ সম্পর্কে জ্ঞানার্জন করা ওয়াজিব। আল্লাহ এবং তাঁর রাসূলের (সাঃ) সীমারেখা জানা আবশ্যক, যাতে জেনে-শুনে আল্লাহ্র ইবাদাত করতে পারে। ইবাদাতটি যেন অজ্ঞতার সাথে না হয়। ⊙ এ জন্য আল্লাহ তা'আলা স্বীয় নাবী মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বলেছেন ঃ "বল! এটাই আমার পথ। আমি ও আমার অনুসারীগণ আল্লাহর দিকে আহবান করি স্বজ্ঞানে।"[সূরা ইউসুফ-১০৮] কোন মানুষ যদি মাক্কা থেকে মাদীনা সফর করতে চায় তাহলে রাস্তা সম্পর্কে অবশ্যই নির্দেশনা নিতে হবে, মানুষকে জিজ্ঞেস করতে হবে যাতে পথভ্রষ্ট হয়ে গন্তব্য হারিয়ে না ফেলে। বাহিরের পথের অবস্থা যদি এমন হয় তাহলে আভ্যন্তরিন পথ যা আল্লাহ পর্যন্ত পৌঁছাবে সে সম্পর্কে কি জ্ঞানার্জন করতে হবেনা? সে সম্পর্কে কি নির্ভরযোগ্য আলেমদেরকে জিজ্ঞেস করতে হবেনা? অবশ্যই কুরআন ও সহীহ হাদীস থেকে জ্ঞান আহরণ করতে হবে। মাথার চুল খাটো করার অর্থ হচ্ছে মাথার সমস্ত অংশ থেকে চুলের কিছু অংশ কেটে ফেলা। চুল খাট করার ক্ষেত্রে উত্তম পদ্ধতি হচ্ছে মেশিন ব্যবহার করা। কারণ এতে সমস্ত মাথা থেকেই চুল কাটা হয়। অবশ্য কেঁচি দ্বারা চুল কাটাতেও কোন অসুবিধা নেই। তবে শর্ত হচ্ছে, মাথার চতুর্দিক থেকে চুল কাটাতে হবে, যেমন করে মাথা মুন্ডন করলে সমস্ত মাথা মুন্ডন করতে হয়। যেমন উযূর সময় সমস্ত মাথা মাসাহ করতে হয়। (আল্লাহই অধিক জ্ঞান রাখেন)

বদলী হাজ্জ

১। কেহ অন্যের পক্ষ হতে বদলী হাজ্জ করতে চাইলে তাকে প্রথমে নিজের হাজ্জ করতে হবে। [ইব্‌ন মাজাহ/২৯০৩-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ দাউদ/১৮১১]

২। জনৈক মহিলা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে বললেন ঃ আল্লাহ কর্তৃক বান্দার উপর আরোপিত হাজ্জ আমার বয়োবৃদ্ধ পিতার উপর ফার্‌য হয়েছে। কিন্তু তিনি বাহনের উপর স্থির থাকতে অক্ষম, আমি কি তাঁর পক্ষ হতে হাজ্জ আদায় করব? তিনি (উত্তরে) বললেন ঃ হ্যাঁ (আদায় করবে)। [বুখারী/১৪২০-আবদুল্লাহ ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), মুসলিম/৩১১৭, তিরমিযী/ ৯৩০, নাসাঈ/২৬২৩]

৩। জুহাইনা গোত্রের একজন মহিলা নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নিকট এসে বললেন ঃ আমার আম্মা হাজ্জের নিয়াত করেছিলেন, কিন্তু তিনি হাজ্জ আদায় না করেই মৃত্যুবরণ করেছেন। 'আমি কি তার পক্ষ থেকে হাজ্জ করতে পারি? রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ হ্যাঁ, তার পক্ষ হতে তুমি হাজ্জ আদায় কর। তুমি কি মনে কর, যদি তোমার আম্মার উপর ঋণ থাকত তা কি তুমি আদায় করতেনা? সুতরাং আল্লাহর হক আদায় করে দাও। কেননা আল্লাহর হকই সবচেয়ে অধিক আদায়যোগ্য। [বুখারী/১৭২৭-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), তিরমিযী/৯৩২, নাসাঈ/২৬৩৪, বুখারী/৬৮০৪]

(ক) বদলী হাজ্জ কেবল তারাই করাবে যাদের হাজ্জে গমন করার শারীরিক শক্তি সামর্থ্য নেই। অথবা হাজ্জ করার সামর্থ্য থাকা সত্ত্বেও যারা হাজ্জ না করে মারা যাবে তাদের ওয়ারিশরা নিজে বা অন্যের মাধ্যমে বদলী হাজ্জ করাবে।

(খ) যাদের দ্বারা বদলী হাজ্জ করানো হবে তারা পূর্বে নিজের ফার্‌য হাজ্জ করেছে কিনা তা অবশ্যই খোঁজ নিতে হবে। কারণ হাদীসে আছে, অন্যের বদলী হাজ্জ করার পূর্বে নিজের ফার্‌য হাজ্জ আদায় করতে হবে।

(গ) একজন লোকের বদলী হাজ্জ কেবল মাত্র একজন লোকের দ্বারাই করাতে হবে। কিন্তু আমাদের সমাজে বিশেষ করে শহর এলাকায় মাসজিদ/মাদ্রাসা/মক্তব/অন্যান্য প্রতিষ্ঠানের আলেমগণকে বিভিন্ন লোক বদলী হাজ্জ করার জন্য প্রস্তাব দেন।

এখানে লক্ষ্যণীয় বিষয় যে, বিশেষ করে শহর এলাকার একজন আলেমকে কতজন লোক বদলী হাজ্জ করার প্রস্তাব দেন জানা যায়না । যদি এমনিই হয় ঐ আলেমের নিকট যত প্রস্তাব আসে সবই গ্রহণ করেন তাহলে এখন প্রশ্ন হচ্ছে, প্রতিটি বদলী হাজ্জের জন্য প্রত্যেক জনের নিকট থেকে প্রায় ৩ লক্ষ টাকা নিচ্ছেন। কিন্তু হাজ্জের সময় দেখা যায় যে, তিনি একাই হাজ্জে যাচ্ছেন।

যদি মনে করি ঐ আলেম ৫ জনের নিকট থেকে টাকা নিয়েছেন। এখন প্রশ্নের উত্তর আপনিই দিবেন, সে কিভাবে ঐ ৫ জনের বদলী হাজ্জ পালন করবে। কারণ একটি হাজ্জ মৌসুমে এক জনের বেশী লোকের বদলী হাজ্জ করা যায়না। আমরা কোন আলেম সমাজের দোষ দিচ্ছিনা, মনে রাখবেন অর্থ লোভীরা

পারেনা এমন কোন কাজ নেই। কিন্তু সেটা অবশ্যই বৈধভাবে অর্জন করতে হবে। আর সবকিছু আল্লাহই ভাল জানেন।

বদলী হাজ্জ সম্পাদন করার জন্য জনৈক লোককে দায়িত্ব দেয়া হয়েছে; কিন্তু পরে জানা গেল ঐ লোক আরো কয়েকজনের হাজ্জ আদায় করার দায়িত্ব নিয়েছে। এ সময় করণীয় এবং ঐ লোক প্রসঙ্গে

১। আল্লাহর উদ্দেশে এই গৃহের হাজ্জ করা সেই সব মানুষের কর্তব্য যারা সফর করার আর্থিক সামর্থ্য রাখে এবং যদি কেহ অস্বীকার করে তাহলে নিশ্চয়ই আল্লাহ সমগ্র বিশ্ববাসী হতে প্রত্যাশামুক্ত। [সূরা আলে ইমরান-৯৭]

২। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ সর্বোত্তম আমল হল আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের প্রতি ঈমান আনা। অতঃপর আল্লাহর পথে জিহাদ করা। তারপর হল হাজ্জ-ই-মাবরুর (মাকবূল হাজ্জ)। [বুখারী/১৪২৪-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৩। এক ব্যক্তি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাছে এসে বলল ঃ হে আল্লাহর রাসূল! কিসে হাজ্জ ফারয হয়? তিনি বললেন ঃ পাথেয় ও বাহন যোগাড়ে সক্ষম হলে। [তিরমিযী/ ৮১১-ইব্‌ন উমার (রাঃ)]

৪। যার সেখানে যাওয়ার সামর্থ্য আছে, আল্লাহর উদ্দেশে হাজ্জ করা তার অবশ্য কর্তব্য। [সূরা আলে ইমরান-৯৭] এই আয়াত নাযিল হলে সাহাবীগণ (রাঃ) বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রতি বছরই করতে হবে? তিনি চুপ করে রইলেন। তারা আবার বললেন ঃ হে আল্লাহর রাসূল! তা কি প্রতি বছরই করতে হবে? তিনি বললেন ঃ না, আমি যদি হ্যাঁ বলতাম তাহলে তোমাদের উপর তা (প্রতি বছর হাজ্জ করা) ফারয হয়ে যেত। [তিরমিযী/ ৮১২]

৫। কেহ অন্যের পক্ষ হতে বদলী হাজ্জ করতে চাইলে তাকে প্রথমে নিজের হাজ্জ করতে হবে। [ইব্‌ন মাজাহ/২৯০৩-ইব্‌ন আব্বাস (রাঃ), আবূ দাউদ/১৮১১]

প্রত্যেক মানুষের উচিত হচ্ছে, যে কোন কাজ করার পূর্বে বিচার বিশ্লেষণ ও বিচক্ষণতার পরিচয় দেয়া। ধর্মীয় দিক থেকে নির্ভরযোগ্য না হলে তাকে কোন কাজের দায়িত্ব দেয়া যাবেনা। লোকটি বিশ্বস্ত কিনা, যে কাজের দায়িত্ব দেয়া হচ্ছে তা বাস্তবায়ন করতে পারবে কিনা, সেই ব্যাপারে যথেষ্ট জ্ঞান আছে কিনা প্রভৃতি যাচাই বাছাই করবেন। হাজ্জ একটি গুরুত্বপূর্ণ ইবাদাত। তাই আপনার পিতা বা মাতার পক্ষ থেকে বদলী হাজ্জ সম্পাদন করার জন্য এমন লোক নির্বাচন করবেন, যিনি জ্ঞানী এবং ধর্মীয় দিক থেকে বিশ্বস্ত ও নির্ভরযাগ্য। কেননা বেশির ভাগ মানুষ, এমন কি অনেক আলেম হাজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে খুবই অজ্ঞ। তারা যথা নিয়মে হাজ্জ আদায় করেনা। যদিও তারা নিজেদের ইবাদাতের ক্ষেত্রে বিশ্বস্ত। কিন্তু তারা ধারণা করে, এটুকুই তাদের উপর কর্ত্যব। অথচ তারা অনেক ভুল করে। জ্ঞানের স্বল্পতার কারণে এ ধরনের মানুষের নিকট হাজ্জের দায়িত্ব প্রদান করা উচিত নয়। আবার অনেক লোক এমন আছে, যারা হয়তো হাজ্জের বিধি-বিধান সম্পর্কে জ্ঞান রাখে, কিন্তু তারা

ভাল আমানাতদার নয়। ফলে হাজ্জের কার্যাদি আদায় করার ক্ষেত্রে কথা ও কাজে কোন গুরুত্বারোপ করেনা। শুধুমাত্র দায়সারা কাজ করে। এ ধরনের লোকের কাছে হাজ্জ পালনের আমানাত অর্পন করা উচিত নয়। সুতরাং হাজ্জের দায়িত্ব প্রদান করার জন্য দীন ও আমানাতদারীতে নির্ভর করা যায় এ রকম লোক অনুসন্ধান করা জরুরী।

প্রশ্নে উল্লেখিত ব্যক্তি যে কয়জনের হাজ্জের দায়িত্ব নিয়েছে, হতে পারে সে অন্য লোকেদের দ্বারা তাদের হাজ্জগুলো আদায় করে দিবে। কিন্তু এরূপ করাও কি তার জন্য জায়েয হবে? অর্থাৎ হাজ্জ আদায় করে দেয়ার জন্য কয়েক জনের পক্ষ থেকে দায়িত্ব নেয়ার পর সরাসরি তা নিজে আদায় না করে অন্য লোককে দায়িত্ব দেয়া কি জায়েয হবে?

উত্তর হল, এটা জায়েয বা বৈধ নয়। এটা বাতিল পন্থায় মানুষের সম্পদ ভক্ষণ করা। কেননা এটা হাজ্জ নিয়ে ব্যবসা করা। মানুষের হাজ্জ আদায় করে দেয়ার নাম করে সে তাদের নিকট থেকে টাকা-পয়সা নেয়; অতঃপর কম মূল্যে অন্য লোককে নিয়োগ করে। এতে সে বাতিল পন্থায় কিছু সম্পদ কামাই করল। কেননা হতে পারে হাজ্জের দায়িত্ব প্রদানকারী ঐ তৃতীয় ব্যক্তির উপর সন্তুষ্ট নয়। সুতরাং আল্লাহকে ভয় করা উচিত। মানুষের অর্থ নিজের পকেটে ঢুকানোর আগে চিন্তা করা উচিত এটা কি ঠিক হল নাকি বেঠিক?

শিস দেয়া, হাতে তালি ও বাঁশি বাজানো প্রসঙ্গ

১। কা'বা ঘরের কাছে তাদের সালাত হল শিস দেয়া ও করতালি প্রদান ছাড়া অন্য কিছুই নয়, সুতরাং তোমরা কুফরী করার কারণে এখন শাস্তির স্বাদ গ্রহণ কর। [সূরা আনফাল-৩৫]

২। যারা মু'মিন ও মুত্তাকী তাদের পরকালের পুরস্কারই উত্তম। [সূরা ইউনুফ-৫৭]

☐ শিস, বাঁশি ও হাতে তালি বাজানো হতে বিরত থাকুন, কারণ এটা জাহিলিযুগের মুশরিকদের নীতি। শিস দিয়ে ও হাত তালি দিয়ে তারা নাবী (সাঃ) ও সাহাবীদেরকে অপমান ও ঠাট্টা-বিদ্রুপ করত। সুতরাং এখনও এ কাজ দ্বারা নাবী (সাঃ) ও সাহাবীদের বিদ্রুপ করা হবে, তাই এ কাজ করা যাবেনা । তবে যদি কোন কিছু আপনাকে মুগ্ধ করে তাহলে বলবেন ঃ মাশা'আল্লাহ অথবা সুবহানাল্লাহ।

হিদায়াত ও ক্ষমতার উৎস

১। অচিরে বিদ্যুৎ তাদের দৃষ্টি হরণ করবে, যখন তাদের প্রতি আলোক প্রদীপ্ত হয় তখন তারা চলতে থাকে এবং যখন তাদের উপর অন্ধকার আচ্ছন্ন হয় তখন তারা ঠায় দাঁড়িয়ে থাকে এবং যদি আল্লাহ ইচ্ছা করেন- নিশ্চয়ই তাদের শ্রবণশক্তি ও তাদের দৃষ্টিশক্তি হরণ করতে পারেন, নিশ্চয়ই আল্লাহ সর্ব বিষয়ে শক্তিমান। [সূরা বাকারা-২০]

২। তোমরা ইচ্ছা করনা যদি বিশ্বজগতের রাব্ব আল্লাহ ইচ্ছা না করেন। [সূরা তানভীর-২৯]
৩। অতএব তোমরা আমাকে স্মরণ কর, আমিও তোমাদেরকে স্মরণ করব এবং তোমরা আমার প্রতি কৃতজ্ঞ হও ও অবিশ্বাসী হয়োনা। [সূরা বাকারা-১৫২]
৪। আর যদি তোমার রাব্ব ইচ্ছা করতেন তাহলে বিশ্বের সকল লোকই ঈমান আনত। তাহলে তুমি কি মানুষের উপর যবরদস্তি করতে পার, যাতে তারা ঈমান আনেই? [সূরা ইউনুস-৯৯]
৫। অথচ আল্লাহর হুকুম ছাড়া কারও ঈমান আনা সম্ভব নয়; আর আল্লাহ নির্বোধ লোকদের উপর (কুফরীর) অপবিত্রতা স্থাপন করে দেন। [সূরা ইউনুস-১০০]
৬। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ হা মীম আস সাজদা-১৩, ১৪, ফুরকান-৭০, যিলযাল-৭, ৮, নূর-২১, আলে ইমরান-২৬।
৭। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহর শপথ! তোমার হিদায়াতের কারণে যদি একটা লোকও সত্য পথের পথিক হয় তাহলে তা তোমার জন্য মূল্যবান লাল উটের চেয়েও উত্তম। [আবূ দাউদ/৩৬২০-সাহ্‌ল ইব্‌ন সা'দ (রাঃ)]
৮। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি হিদায়াতের দিকে আহ্বান জানায় তার জন্য সে পথের অনুসারীদের পুরস্কারের অনুরূপ পুরস্কার রয়েছে। এতে তাদের পুরস্কার থেকে কিছুমাত্র কমতি করা হবেনা। আর যে ব্যক্তি পথভ্রষ্টতার দিকে আহ্বান জানাবে তার উপর সেই পথের অনুসারীদের পাপের অনুরূপ পাপ বর্তাবে। এতে তাদের পাপসমূহ কিছুমাত্র হালকা হবেনা। [মুসলিম/৬৫৬০-আবূ হুরাইরা (রাঃ), তিরমিযী/২৬৭৪]

◫ নিশ্চয়ই আল্লাহ সকল বস্তুর উপর ক্ষমতাবান। এরূপ অনেক আয়াত কুরআনুল কারীমে আছে। কেন এতবার বলা হল? উদ্দেশ্য হল জিন, ইনসান, পাহাড়, পর্বত, বৃক্ষ-লতা, পশু-পাখী, কীট-পতঙ্গ, নদী, সাগর, মহাসাগর অর্থাৎ পৃথিবীতে যা কিছু দৃশ্য-অদৃশ্য, জীব, প্রাণী বিদ্যমান সকলের উপর যিনি ক্ষমতাবান তিনিই আল্লাহ। স্রষ্টা, রাব্ব, সৃজনকর্তা, পালনকর্তা, রক্ষাকর্তা এবং ধ্বংসকারী একমাত্র তিনিই। তাঁর হুকুম সকলের উপর। এ হুকুমের উপর কারো কর্তৃত্ব নেই। আসমানের নীচে যাবতীয় গ্রহ, নক্ষত্র, তারকাপুঞ্জ এবং দৃশ্য-অদৃশ্য নীহারিকাপুঞ্জ, এ সৌর জগত ছাড়াও যা কিছু বিদ্যমান তার উপরও তিনি ক্ষমতাবান। তাহলে আল্লাহ কাকে হিদায়াত বা সঠিক রাস্তা দেখাবেন? নিশ্চয়ই তাদের নয়, যারা আল্লাহকে স্মরণ না করে শাইতান, তাগুতকে স্মরণ-বরণ করতে জিন্দেগী পেরেশান করে ফেলছে।

হারাম উপার্জন

১। হে মু'মিনগণ! তোমরা অন্যায়ভাবে পরস্পরের ধন-সম্পদ গ্রাস করনা; কেবলমাত্র পরস্পর সম্মতিক্রমে যে ব্যবসা কর তা বৈধ এবং তোমরা নিজেদের হত্যা করনা; নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি ক্ষমাশীল। [সূরা নিসা-২৯]

২। আমি ইয়াহুদীদের জন্য পবিত্র বস্তুসমূহ যা তাদের জন্য হালাল ছিল, তা হারাম করে দিয়েছি তাদের বাড়াবাড়ির কারণে, আর বহু লোককে আল্লাহর পথে বাধা দেয়ার কারণে, এবং তাদের সুদ গ্রহণের কারণে যদিও তা থেকে তাদেরকে নিষেধ করা হয়েছিল এবং তাদের অন্যায়ভাবে লোকদের ধন-সম্পদ গ্রাস করার কারণে এবং তাদের মাঝে যারা অবিশ্বাসী আমি তাদের জন্য যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি প্রস্তুত করে রেখেছি। [সূরা নিসা-১৬০-১৬১]

৩। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক যুগ আসবে যখন মানুষ পরোয়া করবেনা যে, কোথা থেকে সে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে। [বুখারী/১৯২৬]

৪। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আল্লাহ তা'আলা তোমাদের উপর হারাম করেছেন মায়ের নাফরমানী, কন্যা সন্তানদেরকে জীবন্ত কাবর দেয়া, কারও প্রাপ্য না দেয়া, অন্যায়ভাবে কিছু নেয়া, অনর্থক বাক্য ব্যয়, অতিরিক্ত প্রশ্ন করা, আর সম্পদ নষ্ট করা। [বুখারী/২২৪১]

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ পবিত্র ও হালাল জিনিস ছাড়া আল্লাহর দিকে কোন কিছু অগ্র গমন করতে পারেনা। [বুখারী/৬৯১১-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৬। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়াসাল্লাম বলেছেন ঃ বান্দার পা (কিয়ামাতের দিন) নড়বেনা যতক্ষণ না তাকে প্রশ্ন করা হবে তার বয়স সম্পর্কে যে, কি কাজে সে তা ব্যয় করেছে; তার ইল্‌ম সম্পর্কে তদনুযায়ী সে কি আমল করেছে, তার সম্পদ সম্পর্কে কোথা থেকে তা অর্জন করেছে এবং কোথায় তা ব্যয় করেছে; তার শরীর সম্পর্কে সে কিসে তা বিনাশ করেছে। [তিরমিযী/২৪২০-আবূ বারযা আসলামী (রাঃ)]

- মানুষ যে অর্থ উপার্জন করে তা নিম্নের শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ

ক) যা আল্লাহর আনুগত্য থেকে উপার্জন করা হয় এবং তাঁরই সন্তুষ্টির পথে ব্যয় করা হয়। আর এটা হল পবিত্রতম ও সর্বোত্তম অর্থ।

খ) যা আল্লাহর অবাধ্য হয়ে উপার্জন করা হয় এবং পাপের পথে ব্যয় করা হয়। আর এ হল অপবিত্র ও নিকৃষ্ট অর্থ।

গ) যা কোন মুসলিমকে কষ্ট দিয়ে উপার্জন করা হয় এবং কোন মুসলিমকে কষ্ট দেয়ার পথে ব্যয় করা হয় । আর তাও নিকৃষ্ট অর্থ।

ঘ) যা বৈধ পথে অর্জন করা হয় এবং বৈধ প্রবৃত্তির পথে ব্যয় করা হয়। যাতে আসলে কোন উপকার বা অপকার নেই।

প্রথম প্রকার অর্থ হল মু'মিনের। এই অর্থ দ্বারা সে উপকৃত হয় দুনিয়ায় ও আখিরাতে। অবশ্য চতুর্থ প্রকার অর্থ থাকা দূষণীয় নয়।

কোন বস্তুকে হালাল বা হারাম করার অধিকার কেবল আল্লাহর

১। মহান আল্লাহ তা'আলা বলেন ঃ

قُلْ أَرَأَيْتُم مَّا أَنزَلَ اللَّهُ لَكُم مِّن رِّزْقٍ فَجَعَلْتُم مِّنْهُ حَرَاماً وَحَلاَلاً قُلْ آللَّهُ أَذِنَ لَكُمْ أَمْ عَلَى اللَّهِ تَفْتَرُونَ

তুমি বল ঃ আল্লাহ তোমাদের জন্য যা কিছু রিয্ক পাঠিয়েছিলেন, অতঃপর তোমরা ওর কতক অংশ হারাম এবং কতক অংশ হালাল সাব্যস্ত করে নিলে; তুমি জিজ্ঞেস কর ঃ আল্লাহ কি তোমাদেরকে অনুমতি দিয়েছেন, না কি তোমরা আল্লাহর উপর মিথ্যা আরোপ করছ? [সূরা ইউনুস-৫৯]

২। হে নাবী! আল্লাহ তোমার জন্য যা বৈধ করেছেন তুমি তা নিষিদ্ধ করছ কেন? তুমি তোমার স্ত্রীদের সন্তুষ্টি চাচ্ছ? আল্লাহ ক্ষমাশীল, পরম দয়ালু। [সূরা তাহরীম-১]

৩। নিশ্চয়ই আল্লাহ তোমাদের প্রতি হারাম করেছেন মৃত-জীব, রক্ত এবং শূকরের মাংস এবং সেই দ্রব্য যার প্রতি আল্লাহ ছাড়া অন্যের নাম নেয়া হয়েছে, তবে যে ব্যক্তি নিরুপায় হয়ে পড়ে। কিন্তু সে নাফরমান ও সীমা লঙ্ঘনকারী নয়, তার কোন পাপ নেই, নিশ্চয়ই আল্লাহ ক্ষমাশীল, দয়ালু। [সূরা বাকারা-১৭৩]।

৪। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ আন'আম-১১৯, ১৪৫, বাকারা-১৮৫, নিসা-২৯, নাহল-১১৬, তাওবা-৩১, মায়িদা-৩, ৮৭, ৮৮।

৫। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ হালালও স্পষ্ট এবং হারামও স্পষ্ট। আর উভয়ের মাঝে রয়েছে বহু সন্দেহজনক বিষয়। অনেকেই জানেনা তা হালালের অন্তর্ভুক্ত, নাকি হারামের অন্তর্ভুক্ত। যে ব্যক্তি স্বীয় দীন ও সম্মান বাঁচাতে তা পরিত্যাগ করল সে নিরাপদ হল। আর যে ব্যক্তি এর কিছু অংশেও নিপতিত হয়, আশংকা হয়, সে হারামে নিপতিত হবে। যেমন কেহ যদি সংরক্ষিত তৃণভূমির পাশে পশু চরায় তাহলে আশংকা আছে যে, সে তাতে নিপতিত হবে। সাবধান! প্রত্যেক শাসকের সংরক্ষিত এলাকা থাকে। সাবধান! আল্লাহর সংরক্ষিত এলাকা হল তাঁর নির্ধারিত হারামসমূহ। [তিরমিযী/১২০৮-নু'মান ইব্ন বাশীর (রাঃ), বুখারী/১৯১৮]

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ এমন এক যুগ আসবে মানুষ পরোয়া করবেনা যে, কোথা থেকে সে অর্জন করল, হালাল থেকে না হারাম থেকে। [বুখারী/১৯২৬]

কোন কিছুকে হারাম জানা, মানা ও বলার পূর্বে এ কথা জানতে হবে যে, হালাল অথবা হারাম ঘোষণা করার অধিকার একমাত্র মহান আল্লাহর। কোন মানুষ নিজের তরফ থেকে কোন কিছুকে হারাম ঘোষণা করতে পারেনা, যেহেতু প্রত্যেক জিনিসের সৃষ্টিকর্তা তিনিই এবং তিনিই মানুষকে আহার দান করেন। অতএব তাঁরই অধিকারে থাকবে হারাম-হালালের বিধান। তাছাড়া কোন সৃষ্টি সঠিকরূপে জানেনা যে, কোন খাদ্যের ভিতর কোন শ্রেণীর অনিষ্টকারিতা

রয়েছে। কিন্তু আল্লাহ তা জানেন। আর এ কথা অবশ্যই জানতে হবে যে, যে জিনিস ইসলামে হারাম, অপবিত্র বা নিষিদ্ধ সেই জিনিসে বান্দার কোন না কোন অনিষ্টকারিতা ও ক্ষতি আছে । মানুষ সৃষ্টি হয়েছে একমাত্র আল্লাহরই বন্দেগীর উদ্দেশে। হারাম-হালালের বিধান দিয়ে তিনি তাঁর অনুগত ও অবাধ্য বান্দাকে পরীক্ষা ও পার্থক্য করে নিতে পারেন। ইসলাম এসেছে মানুষের ঈমান, সম্মান, জ্ঞান ও ধন এইগুলোর মঙ্গল সাধনের জন্য এবং যাতে উক্ত বিষয়ে মুসলিম কোন প্রকার ক্ষতিগ্রস্ত না হয় তার বিশেষ বিধান নিয়ে। সুতরাং মহান আল্লাহই জানেন, মানুষের অমঙ্গল ও ক্ষতি কিসে নিহিত। একমাত্র তিনিই আনুগত্য ও ইবাদাতের যোগ্য। তিনিই মানুষকে পথ দেখান এবং অপূর্ণ জ্ঞানের মানুষ সেই পথে চলতে বাধ্য। তাঁর সেই পথে না চললে মানুষ অংশীবাদী বলে বিবেচিত হবে। যেমন অত্যন্ত ক্ষুধা লাগলে যখন না খেয়ে মৃত্যু হবে বলে আশংকা হয় এবং পানিতে বা স্থলে খোঁজ করেও হারাম ছাড়া অন্য কোন খাবার না পাওয়া যায় তা হলেই উপায়হীন অবস্থা বুঝা যায়। আর সেই সময় বিষাক্ত দ্রব্য ছাড়া যে কোন হারামকৃত খাদ্য কেবল জীবন বাঁচানো সম্ভব ঠিক ততটুকু খাওয়া বৈধ। এ ক্ষেত্রে হারাম খাদ্যের মজা গ্রহণ করে পেট পুরে খাওয়া বৈধ নয়। বৈধ নয় সেই খাদ্যের উপর ভরসা করে হালাল খাদ্য অনুসন্ধান করার চেষ্টা না করা। এমনকি কোন হারাম বস্তু খাওয়ার মাধ্যমে চিকিৎসা করানোও হারাম।

হিংসা-বিদ্বেষ

১। হে আমার রাব্ব ! আমাদেরকে এবং আমাদের সেই সব ভাইকে ক্ষমা করুন যারা আমাদের পূর্বে ঈমান এনেছে এবং মু'মিনদের বিরুদ্ধে আমাদের অন্তরে হিংসা-বিদ্বেষ সৃষ্টি করবেননা। হে আমাদের রাব্ব ! আপনি তো দয়ার্দ্র, পরম দয়ালু। [সূরা হাশর-১০]

২। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা একে অন্যের প্রতি বিদ্বেষভাব পোষণ করনা, পরস্পর হিংসা করনা, পরস্পর বিরুদ্ধাচরণ করনা। তোমরা সবাই আল্লাহর বান্দা ভাই ভাই হয়ে থেক। কোনো মুসলিমের জন্য তিন দিনের বেশী তার ভাইকে পরিত্যাগ করে থাকা জায়িয নয়। [বুখারী/৫৬২৬-আনাস ইবন মালিক (রাঃ), তিরমিযী/১৯৪১, মুসলিম/৬২৯৫]

৩। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দু' ব্যক্তি ব্যতীত অন্য কারো প্রতি হিংসা করা যায়না। এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ সম্পদ দিয়েছেন এবং সে তা হক পথে মুক্ত হস্তে খরচ করে, আর এক ব্যক্তি যাকে আল্লাহ দীনের সূক্ষ্ম জ্ঞান দান করেছেন এবং সে তার আলোকে ফায়সালা করে এবং তা শিক্ষা দেয়। [মুসলিম/১৭৬৬-আবদুল্লাহ ইব্‌ন মাসউদ (রাঃ)]

◻ মুসলিম ভাইকে ভালবাসা ও তার কল্যাণ কামনা করা যেমন ফারয ইবাদত, তেমনি ভয়ঙ্কর হারাম পাপ হলো মুসলিম ভাইকে শত্রু মনে করা, তার প্রতি হৃদয়ের মধ্যে অশুভ কামনা ও শত্রুতা পোষণ করা। কোন কারণে কাহকে ভালবাসতে না পারলে অন্তত শত্রুতা ও অশুভ কামনার অনুভুতি থেকে হৃদয়কে

রক্ষা করা আমাদের অন্যতম দায়িত্ব। দুনিয়াতে কেহ আমাদের পাওনা, অধিকার, সম্পদ বা পরিজনের ক্ষতি করলে আমাদের ন্যায্য অধিকার আদায় করার সর্ব প্রকার বৈধ চেষ্টা করতে ইসলামে নির্দেশ দেয়া আছে। নিজের হক আদায়ের জন্য প্রচেষ্টা করা মুমিনের দায়িত্ব। এতে অন্য মুমিনের সাথে আমাদের বিরোধ হতে পারে। তবে বিরোধ ও বিদ্বেষ এক নয়। আমাদের হক আদয়ের চেষ্টা করতে হবে। এ বিষয়ে প্রয়োজনীয় কথা বলতে হবে। কিন্তু অপ্রাসঙ্গিক গীবত, নিন্দা, শত্রুতা, অমঙ্গল কামনা ও ক্ষতি করার চিন্তা থেকে হৃদয়কে সর্বোতভাবে পরিচ্ছন্ন রাখতে চেষ্টা করতে হবে। সংঘাতময় জীবনে মানুষ হিসেবে আমাদের মধ্যে রাগ, লোভ, ভয়, হিংসা ইত্যাদি আসবেই। এসে যাওয়াটা অপরাধ নয়, বরং পুষে রাখাটাই অপরাধ। মনটা একটু শান্তি হলেই যার প্রতি বিদ্বেষভাব মনে আসছে তার নাম ধরে তার কল্যাণ কামনা করে দু'আ করবেন। বিরোধিতা থাকলে আল্লাহর কাছে বলবেন, আল্লাহ আমার হক আমাকে পাইয়ে দিন, এছাড়া তার কোনো অমঙ্গল আমি চাইনা। দেখা হলে সালাম দিবেন। এরূপ আচরণ আপনার জীবনে বিজয়, সফলতা ও রাহমাত বয়ে আনবে। হিংসা-বিদ্বেষের ভয়ঙ্করতম রূপ ধর্মীয় মতভেদগত বিদ্বেষ। খুটিনাটি মতভেদ নিয়ে শত্রুতা করা এবং মতভেদকে দলভেদ বানিয়ে দেয়া ইয়াহুদী-খৃষ্টান ও অন্যান্য জাতির ধ্বংসের অন্যতম কারণ।

হিংসা-বিদ্বেষ দীনদার মানুষদের প্রিয়তম ও মজাদার পাপ। শাইতান সকল আদম সন্তানকেই জাহান্নামে নিতে চায়। কুফুরী, মদ, ব্যভিচার ইত্যাদি মহাপাপ তার অস্ত্র। তবে যে সকল দীনদার মানুষ পাপ থেকে আত্মরক্ষা করতে সচেষ্ট তাদেরকে জাহান্নামে নেয়ার জন্য শাইতানের অন্যতম অস্ত্র তিনটি, যথা ঃ শির্ক, বিদ'আত ও হিংসা-বিদ্বেষ। এ পাপগুলোকে শাইতান "ধর্মের" লেবাস পরিয়ে দেয়, ফলে দীনদার মানুষ না বুঝেই তার খপ্পরে পড়েন। শাইতানের কু-মন্ত্রনায় পাপের প্রতি ঘৃণার নামে আমরা মুসলমান ভাইকে ঘৃণা করি বা তাকে শত্রু মনে করি ও বিদ্বেষ পোষণ করি। পাপকে ঘৃণা করা যেমন আমাদের দায়িত্ব, তেমনি পুণ্যকে ভালবাসাও আমাদের দায়িত্ব। কাজেই পাপ-পুণ্যের ব্যালান্স করেই হিংসা ও ভালবাসা থাকবে। সবচেয়ে বড় পুণ্য ঈমান। যতক্ষণ কোনো মানুষকে সুনিশ্চিতভাবে কসম করে কাফীর বলে দাবি করতে না পারব, ততক্ষণ তাকে ভালবাসা আমাদের জন্য ফার্‌য। তার পাপের প্রতি আমার বিরক্তি থাকবে। কিন্তু কখনোই কোন বিদ্বেষ, শত্রুতা বা অমঙ্গল কামনা থাকবেনা বরং মুমিন ভাই হিসেবে তাকে ভালবাসব, তাকে সালাম দিব, দু'আ করব।

হাদীসের পরিচয়

❖ হাদীস শব্দের পরিভাষাগত অর্থ বাণী অর্থাৎ আল্লাহর বাণী বা রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের বাণী। ⊙ আল্লাহ বলেন ঃ আমি অবতীর্ণ করেছি সর্বোত্তম হাদীস বা বাণী সম্বলিত কিতাব যা সামঞ্জস্যপূর্ণ। [সূরা যুমার-২৩]

শাব্দিক অর্থে হাদীস মানে বাণী, সংবাদ, খবর, নতুন, প্রাচীন ও পুরাতনের বিপরীত বিষয়। এ অর্থে যে সব কথা, কাজ ও বস্তু পূর্বে ছিলনা, এখন অস্তিত্ব লাভ করেছে। তাই হাদীসের আরেক অর্থ হলো কথা। ইসলামী শারীয়াতের পরিভাষায় নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর রাসূল হিসাবে যা কিছু বলেছেন, যা কিছু করেছেন এবং যা কিছু বলার বা করার অনুমতি দিয়েছেন অথবা সমর্থন জানিয়েছেন তাকে হাদীস বলে । কিন্তু মুহাদ্দিসগণ রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে সম্পর্কিত বর্ণনা ও তাঁর গুণাবলী সম্পর্কিত বিবরণকেও হাদীসের অন্তর্ভুক্ত করেন। এ হিসাবে হাদীসকে প্রাথমিক পর্যায়ে তিন শ্রেণীতে ভাগ করা যায় ঃ কাওলী হাদীস, ফে'লী হাদীস ও তাকরীরী হাদীস।

প্রথমত ঃ কোন বিষয়ে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা বলেছেন, অর্থাৎ যে হাদীসে তাঁর কোন কথা বর্ণিত হয়েছে তাকে কাওলী (বাণী সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়।

দ্বিতীয়ত ঃ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কাজকর্ম, চরিত্র ও আচার-আচরণের ভিতর দিয়েই ইসলামের যাবতীয় বিধি-বিধান ও রীতি-নীতি পরিস্ফুটিত হয়েছে। অতএব যে হাদীসে তাঁর কোন কাজের বিবরণ উল্লেখিত হয়েছে তাকে ফে'লি (কর্ম সম্পর্কিত) হাদীস বলা হয়।

তৃতীয়ত ঃ সাহাবীগণের যে সব কথা বা কাজ নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অনুমোদন ও সমর্থন প্রাপ্ত হয়েছে সেই ধরনের কোন কথা বা কাজের/আমলের বিবরণ হতেও শারীয়াতের দৃষ্টিভঙ্গি জানা যায়। অতএব যে হাদীসে এ ধরনের কোন ঘটনার বা কাজের উল্লেখ পাওয়া যায় তাকে তাকরীরী (সমর্থনমূলক) হাদীস বলে।

হাদীসের অপর নাম সুন্নাহ। সুন্নাত শব্দের অর্থ চলার পথ, কর্মের নীতি ও পদ্ধতি। যে পন্থা ও রীতি নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম অবলম্বন করতেন তাকে সুন্নাত বলা হয়। অন্য কথায় রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কর্তৃক প্রচারিত উচ্চতম আদর্শই সুন্নাত। কুরআন মাজীদে মহোত্তম ও সুন্দরতম আদর্শ বলতে এই সুন্নাতকেই বুঝানো হয়েছে। হাদীসকে আরাবী ভাষায় খবরও বলা হয়। তবে খবর শব্দটি হাদীস ও ইতিহাস উভয়কেই বুঝায়।

ইলমে হাদীসের কতিপয় পরিভাষা

- সাহাবী ঃ যে ব্যক্তি ঈমানের সাথে রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহচর্য লাভ করেছেন বা তাঁকে দেখেছেন ও তাঁর একটি হাদীস বর্ণনা করেছেন, অথবা জীবনে একবার তাঁকে দেখেছেন এবং ঈমানের সঙ্গে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবী বলে।
- তাবিঈ ঃ যিনি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন সাহাবীর নিকট হাদীস শিক্ষা করেছেন অথবা অন্ততঃপক্ষে তাঁকে দেখেছেন এবং মুসলিম হিসাবে মৃত্যুবরণ করেছেন তাঁকে তাবিঈ বলে।

⊙ মুহাদ্দিস ঃ যে ব্যক্তি হাদীস চর্চা করেন এবং বহু সংখ্যক হাদীসের সনদ ও মতন সম্পর্কে বিশেষ জ্ঞান রাখেন তাঁকে মুহাদ্দিস বলে।

⊙ শাইখ ঃ হাদীসের শিক্ষাদাতা রাবীকে শায়খ বলে।

⊙ শাইখাইন ঃ সাহাবীগণের মধ্যে আবূ বাকর ও উমারকে (রাঃ) একত্রে শাইখাইন বলা হয়। কিন্তু হাদীসশাস্ত্রে ইমাম বুখারী ও ইমাম মুসলিমকেও (র) একত্রে শায়খাইন বলা হয়।

⊙ হাফিয ঃ যিনি সনদ ও মতনের বৃত্তান্তসহ এক লাখ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাফিয বলা হয়।

⊙ হুজ্জাত ঃ অনুরূপভাবে যিনি তিন লক্ষ হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হুজ্জাত বলা হয়।

⊙ হাকিম ঃ যিনি সব হাদীস আয়ত্ত করেছেন তাঁকে হাকিম বলা হয়।

⊙ রিজাল ঃ হাদীসের রাবী সমষ্টিকে রিজাল বলে। যে শাস্ত্রে রাবীগণের জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে তাকে আসমাউর রিজাল বলা হয়।

⊙ রিওয়ায়াত ঃ হাদীস বর্ণনা করাকে রিওয়ায়াত বলে। কখনও কখনও মূল হাদীসকেও রিওয়ায়াত বলা হয়। যেমন এই কথার সমর্থনে একটি রিওয়ায়াত (হাদীস) আছে।

⊙ সনদ ঃ হাদীসের মূল কথাটুকু যে সূত্র পরম্পরায় গ্রন্থ সংকলনকারী পর্যন্ত পৌছেছে তাকে সনদ বলা হয়। এতে হাদীস বর্ণনাকারীদের নাম একের পর এক বর্ণিত থাকে।

⊙ মতন ঃ হাদীসের মূল কথা ও তার শব্দ সমষ্টিকে মতন বলে।

⊙ মারফূ ঃ যে হাদীসের সনদ (বর্ণনা পরম্পরা) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম পর্যন্ত পৌছেছে তাকে মারফূ হাদীস বলে।

⊙ মাওকূফ ঃ যে হাদীসের বর্ণনা সূত্র উর্ধ্ব দিকে সাহাবী পর্যন্ত পৌছেছে, অর্থাৎ যে সনদ সূত্রে কোন সাহাবীর কথা বা কাজ বা অনুমোদন বর্ণিত হয়েছে তাকে মাওকূফ হাদীস বলে। এর অপর নাম আসার ।

⊙ মাকতূ ঃ যে হাদীসের সনদ কোন তাবিঈ পর্যন্ত পৌঁছেছে, তাকে মাকতূ হাদীস বলে।

⊙ মুত্তাসিল ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা প্রথম থেকে শেষ পর্যন্ত পূর্ণরূপে রক্ষিত আছে, কোন স্তরেই কোন রাবীর নাম বাদ পড়েনি তাকে মুত্তাসিল বলে।

⊙ মুনকাতি ঃ যে হাদীসের সনদের ধারাবাহিকতা রক্ষিত হয়নি, মাঝখানে কোন এক স্তরে কোন রাবীর নাম বাদ পড়েছে, তাকে মুনকাতি' হাদীস বলে, আর এই বাদ পড়াকে ইনকিতা বলা হয়।

⊙ মুরসাল ঃ যে হাদীসের সনদের ইনকিতা শেষের দিকে হয়েছে, অর্থাৎ সাহাবীর নাম বাদ পড়েছে এবং তাবিঈ সরাসরি রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উল্লেখ করে হাদীস বর্ণনা করেছেন তাকে মুরসাল হাদীস বলা হয়।

⊙ মুতাবি ও শাহিদ ঃ কোন রাবীর হাদীসের অনুরূপ যদি অপর কোন রাবীর কোন হাদীস পাওয়া যায় তাহলে দ্বিতীয় রাবীর হাদীসকে প্রথম রাবীর হাদীসের

মুতাবি বলা হয়। যদি উভয় হাদীসের মূল রাবী অর্থাৎ সাহাবী একই ব্যক্তি হন। আর এইরূপ হওয়াকে মুতাবা'আত বলে। যদি মূল রাবী একই ব্যক্তি না হন তাহলে দ্বিতীয় ব্যক্তির হাদীসকে শাহাদাত বলে। মুতাবা'আত ও শাহাদাত দ্বারা প্রথম হাদীসটির গ্রহণযোগ্যতা বৃদ্ধি পায়।

⊙ মু'আল্লাক ঃ সনদের ইনকিতা প্রথম দিকে হলে, অর্থাৎ সাহাবীর পর এক বা একাধিক রাবীর নাম বাদ পড়লে তাকে মু'আল্লাক হাদীস বলে।

⊙ মারূফ ও মুনকার ঃ কোন দুর্বল রাবীর বর্ণিত হাদীস অপর কোন মাকবূল (গ্রহণযোগ্য) রাবীর বর্ণিত হাদীসের বিরোধী হলে তাকে মুনকার বলা হয় এবং মাকবূল রাবীর হাদীসকে মারূফ বলা হয়। মুনকার হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

⊙ সহীহ ঃ যে মুত্তাসিল হাদীসের সনদে উল্লেখিত প্রত্যেক রাবীই পূর্ণ আদালত ও যাবতগুণ সম্পন্ন এবং হাদীসটি যাবতীয় দোষত্রুটি হতে মুক্ত তাকে সহীহ হাদীস বলে।

⊙ হাসান ঃ যে হাদীসের কোন রাবীর যাবতীয় গুণে পরিপূর্ণতার অভাব রয়েছে তাকে হাসান হাদীস বলা হয়।

⊙ যঈফ ঃ যে হাদীসের রাবী কোন হাসান হাদীসের রাবী গুণসম্পন্ন নন তাকে যঈফ হাদীস বলে। রাবীর ব্যক্তিগত দুর্বলতার কারণেই দুর্বল বলা হয়, অন্যথায় নাবী কারীম সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কোন কথাই যঈফ নয়।

⊙ মাওযূ ঃ যে হাদীসের রাবী জীবনে কখনও ইচ্ছাকৃতভাবে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে মিথ্যা কথা রটনা করেছে বলে প্রমাণিত হয়েছে, তার বর্ণিত হাদীসকে মাওযূ' হাদীস বলে। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীস গ্রহণযোগ্য নয়।

⊙ মাতরূক ঃ যে হাদীসের রাবী হাদীসের ক্ষেত্রে নয় বরং সাধারণ কাজে-কর্মে মিথ্যার আশ্রয় গ্রহণ করে বলে খ্যাত, তার বর্ণিত হাদীসকে মাতরূক হাদীস বলা হয়। এরূপ ব্যক্তির বর্ণিত হাদীসও পরিত্যাজ্য।

⊙ মুবহাম ঃ যে হাদীসের রাবীর উত্তমরূপে পরিচয় পাওয়া যায়নি, যার ভিত্তিতে তার দোষগুণ বিচার করা যেতে পারে। এ রূপ রাবীর বর্ণিত হাদীসকে মুবহাম হাদীস বলে। এই ব্যক্তি সাহাবী না হলে তার হাদীসও গ্রহণযোগ্য নয়।

⊙ মুতাওয়াতির ঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে এত অধিক লোক রিওয়ায়াত করেছেন যাদের পক্ষে মিথ্যার জন্য দলবদ্ধ হওয়া সাধারণতঃ অসম্ভব তাকে মুতাওয়াতির হাদীস বলে। এ ধরনের হাদীস দ্বারা নিশ্চিত জ্ঞান লাভ হয়।

⊙ খাবরে ওয়াহিদ ঃ প্রত্যেক যুগে এক, দুই অথবা তিনজন রাবী কর্তৃক বর্ণিত হাদীসকে খাবরে ওয়াহিদ বা আখবারুল আহাদ বলা হয়।

⊙ মাশহুর ঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্ততঃপক্ষে তিনজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে মাশহুর হাদীস বলে।

⊙ আযীয ঃ যে সহীহ হাদীস প্রত্যেক যুগে অন্তত দুইজন রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে আযীয বলে ।

⊙ গারীব ঃ যে সহীহ হাদীস কোন যুগে একজন মাত্র রাবী বর্ণনা করেছেন তাকে গারীব হাদীস বলে ।

⊙ হাদীসে কুদুসী ঃ যে হাদীসের মূল কথা সরাসরি আল্লাহর নিকট থেকে প্রাপ্ত অথবা আল্লাহর সাথে সম্পর্কিত করে। যেমন আল্লাহ তার নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামকে ইলহাম কিংবা স্বপ্নযোগে অথবা জিবরাঈল (আঃ)-এর মাধ্যমে জানিয়ে দিয়েছেন, মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজ ভাষায় বর্ণনা করেছেন।

⊙ মুত্তাফাক আলাইহি ঃ যে হাদীস একই সাহাবী থেকে ইমাম বুখারী (রহঃ) ও ইমাম মুসলিম (রহঃ) উভয়ে গ্রহণ করেছেন, তাকে মুত্তাফাক আলাইহি হাদীস বলে।

⊙ আদালত ঃ যে সুদৃঢ় শক্তি মানুষকে তাকওয়া ও শিষ্টাচার অবলম্বনে এবং মিথ্যা আচরণ থেকে বিরত থাকতে উদ্বুদ্ধ করে তাকে আদালত বলে। এখানে তাকওয়া বলতে অশোভনীয় ও অভদ্রোচিত কাজ থেকে বিরত থাকা, যেমন হাট-বাজারে বা প্রকাশ্যে পানাহার করা বা রাস্তা-ঘাটে প্রস্রাব-পায়খানা করা ইত্যাদি থেকে বিরত থাকাও বুঝায়।

⊙ যাবৃত ঃ যে স্মৃতিশক্তি দ্বারা মানুষ শ্রুত বা লিখিত বিষয়কে বিস্মৃতি বা বিনাশ থেকে রক্ষা করতে সক্ষম হয় এবং যখন ইচ্ছা তা সঠিকভাবে স্মরণ করতে পারে তাকে যাবৃত বলে ।

⊙ ছিকাহ ঃ যে রাবীর মধ্যে আদালত ও যাবৃত উভয় গুণ পূর্ণভাবে বিদ্যমান, তাকে ছিকাহ ছাবিত বা ছাবাত বলে ।

হাদীসের কিতাবসমূহের স্তরবিভাগ

ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থের ১ম ও ২য় খন্ডের ভূমিকা অধ্যায়ে লিখা আছে যে, হাদীসের কিতাবসমূহকে মোটামুটিভাবে পাচঁটি স্তরে ভাগ করা হয়েছে। শাহ ওয়ালী উল্লাহ মুহাদ্দিস দেহলবী (র) তাঁর 'হুজ্জাতুল্লাহিল বালিগা' নামক কিতাবে এরূপ পাঁচ স্তরে ভাগ করেছেন।

প্রথম স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহে কেবল সহীহ হাদীসই রয়েছে। এ স্তরের কিতাব মাত্র তিনটি ঃ 'মুওয়াত্তা ইমাম মালিক, সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিম । সকল হাদীস বিশেষজ্ঞ এ বিষয়ে একমত যে, এ তিনটি কিতাবেব সমস্ত হাদীসই নিশ্চিতরূপে সহীহ।

দ্বিতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবসমূহ প্রথম স্তরের খুব কাছাকাছি। এ স্তরের কিতাবে সাধারণতঃ সহীহ ও হাসান হাদীসই রয়েছে। যঈফ হাদীস এতে খুব কমই আছে। নাসাঈ, আবূ দাউদ ও তিরমিযী এ স্তরেরই কিতাব। সুনান দারিমী, সুনান ইব্ন মাজাহ এবং শাহ ওয়ালী উল্লাহ (র)-এর মতে মুসনাদ ইমাম আহমাদকেও এ স্তরে শামিল করা যেতে পারে।

তৃতীয় স্তর ঃ এ স্তরের কিতাবে সহীহ, যঈফ, মারফু ও মুনকার সকল প্রকারের হাদীসই রয়েছে। মুসনাদ আবী ইয়া'লা, মুসনাদ আবদুর রাযযাক, বাইহাকী, তাহাবী ও তাবারাণী (র)-এর কিতাবসমূহ এ স্তরেরই অন্তর্ভুক্ত।

চতুর্থ স্তর ঃ হাদীস বিশেষজ্ঞগণের বাছাই ব্যতীত এ সকল কিতাবের হাদীস গ্রহণ করা হয়না। এ স্তরের কিতাবসমূহে সাধারণতঃ যঈফ হাদীসই রয়েছে। ইব্ন হিব্বানের কিতাবুয যুআফা, ইব্নুল-আছীরের কামিল ও খতীব বাগদাদী, আবূ নুআইম-এর কিতাবসমূহ এই স্তরের কিতাব।

পঞ্চম স্তর ঃ উপরিউক্ত স্তরে যে সকল কিতাবের স্থান নেই সে সকল কিতাবই এ স্তরের কিতাব। যেমন, নিয়ামুল কুরআন, বেহেশতি যেওর, মুকছিদুল মু'মিনুন, তাজকিরাতুল আম্বিয়া, আমলে কুরআন ইত্যাদি।

সহীহায়নের বাইরেও সহীহ হাদীস রয়েছে ঃ

বুখারী ও মুসলিম সহীহ হাদীসের কিতাব। কিন্তু সমস্ত সহীহ হাদীসই যে সহীহ বুখারী ও সহীহ মুসলিমে রয়েছে তা নয়। ইমাম বুখারী (র) বলেছেন ঃ 'আমি আমার এ কিতাবে সহীহ ব্যতীত কোন হাদীসকে স্থান দেইনি এবং বহু সহীহ হাদীসকে আমি বাদও দিয়েছি।

এরূপে ইমাম মুসলিম (র) বলেন ঃ 'আমি এ কথা বলিনা যে, এর বাইরে যে সকল হাদীস রয়েছে সেগুলি সমস্ত যঈফ।' অতএব এ দুই কিতাবের বাইরেও সহীহ হাদীস ও সহীহ কিতাব রয়েছে। শাইখ আবদুল হক মুহাদ্দিস দেহলবীর (র) মতে কুতুবে সিত্তাহ, মুওয়াত্তা ইমাম মালিক ও সুনান দারিমী ব্যতীত অন্যান্য কিতাবসমূহেও সহীহ হাদীস আছে (যদিও বুখারী ও মুসলিমের পর্যায়ের নয়)। [ইসলামিক ফাউন্ডেশন, বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত বুখারী ও মুসলিম উভয় হাদীস গ্রন্থের ১ম ও ২য় খন্ডের ভূমিকা অধ্যায় থেকে সংকলিত]

রাসূল (সাঃ)-এর জীবদ্দশায় হাদীস সংকলন ও তার প্রচার

১। আবদুল্লাহ ইব্ন আব্বাস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক ব্যক্তিকে তাঁর চিঠি দিয়ে পাঠালেন এবং তাকে বাহরাইনের গভর্নরের কাছে তা পৌছে দিতে নির্দেশ দিলেন। এরপর বাহরাইনের গভর্নর তা কিস্‌রা (পারস্য সম্রাট)-এর কাছে পাঠিয়ে দিলেন। পত্রটি পড়ার পর সে তা ছিঁড়ে টুকরা টুকরা করে ফেলল। [বর্ণনাকারী ইব্ন শিহাব (র) বলেন] আমার ধারণা ইব্ন মুসাইয়্যাব (রহঃ) বলেছেন, (এ ঘটনার খবর পেয়ে) রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তাদের জন্য বদ দু'আ করেন যে, তাদেরকেও যেন সম্পূর্ণরূপে টুকরা টুকরা করে ফেলা হয়। [বুখারী/৬৪]

২। আবূ জুহাইফা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমি আলীকে (রাঃ) জিজ্ঞেস করলাম, আপনাদের কাছে কি লিখিত কিছু আছে? তিনি বললেন ঃ না, কেবলমাত্র আল্লাহর কিতাব রয়েছে, আর সেই বুদ্ধি ও বিবেক যা একজন মুসলিমকে দান করা হয়। এ ছাড়া যা কিছু এ পত্রটিতে লেখা আছে। আবূ জুহাইফা (রাঃ) বলেন, আমি বললাম, এ পত্রটিতে কি আছে ? তিনি বললেন ঃ দিয়াতের

(আর্থিক ক্ষতিপূরণ) ও বন্দী মুক্তির বিধান, আর এ বিধানটিও যে, মুসলিমকে কাফিরের বিনিময়ে হত্যা করা যাবেনা। [বুখারী/১১২]

৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার পূর্বে কারো জন্য মাক্কা (নগরীতে লড়াই করা) হালাল করা হয়নি এবং আমার পরেও কারো জন্য হালাল হবেনা। জেনে রেখ, তাও আমার জন্য দিনের কিছু সময় মাত্র হালাল করা হয়েছিল। আরো জেনে রেখ যে, আমার এই কথা বলার মুহূর্তে আবার তা হারাম হয়ে গেছে। সেখানকার কোন গাছপালা কাটা যাবেনা এবং সেখানে পড়ে থাকা কোন বস্তু কুড়িয়ে নেয়া যাবেনা। তবে ঘোষণা করার জন্য নিতে পারে। আর যদি কেহ নিহত হয় তাহলে তার আপনজনের জন্য দু'টি ব্যবস্থার যে কোন একটির অধিকার রয়েছে। হয় তার 'দিয়াত' নিবে, না হয় 'কিসাস' গ্রহণ করবে। এরপর ইয়ামানবাসীর এক ব্যক্তি এসে বলল ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম! (এ কথাগুলি) আমাকে লিখে দিন। তিনি (সাহাবীদের) বললেন ঃ তোমরা তাকে (আবূ শাহকে) লিখে দাও। তারপর একজন কুরাইশী [আব্বাস (রা:)] বললেন, 'ইয়া রাসূলুল্লাহ! গাছপালা কাটার নিষেধাজ্ঞা হতে ইযখির বাদ রাখুন, কারণ তা আমরা আমাদের ঘরে ও কাবরে ব্যবহার করি। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন, 'ইযখির ছাড়া, ইযখির ছাড়া (এক প্রকার ঘাস)। [বুখারী/১১৩]

৪। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সাহাবীগণের মধ্যে 'আবদুল্লাহ ইব্ন 'আমর (রাঃ) ব্যতীত আর কারো কাছে আমার চেয়ে বেশী হাদীস নেই। কারণ তিনি লিখে রাখতেন, আর আমি লিখতামনা। [বুখারী/১১৪, তিরমিযী/২৬৬৮]

৫। ইব্ন আব্বাস (রাঃ) বলেছেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের রোগ যখন বেড়ে গেল তখন তিনি বললেন ঃ 'আমার কাছে কাগজ কলম নিয়ে এসো, আমি তোমাদের এমন কিছু লেখে দিব যাতে পরবর্তীতে তোমরা আর ভ্রান্ত না হও।' [বুখারী/১১৫]

৬। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ আমার মুহাজির ভাইয়েরা বাজারে কেনাবেচায় এবং আমার আনসার ভাইয়েরা জমা-জমির কাজে মশগুল থাকত। আর আবূ হুরাইরা (রাঃ) (খেয়ে না খেয়ে) তুষ্ট থেকে রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের সঙ্গে লেগে থাকত। তাই তারা যখন উপস্থিত থাকতনা, তখন সে উপস্থিত থাকত এবং তারা যা মুখস্থ করতনা সে তা মুখস্থ রাখত। [বুখারী/১১৯]

৭। আবূ হুরাইরা (রাঃ) একদা বলেছেন ঃ 'ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমি আপনার কাছ থেকে বহু হাদীস শুনি কিন্তু ভুলে যাই।' তিনি বললেন ঃ তোমার চাদর খুলে ধর। আমি তা খুলে ধরলাম। তিনি দু'হাত অঞ্জলী করে তাতে কিছু ঢেলে দেয়ার মত করে বললেন ঃ এটা তোমার বুকের সাথে লাগিয়ে ধর। আমি তা বুকের সাথে লাগালাম। এরপর আমি আর কিছুই ভুলিনি। [বুখারী/১২০]

৮। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একদা কুরবানীর দিনে খুৎবা দেয়ার সময় বলেছিলেন ঃ প্রত্যেক উপস্থিত ব্যক্তি যেন অনুপস্থিত ব্যক্তির কাছে

(আমার দাওয়াত) পৌঁছে দেয়। কেননা কোন কোন মুবাল্লীগ শ্রবণকারীর থেকে কখনো কখনো অধিক সংরক্ষণকারী হয়ে থাকে। তোমরা আমার পর কাফিরদের মতো হয়োনা যে, একে অন্যকে হত্যা করতে থাকবে। [বুখারী/১৬২৫]

৯। আবূ হুরাইরা (রাঃ) বলেছেন ঃ নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম একবার (মাক্কা বিজয়ের সময়) খুতবা দিলেন। এরপর আবূ হুরাইরা (রাঃ) হাদীসটির বিষয়বস্তু উল্লেখ করেন। এরপর আবূ শাহ (নামক জনৈক ব্যক্তি) বললেন ঃ ইয়া রাসূলুল্লাহ ! আমার জন্য এই ভাষণটি লিখে দিন। তখন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বললেন ঃ তোমরা আবূ শাহকে এটি লিখে দাও। (হাদীসটিতে আরো কথা রয়েছে)। [তিরমিযী/২৬৬৭]

১০। আউফ ইব্‌ন মালিক (রাঃ) বলেছেন ঃ রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম এক জানাযার সালাত আদায় করলেন, আমি তাঁর (পঠিত) দু'আ মুখস্ত করেছি। [মুসলিম/২১০০]

১১। উমার ইব্‌ন উবাইদুল্লাহর আযাদকৃত গোলাম ও কাতিব সালিম আবূ নাযর (রাঃ) থেকে বর্ণিত, আবদুল্লাহ ইব্‌ন আবূ আউফা (রাঃ) তাকে লেখেছিলেন যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা জেনে রেখ, তরবারীর ছায়ার নিচেই জান্নাত। [বুখারী/২৬১৪]

১২। আবদুল্লাহ ইব্‌ন আমর ইব্‌ন আস (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তুমি লেখ, ঐ সত্তার কসম যাঁর হাতে আমার জীবন! আমার মুখ হতে সত্য ব্যতীত বের হয়না। [আবূ দাউদ/৩৬০৭]

১৩। রাসূল সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার নিকট হতে একটি আয়াত হলেও তা অবশ্যই বর্ণনা/প্রচার কর। [বুখারী/৩২০৭, তিরমিযী/২৬৬৯]

১৪। আলী (রাঃ) বলেন, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ তোমরা আমার উপর মিথ্যারোপ করনা। কারণ আমার উপর যে মিথ্যারোপ করবে সে জাহান্নামে প্রবেশ করবে। [বুখারী/১০৭]

১৫। আলী (রাঃ) বলেছেন ঃ আমাদের নিকট আল্লাহর কিতাব এবং নাবী কারীম (সাঃ) থেকে বর্ণিত সহিফা (হাদীসের পান্ডুলিপি) ছাড়া আর কিছুই নেই। [বুখারী/১৭৪৪]

১৬। মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম সাহাবীদের (রাঃ) বলেছেন ঃ ইলমে হাদীসকে লিপিবদ্ধ করে রাখ। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত]

১৭। সর্বপ্রথম লিখিত হাদীস মাদীনার সনদ যার মধ্যে ৫২টি ধারা ছিল। ঐ হাদীসখানির প্রারম্ভিক ভাষা ছিল ঃ মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম আল্লাহর নাবী ও রাসূল কর্তৃক কুরাইশ বংশের মু'মিন মুসলিম ও ইয়াসরীব (মাদীনাবাসী) যারা তাদেরও সাথে মিলিত হবে ও একত্রে জিহাদ করবে, তাদের মধ্যে লিখিত চুক্তিনামা এটা। সিদ্ধান্ত এই যে, তারা অন্যান্য লোকদের

থেকে পৃথক এক স্বতন্ত্র উম্মাত তথা জাতি হবে। [আল বিদায়া ওয়ান নিহায়া, ৩য় খন্ড, ৪০২ পৃষ্ঠা, ইসলামিক ফাউন্ডেশন বাংলাদেশ কর্তৃক প্রকাশিত]

(ক) হাদীসের শত্রুরা হাদীসের মৌলিকত্ব ও প্রমাণিকতা অযৌক্তিক ও ভুল প্রমাণ করার জন্য এ কথা প্রচার করে থাকে যে, নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের যুগে হাদীস লেখা হয়নি। এটা লেখা হয়েছে শতাব্দীকাল পরে। ফলে রাসূলের কথা কোন্‌টা এবং কোন্‌টা না তা বুঝা মুশকিল। অথচ আমরা উপরোক্ত আলোচনায় জানতে পেরেছি যে, বিস্ময়কর স্মৃতিশক্তি ও স্মরণশক্তি এবং মুখস্থ শক্তির অধিকারী আরাবীয় সাহাবায়ে কিরাম কুরআনুল কারীম কেবল কণ্ঠস্থ করে স্মৃতি পটে গেঁথে রাখেননি, তা কিতাবে অহীর লেখকগণ লেখেও রেখেছিলেন। ঠিক তেমনি তারা মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের মুখ থেকে হাদীস শ্রবণ করে মুখস্থ রাখতেন, চর্চা করতেন, একে অন্যকে শুনিয়ে দিতেন এবং পারস্পরিক যেমন আলোচনা করে হাদীসের গুরুত্ব ও বাস্তবে প্রতিষ্ঠিত করণের জরুরী কাজে আত্মনিয়োগ করেছেন তেমনি তা অধিকতর হিফাযাতের জন্য লেখেও রেখেছেন। অবশ্য অহী নাযিলের প্রথম দিকে হাদীস লেখার কোন অনুমতি মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম দেননি। কেননা কুরআন ও হাদীস যদি মিশ্রিত হয়ে যায় তাহলে তা হবে অত্যন্ত খারাপ কাজ। যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহর কালামের ভাব, ভাষা, অলংকার, উপমা এবং ব্যাকরণ রীতি সম্বন্ধে লেখকগণ সম্পূর্ণরূপে অবহিত না হয়েছেন ততক্ষণ পর্যন্ত হাদীস লেখার অনুমতি দেয়া হয়নি।

(খ) লেখক সাহাবীবৃন্দ যখন পার্থক্য করতে শিখলেন যে, কোনটি আল্লাহর কালাম আর কোনটি নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের ভাব ভাষার হাদীস তখনই লেখার কাজ শুরু হল।

(গ) সাহাবীদের পর তাবিঈগণও হাদীস লিখতেন, মুখস্ত রাখতেন। তারপর তাবে-তাবিঈগণও অনুরূপ করতেন। ফলে হাদীস লেখনে ধারাবাহিকতা রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের জীবদ্দশা হতে শুরু করে তা গ্রন্থাকারে সংরক্ষণ ও সংকলনের কাজ যুগ যুগ ধরে চলে আসে।

(ঘ) অনেকেই বলেন যে, ২৫০ বছর পর্যন্ত হাদীস লিপিবদ্ধ হয়নি। এটি হাদীস অস্বীকারকারীদের মিথ্যা প্রচার। খুলাফায়ে রাশেদীন এবং সাহাবীগণ (রাঃ) সংরক্ষণের ব্যাপারে বিশেষ গুরুত্ব দিয়েছেন। অতঃপর তাবিয়ীগণের যুগে কয়েকটি গ্রন্থ প্রনীত হয়েছে। মুআত্তা ইমাম মালিক এখানো মওজুদ রয়েছে, যেটি কেবল এক'শ বছর পর বই আকারে লিপিবদ্ধ হয়েছে। ইমাম মালিক এবং আব্দুল্লাহ বিন উমার (রাঃ)-এর মাঝে কেবল একজন রাবী বর্ণনাকারী "নাফে" রয়েছেন। আনাস (রাঃ) এর বর্ণনায় কেবল ইমাম যুহরী রয়েছেন। মোট কথা মুআত্তা ইমাম মালিক এমন অসংখ্য সনদ (বর্ণনাসূত্র) রয়েছে যাতে সাহাবা এবং ইমাম মালিকের মাঝে কেবল একটি অথবা দু'টি রাবী (বর্ণনাকারী) রয়েছে। আর ইমাম মালিক একজন বিখ্যাত ইমাম ছিলেন। ইমাম বুখারীর পূর্বে হাদীসের যে গ্রন্থগুলি লিপিবদ্ধ হয়েছিল যেমন ঃ সহীফায়ে হাম্মাম, সহীফায়ে

সাদিকা, মুসনাদে আহ্মাদ, হুমাইদী, মুআত্তা মালিক, মুসান্নাফ ইবনে আবী শাইবা, মুসান্নাফ আব্দুর রায্যাক, মুআত্তা মুহাম্মাদ, মুসনাদে শাফেয়ী তা আজও মওজুদ রয়েছে। তাছাড়া অন্যান্য ইমামগণ পঠন-পাঠনের এমন গুরুত্ব দিয়েছিলেন যাতে মিথ্যা হাদীস তৈরী করে সহীহ হাদীসের সাথে মিশ্রণ করতে সক্ষম হয়নি।

সহীহ হাদীস মানার ব্যাপারে গুরুত্ব

১। হে ঈমানদারগণ! তোমরা আল্লাহর আনুগত্য কর, আর রাসূলের আনুগত্য কর, আর তোমাদের 'আমলগুলিকে নষ্ট করে দিওনা। [সূরা মুহাম্মাদ-৩৩]

২। আর সে মনগড়া কথা বলেনা, তাতো অহী যা তার প্রতি প্রত্যাদেশ করা হয়। [সূরা নাজম-৩, ৪]

৩। সে (নাবী) যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। [সূরা হাক্কাহ-৪৪-৪৬]

৪। আমি তোমার পূর্বেও রাসূলগণকে পাঠিয়েছিলাম, আর তাদেরকে দিয়েছিলাম স্ত্রী ও সন্তানাদি, আল্লাহর হুকুম ব্যতীত নির্দশন হাযির করার শক্তি কোন রাসূলের নেই। যাবতীয় বিষয়ের নির্দিষ্ট সময় লিপিবদ্ধ আছে। [সূরা রাদ-৩৮]

(ক) পবিত্র আল-কুরআনুল কারীমের পরেই হাদীসের স্থান। ইহা ইসলামী শারীয়াতের অন্যতম উৎস এবং ইসলামী আদর্শের মৌল ভিত্তি।

(খ) হাদীস মুসলিম মিল্লাতের এক অমূল্য সম্পদ, ইসলামী শারীয়াতের অন্যতম অপরিহার্য উৎস এবং ইসলামী জীবন বিধানের অন্যতম মূল ভিত্তি। কুরআন মাজীদ যেখানে ইসলামী জীবন ব্যবস্থার মৌলনীতি পেশ করে, হাদীস সেখানে এই মৌল নীতির বিস্তারিত বিশ্লেষণ ও তা বাস্তবায়নের কার্যকর পন্থা বলে দেয়। কুরআন ইসলামের প্রদীপ স্তম্ভ, হাদীস তার বিচ্ছুরিত আলো। ইসলামী জ্ঞান-বিজ্ঞানে কুরআন যেন হৃৎপিন্ড, আর হাদীস এই হৃৎপিন্ডের সাথে সংযুক্ত ধমনী, যা জ্ঞানের বিশাল ক্ষেত্রে প্রতিনিয়ত তাজা তপ্ত শোণিতধারা প্রবাহিত করে এর অঙ্গ-প্রত্যঙ্গকে অব্যাহতভাবে সতেজ ও সক্রিয় রাখে। হাদীস একদিকে যেমন আল-কুরআনুল কারীমের নির্ভুল ব্যাখ্যা দান করে, অনুরূপভাবে তা পেশ করে কুরআনের ধারক ও বাহক মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের পবিত্র জীবন চরিত, কর্মনীতি ও আদর্শ এবং তাঁর কথা ও কাজ, হিদায়াত ও উপদেশের বিস্তারিত বিবরণ। এ জন্যই ইসলামী জীবন বিধানে কুরআনে হাকীমের পরপরই হাদীসের স্থান।

(গ) হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য সম্পর্কে আল্লামা বদরুদ্দীন আল-আইনী (র.) লিখেছেন, "দুনিয়া ও আখিরাতের পরম কল্যাণ লাভই হচ্ছে হাদীস অধ্যয়নের উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য।" আল্লামা কিরমানী (র.) লিখেছেন, "কুরআনের পর সকল প্রকার জ্ঞানের মধ্যে সর্বশ্রেষ্ঠ, সর্বোত্তম এবং তথ্য ও তত্ত্ব সমৃদ্ধ সম্পদ হচ্ছে ইল্মে হাদীস। কারণ এই জ্ঞানের সাহায্যেই আল্লাহর কালামের লক্ষ্য ও তাৎপর্য জানা যায় এবং তাঁর হুকুম-আহকামের উদ্দেশ্য অনুধাবন করা যায়।

(ঘ) আল্লাহ তা'আলা জিবরাঈল আমীনের মাধ্যমে মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর যে অহী নাযিল করেছেন তাই হচ্ছে হাদীসের মূল উৎস। অহী এর শাব্দিক অর্থ - ইশারা করা, গোপনে অপরের সাথে কথা বলা । অহীলব্ধ জ্ঞান দুই প্রকার। প্রথম প্রকার মৌল জ্ঞান - যা প্রত্যক্ষ অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত, যার নাম আল-কুরআন। এর ভাব, ভাষা উভয়ই আল্লাহর, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা হুবহু আল্লাহর ভাষায় প্রকাশ করেছেন। দ্বিতীয় প্রকারের জ্ঞান- যা প্রথম প্রকারের জ্ঞানের ভাষ্য এবং যা পরোক্ষ অহীর মাধ্যমে প্রাপ্ত, এর নাম সুন্নাহ বা আল-হাদীস। এর ভাব আল্লাহর, কিন্তু নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম তা নিজের ভাষায়, নিজের কথায় এবং নিজের কাজ ও সম্মতির মাধ্যমে প্রকাশ করেছেন। প্রথম প্রকারের অহী রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর সরাসরি নাযিল হত এবং তাঁর কাছে উপস্থিত লোকেরা তা উপলব্ধি করতে পারত। কিন্তু দ্বিতীয় প্রকারের অহী তাঁর উপর প্রচ্ছন্নভাবে নাযিল হত এবং অন্যরা তা উপলব্ধি করতে পারতনা।

আখিরী নাবী হিসাবে রাসূল মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম কুরআনের ধারক ও বাহক। কুরআন তাঁর উপরই নাযিল হয়। আল্লাহ তা'আলা তাঁর কিতাবে মানব জাতিকে একটি আদর্শ অনুসরণের ও অনেক বিধি-বিধান পালনের নির্দেশ দিয়েছেন, কিন্তু তা বাস্তবায়নের বিস্তারিত বিবরণ দান করেননি। এর ভার ন্যস্ত করেছেন রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের উপর। তিনি নিজের কথা, কাজ ও আচার-আচরণের মাধ্যমে কুরআনের আদর্শ ও বিধান বাস্তবায়নের পন্থা ও নিয়ম-কানূন বলে দিয়েছেন। কুরআনকে কেন্দ্র করেই তিনি ইসলামের এক পূর্ণাঙ্গ জীবনাদর্শ ও জীবন বিধান পেশ করেছেন। অন্য কথায়, কুরআন মাজীদের শিক্ষা ও নির্দেশসমূহ ব্যক্তি, সমাজ ও রাষ্ট্রীয় পর্যায়ে কার্যকর করার জন্য নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম যে পন্থা অবলম্বন করেছেন তাই হচ্ছে হাদীস।

মিথ্যা হাদীস প্রচার করা এক জঘন্য অপরাধ

১। তোমরা সত্যকে মিথ্যার সাথে মিশ্রিত করনা এবং জেনে শুনে সত্য গোপন করনা। [সূরা বাকারা-৪২]

২। সে যদি আমার নামে কিছু রচনা করে চালাতে চেষ্টা করত, আমি অবশ্যই তার ডান হাত ধরে ফেলতাম এবং কেটে দিতাম তার জীবন-ধমনী। [সূরা হাক্কাহ-৪৪-৪৬]

৩। এ বিষয়ে অন্যান্য সূরার আয়াতসমূহ দেখুন ঃ সাফ-১, নাজম-৩, ৪, মায়িদা-৬০।

৪। রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ দলীল-প্রমাণ ব্যতীত কেহকে ফাতওয়া দেয়া হলে, তার পাপের ভার ফাতওয়া দাতার উপর বর্তাবে। [ইব্‌ন মাজাহ/৫৩-আবূ হুরাইরা (রাঃ)]

৫। আবূ হুরাইরা (রাঃ) থেকে বর্ণিত, রাসূলুল্লাহ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ যে ব্যক্তি কোন দীনের কথা জানার পরে তা গোপন করবে, কিয়ামাতের দিন তাকে আগুনের লাগাম পরানো অবস্থায় উঠানো হবে। [ইব্ন মাজাহ/২৬১]

৬। নাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলেছেন ঃ আমার কথা অন্যদের নিকট পৌঁছে দাও, তা যদি এক আয়াতের পরিমানও হয়। কিন্তু যে কেহ ইচ্ছাকৃতভাবে আমার উপর মিথ্যা আরোপ করল সে যেন জাহান্নামেই তার ঠিকানা নির্ধারিত করে নিল। [বুখারী/৩২০৭-আবদুল্লাহ ইব্ন আমর (রাঃ)]

◻ স্রষ্টার গড়া এ পৃথিবী আজ ভেজাল মানুষে ভরা, সত্য-মিথ্যা মিশ্রিত করে মানুষ আজ বহুরূপ ধারণ করে বসবাস করছে এই মানব সমাজে। মাটির মানুষ যেখানে খাঁটি হবে সেখানে ভেজাল দিয়ে জীবন ও সমাজ বরবাদ করছে। আল্লাহ পশু-পাখি, বৃক্ষ-লতা, আসমান-যমীন, গ্রহ-নক্ষত্র, পাহাড়-পর্বত সব সৃষ্টি করছেন। কিন্তু এরা কেহই স্বজাতির বা স্বশ্রেণীর নিকট ভেজাল রূপে বহুরূপী হচ্ছেনা। তারা স্ব স্ব প্রজাতি ও শ্রেণী সৃষ্টিগত স্বভাব নিয়ে স্রষ্টার সীমারেখায় তাঁরই দেয়া নিয়ম-কানূন মেনে তাঁরই শোকর ও অনুগ্রহ পেশ করছে।

সকলেই যেখানে স্রষ্টার গুণগানে অকৃপণ ও হুকুম পালনকারী সেখানে সেরা সৃষ্টি মানব সন্তান কেবল নাফরমান। অথচ তাদেরই সর্বাপেক্ষা বেশী গুণগানে মশগুল থাকার কথা। অকৃতজ্ঞ মানুষ নির্ভেজাল এই মানব সমাজকে ছল-চাতুরী দিয়ে কৃত্রিমতার জাল বিস্তার করে ভেজালে পরিপূর্ণ করে দিল। শিক্ষা, শিল্প, বানিজ্য, আইন কানূনসহ ইবাদাত বন্দেগীতেও ভেজালে ভরে দিচ্ছে ।

মানুষ কুরআন ও সহীহ হাদীসের সতর্ক বাণীর তোয়াক্কা করছে কি? পার্থিব জীবনেও বেপরোয়া, আর অপার্থিব জীবনেও বেসামাল। পার্থিব জীবনের পংকিলতা থেকে উঠে এসে যখন কেহ ধর্মীয় জীবনে আশ্রয় খুঁজবে নির্ভেজাল সত্যের সন্ধানে সেখানেও রেহাই নেই মিথ্যা ভেজালের দৌরাত্ম থেকে। মানুষ বড়ই লোভী। খুব তাড়াতাড়ি চায় অনেক কিছু পেতে, অনেককে টপকে যেতে, অনেক উঁচুতে উঠতে, যেন তার আকাংখা সবার সেরা। কিন্তু সে তো ভুলে যায় তার সৃষ্টিগত উপাদান মাটি-যার গতি নিম্নগামী। অথচ আগুনের শিখা উর্ধগামী; জিনের সৃষ্টি উপাদান, তবুও যেন তার প্রাপ্তির অতৃপ্ত কামনা। সেটা তো হবার নয়, তবুও যেন হতে চায়। তাই আত্ম প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রেও আশ্রয় ভেজাল। ধর্মের কথা শুনলে অনেক সময় কঠিন পাষাণ হৃদয়ও গলে যায়, তাই অসাধু ব্যক্তিরা ধর্মের নামে ভেজাল দিতে শুরু করল। যেন কিছুটা ফায়দা হাসিল করা যায়।

জাল হাদীস যা আদৌ মহানাবী সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের কথা নয়, তা মহানাবীর সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নামে বয়ান বা বক্তৃতায় উদ্ধৃতি দেয়া হয়। তার মাত্র কয়েকটা উদাহরণ নিম্নে প্রদান করা হল ঃ

(১) হে জাবির আল্লাহ সর্ব প্রথম তোমার নাবীর নূরকে সৃষ্টি করেছেন।

(২) যদি আপনাকে না সৃষ্টি করতাম তাহলে দুনিয়া সৃষ্টি করতামনা।
(৩) আমি নাবী ছিলাম, অথচ আদম তখন পানি ও মাটির মধ্যে ছিলেন।
(৪) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের নূর আল্লাহর নূর হতে সৃষ্টি বা আল্লাহর নূরে মুহাম্মাদ সৃষ্টি, আর মুহাম্মাদের নূরে যমীন সৃষ্টি।
(৫) আল্লাহ (নাকি) বলেন, আমি একটি অচেনা ভান্ডার ছিলাম। আমি পছন্দ করলাম আমাকে যেন চেনা হয়। ফলে আমি সৃষ্টিজগত তৈরী করলাম। অতঃপর তুমি (মুহাম্মাদ) তাদেরকে চিনলে আমার দ্বারা, তারপর তারা আমাকে চিনে ফেলল।
(৬) আমি জ্ঞানের নগরী, আর আলী তার দরজা ।
(৭) আমার সাহাবাগণ তারকা সদৃশ। তাদের যে কারো অনুসরণ করলে সুপথ পাবে।
(৮) আদম (আঃ) মুহাম্মাদ সাল্লাল্লাহু 'আলাইহি ওয়া সাল্লামের অসিলায় দু'আ করেছিলেন।
(৯) ধর্মের ব্যাপারে আমার উম্মাতের মতভেদ রাহমাত স্বরূপ।
(১০) আমার উম্মাতের আলেমগণ বানী ইসরাইলের নাবীদের মত।
(১১) জ্ঞানের সন্ধানে যেতে হলে চীনেও চলে যাও।
(১২) যে ব্যক্তির কোন সন্তান জন্মালো অতঃপর তার নাম মুহাম্মাদ রাখল, এর দ্বারা বারাকাত লাভের জন্য সে এবং তার সন্তানটি জান্নাতে যাবে।
(১৩) যে ব্যক্তি হাজ্জ করল অতঃপর সে আমার কাবর যিয়ারত করল, সে যেন আমার জীবদ্দশায় আমার সাথে সাক্ষাত করল।
(১৪) যে ব্যক্তি কোন পরেহেজগার ব্যক্তির পিছনে সালাত আদায় করল সে যেন একজন নাবীর পিছনে সালাত আদায় করল।
(১৫) আহারকারীর উপর সালাম নেই।
(১৬) যে ব্যক্তি নিজেকে চিনল সে তার রাব্বকে চিনল।
(১৭) যে ব্যক্তি এমন অবস্থায় মৃত্যুবরণ করল, যে যামানার ইমামকে চিনল না সে জাহিলিয়াতের যুগের ন্যায় মৃত্যুবরণ করল।
(১৮) প্রত্যেক নাবীর জন্যই একজন করে তত্ত্বাবধায়ক থাকে, আমার ওয়ারিশ আলী।

উপরোক্ত হাদীসগুলো জাল বিধায় মুসলিম হিসাবে আপনারও কর্তব্য হচ্ছে হাদীসগুলো যাচাই-বাছাই করে বলা। অথচ দীনের পরিশুদ্ধতায় ও গ্রহণযোগ্যতায় কোনটা সঠিক আর কোনটা সঠিক নয় তা যাচাই বাছায়ের কোনই গরজ অনুভব হয়না কেন? দুনিয়ার জীবন আখিরাতের জীবন থেকে বেশী মূল্যবান এই ধারণাটাই আজ এই মিথ্যাচার ও ভ্রষ্টাচার এর কারণ।